সম্পাদকের নিবেদন

স্থায়ী সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হ'ল লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর রচনার চাহিদা বৃদ্ধি। এর বিপরীতও দেখেছি আমরা—লেখকের জীবদ্দশাতে পাঠকরা তাঁর নাম পর্যন্ত ভুলে যান, এমন কি তাঁর মৃত্যু ঘটলে জীবিত লেখকরা পরস্পরকে বিস্মিত প্রশ্ন করেন—'উনি কি এতদিন বেঁচে ছিলেন?' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থের বিক্রী ও চাহিদা যে পরিমাণ বেড়েছে—শিশু-স্বভাব বিভূতিভূষণ বেঁচে থাকলে, শিশুর মতোই আনন্দ প্রকাশ করতেন। এই জিনিস আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরও। সাধারণত যিনি প্রথম বইতেই কেল্লামাৎ করেন, তিনি শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা নামক চঞ্চল জীবটিকে ধরে রাখতে পারেন না—কিন্তু বিভূতিভূষণ সেখানেও ব্যতিক্রম। তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েই গিয়েছে, কমে নি। মৃত্যুর পর আরও বেড়েছে।

সম্ভবত সেই কারণেই—বহুদিন যাবৎ তাঁর একটি সমগ্র রচনাসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বোধ হচ্ছিল। অনেক রসিক পাঠক, লেখক ও সুধী ব্যক্তিও এ অনুরোধ করেছেন বার বার। তার ফলেই এই রচনাবলীর আয়োজন। আমাদের প্রয়াস—তাঁর সমগ্র রচনাই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা। কতদূর সফল হব তা জানি না। এ বিপুল দায়িত্ব। অনেক বইয়ের কপিই দুর্লভ। অনেক রচনা প্রতি সংস্করণে কিছু কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ জমতে জমতে ভোলানাথের ঝুলি হয়ে উঠেছে। আমরা চেষ্টা করছি সেগুলির মৌলিক সংস্করণ সংগ্রহ ক'রে সংশোধন করার। কিন্তু যেখানে মৌলিক সংস্করণেই ভুল থেকে গেছে—লেখক বা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রুফ দেখেন নি বলে—সেগুলির সামান্য কিছু অসঙ্গতি হয়ত কিছুতেই দূর করা যাবে না।

এই রচনাবলীর পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যে সব মনীষীর কাছেই গেছি—তাঁরাই প্রচুর উৎসাহ দান এবং আনুকূল্য করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি অনন্যসুলভ ভূমিকা লিখে দিয়ে এ রচনাবলীর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তিনি যদিও বলেছেন যে, 'এ আমার বন্ধুকৃত্য'—তবুও এই বয়সে সহস্র গুরুতর কর্মের মধ্যেও যে এই পরিমাণ পরিশ্রম তিনি করেছেন—এতে আমরা বিস্মিত, যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ তো বটেই। এ ছাড়া, প্রমথনাথ বিশী, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কাছ থেকেও আমরা প্রচুর উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা লাভ করেছি, সেজন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী এই খণ্ডের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের বিশেষ উপকৃত করেছেন।

লেখকের স্ত্রী পূজনীয়া রমা দেবীও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর সহায়তা ছাড়া এ রচনাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না। তবে এ তাঁদেরও কাজ—এই ভেবেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিরত থাকলাম। ইতি—

॥ সূচীপত্র ॥

বিভূতিভূষণ (সংক্ষিপ্ত জীবনী) …		…	৵৹
বঙ্গভারতী-সঙ্গীতি—"বনশ্রী রাগ" ও বিভূতি বন্দনা—শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়			
ভূমিকা	…	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	২।৵৹
পথের পাঁচালী	…	…	১
মেঘমল্লার	…	…	
মেঘমল্লার	…	…	২৩৭
নাস্তিক	…	…	২৫৬
উমারানী	…	…	২৬৫
বউ চণ্ডীর মাঠ	…	…	২৮৬
নব-বৃন্দাবন	…	…	২৯১
অভিশপ্ত	…	…	৩০১
খুকীর কাণ্ড	…	…	৩১০
ঠেলাগাড়ী	…	…	৩২২
পুঁইমাচা	…	…	৩২৬
উপেক্ষিতা	…	…	৩৩৮
স্মৃতির রেখা	…	…	৩৫৩
আমার লেখা	…	…	৪৩৯
গ্রন্থ-পরিচয়	…	…	৪৪৫

বিভূতিভূষণ

[জন্ম—২৮ ভাদ্র, ১৩০১ : মৃত্যু—১৫ কার্তিক, ১৩৫৭]

'পথের পাঁচালী'র অমর লেখক 'অপু'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁচরাপাড়ার সন্নিকটে ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ২৮ ভাদ্র, ১৩০১ (ইং ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) বুধবার বেলা সাড়ে দশটায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মৃণালিনী দেবী। মৃণালিনী বিভূতিভূষণের পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। বিভূতিভূষণের জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার পিতার খাতায় স্ব-হস্ত লিখিত যে বিবরণ আছে তাহা এইরূপ :

জন্ম পত্রিকা

(শুক্লপক্ষ) ১৩০১ সাল, ২৮শে ভাদ্র বুধবার দিবা ১০। সাড়ে দশঘন্টার সময় আমার বিভূতিভূষণ পুত্রের জন্ম হয়। মুরাতিপুর গ্রামে।

ইংরাজী ১৮৯৪ । ১২ সেপ্টেম্বর । দিবা ৩০।৪২ রাত্র ২৯।১৮

২৮ ভাদ্র বুধবার ত্রয়োদশী ৬০। শ্রবণা নক্ষত্র ১২।৪৫ ইং দিবা ১০।৫৮

কৌলবকরণ অতি গণ্ডযোগ ১২।২২ ইং দিবা ১।৪৮।৪৮ যাত্রা নাস্তি পাপ যোগ ......জন্মে মকর রাশি দেবগণ শূদ্রবর্ণ.........

বিভূতিভূষণের পৈতৃক নিবাস ছিল যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে। গত ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের সময় "র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ" অনুসারে বনগ্রাম মহকুমার বনগ্রাম ও গাইঘাটা অংশ ভারত ইউনিয়নের ভাগে পড়িয়াছে এবং বনগ্রাম মহকুমা পুনর্গঠিত হইয়া চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণের পিতামহ তারিণীচরণ যৌবনে কবিরাজী করিবার জন্য চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রাম হইতে বারাকপুর গ্রামে আসেন। বারাকপুর এবং তৎ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তখন নীল ব্যবসায়ের জন্য খুব বর্ধিষ্ণু। তারিণীচরণ উক্ত গ্রামেই থাকিয়া যান এবং কালে বারাকপুর গ্রামের বাসিন্দা বলিয়া পরিগণিত হন।

তারিণীচরণের পুত্র মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীই বিভূতিভূষণের পিতা। মহানন্দ বারাক-পুর এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একজন খ্যাতিমান সংস্কৃত পণ্ডিত ও কথক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি যৌবনে সংস্কৃত শিখিতে কাশীধামে যান এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি আজমীর, গোয়ালিয়র এবং পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল উদাত্ত ও সুমিষ্ট এবং তিনি সে-যুগের বিখ্যাত কথক উদ্ধব শিরোমণির শিষ্য ছিলেন। তিনি কবিরাজীও কিছুটা জানিতেন। কোনো কোনো জীবনী-লেখক বিভূতিভূষণের পিতাকে গ্রাম্য পুরোহিত বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা

যথার্থ নয়। তাঁহারা পুরোহিত ও কথকের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মহানন্দ যৌবনে রাণাঘাটে মুখোপাধ্যায় পরিবারের হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অধিক বয়স পর্যন্ত মহানন্দের সন্তান না হওয়ায় হেমাঙ্গিনী নিজেই আগ্রহ করিয়া বর্ধমানের খোসবাগ-নিবাসী গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন। গুরুচরণের পৈতৃক নিবাস ছিল মুরাতিপুর গ্রামে। কাঁচরা-পাড়ার সন্নিকটে ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর বিখ্যাত গ্রাম। ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর আউলচাঁদ ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের জন্য বিখ্যাত। বিভূতিভূষণের মাতুলালয়ের কাছেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভিটা ও জন্মস্থান। কাছেই নানা বৈষ্ণবতীর্থ। নিকটেই হালিশহর ও কুমারহট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব ও ঈশ্বর পুরী এবং কবিবর রামপ্রসাদ সেনের জন্ম ও কর্মের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। মহানন্দের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় বঙ্গাব্দ ১২৯৬ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। পাত্রী মৃণালিনী দেবীর তখন বয়স ছিল পূর্ণ ১২ বৎসর। মৃণালিনীর গর্ভেই মহানন্দের জ্যেষ্ঠ সন্তান বিভূতিভূষণের জন্ম হয়।

বিভূতিভূষণের পরে মৃণালিনীর গর্ভে মহানন্দের আরো দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যার জন্ম হয়। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও জন্মতারিখ দেওয়া হইল :

১। ইন্দুভূষণ (১৮ ভাদ্র ১৩০৪) ২। জাহ্নবী (৬ চৈত্র ১৩০৫)

৩। সরস্বতী (১১ আশ্বিন ১৩০৮) ৪। নুটবিহারী (৮ শ্রাবণ ১৩১২)

বিভূতিভূষণের উপনয়ন হয় ১৩১৩ সালের ৫ ফাল্গুন রবিবার, পঞ্চমী তিথিতে, বারাকপুর গ্রামে (ইং ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ সাল)। বিভূতিভূষণের অন্নপ্রাশন ও উপনয়নে খুব ধুমধাম হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

বিভূতিভূষণের প্রথমে শিক্ষা শুরু হয় গৃহে পিতার নিকটেই। শোনা যায় বিভূতিভূষণের জন্য প্রত্যহ একটি করিয়া "বর্ণ পরিচয়" লাগিত। প্রত্যহ একটি করিয়া নূতন "বর্ণ পরিচয়" দিয়া বালকের পাঠ আরম্ভ হইত—সন্ধ্যায় সেই বইয়ের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। তখন "বর্ণ পরিচয়"-র মূল্য ছিল এক পয়সা। মাসের প্রথমেই মহানন্দ সাড়ে সাত আনা পয়সা দিয়া এক মাসের "বর্ণ পরিচয়" কিনিয়া রাখিতেন।

বিভূতিভূষণ বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে প্রথমে গ্রামে হরি রায়ের পাঠশালায় তারপর হুগলি জেলায় সাগঞ্জ-কেওটায় এবং পিতার কলিকাতা প্রবাসকালে বৌবাজার আরপুলি লেনের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সেই সঙ্গে পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই পিতার নিকটে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত হয় এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ হয়।

বহু কষ্টের মধ্য দিয়া বিভূতিভূষণকে স্কুলের ছাত্রজীবন শেষ করিতে হয়। পিতা সংসারী ছিলেন না। কবিমন-সম্পন্ন ভবঘুরে উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বৎসরের বেশির ভাগ সময় তিনি বাড়ি থাকিতেন না। কথকতা-কার্য-ব্যপদেশে এবং শুধু ভ্রমণ করিবার

নেশাতেও তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পুত্র বিভূতিভূষণও পিতার নিকট হইতে এই ভবঘুরে স্বভাব ও ভ্রমণের নেশা পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিলেন। পিতা উপার্জনে উদাসীন ছিলেন সেজন্য সংসারে দারিদ্র্য অনটন লাগিয়াই ছিল। বিভূতিভূষণের বাল্য এবং কৈশোরকাল দারিদ্র্য অভাব-অনটনের মধ্য দিয়াই কাটে। তিনি দুইবেলা হাঁটিয়াই স্কুলে যাইতেন। এই সময়েই গ্রাম-বাংলার পল্লীপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁহার চোখে মায়াজাল বুলায়। পথের দুই পাশের শ্যামশোভা তাঁহার নিসর্গপ্রীতি বর্ধিত করে। তারপর গৃহ-শিক্ষকতার বিনিময়ে এক ভদ্রলোকের গৃহে কিছুকাল এবং বনগ্রাম স্কুলহোস্টেলে থাকিয়া তাঁহার পাঠ্য-জীবন শেষ করেন।

বিভূতিভূষণের বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া একটা গল্পকথার মতো ঘটনা। পিতা গৃহে থাকিতেন না। মাতারও অভাব-অনটনের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা দিবার উচ্চাশা ছিল না। পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলেদের দেখিয়া বিভূতিভূষণের অন্তরে বনগ্রামে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে প্রবল বাসনা হয়। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে ইংরাজি বছরের মাঝামাঝি তিনি বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে যান। অর্থাভাবে মা "লক্ষ্মীর ঝাঁপি" হইতে সিঁদুর-মাখানো টাকা দেন। তৎকালে হেডমাস্টার ছিলেন ৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার বহু বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা এবং ইতিহাসে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের ক্ষুধা জাগ্রত হয় সেজন্য সচেষ্ট ছিলেন।

বিভূতিভূষণ বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে গিয়া দুই দিন তো ভয়েই স্কুল কম্পাউণ্ডের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তৃতীয় দিন প্রধান শিক্ষক ৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নজরে পড়ায় তিনি দপ্তরী দ্বারা বিভূতিভূষণকে স্কুলের মধ্যে ডাকিয়া আনেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় সিঁদুর-মাখানো টাকা দেখিয়া জেরা করিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারেন এবং বিভূতিভূষণকে বেতন দিবার হাত হইতে রেহাই দেন। বিভূতিভূষণ তাঁহার সাহচর্যে আসিয়া বহু বিষয়ে উপকৃত হইয়াছিলেন। এই কালেই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁহার মাথায় আসিয়া পড়ে। ১৯১৪ সালে বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে কলিকাতা রিপন কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯১৮ সালে উক্ত কলেজ হইতে ডিস্টিংশনে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কিছুকাল তিনি ও শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী এম এ. এবং ল-ক্লাসে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

বিভূতিভূষণ যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন বসিরহাটের মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহিত জীবন এক বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। এক বৎসরকাল পরেই গৌরী দেবী বিসূচিকা রোগে অকালে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার লেখাপড়ায় সমাপ্তি ঘটে এবং তিনি হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়ায় মাইনর স্কুলে শিক্ষকের চাকুরি গ্রহণ করেন। জাঙ্গীপাড়ার জমিদার-বংশের এক সহপাঠী বন্ধু তাঁহাকে ওখানে লইয়া যান। প্রথম পত্নী-বিয়োগের পরে তিনি তখন শোকে কাতর ছিলেন। সেখানে বেশীদিন মন টিকিল না।

জাঙ্গীপাড়া হইতে শিক্ষকতার কার্য লইয়া সোনারপুর হরিনাভিতে যান। এখানেই ঘটনাচক্রে তাঁহার সাহিত্যিক-জীবনের উন্মেষ ঘটে। তাহা তিনি স্বলিখিত ভাষণ "আমার লেখা"য় বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে থাকিতেই তাঁহার প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা" 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় (বঙ্গাব্দ মাঘ, '৩২৮)। মাঝে কিছুকাল তিনি "গোরক্ষিনী-সভার" ভ্রাম্যমাণ প্রচারক হিসাবে বঙ্গ আসাম ত্রিপুরা এবং নিম্ন বর্মার আরাকান অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণের কাহিনী তাঁহার "অভিযাত্রিক" গ্রন্থে আছে। খেলাত ঘোষের বাড়িতে সেক্রেটারীর কায ও গৃহ-শিক্ষকতা এবং খেলাত ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হিসাবে ভাগলপুর সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কায করিলেও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রধানত শিক্ষকতাই করিয়া গিয়াছেন। জাঙ্গীপাড়া এবং সোনারপুর হরিনাভিতে শিক্ষকতা এবং মাঝে বিভিন্ন কার্যে যোগদান করিয়া আবার ১৯৪১ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত খেলাতচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। যুদ্ধের সময় ওখানের চাকরি ছাড়িয়া দেশে চলিয়া যান। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন অবধি গোপালনগর স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে তিনি কিছুদিন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। বস্তুত এই সময়ই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ আরম্ভ হয়। স্ত্রীর চিন্তাতেই তিনি গভীর ভাবে পরলোকতত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু করেন।

প্রথমা স্ত্রীর পরলোকগমনের বহুদিন পরে বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০) ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁও নিবাসী ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা রমা দেবীকে (ডাকনাম কল্যাণী) বিবাহ করেন। বিবাহের সাতবৎসর পরে পুত্র তারাদাস (ডাকনাম বাব্‌লু) জন্মগ্রহণ করে। তৎপূর্বে রমা দেবী দুইটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ দশ বৎসর বিভূতিভূষণ তাঁহার অতিপ্রিয় বারাকপুর গ্রামে সস্ত্রীক বাস করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের পৈতৃক ভিটার কাছে একটি পুরানো একতলা বাড়ি ক্রয় করেন। ১৯৪২ সালে সেই বাড়ি মেরামত করিয়া সস্ত্রীক সেইখানে আসিয়া ওঠেন। উক্ত বাড়ির বারান্দার আচ্ছাদন হিসাবে খড় ব্যবহার করা হইয়াছিল। তিনি পাকা ছাদ করিতে দেন নাই। বারান্দায় একটি ঠেস-দেওয়াল ছিল। বিশ্রামের নিরল মুহূর্তগুলিতে ঠেস-দেওয়ালে হেলান দিয়া তামাক খাইতেন এবং গল্পগুজব করিতেন।

বিভূতিভূষণের প্রিয় ফল ছিল আম ও কাঁঠাল। তিনি চাঁপা, বকুল এবং শেফালি ফুল ভালোবাসিতেন। বন্যপুষ্পের মধ্যে ঘেঁটু ও ছোট এড়াঞ্চি ফুল তাঁহার প্রিয় ছিল। তাহা ছাড়া দীর্ঘশীর্ষ বনস্পতি তাঁহাকে খুব আকর্ষণ করিত। মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনই তিনি ভালো-বাসিতেন। বিস্তৃত দিগন্ত দেখিতে তাঁহার ভালো লাগিত। অধ্যয়ন তাঁহার নেশা ছিল। সাহিত্য ছাড়াও—আকাশতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার বই তাঁহার প্রিয় ছিল। শেষের দিকে পরলোকতত্ত্বের বই সম্বন্ধে তিনি খুব আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ বিষয়ে

আলোচনা করারও ঝোঁক ছিল খুব। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আলোচনা পছন্দ করিতেন। এবং সর্বদাই এই সকল বিদ্যা সম্পর্কে অপরকে উৎসাহিত করিতে চাহিতেন।

বাংলা বইয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। সারা গৃহে নানাবিধ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ছড়ানো থাকিত। বই-পত্র আলমারিতে গুছাইয়া রাখা পছন্দ করিতেন না। যখন-তখন যে-কোন বই পড়ার ইচ্ছা হইলে যাহাতে হাতের কাছে পান—বোধ হয় সেই জন্যই।

তাঁহার মন বরাবরই ঈশ্বরাভিমুখী ছিল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরেরই মহিমা দেখিতেন। শেষজীবনে এই ভক্তি ও বিশ্বাস প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। বেশীক্ষণ কোথাও বৈষয়িক বা জড়জাগতিক আলোচনা হইলে হাঁপাইয়া উঠিতেন, বলিতেন, 'আসুন, একটু ভগবানের কথা আলোচনা করা যাক।'

বিভূতিভূষণ অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া, গ্রামে থাকিলে শীত বা গ্রীষ্মে যে ঋতুতেই হোক "ইছামতী" নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া লিখিতে বসিতেন। প্রথমে দিনলিপি লিখিতেন ও চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। ৭টা-৭॥টার মধ্যে চা-সংযোগে প্রাতরাশ সারিতেন। ৯টা-৯॥টার মধ্যে আহার সারিয়া একটি সদ্য-ভাঙা গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি হাতে লইয়া গোপালনগর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে যাইতেন। আবার বৈকালে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পরে "ইছামতী"র বা বাঁওড়ের ধারে কোন কর্তিত বৃক্ষকাণ্ডের উপরে গিয়া বসিতেন। নীরবে বসিয়া আকাশের নব-নব মায়ারূপ ও রক্ত-সন্ধ্যার শোভা দেখিতেন। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়া পড়িতে আসিত। তিনি সানন্দে তাহাদের পড়া বলিয়া দিতেন। গল্প বলিতেন। অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই বিভূতিভূষণ রাত্রির আহার সম্পন্ন করিতেন। আহারের পর কোনো কোনো দিন গল্প-গুজব করিতে বাড়ির বাহিরে যাইতেন। রাত্রি ১২॥টা-১টার আগে তিনি কখনো ঘুমাইতে যাইতেন না। আকাশের নৈশশোভা দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইয়া যাইত। এই সময়ে গুনগুন করিয়া স্বরচিত গান গাহিতেন। সে-সব গান কেহ লিখিয়া রাখে নাই। অনেক সময় কান পাতিয়া কীট ও পতঙ্গের গুঞ্জন শুনিতেন। তাঁহার প্রতিদিনের জীবনচর্যায় একটা সুন্দর ছন্দ ছিল।

তিনি এই সাধারণ জীবন হইতে, সাধারণ মানুষের মধ্য হইতেই তাঁহার সাহিত্যের প্রাণরস আহরণ করিতেন। 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে তিনি একবার দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছিলেন: 'আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে—আসল জিনিসটা সেখানে কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কষা, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরী করা—আমি মানি না। নইলে কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ, সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না।' (পরিচয় ১ম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৪৩৩)

এই সময় বারাকপুর ছাড়াও আর একটি স্থানের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগ হইয়াছিল। বৎসরের অনেকখানি সময় সেখানেই কাটিত।' বিভূতিভূষণের ঘাটশীলা ও গালুডির সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে। পরে তিনি ঘাটশীলায় একটি বাড়ি ক্রয় করেন এবং প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিস্বরূপ তাহার নাম দেন "গৌরীকুঞ্জ"।

১৯৪২ সালে বারাকপুর গ্রামে সংসারী হইয়া বাস করিবার কালে বিভূতিভূষণ বৎসরের কয়েক মাস ঘাটশীলায় গিয়া অবকাশ যাপন করিতেন। প্রধানত পূজার প্রাক্কালে—পূজার কয়েকদিন পূর্বে অথবা পূজার মধ্যে ঘাটশীলা গিয়া মাঘের শেষে অথবা ফাল্গুনের প্রথমে দেশে ফিরিতেন। সে-সময় ঘাটশীলায় পূজাবকাশে বহু জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ ঘটিত। অনেক সাহিত্যিক বন্ধুও সেখানে আসিয়া মিলিত হইতেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীযুক্ত সুমথ-নাথ ঘোষ, নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক ছুটিতেই ঘাটশীলা যাইতেন। বিভূতিভূষণ ঘাটশীলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নির্জনে ভ্রমণ করিতে ভালোবাসিতেন। এঁদেলবেড়ের জঙ্গল তাঁহার অতি প্রিয় ভ্রমণের জায়গা ছিল। তিনি সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ধারে, পাণ্ডবশীলা, কাছিমদহ রাত-মোহানায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ফুলডুংরি পাহাড়ের পিছনে এক শীলাসন তাঁহার উপাসনার প্রিয় স্থান ছিল। বাড়ির কাছে একটি শিলাখণ্ডও তাঁহার খুব প্রিয় ছিল—অনেকটা কূর্মাকৃতি বলিয়া তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন 'কূর্মকূট'। বিভূতিভূষণেরই আগ্রহাতিশয্যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ এবং তাঁহার মিতা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (চালকীর) ওখানে বাড়ি কেনেন।

১৯৪২-৪৩ সাল হইতেই তিনি তাঁহার বন্ধু এবং বিহার সরকারের বন-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার সঙ্গে ছোটনাগপুর বিভাগের সিংভুম, হাজারীবাগ এবং রাঁচী ও মানভূম জেলার অরণ্য ভ্রমণ করেন। তিনি দুই-একবার সারান্দা বনের বিভিন্ন নিভৃত অরণ্য-আবাসে (ফরেস্ট রেস্ট হাউস) সস্ত্রীকও বাস করিয়াছেন। তাহার ফলে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁহার 'দিনলিপি'তে এবং 'বনে পাহাড়ে' ও 'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষ হয় পিতার নিকট হইতে। পিতা মহানন্দর সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং তিনি কথকতা করিতেন পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়া তিনি কবিতাও রচনা করিতেন। কয়েকখানি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর-চরিত্রে তাঁহার চরিত্রের অনেক ছায়া পড়িয়াছে। বিভূতিভূষণের জবানীতে লেখা মহানন্দর স্বরচিত কুল-পরিচয়-জ্ঞাপক কবিতা এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল :

"কুল পরিচয়"

'কুল পরিচয় মম শুন সর্ব্বজন।
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হই ব্রহ্ম-পরায়ণ ॥

ফুলিয়া খড়দহ সর্ব্বানন্দী আর।
বল্লভী নামেতে আছে বাঁধা মেল চার॥
খড়দহ মেলে থাকি কুলে বড় খাঁটি।
বিভূতিভূষণ নাম আমি বন্দ্যঘাটী॥
নবাই সবাই আর বিখ্যাত সুন্দর।
ছিলেন পূর্ব্ব পুরুষ তিন সহোদর॥
সুন্দরের বংশাভাব এই কথা খ্যাত।
নবাই সন্তান নানাস্থানে পরিচিত॥
মধ্যম সবাই বড ধর্ম্ম-পরায়ণ।
তস্য বংশধর আমি করহ শ্রবণ॥
ভাবে ভঙ্গ নহে ব্যঙ্গ প্রবরেতে তিন।
শাণ্ডিল্য গোত্র মম কভু নহি হীন॥
কুলীনের পরিচয় আর কত চাও।
মেকীটাকা নহি আমি বাজাইয়া লও॥'

পিতার নিকটেই বিভূতিভূষণ পাঁচ বৎসর বয়স হইতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে শুরু করেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পিতার কবি-মন, লিখিবার শক্তি, তীব্র অনুভূতি এবং ভ্রমণ করিবার নেশা তাঁহার সাহিত্যিক-জীবনে প্রেরণা যোগায়। বিভূতিভূষণও পিতার অনুকরণে অতি বাল্যবয়স হইতে খাতায় পালা লিখিতে শুরু করেন। পিতার অনুকরণে তিনি বারাকপুর গ্রামের গাছপালা ও বাঁশঝাড়কে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়া কথকতা করিতেন।

শৈশবে 'বঙ্গবাসী' কাগজের গ্রাহক হওয়ায় পৃথিবীর অনেক বিষয়ের দ্বার বিভূতিভূষণের নিকট খুলিয়া যায়। তাহা ছাড়া পিতা মহানন্দর পুস্তক-সংগ্রহে ও বাতিক ছিল। তিনি পুত্রকে নানা জায়গা হইতে পুস্তক আনিয়া দিতেন। কথকতা করিতে যাইবার সময় কখনও কখনও মহানন্দ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ফলে বিভূতিভূষণের মনে অধ্যাত্ম-চেতনা এবং ভ্রমণের নেশা গড়িয়া ওঠে। এইরূপ ঘোর অনটন এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁহার সাহিত্যে অন্তপ্রেরণা ও কবি-মনের বিকাশলাভ ঘটে। বনগ্রামে আসিয়া বিদ্যালয়-পাঠাগার এবং সুপণ্ডিত হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভে দিন-দিনই তাঁহার পঠনস্পৃহা বর্ধিত হয়। এই সময়ে স্কুল-ম্যাগাজিনে এবং বিবাহবাড়ির অনুরোধে দুই-চারিটি পদ্যও লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বিভূতিভূষণের প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে। বঙ্গাব্দ মাঘ ১৩২৮-এ তাঁহার প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা" 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। "উপেক্ষিতা"র গল্পলেখক হিসাবে তিনি বঙ্গবাণীর দেউলে প্রবেশ করেন। 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' "মেঘমল্লার" শীর্ষক রচনায় এ-বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভাগলপুরের "বড় বাসায়" তিনি ৩ এপ্রিল ১৯২৫-এ 'পথের পাঁচালী' রচনা শুরু করেন। উহা শেষ হয় ২৬ এপ্রিল ১৯২৮ সালে।

মৃত্যুর পাঁচ-সাতদিন পূর্বে পূজার অবকাশে "শেষ লেখা" গল্পটি লিখিয়া শেষ করেন। মৃত্যুর পর উহা তাঁহার লিখিবার বাক্সে পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণ প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এবং প্রকৃত সাধকের মতো তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। খ্যাতি ও অর্থ আসিয়া তাঁহার সাহিত্য'-সাধনাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। জীবনের শেষ দশ বৎসর বিভূতিভূষণ তাঁহার সাধের ব্যারাকপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি অজস্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'অনুবর্তন', 'দেবযান', 'অশনিসংকেত', 'ইছামতী' প্রভৃতি একালেই লিখিত হয়। বহু সার্থক ছোট গল্পও এ সময়ে রচনা করেন। এই কালেই তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তান বাব্‌লু বা তারাদাস জন্মলাভ করে। বাণীর বরপুত্র প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ ঘাটশীলায় স্বগৃহে ১৫ কার্তিক বুধবার, ১৩৫৭ (১ নভেম্বর, ১৯৫০) সালে রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন।

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

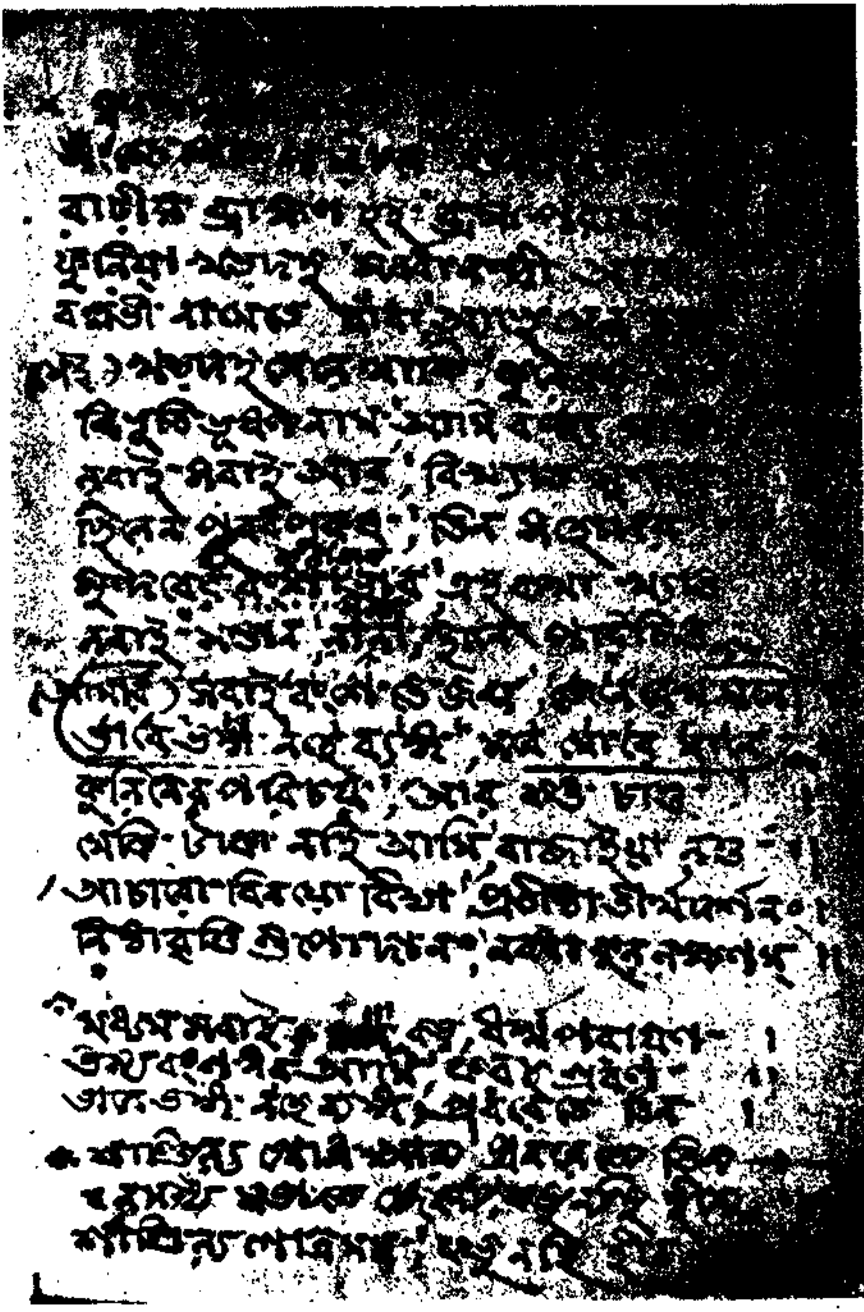

বিভূতিভূষণের কুল পরিচয়
বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সঙ্গীতসংগ্রহের খাতা হইতে সংগৃহীত

সন জন্ম — পত্রিকা।
(শুক্ল পক্ষ) ১৩০১ সাল ২৮ ভাদ্র
বুধবার দিবা ১০।। সাড়ে দশ ঘণ্টার
সময় আমার বিভূতি ভূষণ পুত্রের
জন্ম হয় ।। মুরাতিপুর গ্রামে
ইংরাজী ১৮৯৪। ১২ সেপ্টেম্বর।
দিবা ৩০।৪২ রাত্রি ২৯।১৮

২৮ ভাদ্র বুধবার ত্রয়োদশী ৩০।১০
শ্রবণা নক্ষত্র ১২।৪৫ ইং দিবা ১০।৫৮
।০ কৌলবকরণ ততি গণ্ডযোগ ১২।২২
ই০ দিবা ১।৪৮-১৪৮ যাত্রামাত্রে পাপ
যোগ পূর্ব্বদিনের রাশির ভাব ৪৫।৪৩
পল ফুল্ল মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ
মকর দিনের তারা এই মকর রাশির চন্দ্র
শুদ্ধ পূর্ব্বদিনের তারা ভাব ১২।৪৫ প,
২৪।২৫।২৭।২৮।৩।৭।৯।১১।১৩।১৫।১৬।
১৮।২০।২২ এই সকল নক্ষত্রের তারাশুদ্ধ -
সাধুজন্ম নামকরণ বিভূতিভূষণ সুখ্যাতি
শব প্রবৃত্তি।। জন্মে মকর রাশি দেবগণ;
শূদ্রবর্ণ বৃহস্পতির দশা, ১২।৪৫ পল
দেবারিগণ রাক্ষস দশা ৪৫।৪৩ পল পূর্ব্ব
রাশি বৈশ্যবর্ণ দাঙ্গিল যোগিনী বলেবো
২ প্র, প, ৪ দণ্ড, আর ২ প্র প, ৪ দণ্ড যাইবা
রা ৩ প্র, পল ৪ দণ্ড, প্রবল বাদশী রেপারণ,

শ্রী মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী কমক।
সাং - বারাকপুর। মহকুমা বনগ্রাম

বিভূতিভূষণের জন্মপত্রিকা

পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীর স্বহস্তে লিখিত সঙ্গীতসংগ্রহের পাতা হইতে গৃহীত

বঙ্গ-ভারতী-সঙ্গীতি—"বনশ্রী-রাগ" ও বিভূতি বন্দ্য

(বঙ্গাব্দ ১৩০১-১৩৫৭ , খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৪-১৯৫০)

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[ক]

"মহীদাস আরণ্যক"

ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে নোতুন পদ্ধতিতে সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন আর চিন্তাধারার আলোচনার আবির্ভাবের ফলে, খ্রীষ্টীয় উনিশের শতকের গোড়ার দিক্ থেকেই প্রথমটায় বাঙালীর মনে একটা পুনর্জাগৃতি দেখা দেয় (যে পুনর্জাগৃতি কিছু পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অপরিহার্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে)। সেই পুনর্জাগৃতির যুগে, সারা উনিশ শতক ধ'রে—বিশেষ ক'রে উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, আর কুড়ির শতকের অনেক ধ'রে—বাঙালীর চিত্তে, বাঙালীর ভাবজগতে, বাঙালীর দৃষ্টিতে, বাঙালীর মানসিকতায়, বাঙালীর আধ্যাত্মিকতায়, বাঙালীর বিশ্ব-ভাবনায় একটা যুগান্তর এসে যায়। এই যুগান্তরের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া বাঙালীর সাহিত্যে আমরা দেখ্‌তে পাই। ১৮৪০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই দশোত্তর-শত বৎসরের বাঙ্‌লা সাহিত্য এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এই ১০০/১১০ বৎসরের ভিতরে বাঙালীর মধ্যে যেভাবে এতগুলি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক—কবি, ঔপন্যাসিক, কথাকার, দার্শনিক ও চিন্তানেতা, ঐতিহাসিক, নিবন্ধকার, অনুবাদক, নাট্যকার আর প্রয়োগকার, রূপদক্ষ, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, বাগ্মী, রাজনৈতিক, ধর্মনেতা, জনসেবক, সংস্কারক প্রভৃতি দেখা দিয়েছেন, তেমনটি পৃথিবীর ইতিহাসে সুদুর্লভ। বাঙ্‌লা দেশের খ্রীষ্টীয় ১৯ ও ২০ শতকের এই অপূর্ব ও অভাবনীয় মানসিক বাচনিক ও কার্মিক সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনায় অনুরূপ দেশ ও কাল খুঁজে বা'র করা সহজসাধ্য নয়—আমার মনে হয় যে (আর অনেক চিন্তাশীল ঐতিহাসিক ব্যক্তিও আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত)—প্রাচীন গ্রীসের খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের আথেনাই বা আথেন্স নগরী, আর আধুনিক যুগের সূত্রপাতের সময়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইউরোপের লণ্ডন ও পারিস নগরীদ্বয়, এই তিনটি নগরের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বৈভবের সঙ্গে একমাত্র ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের কলকাতার আর বাঙ্‌লা দেশের মানসিক আর সাহিত্যিক বৈভবকে সমপর্যায়ের ব'লে উপমিত করা যেতে পারে। নানা প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে, আর সাম্প্রতিক কালে বাঙালী রাজনৈতিক দলগুলির মূর্খ ও অন্ধ মারমুখী আত্মহনন-প্রবৃত্তির অপ্রতিহত প্রভাবের ফলে, এ যুগের সব দিকেই বাঙালী নিজের প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে প'ড়েছে, সব দিকেই তার পরাজয় হ'চ্ছে। কিন্তু এখনও বাঙালীর মনের উৎকর্ষটুকুর ছিটেফোঁটা যা অবশিষ্ট আছে, সেটুকুকে, কেবল তার সাহিত্যেই, বিশেষ ক'রে তার গদ্য সাহিত্যেই, কোনও ক্রমে বাঙালীর মনীষী সাহিত্যিকরা জীইয়ে রাখ্‌তে পেরেছেন।

* * *

এই যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস লিখ্‌তে ব'সবো না। কতকটা প্রসঙ্গানুকূল হ'লেও, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-গৌরব বিষয়ে নিজের ছুটো অনুভূতি বা বোধ-বিচারের কথা ব'লতে গেলে, একটু অবান্তর হয়ে প'ড়বে। একথা সত্য যে পৃথিবীর সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আর অন্ত লেখকেরা কিছু-না-কিছু নোতুন জিনিস, নবীন বস্তু—নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রকাশ-ভঙ্গী, নূতন তথ্যের আবিষ্কার অথবা নূতন তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন ক'রে থাকেন, আর তার দ্বারা নিজের দেশের মানুষের চিত্তকে আর দেশের সাহিত্যকে আরও ঐশ্বর্য্যবান্ ক'রে তোলেন, রসানুভূতির নূতন উৎস খুলে দেন। মধুসূদন, নবীন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আর এঁদের মতন আর সকলের কৃতিত্ব তো এইখানেই—সকলেই কোনও-না কোনও অভিনব কুসুম নিজের-নিজের চিত্তোদ্যান থেকে চয়ন ক'রে বঙ্গ-ভারতীর তথা ভারত-ভারতীর, এবং এমন কি বিশ্ব-ভারতীর বেদিতে অর্পণ ক'রে ধন্য হয়েছেন, মানবকেও ধন্য ক'রেছেন। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী কবি ও ভাবুক, সত্যদ্রষ্টা ও চিন্তানেতার কথা তো বলাই বাহুল্য, আমরা সকলেই তাঁদের মহত্ত্ব আর গৌরব বুঝি, সহৃদয় রসবিৎ মানুষের মনে এঁদের সম্বন্ধে সীমিত-দৃষ্টির "অনীহা" কখনও আসবে না। বিশ্বসাহিত্যের সম্বন্ধে যাঁদের মনে আগ্রহ আছে, সঙ্কীর্ণ দলাদলির ক্ষণিকের স্বার্থকে সার বস্তু ভেবে পরম আর চরম সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা যাঁরা হারান নি, তারা কখনও এঁদের দানের এঁদের মর্যাদার মূল্য ভুলবেন না।

* * *

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম আর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা "পথের পাঁচালী" প্রকাশিত হয়, আর এই বই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয়ে যায়। তার পরে তাঁর অবশিষ্ট জীবনে প্রায় ৫১ খানি বই তিনি লিখে যান, এগুলির মধ্যে ৭।৮ খানি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। আর তা ছাড়া অন্য কিছু লেখা এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। সমষ্টি ধ'রলে, তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব নগণ্য নয়, আর তাঁর কৃতি এই সাহিত্য-সম্ভারকে বাঙ্‌লা দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রগতির বা উন্নতির ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় "অবদান" অর্থাৎ পুণ্যকীর্তিই ব'লতে হয়। অবদান বা পূত-চরিত্রের প্রসঙ্গ বা আলোচনায় সহৃদয় মানুষের মন এক অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হয়, তার ব্যক্তিত্বেরও উন্নয়ন হয়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক অবদানের লক্ষণ কি, তার বিশিষ্টতা কোথায়? এ বিষয়ে সাহিত্যিক-জগতের বিশেষজ্ঞরা চুল-চেরা বিচার ক'রছেন, আরও ক'রবেন, এবং তাঁরা নিজ নিজ নিকষ বা বিচার কৌতূহলী পাঠকের কাছে নিবেদন ক'রবেন। বিভূতিভূষণ লেখক হিসাবে বিশ্বজয় ছিলেন না, একথা বললে তাঁর গৌরবের কোনও হানি হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না—শুধু তাঁর সম্বন্ধে কেন, পৃথিবীর মাত্র সাত-আটটি বিরাট মনীষাপূর্ণ, মানসিকতায় ও মানবিকতায় পূর্ণ মানব ভিন্ন আর কারও সম্বন্ধে বলা চলে না (যেমন গ্যোটে, শেক্‌স্পিয়র, লেওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, অশোক, আলেক্‌সান্দর, সোক্রাতেস্, বুদ্ধ, মানবজাতির মধ্যে যাঁদের প্রতীক-শ্রেণীর ব'লে

গণনা করা হয়)—যে, সব কিছুর অন্তরে ছিল তাঁর প্রবেশ, আর তিনি জানতেন জানবার মত সব কিছুই—"স সর্বজ্ঞঃ সর্বমাবিবেশ।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবজীবনের সর্বপ্রকার প্রকাশ সম্বন্ধে, সাহিত্যের সমস্ত বিভাগ সম্বন্ধে "শতাবধানী"—একসঙ্গে বহু বল্গা বহু সূত্র ধ'রে চ'লতে পারতেন। এ ছাড়া সঙ্গীত, নাট্য, অভিনয়, শিক্ষা, উপদেশ, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক চিন্তা, বিশ্বজনের জীবন-স্পন্দনের সঙ্গে সংযোগ—এইরূপ কত বিষয়ে ছিল তাঁর সক্রিয় আগ্রহ। কয় জন লোকের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়? কিন্তু অন্য মহান্ ব্যক্তিত্বশালী লেখক বা অন্য কর্মক্ষেত্রের কর্মী, প্রকাশভূমির জ্যোতিষ্ক যাঁরা, তাঁদের প্রতিভা বহুমুখী না হ'তে পারে—না হ'লে ক্ষতিও নেই, কিন্তু দুই-একটি বিষয়ে তাঁদের এমন একটি কৃতিত্ব এমন প্রাধান্য এমন শক্তি থাকবেই, যেটিতে বা যেগুলিতে তাঁদের "একপত্রী" বলা যেতে পারে, আর সেখানেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের মৌলিকতা।

* * *

বিভূতিভূষণ আর সমস্ত সার্থক-কর্মা দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন লেখকের মত এই দুইটি প্রধান বিষয় বা বস্তু নিয়েই তাঁর যা কিছু বল্‌বার তা ব'লে গিয়েছেন। সে দুইটি বিষয় হ'চ্ছে—(১) প্রকৃতি, আর (২) মানুষ। Nature and Man: মানুষের অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা, যা পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যেই সীমিত, তা এই দুইটির বাইরে আর কোথাও ঠাঁই পায় না। প্রকৃতি আর মানুষের পিছনে, তার আধার বা পটভূমিকা-রূপে অবস্থিত একটা Ultimate Reality বা পরম বা চরম সত্তার সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনের গভীরে একটা আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ আছে। আবার সেই আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ অনেকের মনে বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে বিজড়িত, বিশ্বজগৎকে অতিক্রম ক'রে আর সঙ্গে সঙ্গে তাতে অন্তর্নিহিত থেকে বিদ্যমান আর কার্য্যকর এক ঐশী শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থার রূপ গ্রহণ ক'রে থাকে। এই আস্থা বা বিশ্বাস, ভৌতিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা মানসিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়তো অসম্ভব, কিন্তু উপলব্ধি আর অনুভূতির মাধ্যমে তা সহজ এবং প্রমাণিত সত্য ব'লেই প্রতিভাত হয়। যাঁদের মনে এই ভাব দৃঢ় বা বদ্ধমূল হ'য়েছে, তাঁরা সন্দেহবাদী সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী নন, তাঁরা বিশ্বাসী বা আস্থাশীল; পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধ দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের অতীত এই সত্তাকে অংশতঃ অথবা পূর্ণতঃ উপলব্ধ বা অনুভূতি-গ্রাহ্য ক'রতে তাঁরা সমর্থ হ'য়েছেন—এরূপ আত্মবিশ্বাস অথবা আত্মতৃপ্তির অধিকারী তাঁরা হ'য়েছেন। তাঁদের সঙ্গে বিরোধের কোনও অর্থ হয় না, কারণ এটি হ'চ্ছে মূলতঃ ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের কথা, যে প্রত্যয়ের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁদের মনে ও ভাবনায় কোনও দ্বিধা বা সংশয় নেই। অবিশ্বাসী সজ্জনের পক্ষে, অন্ততঃ সৌজন্যের সঙ্গে, নিজেদের পূর্ণজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে, বিশ্বাসী মনের এই সংশয়হীনতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করা উচিত হবে। বিভূতিভূষণের চিত্ত আর অনুভূতি বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে, ভূমিশ্রীর সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে' ছিল। শিশুকাল থেকেই তিনি বাংলার পল্লীশ্রীর মধ্যে এমনভাবে মানুষ হ'য়েছিলেন যে, সত্যই তিনি নিজের সত্তাকে নিজের আত্মাকে বনের মধ্যে গাছপালা নদনদী পাহাড়পর্বত

কল্পনা-চিন্তার মধ্যে যেন ঢেলে দিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর অপূর্ব বই "রামায়ণী কথা"য় রামায়ণ অবলম্বন ক'রে সীতার সম্বন্ধে যে লিখেছিলেন—"বন-দর্শন-বিস্মিতা প্রকৃতি-প্রিয়া সীতা হরিৎ-ছদ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদিনী হইয়া পড়িলেন।" আমরা "দিব্যোন্মাদ" শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, তার অর্থ আর দ্যোতনা বুঝি, কিন্তু "বনোন্মাদ", এই শব্দটিকে "দিব্যোন্মাদ" শব্দের সঙ্গে এক পর্য্যায়ের-ই ব'লতে হয় ;—অরণ্যানীর সৌন্দর্য্যে, বনস্পতি-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-পত্র-পুষ্পের মধ্যে যে রসানুভবের উৎস আছে, সাধারণ জীবনের মধ্যেই তার উপলব্ধি আর সেইজন্য অপার্থিব আনন্দের এক পূর্ণ অনুভূতি, আর সেই অনুভূতির মধ্যে বিশ্ব-প্রপঞ্চের অন্তরালে অবস্থিত পরম-সত্তার আভাস—এ-সমস্ত যেন "বনোন্মাদ" শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে। বিভূতিভূষণকে এই ভাবের বনজঙ্গল, গাছপালা, তরুলতা, ফুলফল, জলপাহাড় নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকা, এক প্রকারের দিব্যোন্মাদে ভরপুর আত্মভোলা মানুষ ছাড়া আর কিছু আমার মনে হয় না। মানুষের প্রতি তাঁর দরদ অসীম, কিন্তু সেই মানুষকে তিনি তার প্রাকৃতিক আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত নন্, আর তিনি বোধ হয় কল্পনা-ও ক'রতে পারেন নি—স্বাভাবিক জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে', কিভাবে ভবিষ্যৎ মানুষ mechanised man যন্ত্রচালিত আর যন্ত্রাধীন মানুষমাত্র হ'য়ে দাঁড়াবে! আর তার নিজের দেহ-মন ব'লতে কিছুই যেন আর থাকবে না। আর নিতান্ত এ-যুগের মানুষ ছাড়া, যে-মানুষ over-population অর্থাৎ অতি-প্রজননের বিভীষিকার মধ্যে প'ড়ে, ভালো ভাবে স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকবার আর কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না, যে মানুষের জীবনচর্য্যা তার শেষ ধ্বংসের পূর্বে যে সম্পূর্ণ নোতুন পর্য্যায়ের নোতুন পদ্ধতির মরণালিঙ্গনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে, সেই অতিআধুনিক কালের মানুষ ছাড়া সেরূপ কল্পনা আর কেউ ক'রতে পারবেও না।"

* * *

এই প্রকৃতিগত-প্রাণতা আর প্রকৃতি-প্রিয়তার মধ্যে আদিম যুগের "পূর্ণ-মানব"—the Full Man of the Primitive Age—তার নিজ সত্তায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। The Transformation of Man নামে যে উপাদেয় আর চিন্তোত্তেজক পুস্তক আজকালকার এক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য মনীষী Lewis Mumford লিউইস্ মামফোর্ড লিখেছেন, তাতে চমৎকার ভাবে দেখানো হ'য়েছে, কি ক'রে গাছে-থাকা আস্তবানরের পূর্বপুরুষ ক্ষুদ্র চতুষ্পদ পশু থেকে শুরু ক'রে, লক্ষ-লক্ষ বৎসর ধ'রে বৃক্ষবিহারী কিন্তু পদক্ষেপ-পটু লাঙ্গুলহীন নরাকার বানর বা বনমানুষের উদ্ভব হ'ল, তার পরে আরও কয়েক লক্ষ বৎসর পরে দেখা দিলে আদিম মানুষ, সত্যকার মানুষ, যে মানুষ এখন থেকে মাত্র হাজার পঞ্চাশ বছর আগে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, এমন হ'য়ে দাঁড়াল'। এর পরে মানুষের জীবনে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ কাটিয়ে' ঐতিহাসিক যুগ এল'—কিন্তু আদিম মানুষের দেহধর্ম আর চিত্তবৃত্তি, এসবের আমূল পরিবর্তন তেমন কিছু হ'ল না, যদিও শতকের পর শতক ধ'রে তার মনের উৎকর্ষ, দেহের সৌন্দর্য্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য্যপটুতা ক্রমশঃ বেড়ে চ'লল। আধুনিক কালে, লক্ষ-লক্ষ হাজার-হাজার শত-শত বৎসর কাটিয়ে', বিগত শ' দুই বছরের মধ্যে, বিশেষ ক'রে বৈদ্যুতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর

ফলে, অভাবনীয় দ্রুত ভাবে মানুষের রহন-সহন, চাল-চলন, চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হ'চ্ছে, মানুষের এক নোতুন ধরনের New Transformation "নব-কলেবর" হ'চ্ছে, তার মনের গতি আর শক্তি নোতুন দিকে মোড় ফিরছে,—যাতে ক'রে অতি পুরাতন, আর এই সন্ধিক্ষণেও আমাদের অপরিচিত নয় এমন "আধুনিক মানুষ" একেবারে ব'দলে যাবে—হয়তো বা তার মূল রূপটি, এতদিনকার মানব রূপটি, একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষ প্রথম যখন আগুন কাজে লাগাতে আর আগুন জ্বালতে শিখ্‌লে, কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে' যেতে দেখে গাড়ীর চাকার উদ্ভাবন ক'রলে, সুতো কাটতে, কাপড় বুনতে, মাটির কলসী হাড়ী কুঁড়ি গ'ড়তে, ভেড়া গোরু ঘোড়া উট পুষ্‌তে, যব ধান বাজরা গম চাষ ক'রতে, গ্রাম-বদ্ধ সমাজ গ'ড়তে শিখ্‌লে, শহর বানাতে আরম্ভ ক'রলে, তখনকার অবস্থার মানুষের সঙ্গে, চাঁদের মাটিতে গিয়ে পা দিয়ে আবার ফিরে-আসা মানুষ, যে মানুষ ভবিষ্যতে আরও কত কি না ক'রতে পারবে—তার অবস্থার মানুষের তফাতটা কি বিরাট, কি চমকপ্রদ, এমন কি (আমাদের চিন্তায় আর দৃষ্টিতে) কি ভীতিপ্রদ। এর শেষ কোথায় কে ব'লতে পারে? এই পরিবর্তনে, মানুষের পর পর এই সব Transformation-এর অন্ত কোথায়? এর ভিতরে কি কোনও উদ্দেশ্য আছে? আর সেই উদ্দেশ্যই বা কি? এই সমস্ত গভীর কথায় এসে প'ড়তেই হয়, কারণ এটা হ'চ্ছে মানুষের হাতে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের আদর্শের যুগ (যদি সেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়), প্রকৃতির 'ভূমি', এই ক্ষুদ্র পৃথিবী, চাঁদে-বেড়িয়ে-আসা মানব-সন্তানের কাছে যে পৃথিবী এখন নিতান্ত সামান্য, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই পৃথিবী মানুষের কাছে ও এখন যেন বিশেষ তুচ্ছ হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু মানুষ, তার আদিম "পূর্ণ-মানব" হ'য়ে দাঁড়াবার কালে যে কী ছিল, এখনও তা ভুলতে পারছে না। এখনও সময় সুবিধা পেলেই আবার সে আদিম পূর্ণ মানবের মত বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে নদীতে সাগরে ঘুরে' বেড়াতে চায়, বন্য জন্তুর পিছনে ছুটে সে শিকারে আনন্দ পায়, সে ফল পাকড় সাগর তীরের ঝিনুক কুড়িয়ে' তার এক অজ্ঞাত আদিম আনন্দ-স্পৃহা চরিতার্থ ক'রতে চায়। এই আদিম মানুষ তার নিজের মনের কোনও চিত্র বা বর্ণনা রেখে যেতে পারে নি, কারণ তখন সাহিত্য গড়ে ওঠে নি, আর লিখন-রীতির অভাবে তার মুখে-মুখে প্রচলিত "বাঙ্ময়" প্রাচীনতম কালে লিখিত 'সাহিত্য"-রূপে রক্ষিত হ'তে পারে নি। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে প্রাচীন লিখিত সাহিত্য এখন আমরা য' পাচ্ছি—প্রাচীন মিসরের, প্রাচীন কাল্‌দিয়ার, প্রাচীন ভারতের, প্রাচীন গ্রীসের, প্রাচীন চীনের—তা এখন থেকে মাত্র তিন-চার হাজার বৎসরের পুরাতন হ'লেও, তার থেকেই আদিম মানুষের প্রকৃতিগত-প্রাণতার কিছু-কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের রচনার যেমন, বিগত তিন হাজার দু হাজার বছর থেকে এখনকার কাল পর্যন্ত সমস্ত বড় বড় সাহিত্যিক রচনায়—কাব্যে, পুরাণ-কথায়, অন্য গদ্য-রচনায় আদিম মানবের আর প্রাচীনতম সাহিত্যের প্রকৃতি-প্রিয়তার, পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ আর ভালবাসার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে, পৃথিবীর সম্বন্ধে, পৃথিবীর প্রতি মানুষের ভালবাসা আর শ্রদ্ধার সম্বন্ধে, এখানে ওখানে

সেখানে কত না উক্তি আছে, কত না স্তুতি আছে। আদি আর্য্য ভাষায় পৃথিবীকে মানবের ও অন্য সমস্ত প্রাণীর "মাতা" ব'লে উল্লেখ করা হ'ত—"পৃথিবী মাতা, দ্যৌঃ বা আকাশ পিতা", এটি মূল আর্য-জাতির একটি অতি সাধারণ ধারণা—সংস্কৃতে, গ্রীকে আর অন্য আর্য্য ভাষায় পাওয়া যায়। ভারতের অতি প্রাচীন আদিবাসী নিষাদ (কোল) সাঁওতাল-জাতির কাছেও তেমনি "সের্মা-অতে" অর্থাৎ "আকাশ আর পৃথিবী" হ'চ্ছে মানুষের "আপা-এঙ্গা" অর্থাৎ "পিতা ও মাতা।" অথর্ববেদের "ভূমি-সূক্ত" পৃথিবী-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য জাতির শ্রদ্ধা আর প্রীতির নিদর্শন এক অপূর্ব পৃথিবী-স্তুতি;—এই পৃথিবীর প্রতি, যে পৃথিবী ছিল আদিযুগের "অহল্যা" পৃথিবী—মানবের দ্বারা হল বা লাঙ্গল আর পশুর সাহায্যে খাদ্যের জন্য কর্ষিতা হ'য়ে, এখনকার মত ক্রমবর্ধমান, বুভুক্ষা আর লোভের বশবর্তী, সৃষ্টি-সংখ্যা-সীমা অতিক্রমিষ্ণু, দোর্দণ্ড-প্রতাপ মানব-অক্ষৌহিণীর দ্বারা বিজিতা, নিপীড়িতা ও ধর্ষিতা হয় নি—বিভূতিভূষণের সমস্ত সাহিত্য-সর্জনার মধ্যে, মানব-জাতির স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিনী এমন পৃথিবীর প্রতি যে অপার শ্রদ্ধা আর ভালবাসা প্রকাশিত হ'য়েছে, তার এক জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত উৎস আমরা অথর্ববেদের এই ভূমি-সূক্তের মত প্রাচীন সাহিত্য-রচনায় যেন পাচ্ছি। বিভূতিভূষণের মত আধুনিক কালের প্রকৃতি ও পৃথিবীর উদ্‌গাতা, তাঁদের পক্ষে যাঁরা ছিলেন পূজ্য, পূর্ব্য, পূর্বজ আর পথিকৃৎ কবি-ঋষি, তাঁদের মধ্যে, অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডের ভূমি-সূক্তের দ্রষ্টা অথর্বা ঋষি ছিলেন অন্যতম। তাঁর রচিত কাব্যময় এই পৃথিবী-বন্দনা থেকে কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধার ক'রে পাঠ ক'রলে, প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের আশ্চর্য্য যোগ-সূত্র বা ভাব-সাদৃশ্য ধ'রতে পারা যায়।

বাঙলায় বিভূতিভূষণ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যেন ছিলেন আরণ্য-সূক্তের বা ভূমি-সূক্তের দ্রষ্টা দিব্যভাবযুক্ত এযুগের এক নবীন ঋষি। বিভূতিভূষণের প্রশস্তিতে রচিত এই নিবন্ধে, তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের উদ্দেশ্যে, অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডের তেষট্টিটি মন্ত্রে গ্রথিত প্রথম সূক্ত এই ভূমি-সূক্ত থেকে নির্বাচিত ছাব্বিশটি মন্ত্র, মূল বৈদিক পাঠ সমেত বাঙলা অনুবাদে, বিভূতিভূষণের অনুরাগী পাঠকদের সামনে তাঁদের চিত্তপ্রসাদনের জন্য উপস্থাপিত ক'রে দেওয়া গেল।

*　　　*　　　*

২। অসম্বাধং বধ্যতো মানবানাং যস্যা উদ্বতঃ প্রবতঃ সমম্ বহু।
নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ॥

"যে পৃথিবী মনুপুত্র মানবজাতির চাপে মানবের দ্বারা (এখনও) আচ্ছন্ন বা আবৃত হন নি; যে পৃথিবীতে বহু উঁচু-নীচু, আর সমতল ভূমি আছে, যে পৃথিবী নানা গুণ বা শক্তির নিধান বহু ওষধি ধারণ করেন—সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণা হোন্, আমাদের কৃপা করুন।"

৩। যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্ বভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু॥

"যে পৃথিবীতে সমুদ্র, সিন্ধু ও সমস্ত জল বিদ্যমান, এবং যাঁতেই সমস্ত অন্ন ও কৃষ্টি সমুদ্ভূত

হ'য়েছে, যে পৃথিবীতেই প্রাণময় চাঞ্চল্যময় সমস্ত কিছু সঞ্জীবিত হয়, সেই ভূমি বা পৃথিবী আমাদের পূর্বের পানাদিকর্মে আহিত করুন।"

৪। যস্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্ বভূবুঃ।
যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদেজৎ সা নো ভূমির্গোষ্বপ্যন্নে দধাতু॥

"চারিদিকে যে পৃথিবীর প্রদেশসমূহে, আমাদের অন্ন ও কৃষিজীবী জনগণের উদ্ভব হ'য়েছে, যে পৃথিবী বহুবিধ শ্বাস ও গতিযুক্ত প্রাণীর ভরণ করেন, সেই ভূমি আমাদের গোধন ও অন্ন এনে দিন।"

৬। বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥

"সকলকে যিনি ধ'রে আছেন, সমস্ত সম্পদের নিধান যিনি, প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দৃঢ় আধার যিনি, যাঁর বক্ষোদেশ হিরণ্ময়, গতিশীল সকলেরই নিবেশস্থান যিনি,—সেই পৃথিবী দেবী, যিনি বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করেন, ইন্দ্র যাঁর পরিপালক, তিনি আমাদের প্রচুর সম্পদ্ দান করুন।"

৭। যাং রক্ষন্ত্যস্বপ্না বিশ্বদানীং দেবা ভূমিম্ পৃথিবীমপ্রমাদম্।
সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চসা॥

"যে বিশাল ভূমিকে নিদ্রাহীন দেবতারা প্রমাদশূন্য হয়ে রক্ষা করেন, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য মধু দোহন করুন, আমাদের দীপ্তিতে পূর্ণ করুন।"

১০। যামশ্বিনাবমিমাতাং বিষ্ণুর্যস্যাং বি চক্রমে।
ইন্দ্রো যাং চক্র আত্মনেঽনমিত্রাং শচীপতিঃ।
সা নো ভূমি র্বি সৃজতাম্ মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ॥

"যে পৃথিবীকে অশ্বিদ্বয় পরিমাণ ক'রেছিলেন, যাঁর উপরে বিষ্ণু পাদক্ষেপ ক'রেছিলেন, শচীপতি অর্থাৎ সমস্ত শক্তির অধিপতি ইন্দ্র নিজের জন্যই যাঁকে শত্রুহীন ক'রেছিলেন,—সেই ভূমি, মা যেমন পুত্রের জন্য করেন, তেমনি আমার জন্য দুধ ঢেলে দিন।"

১১। গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিম্ পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্॥

"হে পৃথিবী, তোমার গিরিসমূহ, তোমার হিমালয় পর্বতশ্রেণী, তোমার অরণ্যসমূহ—সমস্তই মঙ্গলময় হোক্; এই পৃথিবী, যিনি বভ্রু বা পাংশুবর্ণা, যিনি কৃষ্ণবর্ণা, যিনি রক্তবর্ণা, সমস্ত রূপে রূপময় যিনি, এই বিশাল ভূমি যিনি স্থির ও ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত—আমি সেই পৃথিবীর উপরে দাঁড়িয়ে' র'য়েছি,—আমি হত হই নি, আহত হই নি, আমাকে কেউ জয় করে নি।"

১২। যত্তে মধ্যম্ পৃথিবী যচ্চ নভ্যং যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সম্ বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব, মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহম্ পৃথিব্যাঃ।
পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু॥

"হে পৃথিবী, তোমার মধ্যদেশ, তোমার নাভিদেশ, তোমার দেহ হ'তে যে-সমস্ত শক্তি

সঞ্জাত হয়েছে, আমাদের সেই শক্তিসমূহের মধ্যে রক্ষা করো ; আমাদের উপর তোমার নিঃশ্বাস আসুক ; আমি পৃথিবীর পুত্র, পৃথিবী আমার মাতা। পর্জন্য (বৃষ্টি) আমার পিতা, তিনি আমাকে পূর্ণ করুন।"

১৭। বিশ্বস্বম্ মাতরম্ ওষধীনাং ধ্রুবাম্ ভূমিম্ পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা॥

"এই পৃথিবী আমাদের প্রতি মঙ্গলময়ী হোন, শুভকারিণী হোন্, সমস্ত বস্তুর প্রসূতি যিনি, যিনি স্থিরা, যার উপর আমরা বিচরণ করি, সমস্ত ওষধি অর্থাৎ তরু-লতা-গুল্মের মাতা যিনি, —বিশ্বপ্রপঞ্চকে যিনি ধ'রে র'য়েছেন সেই ধর্মই তাঁকে ধ'রে আছেন।"

২১। অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞুস্ত্বিষীমন্তং সংশিতম্ মা কৃণোতু॥

"হে পৃথিবী, অগ্নিই তোমার পরিধেয়, তোমার জানুদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, আমাকে তেজোময় ও তীক্ষ্ণ করো।"

২৩। যস্তে গন্ধঃ পৃথিবী সম্ বভূব যম্ বিভ্রত্যোষধয়ো যম্ আপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে, তেন মা সুরভিং কৃণু, মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥

"হে পৃথিবী, তোমাতে যে সৌরভ উদ্ভূত হ'য়েছে, যে সৌরভ তোমার ওষধি-সমূহে, তোমার জলসমূহে বিদ্যমান, গন্ধর্বেরা আর অপ্সরারাও তোমার যে সৌরভের অংশভাক্, আমাকেও সেই সৌরভে সুরভি করো—আর, কেউ যেন আমাদের হিংসা না করে।"

২৪। যস্তে গন্ধঃ পুষ্করম্ আবিবেশ যং সং জভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধম্ অগ্রে তেন মা সুরভিং কৃণু, মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥

"তোমার যে সৌরভ পদ্মের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে, সূর্যাকন্যা সূর্যার বিবাহে যে সুগন্ধি প্রস্তুত ক'রেছিল, হে পৃথিবী, অমর দেবতার উপযোগী, অগ্রে সঞ্জাত সেই সৌরভ, তা দিয়ে আমাকে সৌরভযুক্ত করো—আর, কেউ যেন আমাকে হিংসা না করে।"

২৫। যস্তে গন্ধঃ পুরুষেষু স্ত্রীষু পুংসু ভগো রুচিঃ।
যো অশ্বেষু বীরেষু যো মৃগেষূত হস্তিষু॥
কন্যায়াং বর্চো যদ্ ভূমে তেনাস্মাঁ অপি সং সৃজ, মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥

"তোমার যে সৌরভ নরের মধ্যে আছে নারীর মধ্যে আছে,—পুরুষের মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য বা শক্তি, যে তেজ বা জ্যোতি আছে ; যা ঘোড়ার মধ্যে, বীরপুরুষদের মধ্যে, আরণ্য পশুর মধ্যে, হাতীর মধ্যে আছে, কন্যাদের মধ্যে যে দীপ্তি আছে,—হে ভূমি, সেই শক্তি ও দীপ্তি আমাদের মধ্যেও এনে দাও—আর, কেউ যেন আমাদের হিংসা না করে।"

২৬। শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা।
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ॥

"শিলা, মাটি, প্রস্তরখণ্ড, ধূলি—এইগুলির দ্বারায় এই পৃথিবী নির্মিত, কঠিনভাবে গঠিত, সেই হিরণ্যবক্ষোযুক্তা পৃথিবীকে আমি প্রণাম ক'রেছি।"

২৯। বিমৃগ্বরীম্ পৃথিবীমা বদামি ক্ষমাম্ ভূমিম্ ব্রহ্মণা বাবৃধানাম্।
ঊর্জম্ পুষ্টম্ বিভ্রতীম্ অন্নভাগং ঘৃতং ত্বাভি নি ষীদেম ভূমে ॥

"ক্ষমা-রূপিণী পৃথিবী, যিনি সব কিছুকে মার্জনা ক'রে পরিষ্কৃত করেন, আর যিনি ব্রহ্মকৃপায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হ'য়েছেন; হে ভূমি, তুমি আমাদের শক্তি-বর্ধনের জন্য পরিপুষ্ট অন্নভাগ ও ঘৃত আহরণ করো, আমরা তোমার আধারেই উপবেশন করি।"

৩৫। যত্তে ভূমে বি খনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতু।
মা তে মর্ম বিমৃগ্বরী মা তে হৃদয়ম্ অর্পিপম্ ॥

"হে ভূমি, তোমা থেকে যা খনন করি, শীঘ্রই যেন তা আবার গজিয়ে' ওঠে; সকলকেই তুমি মার্জন বা পবিত্র করো; আমি যেন তোমার গভীর হৃদয়তল পর্যন্ত বিদীর্ণ না করি।"

৩৬। গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহাতাম্ ॥

"হে পৃথিবী, তোমার সুনির্দিষ্ট ঋতুগুলি—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত,—সংবৎসর ও দিনরাত—আমাদের জন্য যেন দুগ্ধস্রোত বহায়।"

৪৪। নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিং হিরণ্যম্ পৃথিবী দদাতু মে।
বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু সুমনস্যমানা ॥

"দেবী পৃথিবী বহুবিধ ধনসম্পৎ গুহা-স্থলে রক্ষা ক'রে আছেন—নানা ধন, মণি, স্বর্ণ আমাদের তিনি দান করুন; ধনদাত্রী দেবী, আমাদের প্রতি প্রীতি দেখিয়ে' আরও অনুগ্রহ ক'রে আমাদের নানা ঐশ্বর্য প্রদান করুন।"

৪৫। জনম্ বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং নানাধর্মাণম্ পৃথিবী যথৌকসম্।
সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং ধ্রুবেব ধেনুরনপস্ফুরন্তী ॥

"বিভিন্ন ভাষার আর বিভিন্ন ধারণা বা বিচারের নানা জাতির মানুষকে তাদের যথাযোগ্য আবাসভূমিতে পৃথিবী ধারণ ক'রে আছেন, সর্বদা পয়স্বিনী গাভীর মত, যার দুধ কখনও শেষ হয় না,—তুমি আমাদের ঐশ্বর্যের সহস্রধারা দান করো।"

৪৮। মল্বম্ বিভ্রতী গুরুভৃদ্ ভদ্রপাপস্য নিধনং তিতিক্ষুঃ।
বরাহেণ পৃথিবী সং বিদানা শূকরায় বি জিহীতে মৃগায় ॥

"লঘু ও গুরু উভয়কে পালন ক'রে (পৃথিবী) ভাল ও মন্দ উভয়ের মৃত্যু সহ্য করেন; বন্য বরাহকে পৃথিবী ভাল ভাবে জানেন; আবার বুনো পশু যে শূওর, তার জন্যও পৃথিবী পথ ক'রে দেন।"

৪৯। যে ত আরণ্যাঃ পশবো মৃগা বনে হিতাঃ সিংহা ব্যাঘ্রাঃ পুরুষাদশ্চরন্তি।
উলং বৃকম্ পৃথিবি দুচ্ছুনামিত ঋক্ষীকাং রক্ষো অপ বাধয়াস্মাৎ ॥

"যে সকল আরণ্য পশু, বনে ঘুরে বেড়ায় যে সমস্ত বন্য পশু, সিংহ, ব্যাঘ্র আর অন্য সব নরখাদক, হুণ্ডার, নেকড়ে-বাঘ, আর দুর্ভাগ্য ও অপদেবতা—এদের আমাদের থেকে দূরে বিতাড়িত করো।"

৫১। যাং দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ সম্‌ পতন্তি হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
যস্যাং বাতো মাতারিশ্বেয়তে রজাংসি কৃণ্বংশ্চ্যাবয়ংশ্চ বৃক্ষান্‌।
বাতস্য প্রবামুপবামনু বাত্যর্চিঃ॥

"যে পৃথিবীর উপরে দ্বিপদ পাখিসমূহ উড়ে' বেড়ায়—নানা রকমের পাখী, রাজহংস, সুপর্ণ ইত্যাদি, পৃথিবীর উপর দিয়ে মাতরিশ্বা বায়ু ধাবিত হন, বায়ু ধূলা উড়িয়ে' নিয়ে যায়, গাছ থেকে নাড়িয়ে' দেয়, আর ধাবমান বায়ুকে অগ্নিশিখা এধার-ওধার অনুসরণ করে।"

৫৩। দ্যৌশ্চ ম ইদম্‌ পৃথিবী চান্তরিক্ষং চ মে ব্যচঃ।
অগ্নিঃ সূর্য্য আপো মেধাং বিশ্বে দেবাশ্চ সং দদুঃ॥

"দ্যৌঃ, পৃথিবী, আর উভয়ের মধ্যে স্থিত অন্তরিক্ষ-দেশ—এঁরা আমাকে এই বিশাল স্থান দিয়েছেন, অগ্নি, সূর্য্য, জলসমূহ আর বিশ্বদেবগণ মিলিত হ'য়ে আমাকে মেধা বা মানসিক শক্তি দিয়েছেন।"

৫৬। যে গ্রামা যদরণ্যং যাঃ সভা অধি ভূম্যাম্‌।
যে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্তেষু চারু বদেম তে॥

"পৃথিবীর উপরে যে সকল গ্রাম বা জনসমষ্টি আছে, যে অরণ্য আছে, যে সভা বা মিলন-স্থান আছে, যেখানে (যুদ্ধের জন্য) গ্রাম-সমূহ বা জনগণ মিলিত হয়,—যেখানে বিচার ও আলোচনার জন্য লোকে যায়, সে-সব স্থানে আমরা তোমার স্তুতি ক'রবো।"

৫৭। অশ্ব ইব রজো দুধুবে বি তান্‌ জনান্‌ য আক্ষিয়ন্‌ পৃথিবীং যাদজায়ত।
মন্দ্রাগ্রেত্বরী ভুবনস্য গোপা বনস্পতীনাং গৃভিরোষধীনাম্‌॥

"ঘোড়া যেমন ধুলো ওড়ায়,—তেমনি মানুষেরা, জন্মের পরে যারা পৃথিবীতে বাস করে, তাদের পৃথিবীই বিকীর্ণ ক'রে দেন, এই পৃথিবীই হচ্ছেন নেত্রী আর সমগ্র বিশ্বজনের পালিকা, তিনি আনন্দময়ী, বনস্পতিবৃক্ষের রক্ষয়িত্রী, আর ওষধিসমূহের পালয়িত্রী।"

৬৩। ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্‌।
সং বিদানা দিবা কবে শ্রিয়াম্‌ মা ধেহি ভূত্যাম্‌॥

"মাতা ভূমি, তুমি আমাকে সুষ্ঠুভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো, তুমি কবি অর্থাৎ ঋষির মত, আকাশের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমাকে ভূতি অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতির স্থির আসনে প্রতিষ্ঠিত করো।"

* * *

"ভূমি"—যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, আর যিনি বিদ্যমান আছেন, "পৃথিবী"—যিনি সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রদেশ, "উর্বী"—যিনি বিশাল, "মহী"—যিনি মহতী বা বৃহতী বা বিরাট্‌—পৃথিবীর এই সমস্ত নাম থেকে আদি আর্য্য যুগের মানুষের মনে যে সম্ভ্রম যে বিস্ময় যে আকুলতা দেখা দিয়েছিল, তাই যেন প্রকাশ পায়। এই সম্ভ্রম ও বিস্ময়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা "ভূমি-পুত্র" মানুষ ব'লে আমরাও এই সম্ভ্রম আর বিস্ময়ের অধিকারী, এরকম একটা বোধ, একটা mystic feeling বা রহস্যের অনুভূতি মানুষ একেবারে কাটিয়ে' উঠ্‌তে পারে নি—যদিও এখনকার কালে, বিশেষ ক'রে মানুষ নিজের শক্তির দম্ভে পৃথিবীর প্রভু ব'লে সেই বোধ বা অনুভূতির

ঊর্ধ্বে উঠ্‌ছে, সেই অনুভূতি হারাতে ব'সেছে। মনে হয় পৃথিবী সম্বন্ধে আদিম মানুষের মনে উদ্ভূত এই শ্রদ্ধা-বিস্ময়-প্রীতিতে পূর্ণ প্রতিক্রিয়া, বহুদিন পরে, বিভূতিভূষণের লেখায়—তাঁর বন-জঙ্গল গাছপালায় আনন্দ আর মাতামাতি, তাঁর অরণ্য-প্রীতির মধ্যে, আবার যেন নোতুন ক'রে রূপ নিলে। মানবসমাজ—সমসাময়িক বাঙালী ঘরের মেয়ে পুরুষের জীবনযাত্রা জীবনদর্শন নিয়ে বিভূতিভূষণ কিছু কম লিখে যান নি। আর তাঁর সমাজ আর মানবজীবন নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসে সত্যদর্শন আর যথার্থ-চিত্রণ কিছু কম নয়। তাঁর "আদর্শ হিন্দু হোটেল", তাঁর "বিপিনের সংসার", তাঁর "দুই বাড়ী", তাঁর "অনুবর্তন", তাঁর "অথৈ জল", তাঁর "কেদার রাজা", তাঁর "ইছামতী" প্রভৃতি, উপন্যাস-গৌরবে মহীয়ান বাঙলা সাহিত্যেও লক্ষণীয় গ্রন্থ ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছে। এগুলি দৃষ্ট জীবনের আধারে, সহজ সরল ভাবে বিভূতিভূষণের কল্পিত চরিত্রের অতি মনোজ্ঞ চিত্রণ—এগুলি problem বা সমস্যামূলক উপন্যাস অথবা উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস নয়, এগুলি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যকারের জীবন-দর্শনের আনন্দের প্রকাশ মাত্র। প্রেমের কথা নিয়ে বিভূতিভূষণের রচনায় আখ্যানের বিষয়বস্তু বা অবস্থান দুই-এক জায়গায় অসামাজিক বা প্রতিনৈতিক হ'লেও, তাঁর মনের শুচিতা তাঁর আদর্শবোধ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি। যাঁরা বিশেষ ক'রে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক কৃতির পর্যালোচনা ক'রেছেন বা ক'রবেন, তাঁরা অবশ্য বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর কথাসাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন ক'রছেন, তাঁর সত্যকার প্রতিষ্ঠা তাঁরা স্থির ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রবেন। কিন্তু এযুগে সব দেশেই এক শ্রেণীর "প্রগতিশীল" লেখকের মধ্যে নর-নারীর প্রেমের কথা নিয়ে আর বিশেষ ক'রে দেহাশ্রয়ী প্রেম বা আকর্ষণ নিয়ে, তথা-কথিত "বাস্তবনিষ্ঠ" সাহিত্যের পঙ্ক-পল্বলের মধ্যে উৎকট আনন্দে গড়াগড়ি দেওয়া দেখা যায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের রচনায় যে একটা সহজ সংযম দেখা যায়, তা আমাদের পাঠকসমাজে চিত্তের শালীনতা এমন কি শুচিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য ক'রবে, আর এই জন্যই তাঁর সাহিত্য-সর্জনা চিরকালের জন্য সম্মানিত হ'য়ে থাকবে—সহৃদয় পাঠক-সমাজে অন্ততঃ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের creative genius বা কারয়িত্রী প্রতিভার কল্যাণে ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, যোশেফ্ প্রভৃতি লোকোত্তর ঋষি বা মহাকবিদের দিব্য চরিত্রায়ণের বাইরে, আমরা যে অনেকগুলি অদ্ভুত-সুন্দর নর-নারীর কল্প-লোক পেয়েছি—যেমন কালিদাস, দান্তে, শেক্স্‌পিয়র, গ্যোটে, টলস্টয়, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রভৃতির রচনায়, অনেকটা সেই দরের পুরুষ ও স্ত্রী চিত্রের একটি gallery বা চিত্রশালা বিভূতিভূষণের রচনাসম্ভারেও আমরা পাই। তাঁর নৃ-চরিত্রের প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে, মানবজীবনের পৃষ্ঠভূমি বাহ্যপ্রকৃতি বা ভূমি-মাতার কথা তিনি কিন্তু কোথাও ভোলেন নি। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে তাঁর নিজ জীবনে দেখা মানুষের ছায়া যেমন প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়—তাঁর শিশুজীবনে, তরুণজীবনে, পরিণত বয়সের শিক্ষক-জীবনে—তেমনি যে প্রকৃতি নিয়ে যে মাটি পাহাড় গাছপালা নিয়ে তিনি ছিলেন যেন পাগল, তার ছায়া—ছায়া ব'লবো না, তার হরিৎ-শ্যামল আলোও—তেমনি তাঁর সমস্ত রচনাকে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে। ধরিত্রী-মাতা তাঁর নদ-নদী, খাল-বিল, ঘাস-ফুল, বিটপ-লতা, বৃক্ষ-গুল্ম নিয়ে সর্বদাই যেন স্মিতহাস্যে তাঁর আশীর্বচন জানাচ্ছেন। বিভূতিভূষণ নিজের ভাবনা-চিন্তা বিচার-

বিবেচনা মুখ্যতঃ "স্বান্তঃ সুখায়"—নিজের আভ্যন্তর তৃপ্তির জন্যই কিছু কিছু লিখে রেখে গিয়েছিলেন—এগুলির প্রকাশনও অংশতঃ হ'য়েছে diary বা "দিনলিপি" রূপে ("স্মৃতির রেখা", "তৃণাঙ্কুর", "উর্মিমুখর", "উৎকর্ণ", "হে অরণ্য কথা কও")। এই সমস্ত দিনলিপিতে তাঁর চিন্তাধারা একটু গুছিয়ে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আর চেষ্টা আছে—কিন্তু সারল্যে, নিষ্কপটতায়, আর তার সঙ্গে প্রকৃতি-মাতার আবির্ভাবে, এই রচনাগুলিতেও বিভূতিভূষণের মনের আর মানসিক প্রবণতার সুন্দর ছবি প্রতিফলিত হ'য়ে আছে।

*　　　*　　　*

বিভূতিভূষণের মধ্যে একটা গভীর আধ্যাত্মিকতার ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর মতন বইত। তাঁর সাধারণ চলা-ফেরায় ধবন-ধারণে কথাবার্তায় সেটা তেমন প্রকাশ পেত না, তিনি যেন নিতান্তই ঢিলেঢালা আত্মভোলা সদানন্দ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে অনুধ্যান-পরায়ণ বা চিন্তাশীল ছিলেন—কচিৎ-কখনও একটু serious বা গভীর প্রসঙ্গ উঠ্‌লে, বিভূতিভূষণ সে বিষয়ে তাঁর আস্থার কথা না ব'লে পারতেন না। "ইছামতী"র রামকানাই কবিরাজের মত তিনি নিজে দুই-চারবার "আদি-সংবাদ" শোনবার আর শোনাবার ইচ্ছা প্রকট করেন। আমার নিজের কোনও অনুভূতি নেই, উপলব্ধি নেই, আর এসব বিষয়ে অনাস্থার প্রবৃত্তি-ও যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "ছলনাময়ীর ছলনা" ব'লে, বিচারবিহীন জনসাধারণ্যে প্রচলিত নানা রকমের "আধ্যাত্মিকতা", যেমন গুরুবাদ, "গুরু"দের নানা প্রকারের বুজরুগী, ভক্তদের অন্ধ ভক্তির আতিশয্য, ভোজবাজী প্রভৃতি, সব সময়ে যা আমাদের উদভ্রান্ত ক'রে থাকে—এসব থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা আমার মনের মধ্যে সদা-জাগ্রত। কিন্তু আমার ধারণায় যেটুকু আমি বুঝতুম, আর নানা জাতির শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিন্তায় কিছু পাবার আগ্রহ নিয়ে যেটুকু পড়াশুনা ক'রতুম, তা থেকে, অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায় তাঁর সঙ্গে কথা কইতুম। বিভূতিভূষণ তাঁর "দেবযান" উপন্যাসে এ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। তাঁর সব কথা বুঝি না, সব নির্দেশ ঠিক মান্‌তে পারি না। তবে এইটুকু বোধ মনের মধ্যে এসে যাচ্ছে, কেবল পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ নিয়ে ব'সে থাকা চলে না, বিজ্ঞানও যেন ব'লছে—এক transcendent and immanent বিশ্বাতিগ আর বিশ্বনিহিত শাশ্বত সত্তা আছে, যে সত্তা হ'চ্ছে সর্বব্যাপী, যার মধ্যে আমরা সকলেই আছি—যে সত্তার মুখ্য রূপ হ'চ্ছে "প্রজ্ঞান" বা সম্পূর্ণ জ্ঞান, আর যে সত্তার সঙ্গে আমাদের প্রধান যোগসূত্র হ'চ্ছে আমাদের "রসসানন্দানুভূতি" যাকে rapturous amazement ব'লে Einstein আইনস্টাইন ব'লে গিয়েছেন। এই rapturous amazement বিভূতিভূষণের মধ্যে ছিল—বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ে যতটা, মানুষকে নিয়ে বোধ হয় ততটা নয়। তবে মানুষকে তিনি অবহেলা বা উপেক্ষা করেন নি। আমাদের জগতে আসার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে, তবে আমরা তা জানি না; আর অনন্ত পরিবর্তনই হ'চ্ছে অস্তিত্বের ধর্ম, বিশ্বপ্রপঞ্চে কিছুই কখনও স্থির নেই—মানুষের মধ্যেই তো ক্রমাগত পরিবর্তন চ'লেছে। যা হোক্, এসব বিষয়ে একটা ঈহা বা আকূতি না থাক্‌লে, আমার মনে হয় সাহিত্যের কোনও সার্থকতা কোনও চিরন্তন মূল্য থাকে না। বিভূতিভূষণের মধ্যেও

সে জিনিস লক্ষ্য ক'রেছি ব'লে মনে হয়—তাঁর নিজের আশা বিচার জ্ঞান গোচর অনুভূতি উপলব্ধি তিনি "দেবযান" উপন্যাসে আর অন্যত্র বলবার চেষ্টা ক'রেছেন। এই চেষ্টা না। সাগ্রহ পাতে দেখে পুলকিত হ'য়েছি, মনে মনে তাঁকে সাধুবাদ দিয়েছি।

*　　　　*　　　　*

অবশ্য স্থূলভাবে দেখ্‌লেও, আমরা ব'লবো বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক প্রতিভার মুখ্য কথা হ'চ্ছে প্রকৃতি-সম্বন্ধে তাঁর একটা পূর্ণ আর সমগ্র অনুভূতি। ভাল-মন্দ সুন্দর-অসুন্দর আলো-অন্ধকার রমনীয়তা-ভীষণতা সব কিছু নিয়ে আমাদের মহীয়সী মহী, সুবিস্তীর্ণা পৃথিবী, বিশ্বম্ভরা ধরিত্রী, আর ধরিত্রীর কোলে, সকলের উৎপত্তিস্থল মাতা ভূমির কোলে যে গাছপালা বন-অরণ্য নদ-নদী পাহাড়-পর্বত খন্দ-টিলা পশু-পক্ষী আর বনচারী মানুষ র'য়েছে, সে-সমস্তের সম্বন্ধে তাঁর মনে এক সদা-জাগ্রত অনুভূতি আর আনন্দ, সে-সমস্তের প্রতি তাঁর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর সহানুভূতি-পূর্ণ অবলোকন।

এখন থেকে তিন হাজার বছরের আগেই, ভারতের সাহিত্য-সরস্বতীর উন্মেষ আর প্রকাশ আরম্ভ হ'য়েছে। শতকের পর শতক ধ'রে ভারত-ভারতীর বীণায়, বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে, সর্ব-রসের আধার এক অদ্ভুত বিরাট Concert অর্থাৎ সঙ্গীতি বা ঐকতান ভারতের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ক'রে আসছে, বিশ্বমানবের মনকেও রসসিক্ত ক'রেছে, ক'রছে, ক'রবে। এই সাহিত্য-সরস্বতীর প্রকাশ হ'য়েছে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে, বৌদ্ধ সংস্কৃতে, পালিতে প্রাকৃতে অপভ্রংশে, আবার পাঞ্জাবী সিন্ধী ব্রজভাষা হিন্দী-উর্দূ কোশলী রাজস্থানী গুজরাটী মারাঠী মৈথিলী উড়িয়া বাঙ্গলা অসমিয়া কাশ্মীরী প্রভৃতি নব্য-আর্য ভাষায়, প্রাচীন তমিল মধ্যযুগের তমিল ও কানাড়ী তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষায়, সাঁওতালী মুণ্ডারী প্রভৃতি নিষাদ বা কোল, আর মণিপুরী নেবারী প্রভৃতি কিরাত ভাষায়—এবং মধ্য-যুগে কচিৎ ফারসী ভাষায়, আর অধুনা বিশেষ ক'রে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেও এই একই সংস্কৃতির প্রকাশ হ'চ্ছে। বাঙলা ভাষায় নিবদ্ধ আমাদের বঙ্গ-ভারতীও এই ভারত-ভারতীর অঙ্গীভূত। বঙ্গ ভারতীয় বীণায় যে সঙ্গীতি ধ্বনিত হ'চ্ছে, তাতে কণ্ঠ আর যন্ত্রসঙ্গীতের মত নানা রাগে বিচিত্র রসে ভারতের বহির্জীবনের আর ভারতের অন্তরাত্মার বিকাশ আর বাহ্য প্রকাশ দুই-ই হ'চ্ছে। এই সাহিত্যিক রাগ-রস-সম্ভারে, ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের ভৈরব, মেঘ, বসন্ত, কল্যাণ, খম্বাজ, বিহাগ, ঝিঁঝোটী, গৌরী, টোড়ী, আশাবরী, মালবী, সারঙ্গ, গুর্জরী, হরিকম্বোধি প্রভৃতি শ্রুতিগম্য রাগ-রাগিণীর মত, একটি Note of Nature অর্থাৎ "নিসর্গ-নিক্কণ", একটি Tone of Physical or Phenomenal Being অর্থাৎ "প্রকৃতির বাহ্যাভ্যন্তর তান, অথবা বিশ্ব-প্রপঞ্চের ধ্বনি বা শ্রুতি" সাহিত্য-সঙ্গীতির মানবচিত্ত মোহন অন্যতম মূল সুর। সেই সুরেরই সাধক বিভূতিভূষণ, বঙ্গ-ভারতীয় বীণায় মনোহর ঝঙ্কার তুলে গিয়েছেন। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সঙ্গীতের "শ্রীরাগ, ধনাশ্রী-রাগ, মালবশ্রী রাগ, জৈত (বা জয়ন্ত) শ্রী-রাগ" প্রভৃতি রাগের নামের অনুকরণে, সাহিত্য-সঙ্গীতির এই অশ্রুত অথচ অনুভূতি-গম্য সুর বা রাগটিকে যদি "বনশ্রী-রাগ" বলা যায়, তা-হ'লে বিভূতি বন্দ্যকে

এই রাগের একজন প্রধান কলাবিৎ শিল্পী রূপেই ভারতের তথা বিশ্বের সাহিত্য-সভায় অগ্রাসন দিতে হয়।

* * *

ইতরার পুত্র ঋষি মহীদাস (বা মহিদাস) ঐতরেয়, আরণ্যক-উপনিষদের যুগের একজন প্রখ্যাত তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। আচার্য্য সায়ণ ব'লে গিয়েছেন, মহীদাসের মাতা ইতরার কুলদেবতা ছিলেন ভূমি বা পৃথিবী। "ইতরা" এই নাম থেকে অনুমান হয়, ইনি হয় তো আর্য-কন্যা ছিলেন না, অনার্য্য-বংশ-জাতা ছিলেন। প্রাচীন কালে প্রচলিত অনুলোম-বিবাহে, আর কচিৎ প্রতিলোম-বিবাহে, আর্য্য-অনার্য্যের মিলন আর মিশ্রণ আর্য্য-হিন্দু জাতির উদ্ভব আর বিকাশকে নোতুন পথে চালিত ক'রেছিল। আর্য্যের দেবতারা ছিলেন "দিবৌকসঃ", মুখ্যতঃ স্বর্লোকের বা আকাশের অধিবাসী তাঁরা ছিলেন; আর অনার্যের পুজা-অর্চা ছিল পৃথিবী আর মর্ত্যভূমির দেবতাদের নিয়ে, গিরি-পর্বত-বন-জঙ্গলেই তার দেবতার বাস ছিল। অনার্য্য মাতার আরাধ্যা দেবী ভূমি বা মহীর নামেই হয়তো ইতরার পুত্র ঐতরেয়, "মহীদাস" নামে পরিচিত হন (যদিও "মহিদাস" নামটির অন্য ব্যাখ্যা-ও আছে—"মহি" অর্থাৎ "মহান্ পরব্রহ্মের দাস")। মহীদাসের পিতা মহীদাসকে অবজ্ঞা ক'রতেন। মায়ের প্রার্থনায় ভূমি-দেবী মহীদাসকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তার ফলে তিনি ঋষি আর ব্রহ্ম-প্রবক্তা হন। বিভূতিভূষণেরও মনে ব্রহ্ম-প্রবক্তার ধরনের একটা উপলব্ধি ছিল ব'লে মনে হয়। এইজন্য বিভূতিভূষণের নামের সঙ্গে একটা বিরুদ জুড়ে দিয়ে সংক্ষেপে তাঁর বর্ণনা-প্রশস্তি ক'রতে ইচ্ছা হয়—তিনি হ'চ্ছেন সত্যকার "মহীদাস আরণ্যক" বিভূতিভূষণ।

[খ]

বিভূতিভূষণের "আরণ্যক"

(দিল্লীর "সাহিত্য আকাডেমি"র মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান লিটারেচর" পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যায়, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের আধারে—পরিবর্তিত ও পুনর্লিখিত)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' বইখানি বাঙলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম রত্নস্বরূপ একখানি ছোট বই—আর ব'লতে গেলে, পৃথিবীর যে কোনও ভাষার সাহিত্যের কথা তুললেও এইরকম অপূর্ব বই পাওয়া কঠিন। বইখানি হ'চ্ছে গদ্যে লেখা অরণ্য-সম্বন্ধে একটি খণ্ডকাব্য—গীতিকবিতাও বলা যায়; কালিদাসের "মেঘদূত" যেমন—প্রকৃতি, মেঘ-বৃষ্টি পাহাড়-পর্বত নদ-নদী গাছ-পালা, আর সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের জীবন-সম্বন্ধেও এক অতি মনোহর খণ্ড-কবিতা বা গীতিকবিতা রূপে সাহিত্য-রসিকদের হৃদয়ের ধন মাথার মণি হ'য়ে আছে। ক্রমবর্ধমান মানব-পরিবারের বাসভূমির জন্য যে আদিম এবং অহল্যা বনভূমি ক্রমে-ক্রমে অবলুপ্ত হ'তে চ'লেছে—তারই পৃষ্ঠভূমিকায়, আরণ্য পরিবেশ এবং আটবিক গ্রামের মধ্যে, এই বইয়ে গ্রন্থকার, মানুষের জীবনের, মানুষের চরিত্রের, তার মনের আর কার্য্যের যে সুন্দর

ছবি এঁকে আমাদের সামনে ধ'রে দিয়েছেন, সে ছবি তাঁর সহানুভূতিতে আর তাঁর সহজ-স্বীকৃত সত্যদৃষ্টিতে আমাদের কাছে অপূর্ব লাগে। "আরণ্যক" বইখানি বাস্তবিকই একটি কাব্য, যে কাব্যে আমরা পাই একদিকে প্রকৃতি আর পৃথিবী, তার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ আর তার সমাজ; যে ছবি তাঁর নিজের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা নিয়ে, আর প্রীতি আর সহানুভূতি দিয়ে গ্রন্থকার রচনা ক'রেছেন, সেটি আমাদের সকলেরই মন হরণ করে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত—তিনি দক্ষিণ-বাঙলার নদীমাতৃক দেশের গ্রাম্য-জীবনের যে পরিচয় তাঁর লেখায় দিয়েছেন, সেটি আমাদের ঘরের কথা, দৈনন্দিন অনুভূতির অভিজ্ঞতার কথা ব'লে আমাদের এত ভাল লাগে। বাঙলা দেশের গ্রামের এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, যার বর্ণনায় বিভূতিভূষণ যেন আত্মহারা হ'য়ে যেতেন, সে আবেষ্টনীর হরিৎসম্ভার আমাদের এই দেশে প্রকৃতি দেবী যেমন তাঁর অজস্র এবং অকৃপণ হাতে আমাদের পরিবেশন ক'রে দিয়েছেন, তেমনি তাঁর হাতের দান বর্ণে গন্ধে শোভা সৌন্দর্য্যে বহুমুখী এবং মহীয়ান্। প্রকৃতিকে ভালবাসে এমন মানুষের সংখ্যা একালে কম নয়—কারণ এখন মানুষের নাগরিক সভ্যতা চারদিক থেকে মাতা ধরিত্রীর স্বকীয় সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, আর এর ফলে, পৃথিবীর বৃক্ষ আর অরণ্য, ক্ষেত্র আর পর্বত, নদনদী আর বনানীর মধ্যে যে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য-বোধের অধিষ্ঠান ছিল, তার সঙ্গে আমরা আমাদের প্রাণের ঘনিষ্ঠ যোগ হারিয়ে ফেলছি। এখনকার নাগরিক মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে কখনও-কখনও অবগাহন ক'রতে চায় এইজন্যে যে, বড়-বড় শহরের দম-বন্ধ-করা আবহাওয়া থেকে আমরা একটু উদ্ধার পেতে চাই। আধুনিক মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এটি একটি সাধারণ আর সহজেই বোঝবার মতন আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু এ ছাড়া, বিভূতিভূষণের লেখায়, কথায় বুঝিয়ে-বলা যায়-না এমন একটা জিনিস আছে যেটা আমাদের মনের গভীরে গিয়ে পৌঁছয়, আমাদের জাগিয়ে তোলে, আর আমাদের মনের অবচেতনায় আদিম যুগ থেকে যে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যের একটা অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা আছে সেইটে আবার যেন জীইয়ে তোলে। বিভূতিভূষণ কেবল যে গাছপালা, ফলফুল কন্দমূল আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আরণ্য পশুপক্ষীর জীবন ভালবাসতেন তা নয়, তিনি এই জীবন ভালবাসতেন ব'লেই ভালবাসার-চোখে তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর নিতেন, সহজভাবে সে-সবের সম্বন্ধে অনেক তথ্য তিনি নিজের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করে রাখ্‌তেন। তাঁর এই সংগ্রহ আর আনুষঙ্গিক অনুশীলন, পেশাদার বন-বিজ্ঞানীর কাঁচি আর অনুবীক্ষণ নিয়ে প্রকৃতির এই দিক্‌টিকে অর্থাৎ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানকে হাতের মুঠোয় আনলুম, এইরকম মনোভাব থেকে উদ্ভূত নয়। তিনি একজন সাধারণ, আত্মভোলা অথচ সব বিষয়ে নজর আছে এমন চৌকস মানুষ ছিলেন, প্রকৃতি আর মানুষ সম্বন্ধে যাঁর দৃষ্টি সন্ধানী আলোর কাজ ক'রত। এই মানুষটির কাছে পত্রপল্লব ফলপুষ্প বৃক্ষলতা এসবের নিজের একটা বাণী বা বক্তব্য যেন ছিল, এবং এই-সমস্তের প্রত্যেকটির নাম ও বৈশিষ্ট্য তিনি যেন নিজে থেকেই খুঁজে জেনে নিতেন। আর সেই সঙ্গে তার চোখের সামনে চলাফেরা ক'রছে এমন মানুষকেও প্রীতি আর বিস্ময়ের চোখেও তিনি দেখ্‌তেন। বনজঙ্গল

আর গাছপালা সম্বন্ধে তাঁর যে আগ্রহ ছিল, সেটাও ছিল যেন একটা সংক্রামক ব্যাপার ; তাঁর পাঠকেরা, মানুষের মনকে নাড়াদেওয়া যে সুন্দর বই তিনি লিখে গিয়েছেন, তা প'ড়ে পুলকিত হয়, মানুষের জীবনের পিছনে অবস্থিত প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা অস্পষ্ট ভাবে একটা সচেতনতা লাভ করে।

"আরণ্যক" বইখানিতে একটা বিশেষ লম্বা কাহিনী বা উপাখ্যান নেই। আখ্যানের শুরু হ'চ্ছে, একজন সুশিক্ষিত সহৃদয় বাঙালী ভদ্রসন্তান, ইস্কুলে মাষ্টারি করা ছিল যার বৃত্তি, বেকার হ'য়ে বিত্তশূন্য হ'য়ে ক'লকাতার মত দয়ামায়াহীন শহরে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে উপায়হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে তার কলেজের পুরাতন এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। এই সহপাঠী নিজে ধনী জমিদারের সন্তান, কিন্তু তার কলেজের বন্ধুটির সাহিত্যিক বোধবিচার সম্বন্ধে তার একটা শ্রদ্ধা ছিল—এ তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে একটা নোতুন কাজের ভার দিলে। কাজটা হ'চ্ছে, উত্তর-বাঙলা আর বিহারের সীমানায় গঙ্গার উপরে একটা জঙ্গল-মহাল ছিল এদের পরিবারের অধিকারে, চাষের আর গোচরের জন্য জমির কাঙাল কৃষাণ-শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সেই জঙ্গল বিলি-বন্দোবস্ত করার ভার নেওয়া। এই কাজ নিয়ে, বইয়ের নায়ক, যিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা নিজের জবানীতেই ব'লে যাচ্ছেন, তাঁর কার্য্যস্থানে গিয়ে যোগ দিলেন। বন-জঙ্গল কুড়ুলে কেটে আগুন জ্বালিয়ে সাফ ক'রে প্রজা বসাবার কাজে, সঙ্গে-সঙ্গে অকথিত আদিম বনের জায়গায় মানুষের প্রাথমিক আবাসের জন্য গ্রাম বা বন গাঁ বসিয়ে দেবার কাজে তাঁকে লাগতে হ'ল। পাহাড়ের গায়ে, বনস্পতির তলায় তলায় ঘাসের জমি গোরু চরাবার জন্য বিলি হ'তে লাগ্‌ল, আর কাঠ আর জঙ্গলের নানা জিনিস দূর শহরে যোগান দেবার জন্য গাছপালা নির্মূল হ'তে চ'ল্‌ল। অরণ্যের স্বাভাবিক দান এখন চাষীর চাষের সঙ্গে-সঙ্গে অর্থগৃধ্নু মহাজন ব্যবসায়ী মানুষের-ও পয়সা রোজগারের সাধন হ'য়ে উঠ্‌ল। এইভাবে যে অরণ্যকে গল্পের নায়ক বা বক্তা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শিখেছিলেন, সেই অরণ্যেরই ধ্বংসের কারণ তাঁকে হ'তে হ'ল।

অন্য-উপায়-বিহীন অরণ্যজীবী মানুষের সুবিধার জন্য এই যে ঘটা ক'রে বিরাট্ অরণ্যমেধ যজ্ঞ শুরু হ'ল, তার বর্ণনায়, মনে হয়, প্রকৃতির বুকে সত্যকার এক হৃদয়-বিদারক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় চ'লছিল। সেটা গ্রন্থকারের কবি-মন বেদনার সঙ্গে অনুভব ক'রছিল। আর তাঁর পাঠকেরাও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সেই অনুভূতিটুকু থেকে নিজেদের আলাদা ক'রে নিতে পারেন না। বিভূতিভূষণ তাঁর প্রায় তিন শ' পাতার এই বইয়ের মধ্যে এখানে ওখানে বহুস্থানে আদিম অহল্যা বনভূমির এক অতি অদ্ভুত সুন্দর শব্দচিত্র এঁকে গিয়েছেন, আর তা থেকে এই আদিম অরণ্যের গৌরব আর সৌন্দর্য্য, তার প্রসাদ আর করুণা, আর তার রুক্ষতা আর বিভীষিকা, সবই ফুটে উঠেছে। জমির কাঙাল ভূমিহীন চাষী শ্রেণীর লোকেরা, দূর-দূর থেকে যারা তাদের জমিদার-রাজা, যিনি দূরে ক'লকাতাতে থাকেন, আর যাঁর দেখা তারা পায় না, তাঁর প্রতিভূর কাছে জমি নিয়ে প্রজা হ'য়ে বসবার জন্যে আসে, তারা প্রায় সকলেই অত্যন্ত গরীব আর দুঃস্থ। কিন্তু প্রকৃতির সন্তান সরল এই সব লোকের

চরম দুর্গতির জীবনের মধ্যেও যে একটা চমৎকার জীবনদর্শন স্বাভাবিক ভাবে তাদের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে, সেটা দেখে মন ভ'রে ওঠে। এই জীবনদর্শনের ফলে দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্ট আর চিরন্তন অর্ধাহার বা অনাহার এদের একেবারে নীতিভ্রষ্ট আর জিঘাংসাযুক্ত ক'রে তুলতে পারে নি। আপাতদৃষ্টিতে একটা নৈরাশ্যজনক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও এরা নিজেদের বাঁচিয়ে' চ'লতে সার্থক চেষ্টা ক'রে থাকে, উন্মাদ "শ্রেণী-সংগ্রাম" এর কথা এদের মনে তখনও জাগিয়ে' তোলা হয় নি। লেখকের বর্ণনা অনুসারে, জমিদারের প্রতিভূর চারদিকে তাঁর যে কর্মচারীরা তাঁর কাজের সহায়ক হ'য়ে এসেছিল, আর তা ছাড়া নোতুন এবং ভবিষ্যতের প্রজারা, আর নানারকমের দরিদ্র প্রার্থী মানুষ, একটা বিস্তীর্ণ জঙ্গল-মহালের মধ্যে চাষবাস আর ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য জমির উমেদার হ'য়ে জড়ো হ'ত, নানান্ বিষয়ে প্রার্থী হ'য়ে আসত—অসাধারণ সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাদের চরিত্র তিনি চিত্রিত ক'রে গিয়েছেন। আর তার এই সার্থক চরিত্রাঙ্কনের মূল প্রেরণা হ'চ্ছে, কেবল মানুষ ব'লেই মানুষের প্রতি বিভূতিভূষণের এই ভালবাসা।

এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ "আরণ্যক"-এর কথাপ্রসঙ্গে আমাদের চোখের সামনে এসেছে, তাদের প্রত্যেক জন নিজের বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে—সকলেই জীবন্ত মানুষ তারা। বেশির ভাগই এই সব মানুষ শহর থেকে বহু দূরে জীবন কাটিয়েছে, আর তাদের মধ্যে আদিম মানবের বা আদিবাসী জনের সরলতা আর সততা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্র মিলে, ভারতবর্ষে গ্রামীণ জীবনে যারা পাড়াগাঁয় অথবা আর বনের সীমান্তে বা বনের ভিতরে বাস করে, এমন মানুষের মূর্তির যে সংগ্রহশালা ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়, সেই সংগ্রহ শালায় নতুন-ভাবে যেন তাদেরও স্থান হ'য়ে গেছে। এইসব চরিত্র, যেমন—রাজু পাঁড়ে, নিরীহ সরল সাধু চরিত্রের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—যার জীবনের একমাত্র আনন্দ হ'চ্ছে প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে ডুবে থাকা আর তার পূজাপাঠ নিয়ে সময় কাটানো, আর লোকের ডাক পেলে জড়িবুটি ওষুধপত্র নিয়ে আর তার নাড়ীজ্ঞানের সাহায্যে রোগীদের সেবা করা—এই রাজু পাঁড়ের যৌবনের প্রণয় আর বিবাহ নিয়ে ছোট্ট একটি রোমান্স রাজুর চরিত্রের স্বভাব চোখ এড়ায় নি, অসহায় নিঃস্ব বালক ধাতুরিয়া, নৃত্যশিল্পে যার ছিল অদ্ভুত আগ্রহ আর দক্ষতা—তার রহস্যময় অকালমৃত্যু সকলকেই ব্যথিত করে, জবরদস্ত রাজপুত দেবী সিংয়ের বিধবা পত্নী কুন্তা, যে ছিল কাশীর এক বাঈজীর মেয়ে—অসাধারণ তার চিত্তের দৃঢ়তা আর চরিত্রের বল, দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমাদের করুণার পাত্রী হ'লেও তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না, যুগলপ্রসাদ, যে ছিল একজন সত্যকার উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী—যার প্রীতির বস্তু ছিল সুন্দর সুন্দর ফুল আর নোতুন নোতুন আশ্চর্য্য যত গাছপালা, বিহারের এক অজ পাড়াগাঁয়ে পরলোকগত বাঙালী ডাক্তারের অসহায় পিতৃহীন কন্যা—অবস্থাগতিকে স্বজাতি ও স্বসমাজ থেকে যারা বহু দূরে থাকতে হ'য়েছিল ব'লে গাঁয়ের বিহারী চাষী সমাজেই যাদের স্থান হ'য়ে গিয়েছিল, আর যাদের এই অবস্থা কাটিয়ে' ওঠবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, সারাজীবন ধ'রে হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর সমাজের নিম্নস্তরে থাকাই তাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর বিধান হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—উচ্চতর শিক্ষিত ঘরের জীবনের

অন্ত যাদের কোন আশা ছিল না, যে জীবনের দু-এক ঝলক হয়তো কিছুটা তাদের মনে ছিল; আরও ঐ রকম দুই-একটি বাঙালী পরিবারের ছেলেমেয়ের কথা; পাঠশালার গুরুমশাই গনোরী তেওয়ারী, যে এক বন-গাঁ থেকে আর এক বন-গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতো' এই চেষ্টায় যে, কোথাও একটা পাঠশালা খোলা যায় কিনা; বিহারের একটি সুদূর পল্লীর এক গ্রাম্য কবি বেঙ্কটেশ্বর, যাঁর জীবনের অন্যতম আত্মপ্রসাদ এই যে তিনি শুদ্ধ হিন্দী লিখ্‌তে পারেন ব'লে খাস পাটনার এক হিন্দী সংবাদপত্রের সম্পাদক তাঁর তারিফ ক'রেছিল—তাঁর অতি সরল মন আর সরল ব্যবহার, আর স্বামীর মতই সরল-প্রাণ আর তাঁরই মত মিষ্ট স্বভাবের ঐ কবির পত্নী রুকমা; গাঁয়ের মহাজন আর অত্যাচারী মোড়ল রাসবিহারী সিং, যার জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল উৎকট ভাবে ধন-গর্বের পরিচায়ক, কোনও দিক থেকে যার চরিত্রের ভাল কিছু পাওয়া যায় নি, যে ছিল গ্রাম্য-জীবনের ফল-ফুলের মধ্যে যেন একটা আগাছা বা কাঁটাবন; সেপাই মুনেশ্বর সিং; মটুকনাথ পণ্ডিত, যার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আর উদ্দেশ্য ছিল একটা সংস্কৃত টোল খোলা, যে টোলে দেবভাষা শেখবার জন্যে দু-চারটে ছাত্র সংগ্রহ করার বাসনা তার মনে সদা-জাগ্রত ছিল, আদিবাসী সর্দার বৃদ্ধ দোবরু পান্না, যার কথাবার্তায় ব্যবহারে সত্যই একটা রাজোচিত মর্য্যাদাবোধ ছিল, আর তার প্রপৌত্রী আদিবাসী কন্যা ভানুমতী—এই ভানুমতীর চিত্র লেখক অদ্ভুতভাবে পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে আর অনুকম্পার সঙ্গে এঁকে গিয়েছেন, আর এই সঙ্গে এর মধ্যে সরল আদিবাসী কন্যার জীবনে যে একটু অপ্রকট রোমান্স বা রমন্যাসের জাল বিভূতি-ভূষণ এর চারদিকে বুনে দিয়েছেন সেটা প্রত্যেক পাঠককেই মুগ্ধ ক'রবে, আর এই মেয়েটির কথা মনে হ'লে প্রত্যেকেরই একটু বেদনা-বোধ আসবে, এছাড়া সুরতিয়া, মঞ্চী, সৌজন্য আর পরোপকারের অবতার ধাওতাল সাহু, আসরফি টিণ্ডেল, ভাগ্যহত গিরিধারীলাল, আর অনুরূপ অন্য-অন্য চরিত্র মিলে একটি জীবন্ত প্রতিকৃতিময় চিত্রশালা তৈরী ক'রেছে। এইসমস্ত চিত্র, যে অরণ্য গাছপালা পত্রপুষ্প নদী সুবিস্তীর্ণ উলুখড়ে ভরা মাঠ আর তার উপরে সুনীল আকাশ-মণ্ডল, যার মধ্যে এরা জীবনধারণ করে—তার মতনই এরাও সত্য। জীবনের অন্তরালে অবস্থিত, আমাদের জ্ঞানের বা বিচারের অগোচর যে একটা রহস্য আছে—অন্ততঃ তা অস্বীকার করবার কারণ দেখি না, যদিও সে রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কখনও হয় নি, বিভূতিভূষণ সেই রহস্যে বিশ্বাস ক'রতেন। সেইজন্যে "আরণ্যক"-এর মধ্যে তিনি বোমাইবুরুর গভীর জঙ্গলের অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপারের অবতারণা ক'রেছেন—আর "আরণ্যক"-এর আবহাওয়ার সঙ্গে, এই মোহিনী স্ত্রীরূপ-ধারিণী অপদেবতা বা প্রেতিনী বা ডাকিনীর আবির্ভাবের কথা আর কুকুরের আকার ধ'রে তার চিহ্নিত বলিকে নিজের আয়ত্তে এনে তাকে উন্মাদ ক'রে দেওয়ার বা প্রাণে মারার রোমাঞ্চকর উপাখ্যান, এই অতি-প্রাকৃতের অবতারণা ক'রে—অরণ্যের মধ্যে যে একটা ভয়াবহ দিক্ আছে তার সঙ্গে এটিকে খাপ খাইয়ে' দিয়েছেন।

ভারতীয় সাহিত্যের পরম্পরা বৈদিক যুগ থেকে আমরা পাচ্ছি, এই পরম্পরা কম পক্ষে তিন হাজার বছর ধ'রে চ'লে এসেছে। এই সাহিত্যিক পরম্পরার মধ্যে, জগৎসংসার সম্বন্ধে ভারতের মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গী আর সংসারের ঘটনাবলীর যে ব্যাখ্যা অবিচ্ছিন্ন ভাবে এখনও

পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে, তার প্রচুর নির্দেশ পাওয়া যায়। "আরণ্যক" আর অন্ত বইয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চ আর প্রকৃতি ও পৃথিবীকে বিভূতিভূষণ যে চোখে দেখেছেন, তার পূর্বাভাস, আমার মনে হয়, আমরা বৈদিক সাহিত্যেও পাই। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৬ সংখ্যার সূক্তটি হ'চ্ছে "অরণ্যানী" দেবীর উদ্দেশে, ইরম্মদের পুত্র ঋষি দেবমুনির দৃষ্ট বা সৃষ্ট এই সূক্তটি। এই সূক্তে বৈদিক যুগের অরণ্যপ্রান্তের গ্রামের আর অকর্ষিতা আদিম অরণ্যের একটা অদ্ভুত সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। অরণ্যানী দেবীর এক আধুনিক ছায়া বাঙলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলের হিন্দু আর মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকেদের কল্পিত দেবী, "বন-দেবী" বা "বন-বিবি"র কল্পনায় যেন কিছুটা বেঁচে আছে। এই অরণ্যানী-সূক্ত মাত্র ছয়টি ঋক্ বা শ্লোক নিয়ে; মূলের সঙ্গে এটির একটি বাঙলা অনুবাদ দেওয়া যাচ্ছে—হয়তো এ থেকে বিভূতিভূষণের রচনার সৌন্দর্য্য একটু পূর্ণতর ভাবে গ্রহণ করা যাবে।

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী ॥ ১ ॥

"বনজঙ্গলের দেবতা অরণ্যানী দেবী, মনে হ'চ্ছে যেন তুমি হঠাৎ আমাদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে। কি ব্যাপার, কেন, তুমি তো গাঁয়ে আসতে চাও না, তোমার ভয় হয় না তো?"

বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানি মহীয়তে ॥ ২ ॥

"যখন চিচ্চিক অর্থাৎ ঝিঁঝিঁপোকা আর ফড়িং, পরস্পরের ধ্বনিকে বাড়িয়ে' তোলে, তখন যেন মনে হয় টুঙ্ টাঙ্ ক'রে ঘণ্টার শব্দ আসছে, দেবী অরণ্যানীর পূজা হ'চ্ছে।"

উত গাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি। ৩ ॥

"ওখানে যেন গোরু চ'রছে। মনে হ'চ্ছে ও'টা বাড়ির মত দেখাচ্ছে, কিংবা সন্ধ্যাবেলায় অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন গোরুর গাড়ীর গোরু খুলে দিচ্ছেন।

গামঙ্গৈষ আহ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়ম্ অক্রুক্ষদিতি মন্যতে ॥ ৪ ॥

"এখানে কেউ যেন চেঁচিয়ে' গোরুকে ডাকছে, আবার, ওদিকে কেউ যেন কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে। বনে যে থাকে, তার মনে হয়, সন্ধ্যাবেলায় কে বুঝি দূর থেকে চেঁচাচ্ছে।"

ন বা অরণ্যানির্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে ॥ ৫ ॥

"অরণ্যানী দেবী কাকেও বধ করেন না, কেবল (হিংস্র পশু প্রভৃতি) মানুষের শত্রুই এই কাজ করে। মানুষে অরণ্যের দান মিষ্টি ফল খায়, আর নিজের ইচ্ছামত সে ঘুরে বেড়ায় বা বিশ্রাম করে।"

আঞ্জনগন্ধিং সুরভিম্ বহ্বন্নাম্ অকৃষীবলাম্।
প্রাহম্ মৃগাণাম্ মাতরম্ অরণ্যানিম্ অশংসিষম্ ॥ ৬ ॥

"আমি দেবী অরণ্যানীর এই প্রশস্তি গান ক'রলুম, যিনি গন্ধাঞ্জনময়ী, সৌরভে পূর্ণা, যিনি কৃষি না ক'রেও বহু অন্নের অধীশ্বরী, আর যিনি সমস্ত আরণ্য মৃগদের মাতা ॥"

ভারতের মানুষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই যে পরিবেশের মধ্যে প'ড়েছিল, দেশের আদিম অরণ্যের পরিবেশ, তাকে ভালবাসতেও শিখেছিল। বেদ-সংহিতায় এই ভালবাসার প্রচুর নিদর্শন আছে। অথর্ববেদের ভূমি-সূক্ত বা পৃথিবী-সূক্ত পৃথিবীর প্রতি ভালবাসায় যেন ভরপুর—যে পৃথিবী তার নিজের স্বাভাবিক দান আর মানুষের কৃষির ফল এই দুই দিয়ে সকলের পোষণ করেন। সংস্কৃত মহাভারতের অনেক কথার পিছনে আছে এই বনজঙ্গলের পটভূমিকা। তেমনি রামায়ণেও—রামায়ণ একাধারে মহাপুরুষ নরবীর রামচন্দ্রের আর মহীয়সী নারী সীতার, আর প্রাচীন যুগের শাশ্বত অহল্যা অরণ্যানীর মহাকাব্য। বাণভট্টের গদ্যকাব্য "হর্ষচরিত"—একটি আধুনিক মনোভাবের পণ্ডিতের রচনা। "হর্ষচরিত" সপ্তম উচ্ছ্বাসের শেষের দিকে, ভারতবর্ষের সাহিত্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দচিত্রকারের লেখায়, মধ্য-ভারতের বিন্ধ্য-পর্বতের পাদদেশে বনপ্রান্তে অবস্থিত একটি গ্রামের ("বন-গ্রামক" এর, অর্থাৎ ছোট্ট জঙ্গলের গাঁয়ের) এক অতিজীবন্ত বর্ণনা আছে। খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকের বাঙালী কথাকার অরণ্যপ্রিয় বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" পাঠের আনন্দ আমরা আরও বেশী গভীর ভাবে উপভোগ ক'রতে পারবো, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাণভট্টের এই বন-গ্রামকের বা বন গাঁয়ের বর্ণনা যদি আমরা মন দিয়ে পড়ি।

বাণভট্টের রচিত এই বন-গ্রামকের অপূর্ব বর্ণনাটিতে বন কেটে বসানো নোতুন গ্রামের যে দর্শনোজ্জ্বল (আর বর্ণনা-ভঙ্গীতে কিছুটা কল্পনোজ্জ্বল) চিত্র তিনি ধ'রে দিয়ে গিয়েছেন, সেটিতে যেন বিভূতিভূষণের "আরণ্যক"-এরই পূর্বাভাস পাচ্ছি। বাণভট্টর এই দুই অপরূপ গদ্যকাব্য "হর্ষচরিত" "কাদম্বরী", প্রকৃতি আর গ্রাম আর অরণ্যানীর আশ্চর্য্য-মনোহর বর্ণনায় ভরপুর। ভারতের সাহিত্য-প্রাণ,-প্রায় চোদ্দ শ' বছর আগে যে কথা বল্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল, সংস্কৃতভাষার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হ'য়ে ভাষা-মাধুর্য্যের যে মন্দাকিনী-ধারা বইয়ে' দিয়েছিল—সেই একই সাহিত্য-প্রাণ, বিভূতিভূষণের প্রাঞ্জল সহজ সরল বাঙলায় কি অদ্ভুত-ভাবে পুনর্জীবিত হ'য়েছে। প্রবোধেন্দু ঠাকুর কৃত অতি মনোহর শৈলীর আধুনিক বাঙলায় "হর্ষচরিত"-এর যে অনুবাদ হ'য়েছে, তা থেকে এই গ্রাম-বর্ণনার সামান্য একটু অংশ, এই "আরণ্যক"-প্রসঙ্গের অবতারণায়, বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হবে মনে ক'রে, নীচে দেওয়া গেল :

পরের দিন প্রভাত। হর্ষ আরোহণ ক'রলেন অশ্বে। স্নেহমুগ্ধা ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধিৎসায় নিজেই ক'রলেন প্রয়াণ।

উত্তর-প্রদেশ থেকে বিন্ধ্যাটবীর পদমূল।

এই পথ-যাত্রার বৈচিত্র্য একটি মানসিক সম্ভোগের আহ্লাদ নিয়ে আসে। সম্রাটের নয়নে উদ্ভাসিত হ'তে লাগ্‌ল সমাজ এবং সাধারণ্যের নাগরিক ও অনাগরিক সৌষ্ঠব।

গ্রামের লোকেরা গমের ভুষিগুলিকে ফেলে দিয়ে, যত্নে বাছাই ক'রে রাখছে খোসাগুলো, আগুনে পোড়াবে ব'লে; বীজ-ধানগুলোকে আগুনের ধোঁয়ায় ধূসর ক'রে নিয়ে তুলে রাখছে মাচায়। ছায়া-শীতল বটগাছগুলোর ডালপালা কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে জ্বালানি তৈরি ক'রছে লোকেরা। গোয়ালে গোরু নেই। সুন্দর সুন্দর বাছুরগুলো বাঘ-মারা ফাঁদের সামনে রেখেছে, বাঘে মারলে তবে খাব—এই উদ্দেশ্যে*। কাঠকুড়ানি ও কাঠুরেরা কাঠ কাটতে গিয়েছিল বলে, বন-রক্ষকেরা তাদের কাছে উৎকোচ না পাওয়াতে তাদের যথা-সর্বস্ব—ঐ কোদালগুলোও কেড়ে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে। কোথাও-কোথাও ভগ্ন অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছে চামুণ্ডা-মণ্ডপের ভাঙা দেউল, তাতে শিকড় গজিয়েছে, মণ্ডপটিকে মনে হ'চ্ছে একটি অরণ্যের অংশ। কৃষাণরা পতিত জমির উপরে কোদাল পাড়ছে, হালের বলদ নেই—ছেলেপিলেদের ও কুটুম্বদের ভরণপোষণের ভাবনায় তারা আকুল। দুঃখের চীৎকার দিয়ে নিজেদের গতর খাটাচ্ছে। শালি-ধানের খামারগুলোর ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে চেঁচাচ্ছে, আর ব'লছে—"আমার জমির মাটির রং কালো, সেখানে আমি কি কার্পাস বুনবো ?"

বৃক্ষের কাণ্ডগুলি মাটিতে শুয়ে আছে, শাখা প্রশাখা নেই, দু-একটি মাত্র নূতন পাতা গজিয়েছে। কোকিলাক্ষের চারায় ফুল ধ'রেছে, খয়ের গাছের শুকনো পাতার মধ্যে যেন নিভে গেছে নরকের আলো। শ্যামাক-ধানের নবমঞ্জরী আর অলাবু-ফলের মধ্যে আভা প'ড়েছে কীটদষ্ট দুর্গতির। ক্ষেতের ভিতর মাচান রচনা ক'রে ব'সে র'য়েছে রাত-প্রহরীর দল। সাপেদের উপদ্রব হ'য়েছে গ্রামে। গ্রামের পর কত গ্রাম এই রকম অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছে দেখতে পেলেন মহারাজ শ্রীহর্ষ।

এই সবই দুর্ভিক্ষের সূচনা।

যখন তিনি আবার অন্য গ্রামে পৌঁছলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন, দুর্ভিক্ষের বিপরীত আকৃতি—সুভিক্ষ।

প্রতি পথের পাশে বিন্যস্ত র'য়েছে পথিক-পাদপের নব-পল্লবিত ছায়া, অটবীর বীথিতে-বীথিতে শালফুলের শ্বেত মঞ্জরী, কুটিরে-কুটিরে নাগপুষ্পের রক্তহীন শোভা। নব-খনিত কূপ থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্য বালিকারা। সমাপ্ত হয়ে গেছে মৃৎ-পাত্রিকায় শক্তু-ভোজন, তাতে লগ্ন হয়ে র'য়েছে কুটিল কীটের বেণী। জাম খেয়েছে

* এই অংশের পাঠভেদ ও ব্যাখ্যা নিয়ে গোলমাল আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব আর শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণের সংস্করণের পাঠ—"ব্যাপাদিত-বৎসরূপক-রোষ-রচিত-ব্যাঘ্রযন্ত্রৈঃ", যার অর্থ হ'চ্ছে "বাছুর মারার (জন্য) ক্রোধ-হেতু যে বাঘ (ধরবার বা মারবার) যন্ত্র তৈরী হ'য়েছে।" শ্রীযুক্ত কাণে পাঠান্তর দিয়েছেন—"রোষাবিষ্ট-গোপাল-কল্পিত-ব্যাঘ্রযন্ত্রৈঃ"; অর্থাৎ "(বাছুর মেরে ফেলার জন্য) ক্রোধান্বিত গোয়ালাদের দ্বারা তৈরি বাঘ-মারার কল।" "ব্যাপাদিত-বৎসরূপ-রোষাবিষ্ট-গোপাল-কল্পিত-ব্যাঘ্রযন্ত্রৈঃ" এই পাঠ পাচ্ছি কেরলের পণ্ডিত শূরনাড কুঞ্জন্ পিল্ল-র সংস্করণে। এই পাঠ ও অর্থ E.B.Cowell ই-বী-কাউএল এবং F.W.Thomas এফ-ডব্লিউ-টমাস তাঁদের ইংরেজি অনুবাদে, আর বাসুদেবশরণ অগ্রবাল তাঁর হিন্দী বই "হর্ষচরিত—এক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন"-এ দিয়েছেন। প্রবোধেন্দু ঠাকুর তাঁর বাঙলা অনুবাদের মূল কোথায় পেলেন জানি না।

পথিকেরা, পথে ছড়িয়ে' আছে জামের আঁটি। ধূলি-কদম্বের স্তবকে জেগেছে গ্রাম্য মেহের পুলক।

আর একটা গ্রামে দেখতে পেলেন, গ্রৈষ্মী উষ্মা ;—

বালির ঘড়ার গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে' রৌদ্রে রেখে ঘড়ার জল শীতল করা হ'চ্ছে ;

জালার গায়ে শৈবালের প্রলেপ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হ'চ্ছে জল ; ছোট-ছোট ঘড়ার ভিতর পারুল ফুল, কিছু লাল চিনি, কর্পূরের মেশানি দিয়ে রাখা হ'য়েছে। জল-ঘটিকার মুখগুলিকে বাঁধা হ'য়েছে ক্ষৌম বস্ত্রের মধ্যে পাটল ফুলের সঞ্চয় দিয়ে,—হবে সুখপান।

অন্য গ্রামে যেতে-যেতে চোখে প'ড়্‌ল—

পথের ধারে র'য়েছে অনেক জলসত্র, প্রপা, অনেক পানীয়-শালা। সেখানে বিশাল-বিশাল জলশালার শিখরগুলি আবৃত র'য়েছে আম্রের শিশু-পল্লবের সরস সমারোহে। রৌদ্র ক্লান্ত পথিকেরা সেখানে পান করে শীতল জল, এবং আর্দ্র ক'রে নেয় শ্রান্ত মস্তকের চীর-বাস।

এই বিজয়াভিযানের পথে কত যে গ্রাম, গণ্ডগ্রাম, দুর্ভিক্ষের ইতিহাস, সুখের সংসার, আনন্দিত শোভা শ্রীহর্ষদেবের চোখে প'ড়্‌ল, তার ইয়ত্তা নেই। এ যেন একটি আরণ্য আর গ্রাম্য দিগন্ত-দর্শন।

[এর পরে বর্ণনা আছে বিভিন্ন গ্রামের—লোহারদের, কাঠুরিয়াদের, বন-গ্রাম প্রান্তে ব্যাধদের আর পাখমারদের বসতির, আর তার পরে নানা প্রকার বনজ বাকল ফল ফুল তুলার-চারা, শণের-মূল অতসী-পাটের গাঁট, আরণ্য মধু, মোমের মালা, বাঁকে-কোলানো লামঞ্জক ফুলের জটিল জটা, খদির গাছের 'বাকল-ছাড়ানো ছোট-ছোট ডাল, সুগন্ধি কুষ্ঠলতা আর লোধ্র ফুলের ভার, ফলের পেটী—জঙ্গল থেকে এই সব সংগ্রহ ক'রে ভারীরা মাথায় বা বাঁকে ক'রে কাঁধে নিয়ে চ'লেছে, বিক্রীর উদ্দেশ্যে। তার পরে—]

ভিন্ন গ্রামে যখন পৌঁছুলেন শ্রীহর্ষদেব, তখন তাঁর বিস্মিত নেত্রে প্রস্ফুটিত হ'ল বিরুক্ষ ক্ষেত্রের অনুর্বর দুর্বল রূপ। "আরক্ষ"-নামক রাজকর্মচারীরা সেই সব ঊষর জমির সংস্কার কার্য্যে দণ্ড-হস্তে ব্যাপৃত। শঙ্কিত চরণে অন্তর্ধান ক'রছে অরণ্য-হরিণেরা। হেলা ভরে পালিয়ে' যাবার কি সুন্দরী তাদের গতিলীলা! অত বড়-বড় উঁচু বাঁশের বেড়াগুলোও উদ্দাম উল্লম্ফনে টপকিয়ে' পালাচ্ছে। পথ জুড়ে চ'লেছে সহস্র সহস্র শকটের শ্রেণী, আকাশ অন্ধকার ক'রে উঠ্‌ছে শকটের ধূলি। ক্ষেত্র-সংস্কারের জন্য গাড়ী বোঝাই ক'রে সার চ'লেছে। সার-সংগ্রহের মধ্যে র'য়েছে—পুরাতন পাঁশ, পচা পাতার সার, এবং কালো ঘুঁটের সার।...

দেখতে পেলেন :—

গ্রামবাসীদের খড়ের ঘর। তার পাশে নিম্নস্তরে অশ্বত্থ গাছের ছায়া। উপকণ্ঠে সযত্নে রচিত হ'য়েছে ইক্ষুর ক্ষেত্র—দেখাচ্ছে যেন এক-একখানি বাঁধানো পান্না।

গৃহগুলির অবস্থান কিছু দূরে-দূরে। মাঝে-মাঝে র'য়েছে মরকত-বর্ণের মুচ্‌ছিপাদপ এবং কার্মুক-কর্মকারী বিংশবিটপের বেড়া। সেগুলির পাশে অনধিকার প্রবেশে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে সজ্জিত র'য়েছে—কণ্টকিত করঞ্জ-মঞ্জরীর রক্তবর্ণ বৃতি।

বৃক্ষবাটিকার গুল্ম-গহনতায় দেখতে পাওয়া গেল এরণ্ড, বচ, বল্কক, সূরণ, (শুষণী শাক), শেগট (শীগ), গ্রন্থিপর্ণ, গোধুক (কাশিয়া) এবং গর্মুৎ ঘাস। পাহারার জন্য পাশে-পাশে উঠেছে ছোট-ছোট উঁচু মাচান—তাদের মাথায় অলাবুর লতা। খদির-কাঠের খুঁটিতে বাঁধা র'য়েছে বাছুরের দল। মাচানের পাশে ফলন্ত ডুমুরের উজ্জল শোভা। দূরের একটি কুটির থেকে হঠাৎ উঠ্‌ল কুক্কুটের আরটন। কুটিরের আঙ্গিনাটি অগস্তি গাছের স্তম্ভ দিয়ে রচিত। তার মধ্যে ছিল ক্ষিপ্র বাজপাখী ও গ্রহবাজ কপোতের ছোট-ছোট কুঠ্‌রি। আঙ্গিনার পাশে ছোট একটি পুষ্করিণী, তাতে ফুটে র'য়েছে পদ্মফুল।

এই গ্রামগুলির শোভাখানি সুন্দরিত ছিল :—

কোথাও কিংশুক ফুলের অগ্নিমান্ সমারোহে; কোথাও শাল্মলী ফুলের তুলায় সঞ্চয়ে; কোথাও নল শালি ধানের এবং বেণুকুঞ্জের শ্যামলতায়; কোথাও নাল-বীজের স্বর্ণ-শোভায়; কোথাও কুমুদ-শালুকের বীজের শর্করিত খণ্ডের তণ্ডুলে।

কুসুম্ভফুলের বন্ধনী দিয়ে অপূর্ব কৌশলে রাখী করা র'য়েছে রাজাদান চাউলের মরাই। মদন ফল দিয়ে স্ফীত করা র'য়েছে মধুক ফুলের মদ। কুঞ্জে কুঞ্জে সঞ্চিত র'য়েছে রাজমাসা (মসুর), ত্রপুষ (শশা), কুষ্মাণ্ড, অলাবু এবং কর্কটিকার (কাঁকুড়ের) বীজ। তাদের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোষা বিড়াল এবং জাত-কুকুর।

এই বনগ্রামক-গুলি উত্তীর্ণ হ'য়ে ভিন্ন দেশে যখন উপনীত হ'লেন শ্রীহর্ষদেব, তখন আকাশে লেগেছে সন্ধ্যা-সূর্য্যের অস্তশ্রী। অরণ্যের প্রান্তে এসে শিবির-সংস্থানের আদেশ দিলেন শ্রীহর্ষদেব ॥

ধরিত্রীমাতার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে মানুষকে পাওয়া যায়, তার বিষয় পাঠ ক'রে যাঁরা আনন্দ পান, তাঁদের সকলের কাছে, ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতি-দেবীর স্থান—এই বিষয়টি বিশেষ মনোজ্ঞ হবে। মনে হয়—একথা জোর দিয়েও কোনও কোনও সমালোচক ব'লেছেন—ভারতের মানুষ পৃথিবীর বহু অন্য দেশের মানুষের চাইতে নিজেকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির সন্তান ব'লে মিলিয়ে' দিয়েছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় শিল্প-কলায়, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ভারতীয় সাহিত্যে এ-কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে। এবিষয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার সুসভ্য প্রতিবেশী চীনের দৃষ্টিভঙ্গীর বেশ পার্থক্য আছে। চীন এখন থেকে অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রকৃতিকে যে চোখে অবলোকন ক'রতে আরম্ভ করে, সেটা হ'চ্ছে মার্জিত-রুচি নাগরিকের চোখ—যে নাগরিক নিজেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে একটু যেন আলাদা ক'রে দেখ্‌তে শিখেছিল; আর এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী হ'চ্ছে আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, আর এটি বিদগ্ধ সৌন্দর্য্যপিপাসু

মাহুষেরই দৃষ্টিভঙ্গী। ধীরে ধীরে নগরবাসী সভ্য নরনারীর মনে এই দৃষ্টিভঙ্গী এখন প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাচ্ছে, এর কারণ হ'চ্ছে, মাহুষের নিবাসস্থান এখন আর অরণ্যের আওতায় নেই। মানুষ এখন প্রকৃতির সন্তান নয়, নিজেকে প্রকৃতির সন্তান মনে করে না। সে মনে করে, প্রকৃতি তার দাসী, আর বিধি বা নিয়তি অথবা অজ্ঞাত কোনও শক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট, প্রকৃতির কাজ হ'চ্ছে, নানাভাবে যন্ত্রবলে বলীয়ান্ মাহুষের সেবা করা। বিভূতিভূষণের "আরণ্যক"-এ দুটি মনোবৃত্তির মিলন দেখ্‌তে পাই—প্রথমতঃ, প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মহারা হ'য়ে তিনি যেন নিজেকে নিবেদিত ক'রে দিয়েছেন, আর যেন প্রকৃতির একটা অংশই হয়ে গিয়েছেন; আর সঙ্গে সঙ্গে "মেঘদূত"-এ কালিদাস যে শক্তি দেখিয়েছেন, সেই শক্তিরও অধিকারী তিনিও যেন হ'য়েছেন। তাঁর সম্বন্ধেও ব'লতেও পারা যায়—তিনি নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতি আর পৃথিবী থেকে আলাদা ক'রে নিতে পেরেছেন, আর তার ফলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, তার বিরাট্ ভাব, আর তার সর্ব্বব্যাপ্তির অনুভূতিও যেন পৃথিবীর বাইরে দাঁড়িয়ে' দেখ্‌তে পাচ্ছেন, পৃথিবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও তার সঙ্গে একাত্মতা না ভুলেও। প্রকৃতির সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই আদিম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে আরও মার্জিত, আর সত্যকার সৌন্দর্য্যপিপাসুর দৃষ্টিভঙ্গী। শিক্ষিত দার্শনিক মনোভাবের মানুষ অবশ্য এখন আর কেবল Conquest of Nature ব'লে দম্ভ করা অশোভন ব'লে মনে ক'রবেন। তাঁরা ব'লবেন—প্রকৃতির নিয়ম জেনে নিয়ে, আরও পূর্ণভাবে প্রকৃতির দান সংগ্রহ করা, উপভোগ করা—এই হ'চ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানবের কৃতিত্ব—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কথা না ভুলেও।

প্রকৃতির সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব তার মধ্যে আমরা একটা গভীর বেদনার অনুভূতি যেন পাই—মানুষের সর্ব্বভুক্ আকাঙ্ক্ষার কাছে প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রতে হ'চ্ছে, এটা তাঁর মনোবেদনার মূল কথা। "আরণ্যক" বইখানির পরিসমাপ্তিতে তিনি তাঁর মনের এই ব্যথাকে প্রকাশ ক'রেছেন। মানুষের দরকারের তাগিদে নূতন-নূতন মানব-বসতি স্থাপিত করবার জন্যে আদিযুগের অরণ্যকে তিনি যে নিশ্চিহ্ন ক'রতে সাহায্য ক'রেছেন, সে-জন্যে তাঁর মনের অনুশোচনা তিনি চেপে রাখ্‌তে পারেন নি:

> নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।
>
> বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্ত্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চীৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী, আপনার কাজ দেখে আমরা পর্য্যন্ত অবাক্ হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!
>
> কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে।

দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিলাম। হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!…

বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" অতি উচ্চমানের কারয়িত্রী প্রতিভার পরিচায়ক তথ্য এবং তত্ত্বময় সংসাচিত্য। এই বই অরণ্য আর-অরণ্যপ্রান্তের মানুষের বসতির ভিতরের আত্মাকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে, আর প্রকৃতি আর মানুষ এই দুইয়েরই প্রতি আমাদের মনে ভালবাসা এনে দেয়। তা-ছাড়া, এই বইয়ের আর একটি মূল্য এই যে, এই বই যেন একটি জীবন্ত তথ্যচিত্র—মানুষের বিশিষ্ট কৃতির একটি ছবি এতে ফুটে উঠেছে—এমন মানুষের, যে প্রকৃতিকে তার নিজের কাজে লাগাচ্ছে।—আর এইভাবে কাজে লাগানো ছাড়া তার অন্য কোনও উপায় নেই, যদিও তার নিজের অভাব অনটন আর অর্থলিপ্সা মেটাবার জন্য সে প্রকৃতির চেহারা ব'দলে দিচ্ছে। বাঙলা দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিহার প্রদেশের একটি কোণে সেখানকার জীবনযাত্রার একটি স্তরের ছবি এমন সরস সততার সঙ্গে এই বইয়ে দেওয়া হ'য়েছে যে, যে সময়ে প্রকৃতি দেবী তাঁর সন্তান মানুষের দরকারের জন্য নিজে স'রে আসছেন, তার নিখুঁত ছবি হিসাবে এই বইখানির স্থান ভারতীয় সাহিত্যে একক এবং অমূল্য হ'য়ে যুগ-যুগ ধ'রে মানুষের মনকে রসসিক্ত ক'রবে। উপস্থিত সমালোচকের মতই যাঁরা এই বইয়ের রস একবার আস্বাদন ক'রতে পেরেছেন, তাঁরা কালিদাসের "মেঘদূত" আর অনুরূপ অন্য দু'চারখানি বইয়ের মত এই বইখানিকে কখনও ছাড়্‌তে পারবেন না॥

[গ]

বিভূতিভূষণের তিরোধানে

("কথাসাহিত্য", অগ্রহায়ণ ১৩৫৭—পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত)

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু আমাদের কাছে নিতান্তই অনপেক্ষিত, অনাশঙ্কিত—এখনও বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে না যে সেই সদানন্দ মূর্তি চিরতরে আমাদের চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছে। কাগজে বন্ধুবর শ্রীসজনীকান্ত দাসের লেখায় প'ড়লুম, মৃত্যুর ছায়া যে তাঁর উপরে প'ড়েছে তা তিনি মৃত্যুর দুদিন পূর্বেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। আর সেই বোধে স্থিরবিশ্বাসযুক্ত প্রসন্ন চিত্তে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁর "দেবযান" উপন্যাস বা'র হবার পরে তিনি নিজে আমায় এ বই প'ড়তে দেন—বইখানা প'ড়ে ছেলেবেলায় পড়া Marie Corelli মারি করেলির ইংরেজি উপন্যাস A Romance of the Two Worlds-এর কথা মনে হয়—আমি বিভূতিবাবুকে আমার অবিশ্বাসী মন দিয়ে ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিলুম, শেষটায় সাহিত্যে এইসব গাঁজাখুরি

ঢোকাতে লাগ্‌লেন! তাতে তিনি এই অলৌকিক রহস্যে পূর্ণ বিশ্বাসের জোরের সঙ্গে আমায় বলেন, "গাঁজাখুরি নয়, সব সত্যি। এ আমার অভিজ্ঞতার ফল।" এই বিশ্বাস তাঁকে মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায়ও ভয়ে ভীত হ'তে দেয় নি। প্রশান্ত ভাবে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। বিভূতিবাবুকে আমরা প্রকৃতির পূজারী, বন-পাগলা কবি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের দ্রষ্টা আর সাহিত্যে তার স্রষ্টা ব'লেই জানতুম, শ্রদ্ধা ক'রতুম—কিন্তু তিনি যে এইভাবে নিজ জীবনের এক Philosophy, নিজের বিশেষ দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে নিয়ে তারই আধারে স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী হ'য়ে ছিলেন, তার খবর আমার জানা ছিল না। এইরূপ কোনও জিনিস জীবনে না পেলে, মানুষ শোকাতীত দুঃখজয়ী হ'তে পারে না—

যং লব্‌ধ্বা চাপরং লাভম্ মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে॥

এ জিনিস তিনি যে পেয়েছিলেন, মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়ে তিনি তাঁর অবিচলিত ব্যবহারে তা আমাদের দেখিয়ে' গিয়েছেন। তিনি এখন আমাদের নাগালের বাইরে—নইলে তাঁকে ধ'রে সেই ধনের সন্ধান চাইতুম, যে ধনে ধনী হ'য়ে তিনি মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে যেতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের রূপকথায় যে আছে, স্বর্গের অপ্সরা এসে যখন দেখা দিয়েছিল কালো মেয়ের রূপে, তখন কেউ তাকে চিন্‌তে পারে নি। কিন্তু যখন সে চিরতরে চ'লে গেল, তখন তার আসল রূপের একটু ঝলক দেখিয়ে' সে চ'লে গেল। বিভূতিবাবু কি সেই ধরনের গুপ্তসাধক বা উপলব্ধিযুক্ত আত্মা ছিলেন, যিনি নিজের সত্য রূপকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন ক'রে রেখে আমাদের ধোঁকা দিয়ে গিয়েছেন?

কতদিন ধ'রে বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়, তার সূত্রপাত কবে, সে কথা আমার মনে নেই, তার হিসাব নেই; তবে বোধ হয়, বিশ বছরের বেশী হবে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। মনে হয়, তাঁকে তো বরাবরই চিনি। "পথের পাঁচালী" যখন ধারাবাহিক রূপে "বিচিত্রা"য় বা'র হ'ত, তখন মাঝে-মাঝে পড়তুম—চমৎকার লাগ্‌ত। তার পরে যখন "পথের পাঁচালী" বেরিয়ে' গেল, রসজ্ঞ সাহিত্যিক মহলে বিভূতিবাবুর স্থান হ'য়ে গেল, তখন "প্রবাসী"তে "পথের পাঁচালী"র দ্বিতীয় পর্ব "অপরাজিত" বা'র হ'তে লাগ্‌ল। আমার মনে আছে, ছাত্রাবস্থায় যে অধীর আগ্রহে "প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথের রচনা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রচনা প'ড়তুম, সেই আগ্রহে উক্ত কালে মাস-মাস "অপরাজিত" পড়্‌বার অপেক্ষায় থাকতুম। আমার নিজের কাছে "অপরাজিত"কে বিভূতিভূষণের সর্বশ্রেষ্ঠ বই ব'লে মনে হয়; আর এর মধ্যে অপুর বিবাহের আর বিবাহিত জীবনের যে মনোজ্ঞ ছবি বিভূতিভূষণ এঁকে গিয়েছেন, সেটিকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ Love Idyl বা প্রেম-চিত্রের অন্যতম ব'লে আমার মনে লেগেছে। শুনে খুশী হ'য়েছি, বিভূতিভূষণের নিজের বিশ্বাসও ছিল যে "অপরাজিত" তাঁর চরম সৃষ্টি। "পথের পাঁচালী"র চেয়ে "আরণ্যক" আমার বেশী ভাল লাগে—বোধ হয় এতে মানুষের স্থান একটু বেশী ব'লে।

বিভূতি বন্দ্যর সঙ্গে প্রথম আলাপের সন-তারিখ স্থান-কাল মনে নেই—বোধ হয় তখন

এমনি সাধারণ শিষ্টাচার-সঙ্গত ব্যাপারই হ'য়েছিল। কিন্তু আমি আমার বিগত ৩০ বছরের জীবনে, ওঁর সঙ্গে যখন পরিচয় আমার ছিল না তখনকার কথা যেন মনেই ক'রতে পারি না। সাহিত্যিক বন্ধু-মহলেই প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা হ'ত। পরে তাঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হ'ল, যখন তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাঙলায় পরীক্ষক হ'য়ে আমার সঙ্গে কাজ ক'রতে এলেন। ম্যাট্রিকুলেশনের বাঙলার প্রধান পরীক্ষক হ'য়ে সহকর্মী পরীক্ষকদের সঙ্গে পরম আনন্দে কয় বছর কাজ করবার সুযোগ আমার হয়। বিশেষতঃ যাঁরা Scrutiniser বা নিরীক্ষক হ'য়ে, আমার গৃহে এসে স্তূপীকৃত কাগজ নিয়মিত ভাবে দেখ্‌তেন, তাদের সঙ্গে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কী আনন্দে সময় অতিবাহিত হ'ত। এঁরা ছিলেন বেশীরভাগই স্কুলের মাষ্টার—দুই-একজন প্রফেসরও থাক্‌তেন। আর সাধারণ সাহিত্যিকও থাক্‌তেন। যাঁরা দেখা-খাতা জমা দিতে আস্‌তেন, তাঁরাও এই অন্তরঙ্গ Scrutiniserদের দলে জ'মে যেতেন। পরীক্ষার কাজে আমার সহকর্মীরাও পূর্ণ সহযোগের সঙ্গে কাজ সম্পূর্ণ ক'র্‌তেন। বিভূতিবাবু কয়েক বৎসর সাধারণ পরীক্ষক থাকার পরে, তাঁকেও Scrutiniser বা নিরীক্ষক ক'রে নিই। তাঁর কাজ একটু ঢিলা-ঢালা হ'ত, কিন্তু তাতে কিছু আস্‌ত'-যেত' না। খাতা দেখাও চ'লছে,—খাতায় বিভিন্ন উত্তরের জন্য নম্বরের যোগসংখ্যা ঠিক আছে কি না, কোথাও নম্বর দেওয়া বাদ প'ড়েছে কি না, কোথাও বা অনাবশ্যক বা বেশী প্রশ্নের উত্তরের জন্যও নম্বর দেওয়া হ'য়েছে কি না, কড়া ক'রে উত্তরের বিচার হ'য়েছে কি ঢিলা ক'রে—এই সব দেখা ছিল Scrutiniser-এর কাজ। এই নীরস কাজ সকলের পক্ষে রোচক হ'ত, মাঝে-মাঝে নানা সাহিত্যিক আর অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে। বিভূতিবাবুও এতে যথারীতি অংশগ্রহণ ক'র্‌তেন। তাঁর ব্যক্তিগত সরলতা এতখানি ছিল যে তিনি নিজের কথা পঞ্চমুখে ব'লে যেতেন, নিজের ভুল-চুক দোষ-ত্রুটি হাস্যকর পরিস্থিতি কিছুই ঢেকে-ছেপে কথা কইতে জানাতেন না। তাঁর মনটি ছিল স্ফটিক-শুভ্র, তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা যেত'। অনেক সময়ে তাঁর নিজের আচরণ, অন্য লোকের সম্মুখে যা তিনি নিজেই ব্যক্ত ক'র্‌তেন, তা এত বোকার মতন আমাদের কাছে লাগ্‌ত যে তা নিয়ে আমরা বহুভাবে তাঁকে ঠাট্টা ক'রেছি গঞ্জনাও দিয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর চিত্তপ্রসন্নতার কোনও বিকার কখনও দেখি নি। বিভূতি-বাবুর অনুরাগী ভক্ত মেয়ে আর পুরুষ, স্কুলের ছেলে আর কলেজের অধ্যাপক জুটত প্রচুর। তিনি নিজেকে কারো কাছ থেকে দূরে সরিয়ে' নিয়ে যেতে পার্‌তেন না, প্রাণ খুলে গা ঢেলে সকলের সঙ্গে মিশ্‌তেন। এতে ক'রে মাঝে-মাঝে তিনি নিজেকে খেলো ক'রে ফেল্‌তেন—কিন্তু বন্ধুদের অনুযোগে কোনও ফল হ'ত না, ভারিক্কে হবার কলা তাঁর কৌশলের বাইরে ছিল।

সদানন্দ প্রকৃতিগত-প্রাণ আত্মভোলা এই মানুষটিকে ভাল না বেসে কেউ পার্‌ত না। ইনি কারো তাচ্ছিল্য তুচ্ছতামিশ্র ব্যবহার গায়ে মাখ্‌তেন না—এক সহজ চিত্তপ্রসন্নতা এঁকে যেন অভেদ্য বর্মে আবৃত ক'রে রেখেছিল। ক্রমে বুঝ্‌ছি, এই চিত্তপ্রসন্নতার আড়ালে তাঁর চরিত্রে এমন একটা বড় জিনিস ছিল যেটির হদিস আমাদের কাছে পৌঁছায় নি। বিভূতিবাবু একটু

ভোজনপটু বা ভোজনবিলাসী—এমন কি, ঔদরিক ছিলেন। এই ভোজনপ্রিয়তা তাঁর স্বাস্থ্যকে ভিতরে-ভিতরে নষ্ট ক'রে দিচ্ছিল, এটি দুই-চারজন বন্ধুর অভিমত। স্বাস্থ্যের জন্য ভোজনের আনন্দ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে' বাঁচিয়ে' চ'লতে হবে, এ যেন তাঁর ধাতের বাইরে ছিল। মজলিসী লোকের এটি একটি চরিত্র-রীতি বটে।

বিভূতিবাবু যেখানেই গিয়ে হাজির হোন না কেন, তাঁকে পেয়ে সকলেই খুশী হ'ত। সত্যই তিনি সকলের আনন্দ বর্ধন ছিলেন—তাঁর নিষ্কপট ব্যবহারে, তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টির জন্য। খুব বেশী কইয়ে-বলিয়ে ছিলেন না, ধৈর্য্যশীল শ্রোতা ছিলেন,—তবে উৎসাহের সঙ্গে সব আলোচনায় যোগ দিতে তৎপর ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই সহজ আভিজাত্যের জন্য কেউ তাঁর উপরে চটতে পারত না। সত্যই তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। প্রকট বা প্রচ্ছন্ন সাহিত্যিক দম্ভের লেশমাত্রও তাঁর মনে ছিল না। সহজ মৈত্রী আর শ্রদ্ধা আকর্ষণের এটি ছিল একটি মস্ত কারণ।

অনেক সময় তাঁর অনেক কাজ ছেলেমানুষীর পরিচায়ক ব'লে মনে হ'ত, তাতে আমরা একটু কৃপার চক্ষে তাঁকে দেখে হাসতুম। নানা জাতের সংস্কৃতির পরিচায়ক, বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত কতকগুলি মহাকাব্য, পাথরে খুদে আমার গৃহে বিভিন্ন ঘরের দেয়ালে বসিয়ে' রেখেছি, ঘরের শোভা হিসাবে। তার মধ্যে একটি গ্রীক বচন বিভূতিবাবুর খুব ভাল লেগেছিল। এই বচনটি গ্রীক-নাট্যকার মহাকবি Euripides এউরিপিদেস্-এর এক-খানি নাটক থেকে নেওয়া। কয়েকটি ছত্রের এই বচনের মূল গ্রীকটি আমার উচ্চারণ শুনে-শুনে তিনি মুখস্থ করে নেন, আর পরে দেখেছি, বিভিন্ন নিমন্ত্রণ-সভায় বা বন্ধু-গোষ্ঠীতে, পরিচিত বা অপরিচিত লোকেদের সামনে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে গ্রীক ছত্রকয়টি উচ্চকণ্ঠে আউড়ে শুনিয়ে' দিতেন : ō ges okhēma, kapi ges ekhōn hedran "ও গেস্ ওখেমা, কাপি গেস্ এখোন্ হেদ্রান্…" ইত্যাদি। আমি সভায় বা গোষ্ঠীতে উপস্থিত থাকলে, এই আবৃত্তির আগ্রহ তাঁর বেশী ক'রে দেখা দিত। এটা আমার কাছে পাগলামি বোধ হ'ত। কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে, এই ছত্রকয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ, যা তিনি জানতেন, তাঁকে অদ্ভুত ভাবে পেয়ে ব'সেছিল। এর অর্থ হ'চ্ছে এই :

> "তুমি পৃথিবীকে বহন ক'রে আছো,আর পৃথিবীতে তোমার সত্র বা আসন পেতেআছো ;
> তুমি যেই হও, তোমায় জানা কঠিন ,
> তুমি জেউস্ (দ্যৌষ্পিতা, পৃথক্ দেবতা) হ'তে পারো, তুমি প্রকৃতির বিধান হ'তে পারো,
> তুমি মানুষের চিৎশক্তিও হ'তে পারো ;
> তোমাকে প্রণাম করি ; ক'রণ, তুমি নিঃশব্দ পদক্ষেপে,
> মরণধর্মী প্রত্যেক প্রাণীকে তার যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছে দিচ্ছ।"

বোধ হয় এইরূপ একটা গভীর অনুভূতি বা উপলব্ধি তাঁর ছিল, যে অজাত আর অজ্ঞেয় শাশ্বত সত্তা বা পরাৎপর পরমেশ্বর, যাঁর স্বরূপ আমরা জানি না, তিনি সমগ্র অস্তিত্বকে ধ'রে আছেন, তার অন্তরে নিহিত হয়ে আছেন, আর সেই পরাৎপরই সকলের নিয়ন্তা। সেই জন্যই এউরিপিদেস্-এর এই বাণীটি তাঁর প্রিয় হ'য়েছিল।

ঋগ্বেদের মধুমতী-সূক্তে (১।৯০।৬, ৭, ৮) যে প্রার্থনা করা হ'য়েছে, যিনি ঋত অর্থাৎ বিশ্ব-নীতি বা ধর্ম পালন করেন, তাঁর পক্ষে বিশ্বজগতের সব-কিছুই যেন মধুময় হয়—বায়ু, নদনদী, ওষধি-লতা-গুল্ম, রাত্রি এবং উষঃকাল অর্থাৎ দিন, পৃথিবীর ধূলি থেকে আলোকময় আকাশ যিনি সকলের পিতা, পৃথিবীর অরণ্য ও বনস্পতি, গগনের সূর্য, আর আমাদের ঘরের গোসমূহ ; সেই প্রার্থনা যেন ঋতানুসন্ধানী আর ঋতজ্ঞ বিভূতিভূষণের জীবনেও সার্থক হ'য়েছিল—

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তম্ উতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌর্ অস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্ নো বনস্পতির্, মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্ গাবো ভবন্তু নঃ ॥

বিভূতিভূষণের সম্বন্ধে কথা ব'লতে আরম্ভ ক'রলে ছোটখাটো অনেক ঘটনা অনেক আলাপ-আলোচনা মনে আসে। কিন্তু আজ মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়ে তাঁর এই চিত্তস্থিরতা, এই অকুতো-ভয়তা, সেইটেই বেশী ক'রে মনকে নাড়া দিচ্ছে। আর তা থেকেই বুঝ্তে পারছি, জীবনের ক্ষুদ্রতা বা দৈন্য যা আমাদের জড়িয়ে' থাকে তা হয়তো তাঁকেও জড়িয়ে' ছিল, কিন্তু তার গভীরতম অবস্থানের মধ্যে তিনি হয়তো সব-কিছু গ্লানি থেকে মুক্তই ছিলেন। ইহজগতে তাঁর কৃতিত্ব তাঁকে অমর ক'রে রাখ্বে, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ তেজে দীপ্ত আর জয়যুক্ত হোক্ ॥

ভূমিকা

(১)

অভিজ্ঞ লাঠিয়াল প্রথম আঘাতেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করে দেয়, তারপর আর তার উঠবার ক্ষমতা থাকে না। 'পথের পাঁচালী' লিখতে বসে অলঙ্কারটা একটু মারাত্মক হ'ল, তবে জুৎসই সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণের প্রথম গ্রন্থ পথের পাঁচালী অভিধাতে আজ প্রায় দুই প্রজন্মকাল বাঙালী পাঠক লেখকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রথম গ্রন্থেই পাঠকের হৃদয় জয় করবার দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী এইরকম একটি উদাহরণ। এই রীতির ভালো মন্দ দুই-ই আছে। ভালোর দিক এই যে 'খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট', পাঠকের হৃদয়-প্রবেশের পথ অবারিত হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী রচনাসমূহ সহজেই সেখানে প্রবেশ করে। মন্দর দিকে প্রথম দানেই বাজী মাৎ করবার ফলে লেখক অনেক সময়ে অসাবধান হয়ে পড়েন, প্রথম গ্রন্থে স্বাভাবিক ভুলগুলিকে পরবর্তীকালে সংশোধন করবার দিকে তেমন মনোযোগী হন না। সুখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ এই শোচনীয় দৃষ্টান্তের ব্যতিক্রম।

সাহিত্যক্ষেত্রে অন্য জাতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। অপরিণত বয়সে নিতান্ত অপরিণত রচনা নিয়ে আবির্ভাব। পাঠক-সমাজের চোখের উপরে ধীরে ধীরে তাঁর পরিণতি হয়েছে, কখন যে পরিণতির পূর্ণাবস্থায় পৌঁছলেন পাঠক খেয়াল করতে পারেন নি। এ যেন মেঘলা দিনে সূর্যের অতিক্রমণ। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে সূর্য উচ্চতর আকাশে উঠছে, কিন্তু ঠিক কখন কতদূর উঠলো পুরোপুরি বুঝতে পারা যায় না, হঠাৎ একসময় মেঘ কেটে গেলে দেখা যায় মধ্যগগনে প্রচণ্ড সূর্য দীপ্যমান। তবেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুই শ্রেণীর রীতিরই উদাহরণ বর্তমান।

পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ, পথের পাঁচালীর সুবাদেই তিনি সর্বত্র পরিচিত, অনেকেই পরবর্তীকালে পরিণততর গ্রন্থের নামটা পর্যন্ত জানেন না। আবার পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের কল্যাণে ভারতের বাইরেও তার একটা পরিচয় আছে (যদিচ প্রযোজক সত্যজিৎ রায়ের নামটাই অধিকতর পরিচিত)। বইখানার ইংরাজি ও ফরাসী অনুবাদ হয়েছে। (এক্ষেত্রেও সাহিত্যের উপরে ছবির জিৎ, কারণ ছবির গল্পটাই অনুবাদে প্রকাশিত।) ছবিতে পথের পাঁচালীর নাম সুবিদিত হলেও পথের পাঁচালীর যথার্থ রস পরিবেশিত হয়েছে কিনা যথাস্থানে তার আলোচনা করবো।

পথের পাঁচালী গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়ে বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করেছে সত্য, কোন্ গুণে সম্ভব হলো বর্তমান আলোচনায় সেটা অন্যতম বিষয়। গ্রন্থখানা নানা আকারে ও রূপান্তরে বিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়ায়, সংক্ষেপিত ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাজারে প্রচলিত থাকায় এবং সর্বোপরি চলচ্চিত্রে পরিণত হওয়ায় পথের পাঁচালী ও তার লেখককে নিয়ে একটি Legend

গড়ে উঠেছে। এরকম সৌভাগ্য আর কোনও বাংলা গ্রন্থকারের হয়েছে কিনা সন্দেহ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাস অনেকদিন হলো পাঠ্যক্রমে নির্দিষ্ট হয়েছে, তবে সে কলেজে, যখন ছাত্রদের মন অনেকটা পরিণত হওয়ায় ভালোমন্দ বিচারশক্তি জাগ্রত হয়। বিভূতিভূষণ একেবারে স্কুলে গিয়ে আক্রমণ করায় বিনাতর্কে তিনি ছাত্রদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর গ্রন্থের যে নায়ক অপু সেও কিনা ছাত্রদের সমবয়সী। ফলে নায়কের বয়সে আর ছাত্রদের বয়সে জলে জল মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, কোথাও ভেদা-ভেদের রেখাটি পর্যন্ত নেই। পরবর্তীকালে সেইসব ছাত্র যখন বৃদ্ধিতে পরিণত হয়েছে, যখন তাদের ভালোমন্দ বিচারশক্তি জাগ্রত হয়েছে তখনও অপু-মোহ কাটাতে পারেনি। বাল্য-কালের আর দশটা সুখস্মৃতির সঙ্গে তাকে হৃদয়ে বহন করে চলেছে, অপুকে ও সেই সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে। তাহলে এখানে দুটি জিনিসকে পেলাম। একটি অপু ও তার শৈশব, আর একটি নিশ্চিন্দিপুর নামে গ্রাম। অর্থাৎ দেশ ও কাল।

দেশ ও কাল সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। এ দুই যে কী, সে বিষয়ে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ আজও মীমাংসায় পৌঁছতে পারেন নি, কোনকালে পারবেন বলে মনে হয় না। আবার এ দুই এক কি আলাদা—সে নিয়েও তর্ক আছে। আমাদের সে সব বিতর্কে প্রবেশ নিষ্প্রয়োজন। দেশ ও কাল সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান যা আমাদের আছে তা দিয়েই কাজ চলবে। পথের পাঁচালীতে বিভূতিভূষণের প্রধান কলা-কৌশল দেশ ও কালের কৈবল্যসাধন। দেশ ও কালের কৈবল্যসাধন বলতে কি বোঝায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটাই হবে গিয়ে বর্তমান আলোচনা। কাজেই পাঠকের ধৈর্যের প্রশ্রয় নিয়ে অগ্রসর হতে চেষ্টা করব।

দেশ ও কালের কৈবল্যসাধন বলতে বুঝি যখন ও যেখানে দেশ ও কাল একীভূত অর্থাৎ দু-ইয়ে এক, একে দুই। একটিকে গ্রহণ করলে আর একটিকে গ্রহণ করা হয়, দুটিকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আমরা দেখতে পাব যে নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ও অপুর শৈশব দুয়ে মিলে এক হয়ে গিয়েছে। একটিকে ধরে টানলে আরেকটি চলে আসে। এটি লেখকের একটি মস্ত কলা-কৌশল।

এই দুইকে আলাদাভাবে আলোচনা করার আগে কালকে লওয়া যাক।

পথের পাঁচালী গ্রন্থের শেষে অপুর বয়স কত? সাত-আট বছরের বেশী নয়। সে নিতান্ত নাবালক। যে ইন্দ্রিয়বোধ নিয়ে জন্মেছিল তার সামান্য কিছু ইতর-বিশেষ হলেও বুদ্ধি যা কিনা বয়সের সঙ্গে বাড়ে তা আদৌ বাড়ে নি, কারণ বয়সটাই বাড়ে নি। অপু চির-নাবালক। পরবর্তী গ্রন্থ অপরাজিততেও তার বয়স বাড়ে নি। অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে বয়স বাড়লেও ইন্দ্রিয়বোধের হিসাবে অপু নাবালক রয়ে গিয়েছে। সিন্ধবাদ নাবিক একটা বুড়োকে ঘাড়ে নিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছিল, অপু চলেছে তার শৈশবকে ঘাড়ে ক'রে। শুধু অপুই বা কেন, এই গ্রন্থের (আম-আঁটির ভেঁপু অংশের) প্রধান পাত্র-পাত্রী সকলেই নাবালক।

সবচেয়ে প্রবীণ নাবালক হরিহর রায় নিজে। এমন জাত-নাবালকের পুত্র কখনো যে সাবালক হবে এ যেন নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন। সংসারে এত যে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটন তবু হরিহরের আশাবাদ অটল। এই দুরপনেয় আশাবাদ চিরশিশুর লক্ষণ। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন তার মজ্জাগত। কোথায় কোন গ্রামে এক সম্পন্ন কায়স্থ গৃহী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল যে হরিহর ঠাকুরের কাছে মন্ত্র নেবে। এ কেবল কথার কথা, কিন্তু হরিহর তাকে সার কথা বলে ধরে নিয়ে আশার সৌধ গঠন করতে শুরু করল। কৃষ্ণনগরের অনির্দিষ্ট কারো কাছে অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে অনির্দিষ্ট ভাবে গেলে অনির্দিষ্ট একটা কিছু জুটে যেতে পারে। অতএব সুনির্দিষ্ট পয়সা খরচ করে চললো সেখানে হরিহর। এমন অনির্দিষ্ট স্বর্ণমৃগয়ায় ধাবমান হওয়ার অজস্র দৃষ্টান্ত বইখানিতে আছে। সর্বদাই শেষ পরিণাম নৈরাশ্য, তবু তার আশাবাদ টোল খায় না। হরিহর বাংলা সাহিত্যে Mr. Micawber, তার চির-অকৃতকার্যতা শেষ পর্যন্ত পাঠককে তার গুণগ্রাহী করে তোলে। এ ব্যক্তি যদি নাবালক না হয় তবে নাবালক আর কাকে বলে? অবশেষে সে একদিন সপরিবারে কাশীযাত্রা করেছে, সেখানে নাকি তার আশাতরু ফলবান হয়ে উঠবে। এ হেন লোককে নিয়ে কি করা যায়! অপু ও দুর্গা বয়সে ও স্বভাবে নাবালক, কাজেই বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ওর মধ্যে অভাব-অনটনে পোড় খেয়ে সর্বজয়ার যেন একটু বয়স হয়েছে, তবু একখণ্ড কাচকে দুর্মূল্য হীরকখণ্ড মনে করতে তার বাধে না, ধনীর পুত্র নীরেনের সঙ্গে দুর্গার বিবাহের প্রস্তাব করে চিঠির পরে চিঠি লিখতে তার আটকায় না। এই নাবালকের সংসারে না পড়লে আর দশজনের মতই একদিন সে সাবালক হতে পারত। স্থানমাহাত্ম্যে সে নাবালকই রয়ে গিয়েছে।

আর শুধু পাত্র-পাত্রীই বা কেন, হরিহর রায় পরিবারের মায়াগণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করলে প্রবীণ পাঠকও হঠাৎ নাবালক হয়ে পড়ে। বয়স ও বয়োজাত অভিজ্ঞতা কর্পূরের মত উবে গিয়ে তার খেলা শুরু হয়ে যায় অপু ও দুর্গার সঙ্গে। ওদের সাহচর্যে আবার সে নিজের শৈশবে ফিরে গিয়েছে। তখন তার কাছে আর কিছু অবিশ্বাস্য অসম্ভব বলে মনে হয় না। তখন কাঁচের টুকরো তার কাছে হীরের টুকরো বলে মনে করতে বাধে না, তখন চিনি মুখে দিয়ে অমৃতের স্বাদ পায়, আর যাত্রাদলের অভিনেতাদের রামায়ণ মহাভারতের প্রতিমূর্তি বলে বিশ্বাস করে। বাস্তবিক পথের পাঁচালী (আম আঁটির ভেঁপু) আমাদের সমষ্টিগত শৈশব, ঐ মায়াপুরীতে প্রবেশ করলে শৈশবের সোনার কাঠি স্পর্শে বয়সের জড়তা ভেদ করে জেগে ওঠে আমাদের শিশুচিত্ত। এই শিশুকেই আমরা দেখতে পাই Wordsworth-এর বিখ্যাত 'We are seven' কবিতায় এবং রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে। অপু এ দুইয়ের কোনটাতেই বেমানান হতো না। ✓

কালকে নাগের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে, কালনাগ। নাগের দুটি মূর্তি – একটি সরল, দীর্ঘ, আরেকটি কুণ্ডলীকৃত। কালেরও তাই। সাধারণ লোক সরল ও দীর্ঘ রূপটির সঙ্গেই পরিচিত। তবে চির-শিশু বিরাজ করে ঐ কুণ্ডলীকৃত রূপের উপরে, যেখানে কাল বিন্দুতে

পরিণত। বিভূতিভূষণ আশ্চর্য নিপুণতায় আম আঁটির ভেঁপুতে কালকে বিন্দুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই এই গ্রন্থের অমরত্বের আসল রহস্য।

কিন্তু হঠাৎ যখন 'বল্লালী বালাই' অংশের শেষে চোখে পড়ে 'ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের সেকালের অবসান হইয়া গেল' তখন মনটা আচমকা ধাক্কা খায়। নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম তো কালের অধিকারের বহির্ভূত, তার আবার সেকাল একাল কি, কুণ্ডলীকৃত কাল সেখানে তো আপনাকে লোপ করে দিয়েছে। আবার এই কারণেই অক্রূর সংবাদ অংশ মনকে ধাক্কা দেয়। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের বাইরে প্রকাণ্ড যে জগৎ আছে, কাল যেখানে কুণ্ডলীকৃত নয়, সরল সুদীর্ঘ দেহে চলমান কাশীতে হঠাৎ আমরা সেই কালের মধ্যে এসে পড়ি। এ যেন সাঁতার না-জানা লোকের অতর্কিতে অথৈজলে পড়ে যাওয়া। মুহূর্তে নিশ্চিন্দিপুরের কালাতীত স্বপ্ন ভেঙে শতখণ্ড হয়ে যায়। আমার কেমন যেন বিশ্বাস 'বল্লালী বালাই' ও 'অক্রূর সংবাদ' পথের পাঁচালীর অনিবার্য অংশ নয়। অপুর জন্মের সঙ্গে যে কাহিনীর সূত্রপাত, নিশ্চিন্দিপুর গ্রামত্যাগে তার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। এ কাহিনীর স্বভাবতই আদি-অন্ত নেই। তাই ঐ আদি ও অন্তটুকু অর্থাৎ 'বল্লালী বালাই' ও 'অক্রূর সংবাদ' ছেঁটে দিলে পথের পাঁচালীর রসহানি হয় এমন মনে হয় না।

এবারে স্থানের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে।

শামুক যখন চলে পিঠের উপরে তার বাসস্থানটিকে বহন করে নিয়েই চলে, ওটিকে বাদ দিলে সে একমুহূর্তও জীবিত থাকতে পারে না। শামুক ও তার বাসস্থান অভিন্ন। নিশ্চিন্দিপুর নামে শামুকের খোলাটি হরিহরের পরিবারের পিঠের উপরে বিধাতা অচ্ছেদ্য ভাবে এঁটে দিয়েছেন। ওরা যখন যেখানেই যাক, স্মৃতিতে নিশ্চিন্দিপুরকে বহন করে নিয়ে গিয়েছে। তবে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অপু; অবশ্য অন্যরাও নিতান্ত নিকৃষ্ট নয়। হরিহরের কাশীপ্রাপ্তি গোড়া থেকেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, কারণ সে পিঠের খোলাটিকে বর্জন করেছিল। আবার অপু ও সর্বজয়া যে জমিদার-বাড়ির আশ্রয়ে থাকতে পারলো না, তার গৌণ কারণ যা-ই হোক মুখ্য কারণ সেখানে তাদের স্বাভাবিক আশ্রয় নয়। তারা জমিদার-বাড়ির কৃত্রিম আশ্রয় পরিত্যাগ করে আবার পথে নেমেছে; সে পথ প্রত্যক্ষত ও পরোক্ষত নিশ্চিন্দিপুরেই চললো, কিন্তু সেখানে গিয়ে এ পথ শেষ হয়ে যায় নি। দেশ-দেশান্তর ছাড়িয়ে, যুগযুগান্তর পেরিয়ে এ পথ চলেইছে। পথের দেবতা প্রসন্ন হেসে অপুর কানে কানে পথের পাঁচালীর মন্ত্র দিয়েছেন, এখন সে যেখানেই থাক না কেন সে স্থানটাই হবে নিশ্চিন্দিপুর। মানুষ যেমন আপনার ছায়াকে অতিক্রম করতে পারে না, অপুও পারে নি অতিক্রম করতে নিশ্চিন্দিপুরকে। কোন মানুষ পারে কি? নিজের গ্রাম ছেড়ে মানুষ যেখানেই যাক সেই স্মৃতিকে বহন করে যায়। নাম দেয় নিউ ইয়র্ক, নিউ ইংল্যাণ্ড, নূতন নিশ্চিন্দিপুর। নিশ্চিন্দিপুর ক্ষুধিত পাষাণের সহোদর ক্ষুধিত পল্লী। সৌন্দর্যে মাধুর্যে যে স্মৃতি দুঃখময় হওয়া সত্ত্বেও আনন্দময়, সেই স্মৃতি জারক রসে সেখানকার বাসিন্দাদের ধীরে ধীরে অগোচরে আত্মসাৎ করে নেয়। তুলোর

হাকিম ক্ষুধিত পাষাণ পরিত্যাগ করে থাকতে পারে নি, অপুও পারল না, তাকে ফিরতে হলো নিশ্চিন্দিপুরের ক্ষুধিত পল্লীতে। তবে এ দুজনের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। তুলোর হাকিম ঘটনাচক্রে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণে, তাই যখন সে ছুটি পেল বুঝল 'সব ঝুটা হ্যায়'। আর অপু ক্ষুধিত পল্লীর মাটি উদ্ভিন্ন করে ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে, তার কাছে এর চেয়ে স্বাভাবিক ও সত্য কিছুই হতে পারে না। তাই সব সাচ্চা হ্যায়। এই সাচ্চা বলতে যে কি বোঝায় তা পরে বলছি।

আবার নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ও অপুর শৈশবকে আলাদা করে দেখা চলবে না, আগেই আভাস দিয়েছি। ঐ শৈশব যেমন সমস্ত মানুষের ঘনীভূত স্মৃতি—ঐ গ্রামটিও তেমনি। শৈশবের ঐ আদর্শ রূপ তার আদর্শ বাসস্থান ছেড়ে বাইরে এলেই অভিজ্ঞতার রূঢ় আঘাতে মুহূর্তে ভেঙে পড়ে, যেমন ভেঙে পড়েছে কাশীতে ও জমিদার-বাড়িতে একটি আর একটির আধার। তবে আধার ও আধেয়র মধ্যেও প্রভেদ আছে। এ যেন গায়ের কাপড়, যার দুই পিঠ হওয়া সত্ত্বেও দুই নয়। এখানেই স্থান ও কালের কৈবল্যসাধন সংগঠিত। নিশ্চিন্দিপুরের বাইরে অপু ডাঙায় তোলা মাছ, আবার অপুর বিরহে নিশ্চিন্দিপুরও আর আদৌ নিশ্চিন্ত নয়। এই যে দুইয়ে এক, একে দুই—এ অপূর্ব শিল্প-কৌশল। আশা করি দেশ ও কালের কৈবল্যসাধন মোটামুটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি।

সাহিত্য আবিষ্কার-কার্য, সাহিত্যিক আবিষ্কারক। কলম্বাস ও শেক্সপীয়ারের মধ্যে প্রভেদ এই যে একজনের আবিষ্কার-কার্য বহির্জগতে, অপরের অন্তর্জগতে। এ দুজন চরম দৃষ্টান্ত, ছোট-খাটো আবিষ্কারক অসংখ্য। সম্প্রতি মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌঁচেছে, কালক্রমে অন্যান্য গ্রহে গিয়েও পৌঁছবে, সাহিত্যের আবিষ্কার সম্বন্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য। বস্তুত উচ্চকোটি সাহিত্যের মূল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে আবিষ্কারের গুরুত্বের উপরে।

নব্য বাংলা-সাহিত্যে মধুসূদন পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আধুনিক রস আবিষ্কার করেছেন, আবার বাংলা ভাষার মজ্জায় আবিষ্কার করেছেন ক্ষাত্রতেজ। বঙ্কিমচন্দ্রের আবিষ্কার-ক্ষেত্রের পরিধি বহুবিস্তৃত। নানা সংস্কারে চারকলে আবদ্ধ বাঙালীর দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্র কল্লোলে জোয়ার-ভাটা আবিষ্কার তার একটি মহৎ কীর্তি। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালে রক্ত মাংস ও লাবণ্য সংযোজন করে সাহিত্যে তাকে নাগরিকত্ব দান করেছে। গীতার ধর্মকে আধুনিক জীবনে প্রয়োগ করে মানুষের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্র অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কারের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। একটির উল্লেখ এখানে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। পল্লীবঙ্গে অখ্যাত অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত জীবনের যে এত মাধুর্য, এত সৌন্দর্য, এত আনন্দ এবং এমন গভীরতা আছে তা আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীবঙ্গকে সেই সঙ্গে পল্লী-প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে দিয়েছেন আমাদের চোখের সামনে—চোখের সামনে থাকাতেও যা চোখে পড়ে নি। গল্পগুচ্ছ, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, কণিকা ও ছিন্নপত্রাবলী আমার উদ্দিষ্ট গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে আসেন

বিভূতিভূষণ। তিনিও পল্লীবঙ্গের আবিষ্কারক। তবে দুজনের কেন্দ্র ও দৃষ্টি স্বভাবতঃই এক নয়। আগন্তুকের দৃষ্টি দিয়ে, পথিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণ দেখেছেন পল্লীবাসীর দৃষ্টি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কুয়াশার রহস্য বিরাজমান, বিভূতিভূষণের দৃষ্ট বস্তু নির্মল মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে সুপ্রকট। তার প্রত্যেকটি মানুষ, গাছপালা, ঘরবাড়ি, নদী এবং নদীর ঘাট, দীঘি, এবং পানাপুকুর সমস্ত সুস্পষ্ট। তাদের আবার প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম আছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট জগতের স্মৃতি সকলের মনেই আছে, বিভূতি-ভূষণের দৃষ্ট জগতের কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। সবিশেষ বলবার প্রয়োজন নেই, কারণ বইখানার যে কোন পৃষ্ঠা উল্টোলেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানে একটি—"বাড়িতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুক্‌নো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজ্‌ঝোলা হল্‌দে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ঐ কঞ্চিখানার উপরে বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখী চারিদিকের বনে কিচ্‌-কিচ্‌ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—একটু-একটু রাঙা রোদ গাছের মাথায় এখনও মাখানো, মগডালে একটা কি সাদা মত দুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহার ঘুড়ি ছিঁড়িয়া আটকাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিক নির্জন···কেহ কোনো দিকে নাই···নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটায় কচুঝাড়ের কালো ঘনসবুজ নতুন পাতা চক্‌চক্‌ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ী আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি ?"

হরিহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে 'কিছু একটা হবে' এই আনন্দ, অপুকে বাঁচিয়ে রেখেছে 'কিছু হয়েছে' এই আনন্দ। পথের পাঁচালীর জগৎ অপুর চোখে দেখা জগৎ, তার সৌন্দর্য অপুর চোখে দেখা সৌন্দর্য। বিভূতিভূষণের চোখে নয়। পথিক রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে করতে পথ চলেছেন, বিভূতিভূষণ অপু ও দুর্গার চোখের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীজগৎ Subjective, বিভূতিভূষণের Objective

সৌন্দর্যের সঙ্গে করুণা আছে, একটুখানি করুণার মিশেল না থাকলে সৌন্দর্য বুঝি অসম্পূর্ণ থাকে। অপু গরীব ঘরের ছেলে। সুখাদ্য কখনও খেতে পায় নি, অথচ সংসারে নবাগন্তুক বালক বালিকা দুইটির সমস্ত ইন্দ্রিয় নবীনতার স্বাদের জন্য উন্মুখ। "দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটা কতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল। জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনো কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালক-

বালিকাদের জন্ত তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুল ফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।"

আবার "সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়। প্রত্যেক তরকারির জন্তে আবার আলাদা আলাদা বাটি।—তরকারিই বা কত। অত বড় গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্ত? লুচি। লুচি। তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়⋯কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ী ও লাউছেঁচকী দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার খাওয়া-শূন্য সকালে ও বিকালে, অন্তমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ, উদাসগতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনী বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ত-তৈয়ারী বড় উনুনে বড় লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি ভাজার অপূর্ব সুধারুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভাল কাপড়-জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলী-বাড়ীর বড় নাটমন্দির ও জলপাই-তলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে শতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই চৈত্র-বৈশাখ মাসের রামনবমী দোলের দিনটি—তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ী। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া। খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এ রকম খাইতে পায় নাই কখনো।"

লুচি হোক বা সামান্ত বুনো ফল হোক, দুই-ই তাদের কাছে সমান, বুনো ফল অবশ্য নূতন নয়। কিন্তু নবীনতা যাদের রসনায় তাদের কাছে নবীন না হয়ে যায় না। এই নবীনতাই কবির অন্তর্নিহিততম ধর্ম। কবির চোখে চরাচর নবীন। প্রথম দৃষ্টির সেই নবীনতা অন্তিম দৃষ্টিতেও যায় না। যে ব্যক্তি শৈশবের নবীনতাকে শেষ বয়স পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে সক্ষম সে যথার্থ কবি, কবিতা লিখুক আর নাই লিখুক। অপু জাতকবি। হয়তো পিতার অলিখিত কাব্যগুলি তার হাতে সুলিখিত হয়ে উঠবে। অথবা লিখতেই হবে এমন কথা নেই, বিশ্বকাব্যের উপরে চোখ দিয়ে দাগা বুলোতে বুলোতে তাকে আপন করে তুলবে হরিহর রায়ের পুত্র অপূর্ব রায়। পথের পাঁচালীর আসল কথা এই অপূর্ব কবিত্ব।

এই কবিত্বটুকু যে না বুঝতে পারল তার পক্ষে পথের পাঁচালী পড়া-না-পড়া সমান, বোধ করি না পড়াই ভাল, কারণ সে ভুল পড়া হবে। সাদা দৃষ্টিতে পথের পাঁচালী একটি হতদরিদ্র নিম্নবিত্ত পরিবারের কাহিনী, যাদের অনেক সময়ে অন্নের অভাবে গ্রামে অনায়াসলব্ধ তরকারি সিদ্ধ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়, ভাঙা ছাদ দিয়ে যাদের জল পড়ে, ছিন্নবসন যাদের দেহকে আবৃত করতে পারে না, গায়ের অঙ্গে একটা জামা জুটে ওঠে না, পরিবারের কর্তা নিরুদ্দম, ছেলে-মেয়ে দুটো নিতান্ত নাবালক আর পরিবারের কর্ত্রী কিভাবে আগামী বেলা স্বামী-পুত্রকে খেতে দেবেন সেই দুশ্চিন্তায় মগ্ন। যাঁরা অর্থনীতির মাপকাঠি দিয়ে জীবনকে

বিচার করতে অভ্যস্ত, যাঁরা সামাজিক পরিবেশের আবহাওয়া দিয়ে ভালমন্দ বিচার করে থাকেন—এ গল্প পড়ে তাঁরা হতাশ হবেন। অথবা উল্লসিত হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। তাঁদের প্রচার-কার্যের জন্য হয়ে উঠবে এই পরিবারটির অবস্থা। বুর্জোয়া সমাজে এ ছাড়া আর কি হবে, সামাজিক পরিবর্তনের ভার তাঁদের হাতে পড়লে এই পরিবারটির মানুষগুলোকে কারখানায় শ্রমিক বানিয়ে দিয়ে একটা হিল্লে করে দিতে পারতেন। কিংবা আরও বেশী, সমস্ত গ্রামটা জুড়ে কারখানা স্থাপন করে নিশ্চিন্দিপুরের নাম ঘুচিয়ে দুশ্চিন্তাপুর নামকরণ করতে সক্ষম হতেন। কেননা জীবনধারণের মান উন্নয়নেই সভ্যতার নাকি প্রাণ। আর সেই উন্নয়নের সঙ্গেই দুশ্চিন্তার কার্যকারণ সম্বন্ধ। কিন্তু হায়, এ গ্রামে কারও যে জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য শিরঃপীড়া আছে এমন মনে হয় না। যার আছে সে নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ত্যাগ করে গিয়েছিল। হরিহর রায়ও সপরিবারে গিয়েছিল, গিয়ে গ্রামের ও নিজের স্বধর্ম লঙ্ঘন করেছিল। সেইজন্যই ঐ অংশটাকে পথের পাঁচালীর অনিবার্য অঙ্গ বলে মনে হয় না। যাই হোক, এই পরিবারটির জীবনযাপনের মানের উন্নতিতে এতটুকু আগ্রহ নেই। হরিহর একটি ছড়া লিখতে পারলে কিংবা একছড়া পাকা কলা কোথাও থেকে পেলেই সপ্তাহকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকে। আর অপু ও দুর্গা তো সেই পিতারই সন্তান। তাদের চোখে যা পড়ে সবই সুন্দর, সবই অতলস্পর্শ আনন্দে পূর্ণ। দিনের প্রতি মুহূর্তটি, গ্রামের প্রতিটি দৃশ্য অপুর কাছে অমেয় রহস্যের আকর। আর সে রহস্য অমেয় বলেই তার নবীনতা কখনও জীর্ণ হয় না। "তুমি চলিয়া যাইতেছ…তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইলাম, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কি না, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে।"

পাশের বাড়ির প্রতিবেশী অপুকে একদিন মোহনভোগ তৈরী করে খেতে দিয়েছিল। মোহনভোগ যে এত সুস্বাদু হয় অজ্ঞাত ছিল তার। এই বস্তুটিকে তার সদ্য-আবিষ্কৃত এক রাজ্যের প্রথম দর্শনজনিত আনন্দ বলেই মনে হলো। ধনী প্রতিবেশীর বাড়িতে নূতন ধরনের খেলনা দেখলে তার মনে যে বিস্মিত পুলকের সঞ্চার হয় তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে যক্ষের অলকাপুরীর সৌন্দর্যে। আর রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী—যার কতকটা শুনেছে মায়ের মুখে, কতকটা দেখেছে যাত্রার আসরে, অপুর কাছে তা আদৌ পৌরাণিক নয়। নিতান্তই আধুনিক ব্যাপার। সেদিন না ঐখানে ভূপ্রোথিত রথের চাকাকে টেনে তুলতে গিয়ে কর্ণ মহাসঙ্কটে পড়েছিল, আর নদীর ওপারে বাবলা বনের আড়ালে এই সেদিন সকালে

কুরু-পাণ্ডবে কি যুদ্ধটাই না হয়ে গিয়েছিল। সে একই সঙ্গে ত্রিকালের সন্ধিস্থলে বাস করছে বলে আধুনিককে পৌরাণিক, পৌরাণিককে আধুনিক এবং অলৌকিককে লৌকিক বলে মনে করে। বোধ করি একটা বয়সে সকল শিশুই এরকম করে থাকে। এই শিশু সাধারণের সাধারণ রূপ হচ্ছে অপু। তবে অন্য শিশুরা বয়োপ্রাপ্ত হয়ে শৈশবটাকে ছেলেমানুষী বলে মনে করে, অপু বয়োপ্রাপ্ত হয়েও তা করে নি। শিশু-স্বর্গে একক অধিবাসী হয়ে গিয়েছে সে। এই শক্তিটিরই নাম কবিত্ব। ইন্দ্রিয় ও মনের নবীনতা বজায় রাখে কবিত্ব নামে গুণটি। এই কবিত্ব-গুণটি সমস্ত কাহিনীটিকে ইন্দ্রিয়চেতনার মোড়কে মুড়ে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রে এই গুণটির ঐকান্তিক অভাব। তাতে দারিদ্র্যের কঙ্কালটাকে ফলাও করে দেখানো হয়েছে, নিশ্চিন্দিপুর একটি পরিত্যক্ত পোড়ো জংলা গ্রাম, মানুষগুলো হতদরিদ্র আর রাজ্যের দারিদ্র্য-চোলাই-করা আরও হরিহর রায়ের পরিবারটি। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে বিদেশী পাঠকদের কেন এ ছবি ভাল লেগেছে। তারা জানতে অভ্যস্ত যে ভারতবর্ষ দরিদ্র, ওই তো ছবিতে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। দেহের প্রাণ ও লাবণ্য বাদ দিয়ে শুধু নীরস কঙ্কালটাকে যদি দেহ বলা চলে, তবে পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রটিকে পথের পাঁচালী গ্রন্থ বলা যেতে পারে।

বারংবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে কবিত্ব নামে অনির্বচনীয় গুণটি মুক্তার লাবণ্যের মত পথের পাঁচালীকে অপূর্বতা দিয়েছে। ঐ গুণটি বাদ পড়লে বইটি আর দশখানা গার্হস্থ্য উপন্যাসের চেয়ে বেশী নয়। ঐ গুণটি থাকাতে বইখানা দশখানার অন্যতম না হয়ে একেবারে দশম হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ দশম বললে বেশী বলা হয়, কমিয়ে দ্বিতীয়তম বলা উচিত। কেননা কপালকুণ্ডলা ছাড়া এত অধিক কবিত্বগুণ আর কোনো বাংলা উপন্যাসে আছে বলে জানি না। তবে আর কোনো কারণে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পথের পাঁচালীর তুলনা করা উচিত নয়। কেননা কপালকুণ্ডলা কালস্রোতের বেগে উপল-খণ্ডের মতো তাড়িত হতে হতে ভয়াবহ পরিণামের দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে। আর জানি না কেমন করে, পথের পাঁচালী-রূপ বিচিত্র উপলখণ্ডটি কালস্রোতের ঊর্ধ্বে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উপরে স্থান পেয়ে গিয়েছে। তার চারিদিকে পরিবর্তনের প্রবাহ আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও কলরোল। কিন্তু ক্ষুদ্র এই দ্বীপটি 'দি টেম্পেস্ট' নাটকের আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় এ সমস্ত পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে। সেখানকার অধিবাসীরা চিরশৈশবে অমরলোকে বিরাজমান, তুচ্ছ কাঁচখণ্ডকে হীরকখণ্ড মনে করে আনন্দ লাভ করতে পারে এমন সৌভাগ্যবান, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীদের প্রতিবেশীরূপে কল্পনা করতে পারে এমন ক্ষমতাবান, সামান্য বন্য ফলে এমন স্বাদ তারা পায় নন্দনবনের মধুরতম ফলেও দেবতারা তা পান কিনা সন্দেহ। এখানে কারও বয়স বাড়ে না, অভিজ্ঞতা নামে কুটিল বৃদ্ধ এখানকার অধিবাসীদের স্পর্শ করতে পারে না, আর দারিদ্র্য নামে ভয়াবহ জীনটা তাদের ভয় দেখাতে এসে হঠাৎ কি মনে করে বিকৃত-দর্শন মুখোশখানা খুলে ফেলে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চিরপরিচিত বন্ধুর মতো হেসে উঠে শুধোয় 'ভয় পেয়েছিলে নাকি? ঠাট্টা

করছিলাম।' এখানে দারিদ্র্য, রোগ, শোক আপনার স্বভাব ভুলে যায়। তাই না দুর্গার মৃত্যু-সংবাদ একটিমাত্র ছত্রে প্রদত্ত হয়েছে! দুর্বল লেখকের হাতে পড়লে ওখানে দুই পরিচ্ছেদ চোখের জলের আশঙ্কা ছিল। চিরশিশুর রাজ্যে আবার দুঃখ-সুখ অভাব-অনটন কোথায়? বিভূতিভূষণের [illegible] বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা এই যে, তিনি এই চিরশিশুর রাজ্যটি নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হন নি, সেখানে সকলের জন্যই নাগরিকত্ব লাভের অধিকার সংবিধান-সম্মত করে দিয়েছেন। যে [illegible] প্রবেশ করে বয়সের খোলস খুলে ফেলে সেই রাজ্যের অধিবাসীরূপে চিরশৈশব [illegible] অধিকার অর্জন করতে পারে, যেখানে "জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা"।

(২)

বাংলা ছোটগল্পের [illegible] রবীন্দ্রনাথের হাতে। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী ও যুগলাঙ্গুরীয়কে ছোটগল্পের পূর্বাভাস বলে থাকেন, তাঁদের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছুদিন জীবিত থাকলে রীতিমত ছোটগল্প লিখতে শুরু করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেই রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী ও যুগলাঙ্গুরীয় ছোটগল্পের পূর্বাভাস নয়, উপন্যাসের বামনাবতার। এই সব ক্ষুদ্র কথা ইচ্ছা করলে ত্রি-পাদ ভূমিতে চরাচর আচ্ছন্ন করতে সমর্থ, প্রমাণ ক্ষুদ্র ইন্দিরা ও ক্ষুদ্র রাজসিংহের বিরাট উপন্যাস মূর্তি ধারণ। কাজেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছোটগল্পের লেখক থেকে যাচ্ছেন।

সৌভাগ্যবশতঃ বাঙালী ঔপন্যাসিকগণ উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের লেখকও বটে। মৃতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ, জীবিতদের মধ্যেও এই ধারা রক্ষিত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন বাঙালী লেখকের কলম উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পে অধিকতর উপযোগী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার কারণ সবিস্তারে বিবৃত করেছেন।

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ছেড়ে দিলে বোধ করি তাঁর ছোটগল্পগুলির জনপ্রিয়তা উপন্যাসের চেয়ে বেশী। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে বোধকরি সকলেই স্বীকার করবেন যে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপ একই রকম, একই পাকে তাদের সৃষ্টি।

মেঘমল্লার বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ। প্রথম গল্প মেঘমল্লারের নামেই গ্রন্থের নাম। দুই শ্রেণীর গল্প বইখানিতে আছে। প্রথম শ্রেণীতে মেঘমল্লার ও অভিশপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাকী সবগুলি। গল্পগুলি রচনার সঠিক তারিখ না জানা গেলেও মোটের পরে এগুলি পথের পাঁচালী রচনার কিছু আগে ও সমকালে।

পুঁইমাচা একটি জনপ্রিয় গল্প। গল্পটি খুব সম্ভব পথের পাঁচালী রচনার আগে লিখিত। তা হোক বা না হোক গল্পটির মধ্যে পথের পাঁচালী নখদর্পণে বিম্বিত। ক্ষেন্তি দুর্গার পূর্বরূপ। ক্ষেন্তির বোন ভাই হয়ে জন্মেছে অপু নামে, তাদের পিতা সহায়হরি হরিহরের মতোই চির নাবালক, সংসারবিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন (দুটি নামের মধ্যেও মিল আছে)। আর

অন্নপূর্ণা সর্বজয়ার নামান্তর। (নাম দুটির মধ্যে কি প্রচ্ছন্ন অশ্রু নিহিত? যার ঘরে অন্ন নাই সে অন্নপূর্ণা, আর যার পরাজয় প্রথম থেকে শেষ অবধি সে কিনা সর্বজয়া) পুঁইমাচা গল্পের গ্রামের নাম নিশ্চিন্দিপুর হলে কেউ বিস্মিত হত না, একই পরিবেশ দুই গল্পে।

উপেক্ষিতা ও উমারাণী সমরসের গল্প। দুটি অসহায় বধূকে নিয়ে কাহিনী। উপেক্ষিতার বউদি ঘরের মানুষ নয়, নিতান্তই ঘাটের মানুষ। আর উমারাণী দ্বিতীয় পক্ষের অনাদৃতা বালিকা বধূ। ঠেলাগাড়ী আর কিছুই নয়, একটি বালকের খেলার গাড়ীর কাহিনী। খুকীর কাণ্ড গল্পটির নায়িকা ছোট্ট একটি খুকী।

গল্পগুলির আসল মজা এই যে এদের মধ্যে কোথায় গল্প পাঠকে বুঝতে পারে না, তবে শেষ করবার পরে একটি পরিপূর্ণ গল্প পাঠের তৃপ্তিতে পাঠকের মন খুশি হয়ে ওঠে। প্রস্তুতি নেই, পরিণতি নেই, অ্যারিস্টটলের প্রসিদ্ধ সূত্র আদি-অন্ত-মধ্য নেই, তবে যা আছে সকল রচনার কাম্যবস্তু; তৃপ্তিদায়ক পরিপূর্ণতার রস। পথের পাঁচালী এই রকম আর একটি উদাহরণ, যেটুকু প্রভেদ বিস্তারে ও সংক্ষেপে। এ এক আশ্চর্য শিল্প-কৌশল। বিভূতিভূষণ এই কৌশলে সিদ্ধহস্ত।

নববৃন্দাবন গল্পটিতে কিছু প্রস্তুতি ও পরিণতি আছে। বৃন্দাবনযাত্রী কর্ণপুরের পুনরায় সংসারী হওয়া এই গল্পের কাহিনী। নিজের সংসার যখন ভেঙে গেল, তখন বৃন্দাবনের পথে পিতৃমাতৃহীন একটি শিশুকে পেলেন। তাঁর আর বৃন্দাবন যাওয়া হল না। ঐ শিশুটিকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এসে আবার সংসার পাতলেন। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পে প্রধান পাত্রপাত্রী শিশু বালক-বালিকা বড়জোর কিশোর-কিশোরী।

অভিশপ্ত গল্পটি ঐতিহাসিক পরিবেশে রচিত। পাপের দণ্ডরূপে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ দুষ্কৃতকারী পরিবারের চাপা ক্রন্দন এখনও শুনতে পায় নৌযাত্রীর দল গভীর রাতে। এখানেও আছে একটি কিশোরী বধূ। কীর্তি রায়ের জিঘাংসা থেকে সে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল একটি নির্দোষ যুবককে। সে-অপরাধে কীর্তি রায় তাকে সুড়ঙ্গে জীবন্ত অবরুদ্ধ করেছিল। অবশেষে কীর্তি রায় সপরিবারে অবরুদ্ধ হল তার গড়ের মধ্যে। তাদের প্রাণরক্ষার সেই তিনশো বছর আগেকার আবেদন এখনও কানে এসে পৌঁছয় ভীত যাত্রীদের। এ গল্পটির আদি-অন্ত-মধ্য দেখতে পাওয়া যায়।

মেঘমল্লার এই গ্রন্থের তথা বাংলা ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। আদি-অন্ত-মধ্য অবলম্বন করে ইটের পরে ইট সাজিয়ে বৌদ্ধযুগের এই কাহিনীটি গঠিত।

এক তান্ত্রিকের জিগীষায় সরস্বতী বন্দিনীরূপে তার বাড়ীতে বাস করছেন। বৌদ্ধমঠে তরুণ বিদ্যার্থী প্রদ্যুম্ন নিজেকে পাষাণে পরিণত করে জগতের সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে দাসীত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। প্রদ্যুম্নর প্রণয়িনী সুনন্দা মঠে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করল। সব যায় গিয়েছে আশা তার যায় না বলে এখনও সে পথের দিকে কান পেতে বসে থাকে। তার মন বলে 'সে যে আসে আসে আসে'।

ঘোরতর আস্তিক বিভূতিভূষণ নাস্তিক গল্পটির মধ্যে তার ঘোরতর বিপরীতকে মূর্তি দান করে একপ্রকার আনন্দ লাভ করেছেন মনে হয়।

বউ চণ্ডীর মাঠ গল্পটি ইচ্ছা করেই শেষের জন্তে রেখেছি। এ-ও এমন একটি গল্প যাতে গল্প নেই তবে তৃপ্তির রস আছে। তবে একটি অনুযোগ, ছয় পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র একটি গল্পের মধ্যে ছাব্বিশটি গাছপালার উল্লেখ। গাঁয়ের মানুষ বিভূতিভূষণের নানারকম গাছপালার নাম জানবার কথা, কিন্তু সমস্ত পাঠক তো তেমন সৌভাগ্যবান নন।

(৬)

বিভূতিভূষণ আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ লিখেছেন, সে-সব মিশ্র উপাদানে গঠিত বলে তাদের কি নামকরণ করব ভেবে পাই নি। স্মৃতির রেখা, তৃণাঙ্কুর, ঊর্মিমুখর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও প্রভৃতি এক দেহে রোজনামচা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প ও আত্মচিন্তা। ঠিক এ শ্রেণীর বই বাংলায় আর আছে কিনা মনে পড়ছে না। এ রীতিটা অভিনব বলেই বোধ করি এসব বই পাঠকের কাছে তেমন পরিচিত নয়, আর গল্প উপন্যাসের মতো যে জনপ্রিয় হবে না, এ তো খুবই স্বাভাবিক। এক এক সময়ে মনে ভাবি এ জাতীয় বই লিখবার প্রেরণা কোথায়? বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস ও এই রচনাগুলি সমরস ও সমরীতিক। উপন্যাস রচনায় শেষে যে বাড়তি উপাদান হাতে থেকে গিয়েছে তাই দিয়ে এগুলি নির্মিত। এইসব রচনারও ফলশ্রুতি একটি পরিপূর্ণ রচনাপাঠের আনন্দলাভ। রাজশেখর বসু বলতেন, বিভূতিবাবু যাই লিখুন না কেন তা সুখপাঠ্য ও তৃপ্তিদায়ক। কোন লেখকের সম্বন্ধে এর চেয়ে উচ্চকোটির প্রশংসা আর আছে কিনা জানি না। আর সব বাঙালী উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক পাঠককে মুগ্ধ করেছে গল্প দিয়ে বিভূতিবাবু মুগ্ধ করেছেন গল্প না দিয়ে। গল্পের বদলে নিজের ব্যক্তিত্বটিকে চোলাই করে চাপাই করে বিতরণ করেছেন পাঠকদের পাতে। তাই বিভূতিভূষণ তাঁর রচনার চেয়ে প্রিয়তর। এখানেই তাঁর অমরতার রহস্য।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পথের পাঁচালী

বল্লালী-বালাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চার ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিকী প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিধাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্ব দিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাকরুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাকরুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই ছাখো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড বীচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাকরুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে।

ইন্দির ঠাকরুণ বলিল, থাক্ বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করচে না। থাক্ বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে, চলে আয় বলচি উঠে—

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাকরুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন। হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ী ছিল পাশের গ্রামে যশড়া-বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্পবয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার দিকে পিতৃদেবের কোন লক্ষ্যই নাই। বছরখানেক কোনরকমে চক্ষুলজ্জায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোন উদ্যম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ মরীয়া হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। দুপুর বেলা কোথাও কিছু নাই, সহজ মানুষ রামচাঁদ

আহারাদি করিয়া বিছানায় ছটফট করিতেছেন—কেহ নিকটে বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ সুর ধরিতেন—তাঁহার আর কে আছে, কে-ই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি—ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয়, এবং বিবাহের অল্পদিন পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যশড়া-বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস সুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্পবয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পরে শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোন বিষয়কর্ম্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, করার উপযুক্ত তিনি ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাহার স্ত্রী-পুত্র শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ার পতিরাম মুখুয্যের পাশার আড্ডায় অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শ্বশুরবাড়ী হাজির হইতেন মাত্র, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—পণ্ডিতমশায়, বৌটা ছেলেটা আছে, আখেরটা তো দেখতে হবে? রামচাঁদ বলিতেন—কোন ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে। পরে তিনি ছক্কা ও পঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে ঘর ভাঙিতে পারিবেন, তাহাই একমনে ভাবিতেন।

ব্রজ চক্রবর্ত্তীর ধানের মরাই-এর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা যে কতটা বে-আন্দাজী ধরণের হইয়াছিল, তাহা শ্বশুরের মৃত্যুতে পরে রামচাঁদের বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। এ গ্রামে তাঁহার জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটি শিষ্য-সেবক এদিকে-ওদিকে জুটিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কোন রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতেই হয়। তাহারাও এখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতেন, কিন্তু কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কর্ম্ম-স্থলে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে আর কেহ নাই।

শোনা যায়, পূর্ব্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাকরুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলীন্য-সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্ত্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্পি-বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকরুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সে ভাইও অল্প বয়সে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ আর পরেই এ ভিটাতে বাড়ী তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাকরুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত

আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জন্সন টম্‌সন সাহেব, কত মজুরদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল!

শুধু ইন্দির ঠাক্‌রুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাজিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও, তুমি রাজু...

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুণের চোখের উপর ঘটিয়া গেল! ঐ ব্রজ চক্রবর্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে! তখন কি ছিল ঐ রকম বাঁশবন! পৌষপার্বণের দিন ও ঢেঁকীশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাক্‌রুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ঐ রায়বাড়ীর মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকীতে দমাদম পাড় পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা-হাতে একবার সাম্‌নে সরিয়া আসিতেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমনি স্বভাবচরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাক্‌রুণ বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে! সেকালের আর কেও বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখ-দুঃখের দুটো কথা কয়।

তারপর এ সংসারে আশ্রয়দাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন। ঘাটে পথে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইত, মুখুয্যেদের তেঁতুল গাছে ডাঁশা তেঁতুল খাইতে গিয়া পড়িয়া হাত ভাঙিয়া দুই-তিন মাস শয্যাগত ছিল; সেদিনের কথা। ধুমধাম করিয়া অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হইল—পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসরের নববিবাহিতা পত্নীকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট দশ বছর প্রায় কোন খোঁজ-খবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো দু'পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ী আগলিয়া কত কষ্টে, কতদিন না খাইয়া প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে।

অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর সংসার পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে—সেই প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনে সে অন্য সুখ চাহে নাই,

অন্ত প্রকার সুখদুঃখের ধারণাও সে করিতে অক্ষম—আশৈশব-অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সে খুশী, তাহার কাছে সেইটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্পবয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে টুকটুকে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারি ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে!

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ীর সঙ্গে দু'বেলায় ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটি পিতলের ঘটী কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলি ঝুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন বৌ, আর যদি কখনো এ বাড়ীর মাটি মাড়াই, তবে আমার—। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—ওঠ্ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্ তোকে বক্‌বে না, আয় পিতিমা। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত। সর্ব্বজয়া মুখ ফিরাইয়া বলিত, ঐ এলেন! যাবেন আর কোথায়! যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া?··· তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা।

এ রকম উহারা বাড়ী আসার বৎসর-খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে—বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পূবের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ী থাকে। একটা বাঁশের আল্‌নায় খান দুই ময়লা ছেঁড়া থান। ছেঁড়া জায়গাটার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ী আজকাল ছুঁচে সুতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেশী ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে। একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁটুলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্ত্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্রমাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ী সেগুলো খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয়। বেতের পেঁটরাটার মধ্যে একটা

পুঁটুলি বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লালপাড় শাড়ী—সেগুলি তাহার মেয়ে বিশেশ্বরীর, একটা পিতলের চাদরের ঘটী, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড। পিতলের ঘটীতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটির ভাঁড়গুলার কোনটাতে একটুখানি তেল, কোনটাতে একটু নুন, কোনটাতে সামান্ত একটু খেজুরের গুড়। সর্ব্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁটরার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়।

সর্ব্বজয়া এ ঘরে আসে কচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর খুকী বলে,—পিভি, সেই ডাকাতের গপ্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকরুণের মুখস্থ ছিল। অল্পবয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাকরুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন সে এরকম ধৈর্য্যশীল শ্রোতা পায় নাই, পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, এইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্‌সে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চুলোবাঁধা এক—মিন্‌সে!—'মি' অক্ষরটা'র উপর অকারণ জোর দিয়া ছোট্ট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটা উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে খুকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ-পনেরো দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী-বংশ চৌধুরীরা নিকর ভূমিদান করিয়া যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন, হরিহরের পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান,—লাঠি এবং সড়কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চূয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনা-ডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্য্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরণের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহারা তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাস গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্ত্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্ব্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্ত্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে

পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্ত্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে সূর্য্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝির পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক,—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাঙ্গলা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্ণে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধবলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহানায় একটা নির্জ্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুইদিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষত পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহানার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু-একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া

উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হড়ুস্ করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছু কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্ব্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল। ডাঙা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জ্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে, সে অদৃশ্য ধর্ম্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের ঝাঁঝাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্ব্বেই কোন-না-কোন যোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হোক, বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হোক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিনকতক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসিমা নাই, অন্ত দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন্ এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্য্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড় দেখে না।

খুকী শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শির্‌শির্ শব্দ হইতেছে, আঁতুড় ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে—কেমন আছে খুড়ী? কি হয়েচে? আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরণের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তাহার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিড়ালছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনী বিড়ালের ছানাগুলা সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল—ঐ যাঃ—ওদের হুলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেললে···ঠিক্।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে। হুলো বেড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পরে সে অবাক্ হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল, ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েচে দেখবা না? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হলো, কালপুরের পীরির দরগায় সিন্নি দেবানে—বড্ডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকী এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভাল দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া

নিতান্ত দুর্বলভাবে অতি ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অবিকল বিড়ালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়ুনীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছাসত্বেও আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকমের কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথার চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন দি?

খুকী কেবল ভাবে, তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত! সবাই দেখিতেছে, আর তাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না। সে ছেলেমানুষ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়ীতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কবাটটা এক একদিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত? খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায়—সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে?

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটী আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে—এসে চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগ্‌গাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহ'লে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতেরই বাড়ী বসিয়া বুড়ী তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি!

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল—উঠানে ঝি-বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, এ তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে—

বাড়ী আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

বুড়ী সকালে উঠিয়া মহা খুশিতে ভিতর উঠান ঝাঁট দেয়, আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারটা যেন ঠিকমত চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহার করিয়া বুড়ী খিড়কীর পিছনে বাঁশবনের পথের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। সেদিকে আর নদীর ধার পর্য্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় এক-পোয়া পথ—এই সমস্তটা শুধু বড় বড় আমবাগান ও সুপসি বাঁশবন ও অন্যান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, আবোল-তাবোল বকে। ছোট এক বোঝা কাটা কঞ্চি জড়ো হইলে দুর্গা সেগুলি বহিয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় বুড়ীর নানা কথা মনে আসে।

সেই কতকাল আগেকার কথা সব।

সেই তিনি বার-তিনেক আসিয়াছিলেন—স্বপ্নের মত মনে পড়ে। একবার তিনি পুঁটুলির মধ্যে কি খাবার আনিয়াছিলেন। বিশেশ্বরী তখন দুই বৎসরের। সকলে ব'লল, ওমা,—চিনির ডেলার মত। ঘটীর জলে গু'লিয়া সেও একটু খাইয়াছিল। সেই একজন লোক আসিল—পুরানো সেই পেয়ারা গাছটার কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুর-বাড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে, একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, তাই গোলোকও পূর্ব্ব বৎসর মারা গিয়াছে—ব্রজ কাকার চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজে পত্রখানা লইয়া গেল। সেদিনের কথা আজ স্পষ্ট মনে হয়—ন-জেঠা, মেজ জেঠা, ব্রজ কাকা, ও-পাড়ার পণ্ডিত রায়ের ভাই যদু রায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধী ভজহরি। পত্র পড়িলেন সেজ জেঠা। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আনলে এ চিঠি রে ইন্দির? তাহার পর ইন্দির ঠাকরুণকে বাড়ী আসিয়া তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের সাধের জিনিস বাপ-মায়ের দেওয়া রূপার পৈঁছেজোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিঁদুর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিতে হইল। কত কালের কথা—সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের।......

নিবারণের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ। ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ। ষোল বৎসরের বালক, কি টকটকে গায়ের রং, কি চুল। ঐ যে চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জ্বররোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন দিন রহিল। আহা, বালক সর্ব্বদা জল জল ক'রত, কিন্তু ঈশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থ দিন রাত্রে মারা গেল, মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে বড় খুড়ীর মুখে কেউ জল দেওয়াইতে পারে নাই—পাঁচদিনের পর ভাশুর রামচাঁদ চক্কোত্তি নিজে ভ্রাতৃ-বধূর ঘরে গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাবো মা? বড় খুড়ী বনিয়াদী ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন—জগদ্ধাত্রীর মত রূপ,

অমন রূপসী বধূ এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পাদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই—সেকালের গৃহিণী, রন্ধন করিয়া আত্মীয়-পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্ত আহার করিতেন। দান-ধ্যানে, অন্নবিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাই ভাতরের কথায় মনের কোন কোমল স্থানে বুঝি ঘা লাগিল—তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশীদিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনিও পুত্রের অনুসরণ করেন।

একটু জল দে মা—এতটুকু দে—

জল খেতে নেই, ছিঃ বাবা—কবরেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

এতটুকু দে—এক ঢোঁক্ খাই মা—পায়ে পড়ি······

দুপুরের পাখ্‌পাখালির ডাকে সুদূর পঞ্চাশ বছরের পার হইতে বাঁশের মর্ মর্ শব্দ কানে ভাসিয়া আসে।

খুকী বলে—পিতি, তোর ঘুম লেগেচে? আয় শুবি চল্।

হাতের দা-খানা রাখিয়া বুড়ী বলে—ওই তাখো, আবার পোড়া ঝিমুনি ধরেচে—অবেলায় এখন আর শোবো না মা—এইগুলো সাঙ্গ করে রাখি—নিয়ে আয় দিকি ঐ বড় আগালেডা?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটি বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি সুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন, আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে! মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে—জে—জে—জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না—না—না—না ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটির ঢেলা, এক টুকরা কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ও কি, হাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন?—ছাড় ছাড়—ওরে করিস কি—দু'খানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল—ভেঙে গেলে তখন হাস্‌বি কি করে শুনি? খোকা তবুও ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি-হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া একমুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়ীচাঁচা পাখী সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে, জে—জে—জে—জে, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা থল্‌বল্‌ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইতে যায়। এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্ব্বজয়া বলে—খোকন বলে টু—উ—উ! দোলো তো খোকা? দোলে দোলে খোকন দোলে—! খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধরে—

(গীত)

জে—এ—এ—জে—জে—জে—এ—এ—ই
জে—জে—জে—জে—এ
জে—জে—জে—জে—জে—জে—

তার মা বলে,—আচ্ছা থামো, আর দুলো না খোকা, হয়েচে, হয়েচে, খুব হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্ব্বজয়া কান পাতিয়া শুনি . খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে না—যেন সে চুপ করিয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্‌ করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি-উপুড়-করা এক রাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নালসে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিঁপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জ্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল

জনমনের বার্তায় ব্যস্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া-হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ ছানিয়া-গড়া মুখ, আধ-আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না।

এক একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্ব্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েচে —ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে···ধরো দিকি একটু!—আমি নাইবো, না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে? হরিহর বলে—উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্ব্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, ছাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে!

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চা হয়া অবাক্ হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—জে—জে—জে—জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেক দিন আগের এক রাত্রির কথা মনে পড়ে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। দুপুরের পর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের ঘাটে নৌকা পৌঁছিল। বিবাহের পরে একটিবার মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, পথঘাট মনে ছিল না, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ডাকাডাকিতে একটি গৌরাঙ্গী ছিপছিপে চেহারার তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাহিরের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহার সহিত চোখাচোখি হওয়াতে সেখান হইতে চট্ করিয়া সরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—হরিহর ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। সর্ব্বজয়া দারিদ্র্য হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের একখানা লালপাড় মটকা শাড়ী পরিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিল। হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকাপত্নীর কিছুই আর এই সুন্দরী তরুণীতে নাই—কে যেন ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। মুখের সে কচি ভাবটুকু আর নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে তাহা যে খুব সুলভ নহে হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেরি হইল না। হাত-পায়ের গঠন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বজয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা একরূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহরই প্রথমে কথা কহিল। স্ত্রীর ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—ব'সো এখানে, ভাল আছো?

সর্ব্বজয়া মৃদু হাসিল। লজ্জাটা যেন কিছু কাটিয়া গেল। বলিল—এতদিন পরে বুঝি মনে পড়লো? আচ্ছা, কি ব'লে এতদিন ডুব মেরে ছিলে? পরে সে হাসিয়া বলিল—কেন, কি দোষ করেছিলাম বলো তো?

স্ত্রীর কথাবার্ত্তায় অজ-পাড়াগাঁয়ের টান ও ভঙ্গিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারি মিষ্ট বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল স্ত্রীর হাতে কেবল গাছকয়েক কড় ও কাচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। গরিব ঘরের মেয়ে, দিবার কেহ নাই, এতদিন খবর না লইয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে সে। সর্ব্বজয়াও চাহিয়া চাহিয়া স্বামীকে দেখিতেছিল। আজ সারাদিন সে চারি পাঁচ বার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে—স্বাস্থ্যময় যৌবন হরিহরের সুগঠিত শরীরের প্রতি অঙ্গে যে বীরের ভঙ্গি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাংলা দেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপমায়ের কথাবার্ত্তায় আজ সে শুনিয়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, টাকাকড়ির দিক্ হইতেও দু'পয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচিল, ভগবান বোধহয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সকলেই বলিত স্বামী তাহার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে,—আর কখনো ফিরিবে না। মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামীর পুনরাগমন এতকাল তাহার কাছে দুরাশার মতই ঠেকিয়াছে। কত রাত্রি দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে, গ্রামের বিবাহ উপনয়নের উৎসবে ভাল করিয়া যোগ দিতে পারে নাই,—সকলেই আহা বলে, গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি জানায়; অভিমানে তাহার চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনের সোনালী কল্পনা এতদিন শুধু আড়ালে আবডালে নির্জ্জন রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত—এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপমায়ের মৃত্যুর পরে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে?

এতদিনে কিনারা মিলিল।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখলে—তখন চিনতে পেরেছিলে? সত্যি কথা বোলো কিন্তু—

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলিল—নাঃ, তা চিন্‌বো কেন! প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তারপর তখুনি—

আন্দাজে—

আন্দাজে নয় গো, আন্দাজে নয়—সত্যি-সত্যি! দেখলে না, তখ্‌খনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা তুমি বল তো, আমায় চিন্‌তে পেরেছিলে? বল তো গা ছুঁয়ে?

নানা কেজো-অকেজো কথাবার্ত্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা উঠিতে সর্ব্বজয়ার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল—বীণার বিয়ে কোথায় হল? ছোট শালীর নাম জানিত না, আজই শ্বশুরের মুখে শুনিয়াছে।

তার বিয়ে হোল কুড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ, কি বলে? মধুমতী!—সেই মধুমতীর ধারে—

একটা প্রশ্ন বার বার সর্ব্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না, দেখাশুনা করিয়া আবার চলিয়া যাইবে সেই কাশী গয়া? বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোনরূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল—না নিয়ে যাক গে—আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট হতে যাওয়া?—

হরিহর সমস্যার সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল—কাল চল তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই নিশ্চিন্দিপুরে—

সর্ব্বজয়ার বুকে ধড়াস করিয়া যেন ঢেঁকীর পাড় পড়িল—সামলাইয়া লইয়া মুখে বলিল—কালই কেন? এ্যাদ্দিন পরে এলে—দুদিন থাকো না কেন?…বাবা মা কি তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন? পরশু আবার আমার বকুলফুলের বাড়ী তোমায় নেমতন্ন করে গিয়েছে—

—কে তোমার বকুলফুল?…

—এই গাঁয়েই বাড়ী—এ-পাড়ায়, আবার ও-পাড়াতে বিয়ে হয়েচে। পরে সে আবার হাসিয়া বলিল, কাল সকালে তোমাকে দেখতে আসবে বলেচে যে—

কথাবার্ত্তার স্রোত একভাবেই চলিল—রাত্রি গভীর হইল। বাড়ীর ধারেই সজনে গাছে রাতজাগা পাখী অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনা-সজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্ব্বর অপরিচিত মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে!

রাতজাগা পাখীটা একঘেয়ে ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। এক হিসেবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গেছে—আজ রাতটি হইতেই তাহার সুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে! কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়-রূপে?

দুইজনেরই মনে বোধহয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। দুজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাতা?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাস হইল, সর্ব্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে বুড়ী ডাইনী সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। দু'বেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ইঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন্ দিকে—জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষদিকে বুড়ী অবশেষে এক যুক্তি ঠাওরাইল। ছয় ক্রোশ দূরে ভাণ্ডারহাটিতে তাহার জামাইবাড়ী। তাহার জামাই চন্দ্র মজুমদার বাঁচিয়া আছেন। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ, অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে—আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের আগের কথা—তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা বা খবরাখবরের লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে?

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভাণ্ডারহাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ী দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানের ডাক-হাঁকে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল—কোথাকার গাঁড়ী? তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির হইলেন—কে রাধু? জিগ্যেস্ করো কোথা থেকে আসছেন?

বুড়ী চিনিল—কিন্তু অবাক্ হইয়া রহিল—এই সেই তাহার জামাই চন্দর। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সে সবল দোহারা-গড়ন সুচেহারা ছেলেটির সঙ্গে এই পক্বকেশ প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে-উৎপন্ন —না-হাসি-না-দুঃখ গোছের মনের ভাবে সে বিহ্বলের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাঁদিল।

বিস্ময়বিমূঢ় চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন। একটু সামলাইয়া বুড়ী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাঙাগলায় বলিল—তোমার কাছে এয়েচি বাবাজী এতদিন পরে—একটুখানি আচ্ছয়ের জন্যি—আর কডা দিনই বা বাঁচবো! কেউ নেই আর ত্রিভুবনে—এই বয়সে দুটো ভাত-কাপড়ের জন্যি—

মজুমদার মহাশয় বড়ছেলেকে গাড়ীর দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলের সঙ্গে শাশুড়ীকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয়পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। আরও তিনটি পুত্রবধূ আছে। নাতি-নাতনীও তিন চারিটি।

তালগাছের গুঁড়ির খুঁটি ও আড়াবাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া-উঁচু আটচালা ঘর জিনিসপত্র, সিন্দুকতোরঙ্গে বোঝাই, পা ফেলিবার স্থানাভাব। মজুমদার মহাশয়ের বিধবা মেয়েটির নাম হৈমবতী। খুব ভাল মেয়ে—সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জলখাবার সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইল; একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল—দিদিমা, আমায় কখনো দেখেননি, না? কখনো তো এদিকে পায়ের ধুলো দ্যান্‌নি এর আগে! আক কেটে দেবো দিদিমা? দাঁত আছে? পাশের রান্নাঘরে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বসিয়া হৈ চৈ করিতেছে। একজন চেঁচাইয়া বলিতেছে, ও মা দ্যাখো, উর্মি সব ডালটুকু আমার পাতে দিচ্ছে! পুত্রবধূ চেঁচাইতেছে, ওর কাছে খেতে বসিস্ কেন? রোজ না বলচি আলাদা বস্‌বি—এই উর্মি, বড্ড বাড় হয়েচে, না?

কিন্তু দশ বারো দিন কাটিয়া গেল বুড়ীর সব কেমন নতুন নতুন ঠেকিতে লাগিল, তেমন স্বস্তি পাওয়া যায় না—নতুন ধরণের ঘরদোর, নতুন পথঘাট, নতুন ভাবের গৃহস্থালী। কেমন যেন মনে হয় এ ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পড়িত নিঝিবিলি দাওয়া আর খুকী-খোকার মুখ। দিন কুড়িক পরে বুড়ী যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। এখানে আর মন টেকে না। কর্তার প্রথম পক্ষের শাশুড়ীর এ আকস্মিক আবির্ভাব ও তাঁহার মতলব শুনিয়া বাড়ীর বড়বধূ প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্তর্দ্ধানে খুশী ছাড়া অ-খুশী হইলেন না। চন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু বড় ছেলে ও বড়বধূর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

অনেকদিন পরে আবার নিজের ঘরের দাওয়ায় দুর্গাকে কাছে লইয়া খোকাকে কাছে লইয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেলশাখার মৃদু কম্পন দেখিতে দেখিতে সুখে বুড়ীর ঘুমের আমেজ আসে।

খুকী প্রথমে ভারি অভিমান করিয়াছিল, কথা কহিবে না, কাছে আসিবে না। নানা কথায় সান্ত্বনা দিবার পর আজকাল ভাব হইয়াছে। বুড়ী ভাইঝির মাথায় আদর করিয়া হাত বুলাইয়া বলে,—বেশ লাল একজোড়া ঢেঁড়ি ঝুমকো হয় তো দিব্যি মানায়, না আজকাল কি উঠেচে—ওগুলোকে বলে কি ছাই—

শীত আসিল। বুড়ী ও-পাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ী গিয়া বুড়া রামনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে বলিল—ও রাম, জাড় পড়লো বড্ড আবার—তা গায়ে একখানা বস্তর এমন নেই যে, সকাল-সন্ধে একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বসি, তা আমায় যদি একখানা—

রাম গাঙ্গুলী বলিলেন—আচ্ছা দিদি, একদিন এসো, এ মাসটায় আর হবে না—ও মাসে বরং দেখবো।

বহুদিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি ঘোরা-ফেরার পরে একদিন কুঠিয়ার রাঙা ছিটের সূতী চাদর একখানা বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিলেন—এই নাও দিদি, খাসা গরম জিনিস—সাড়ে ন' আনা দাম—এর চেয়ে ভাল জিনিস আর নবাবগঞ্জে পাওয়া যায় না—কুঠিয়ার এনে রেখেচি—দ্যাখো না খুলে?

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY 53801 7·3·73 AGARTALA, TRIPURA

বুড়ীর তখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। আহ্লাদে একগাল হাসিয়া সে সেখানাকে খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল—দিব্যি,—কেমন ওম্—মোটাসোটা দিব্যি কাপড়—আঃ দাদা, বেঁচে থাকো—কানাই বলাই বেঁচে থাকুক, অক্ষয় প্রমাই হোক—কাঙাল গরিবকে কেউ দেয় না, ওই অন্নদার কাছে একখানা গায়ের কাপড় চাচ্চি আজ তিন বছর থেকে—দেব দেব বলে, তা দিলে না—সখটা মিটিয়ে নি, কত্তা দিনই আর বা?

সর্ব্বজয়াকে আহ্লাদ করিয়া দেখাইতেই সে বলিল, দ্যাখো ঠাকুরঝি, এ বাড়ী থেকে যে তুমি সাত দোর মেগে বেড়াবে তা হবে না, পষ্ট বলে দিচ্চি। ভিক্ষে মাগতে হয়, আলাদা বন্দোবস্ত করো—

বুড়ী সে কথা হজম করিয়া লইল। এরূপ অনেক কথাই তাহাকে দিনের মধ্যে দশবার হজম করিতে হয়। সেকালের ছড়াটা সে এখনও ভোলে নাই—

লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল—

দুর্গা ভারি খুশী হইয়া বলে, ক'পয়সা দাম পিতিমা—কেমন নাঙা—না? আশ্বাসের সুরে পিসি বলে, আমি মরে গেলে তোকে দিয়ে যাবো, তুই গায়ে দিস্ বড় হলে। নতুন চাদরের সোঁদা সোঁদা মাড়ের গন্ধটা বুড়ীর কাছে ভারি উপাদেয়, ভারি শৌখীন বলিয়া মনে হয়। সকালে চাদরখানা গায়ে জড়াইয়া ঝাঁট দিবার সময় মাঝে মাঝে নিজের দিকে চাহিয়া দেখে। নিষ্প্রয়োজনে ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া থাকে, পথ-চলতি নিরীহ ঝি-বউকে ডাকিয়া বলে, কে যায়? রাজীর মা?—এত বেলা যে?—ভূমিকা আর বেশী দূর না করিয়া একটু হাসিয়া নিজের গায়ের দিকে চাহিয়া বলে, এই গায়ের কাপড়খানা এবার ও-পাড়ার রামচাঁদ—সাড়ে ন' আনা দাম—

দু'একটা দুষ্ট মেয়ে বলে—উঃ ঠাক্'মাকে রাঙা কাপড়ে যা মানিয়েচে! ঠাক্'মার বুঝি বিয়ে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ও পাড়ার দাসীঠাক্‌রুণ আসিয়া হাসিমুখে বলিল—পয়সা দুটোর জন্যি এয়েছিলাম বৌ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা সোনা নিয়ে এল, বল্লে কাল দাম গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসো—

সর্ব্বজয়া ঘরের কাজকর্ম্ম করিতেছিল, অবাক্ হইয়া বলিল—সোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে?

দাসীঠাক্‌রুণ ঘোর ব্যবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্য্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল—

এনেচে কিনা জিজ্ঞেস্ করো না তোমার ননদকে! সকালবেলা কি মিথ্যে বল্‌তে এলাম দুটো পয়সার জন্তি? চার পয়সার কমে আমি দেবো না—বল্‌লে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েছে—তা যাক্ দু'পয়সাতেই—

রাগে সর্ব্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মত ফল, যাহা কিনা এত অপর্য্যাপ্ত বনে জঙ্গলে ফলে যে, গরু বাছুরের পর্য্যন্ত খাইয়া অরুচি ধরিয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্ব্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি হাঁগা, তিন কাল গিয়েচে এককালে তো ঠেকেচ, যার ব'সে খাই তার পয়সার তো একটু দুখ-দরদ করে চল্‌তে হয়? নোনা গিয়েচ কিন্‌তে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল দানা খাওয়াব? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?

বুড়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা দে বৌ—পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কন্ডা দিনই বা বাঁচবো? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা—

সর্ব্বজয়া চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা! নিজের ঘটি-বাটি আছে বিক্রী করে দাও গিয়ে পয়সা—

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কী দুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল। দাসী খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আমার নাকে খৎ কানে খৎ, জিনিস বেচে এমন হয়রান তো কখনো হইনি! তোমায়ও বলি ইন্দির পিসি, নিজের পয়সাই যদি না ছিল তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভাল হয়নি বাপু, ও-রকম ধারে জিনিসপত্তর আর এনো না। তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা কর, আমি গরিব লোক, ও বেলা আসবো, আমায় পয়সা দুটো বাপু ফেলে দিও—

দাসীর পিছু পিছু খুকী বাড়ীর বাহিরের উঠান পর্য্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল—পিসিমা বুড়ো মানুষ, একটা নোনা এনেচে, তা বুঝি বকে? খেতে ইচ্ছে হয় না, হ্যাঁ দাসীপিসি? বেশ নোনা, আমায় আধখানা কাল দিয়েছে—তোমার বাড়ী বুঝি গাছ আছে পিসী?—পরে সে ডাকিয়া কহিল—শোনো না দাসীপিসি, আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে, মা ঘরে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে লুকিয়ে দেবো এখন, মাকে বোলো না যেন পিসি!

দুপুরের কিছু পূর্ব্বে ইন্দির বুড়ী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, ডান হাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরানো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিঁড়িয়া কাটিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকী বলিল, ও পিসি, যাস্‌নে—ও পিসি, কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল। তুই চলে গেলে আমি কাঁদ্‌বো পিসি—ঠিক—

সর্ব্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে, তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনথ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যেণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো? ঐ রকম কুচক্কুরে মন না হ'লে কি আর এই দশা হয়?…

বুড়ী ফিরিল না। খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ী গিয়া গ্রামের ও-পাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ী উঠিল। নবীন ঘোষালের ব সব শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি, হাঁগা খুড়ী? তা থাকো তুমি এইখানেই থাকো। মাস দুই সেখানে থাকাব পর বুড়ী সেথান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ী ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রথম আপ্যায়নেব রুক্ষতাটুকু কিছুদিন পর উবিয়া যাওযার পরে বাড়ীর লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত। পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে। বুড়ী আরও দু'এক বাড়ী ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরসা ছিল বাড়ী হইতে আর কেহ না হয়, অন্তত হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিন মাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাও আসে নাই। বুড়ী জানে ও-পাড়া হইতে এ-পাড়া অনেক দূরে, ছোট মেয়ে এতদূর আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু-একবার গেল, খুকীর সঙ্গে দেখা হইল না।

বারো মাস লোকের বাড়ী আশ্রয় হয় না। পূব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়া ছিল—মাস দুই পরে সকলে মিলিযা সেই ঘরখানি বুড়ীর জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেওয়াল, পাড়া হইতে দূরে, একটা বাঁশবনের মধ্যে। লোকের মুখে শুনিত সর্ব্বজয়া নাকি বলিয়াছে—তেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ী আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হ'বে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক গিযে। যাহাদের সাহায্য করিবাব কথা ছিল, তাহারা প্রথম দিনকতক খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কমিযা গেল। বুড়ী ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম? বৌ বারণ কল্লে, খুকী কত কাঁদলে, হাতে ধরে টানাটানি কল্লে—। নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিয়া যায়। বলে—শেষ কালডা এত দুঃখুও ছিল অদৃষ্টে—আজ যদি মেয়েডাও থাকতো—

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, গোসাঁইপাড়ায় চডকের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রৌদ্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীব রোজ সন্ধ্যাব পর একটু একটু জর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জরের তৃষ্ণাব মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

পিসিমা !···বুড়ী কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুকী উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চক্কত্তির মেয়ে রাজী। খুকীর পরনে ফর্সা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুঁটুলি বাঁধা। বুড়ীর মুখ দিয়া বেশী কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—বলিস্‌নে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দে বেলা চুপিচুপি এলাম, রাজীও এল আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই স্তাখ্, তোর জন্যে সব এনেচি—

খুকী পুঁটুলি খুলিল।

মুড়কি পিসিমা, তোর জন্যে দু'পয়সার মুড়কি আর দু'টো কদ্‌মা, আর খোকার জন্যে একটা কাঠের পুতুল—। বুড়ী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—দেখি দেখি, ও আমার মাণিক, কত জিনিস এনেচে স্তাখো ! রাজরাণী হও, গরিব পিসির ওপর এত দয়া ! দেখি খোকার কাঠের পুতুলটা ! বাঃ দিব্যি পুতুল—কটা পয়সা নিলে ?···

এক ঝোঁক কথাবার্ত্তার পরে খুকী বলিল—পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম ?

সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমটা হয়েচে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। দুঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইয়া—বলিল, তুই অবিশ্যি করে বাড়ী যাস্—সন্দে বেলা গল্প শুনতে পাইনে কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো ?

বুড়ী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বৌ বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ ?

রাজী বলিল—খুড়ীমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়ীমা আসতে দেয় না। আমরা বল্লে বকে, তবে তুমি যেও পিসিমা। তুমি একটুখানি ব'লো, তাহলে খুড়ীমা আর কিছু বলবে না—

খুকী বলিল—কাল তুই ঠিক যাস্ পিসি, মা কিছু বলবে না—তাহ'লে এখন বাড়ী যাই পিসি, কাউকে যেন বলিস্‌নে ? কাল সকালে ঠিক যাস্ কিন্তু—

সকালে উঠিয়া বুড়ী দেখিল শরীরটা একটু হালকা। একটু বেলা হইলে ছোট্ট পুঁটুলিতে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় দু'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ী বাড়ীর দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাক্‌রুণ, তা বাড়ী যাচ্ছ বুঝি ? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েছে বুঝি !

বুড়ী একগাল হাসিল, বলিল, কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকতে গিয়েছিল, কত কাঁদলে, বল্লে মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ী চ'—তা আমি বললাম—আজ তুই যা, কাল সকালে বেলাটা হোক্, আমি বাড়ী গিয়ে উঠবো—মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায় !···তাই সকালে যাচ্ছি।

বুড়ী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ী নাই। কাল সারারাত জ্বর ভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্ব্বলশরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ার পৈঠায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিড়কী দোর ঠেলিয়া সর্ব্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়ীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল। বুড়ী হাসিয়া বলিল—ও বৌ, ভাল আছিস্? এই অ্যালাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়েসে—তাই বলি—

সর্ব্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—তুমি এ বাড়ী কি মনে করে?

তাহার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্ব্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি—ফের কোন্ মুখে এয়েচ?—

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিসনে—একটুখানি ঠাঁই দে আমারে—কোথায যাবো আর শেষকালডা বল্ দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে—

যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে তোমার তো ঘুম নেই, যাও এক্ষুনি বিদেয় হও, নৈলে আমি অনথ বাধাবো—

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে বুড়ী বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ী সেইরূপ মুঠা আঁকড়াইবার আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেমন মনে হইল যে, বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নেই।

সর্ব্বজয়া বলিল—যাও আর বসে থেকো না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমার কাজকর্ম্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনো রকমে দিতে পারবো না—

বুড়ী পুঁটলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ·স ঠেওয়ানো আছে, আজ তিন চারি মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকী, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা—তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছুই জানেও নাই, বুঝেও নাই। চিরকালের মত তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে!

সজনেতলা দিয়া পুঁটুলি বগলে যাইতে পিছন হইতে রায়বাড়ীর গিন্নী বলিল—ঠাক্‌'মা, ফিরে যাচ্ছ কোথায়? বাড়ী যাবে না? উত্তর না পাইয়া বলিল—ঠাক্‌'মা আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে।

বৈকালে ও-পাড়া হইয়া কে আসিয়া বলিল—ও মা-ঠাকরুণ, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারে নি—একবার গিয়ে দেখে এস—দাদাঠাকুর বাড়ী নেই? একবার পাঠিয়ে দেও না!

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাকরুণ মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ী হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশী বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রোদ্দুরটা পড়েচে আজ? কেহ বলিতেছে—এখুনি সাম্‌লে উঠবে এখন, ভিরমি লেগেছে বোধ হয়—

বিশু পালিত বলিল—ভিরমি নয়। বুড়ী আর বাঁচবে না, হরিজেঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েচে, কিন্তু এতদূরে আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণী ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল —দাও দাদাঠাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। ছ্যাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

ফণী হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—ও পিসিমা!

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল—কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুখ মনে হচ্চে? পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

আম-আঁটির ভেঁপু

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যুর পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝোপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভুষ্‌ণো গোয়ালার দরুণ কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্ব্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন যে মধ্যবয়সী, পুরাদস্তুর সংসারী, ছেলেমেয়েদের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্য-সেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটেমাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙে-পটলের দরদস্তুর করিয়া ঘোরে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের সে-জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চুণার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্য্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত-কাটানো, শাহ্‌ কাশেম শুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক কমলা লেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া, গলিত-রৌপ্যধারার মত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্গনদী, অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রাণা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন।

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছনে ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার. পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড় বড় কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য-শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড় বড় কান?—

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অব্‌ধি সুরু করেচো এটা কি, ওটা কি—কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি।

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

, নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চলো যাওয়া যাক্—পূর্ব-পাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ্ দিচ্ছে, রোজ দেড়মণ দু'মণ এইরকম পড়চে—পাঁচ-সেরের নীচে মাছ নেই! শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বক্না বাছুরের ডাক—বুঝলে?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—অনেক-কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউ-গোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফর্সা না হোলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপর সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্ছে বাবা, ভাখো বাবা, ঐ গেল বাবা, বড় বড় কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল,—উহু উহু উহু—কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ্ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল,—আঃ বড্ড বিরক্ত করে দেখচি তুমি, একশ' বার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল —কি বাবা?

হরিহর বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি!—শূওর-টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

শূওর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নীচু হইয়া দুষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

চল চল—হ্যাঁ—আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি!……

নবীন পালিত বলিল—ও হোলো খরগোশ, খোকা, খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই। বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোশ!—জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়,—ছবি না, কাচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ!—এই রকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে!—জল-মাটির তৈরী নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাবলা ও জীওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইটের পাঁজার মত জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির

জালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির আমলে এই নিশ্চিন্দিপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্সার্নের হেড কুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্ লারমার দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জালঘর, সাহেবের কুঠি, আপিস্, জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবলপ্রতাপ লারমার সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু'একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলা উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্য্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য্য, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁক আলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, কুঠির ইটগুলো নাকি বিক্রী হবে শুনছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরদস্তর কচ্ছে। মতি দাঁর কথায় সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধনবান হইয়াছে সে কথা আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্ত্তমান কালের দুর্ম্মূল্যতা, আষাঢ়ু'র বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারী দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলীর মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখী কৈ বাবা ?

এই দেখো এখন বাব্‌লাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্ত্তী সম্মুখ বাব্‌লাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নীচু নীচু কুলগাছের অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয় ? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকশীটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—ওমা আমার কি হবে! এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি ? এই সেদিন উঠলে জ্বর থেকে, আজ অমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ! একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ী নাই ? কটা কুল খেয়েচিস্, দেখি মুখ দেখি ?

সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি ?

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের মুখের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হাঁ করে। তাহার মা ভাল করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর মত গন্ধ বাহির হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে—কক্‌খনো খেও না যেন খোকা!...তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেবো—তাই বোশেক জষ্টি মাসে খেও, লুকিয়ে লুকিয়ে কক্‌খনো আর খেও না—কেমন তো?

হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, ঐ ছাখো খোকা সাহেবদের কুঠি—দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মত পড়িয়া ছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ণ তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্নের বিশাল হেডকুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor
The only son of John & Mrs. Lermor,
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860.

অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকীর মোহানা হইতে প্রবহমাণ জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ী হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ী, নিজেদের বাড়ীর সামনেটা, বড়জোর রাজুদিদিদের বাড়ী, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক দিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছায় দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাড়া জালঘরটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ঐ মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রংএর

ফলের খোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ, হাত দিও না,—আল্‌কুশী আল্‌কুশী! কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখ্‌চি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুল্‌কে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না।—

হাত চুল্‌কুবে কেন বাবা?

হাত চুল্‌কুবে, বিষ বিষ—আল্‌কুশী কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার সুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কীর দোর দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্ব্বজয়া খিড়কীর দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হোল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে না কিছু!

হরিহর বলিল, আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত। এ'দিকে যায়, ও'দিকে যায়, সাম্‌লে রাখতে পারিনে—আল্‌কুশীর ফল ধরে টান্‌তে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন, হোল তো কুঠির মাঠ দেখা?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে—একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল্‌-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশী, গোটাকতক কড়ি—এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপুজার কড়ির চুপড়ী হইতে খুলিয়া লইয়াছিল পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্ব্বদা লুকাইয়া রাখে—একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুক্‌নো নাটা ফল। দেখিতে ভাল বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গাযমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহা-মূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশীটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও এক পাশে পিঁজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে সে গঙ্গাযমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে, তাক্ ঠিক হইতেছে কিনা!

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও অপু—।

সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মত লক্ষীর চুপড়ীর কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল—কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে—শোন্—

দুর্গার বয়স দশ-এগার হইল। গড়ন পাত্‌লা পাত্‌লা, রং অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কি রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। স্বর নীচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুশী জারাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটুদিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

তুই যা না শীগগির করে, মার আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শীগগির যা—

অপু বলিল—নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আস্‌বো—তুই খিড়কী দোরে গিয়ে ত্যাখ্ মা আসচে কিনা। দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল, তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত।

তুই অতগুলো খাবি দিদি?

অতগুলি বুঝি হোল? এই তো—ভারি বেশী—যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে—

লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

তবে থাক্‌গে যাক্—আবার ওবেলা আন্‌বো এখন—পটুদিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটী যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি

গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী।

হরিহরের বাড়ীটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙ্গা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কী দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্ব্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্ত্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাক্‌লাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতা-সূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া ভেরেণ্ডা-কচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর—নুন লেগে রয়েছে যে···

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোন দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কে-বল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা খিদে পেয়েচে!

রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু···একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ! ও দুগ্‌গা, দ্যাখ্ তো বাছুরটা হাঁক পাড়চে কেন?

খানিকটা পরে সর্ব্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এটু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল—চাল ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্দ্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসা-সূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্ব্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই কেন এখন বেরিয়েছিলি বুঝি ?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগ্যেস করো না ? আমি—এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাক্‌লে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হোল—কমলে বাছুর, ও সয়, এত বেলা ক'রে এলে কি বাঁচে ? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পঙ্কস্থ বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষীছাড়া বাঁদর ! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেও—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায় ? খেও এখন ? হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে !

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখচিনে ?

সর্ব্বজয়া বলিল—অপু তো ঘরে ঘুমুচ্চে।

দুগ্‌গা বুঝি—

সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে—সে বাড়ী থাকে কখন। জুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক ! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে—কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে—এই চত্তির মাসের রোদ্দুর, কের ত্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে—অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত ? কথা শোনে, না কানে নেয় ?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল—আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে ? একজন লোক, বেশ মাতব্বর, পাঁচটা ছয়টা গোলা বাড়ীতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে—দাদাঠাকুর, আমায় চিনতে পাচ্ছেন ? আমি বল্লাম—না বাপু, আমি তো কৈ— ? বল্লে—আপনার কর্ত্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচ্চায় সব সময়ই তিনি আসতেন, পায়ের ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়ীসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি—তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি—আপনিই কেন মন্তরটা দেন না ? তা আমি ওদের বলেচি আজ আর কোনো কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু-এক দিনে—বুঝলে ?

সর্ব্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল,—হ্যাগো, তা মন্দ কি ? দাও না ওদের মন্তর ? কি জাত ? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল—ব'লো না কাউকে।—সদ্গোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—

আমি আবার কাকে বলতে যাবো? তা হোক সে নদোপাপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে—ঐ রায়বাড়ীর আটটা টাকা ভরসা, তাও দু'তিন মাস অন্তর তবে আয়—আর এদিকে রাজ্যির দেনা। কাল ঘাটের পথের সেজ ঠাকরুণ বল্লে—বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিইনে—তবে তুমি অনেক করে বল্লে বলে দিলাম—আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্চে, দু'বেলা তাগাদা আরম্ভ করেচে। ছেলেটার কাপড় নেই—দু'তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েচে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই—

আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই আপনি যদি এ গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা জমি দিয়ে বাস করাই—গাঁয়ে এক ঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমি-টমি দিতেও রাজী—পয়সার তো অভাব নেই। আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা—ভদ্দর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্ব্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—এখ্‌খুনি। তা তুমি রাজী হ'লে না কেন? বল্লেই হোত যে আচ্ছা আমরা আসবো! ও-রকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়—এ গাঁয়ে তোমার আছে কি? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল! তখুনি কি রাজী হতে আছে। ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে—উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—আর এখন ওঠ্‌ বল্লেই কি ওঠা চলে? সব ব্যাটা এসে বল্‌বে টাকা দাও, নৈলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সচুপ দেখিয়া ও-ধারের পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলা যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এই জন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষত মার সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ী ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিকে চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুক্‌নো রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুনিতে আরম্ভ করিল, এক—দুই—তিন—চার···ছাব্বিশটা হইল। পরে সে

দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উল্টা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—অপুকে এইগুলো দেবো—আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো—কেমন বীচিগুলো তেল চুকচুক কচ্ছে—আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস্ আগে গেলাম, নৈলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

অপুদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বথ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক—দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—কোন্ দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মা'র মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্রদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের 'ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রংএর আকাশটা অনেক-দূর, ঘুড়িটা - কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—এবং সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে—ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির-বাটী হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্য্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—অ্যাখো দ্যাখো ছেলের কাণ্ড দ্যাখো—ছাড়্—ছাড়্—দেখছিস সক্‌ড়ী হাত?...ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই দ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করো না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দুগ্গা। অপু বলিত, মা, সেই ঘুঁটে-কুড়োনোর গল্পটা? তাহার মা বলে—ঘুঁটে-কুড়োনোর কোন্ গল্প বল্ তো —ও সেই হরিহোড়ের? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়া সুর করিয়া পড়িতে থাকিত—

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত—এ, বড্ড তেতো—এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও খয়ের যেন আনে না, তবুও—

জানালার বাহিরে বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া-বেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—দুই হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন! মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্য্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয়তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে…সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথাও এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে…রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর,

কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ!—বিজয়ী বীর অর্জ্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ—যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।

এক একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্ত এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্ত সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোন গাছের ডাংকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জ্জুন করলেন কি, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর—ওঃ সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল! (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কাশী-দাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জ্জুন করলেন কি, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্য্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে—আর কিছু দেখা গেল না।...মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, যশোলাভের পথ ক্রমশই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?...

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্ব্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময়ে শেওড়া বনের ওদিক্ হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ও কি রে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ-টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বক্‌চিস বিড়্ বিড়্ করে, আর হাত পা নাড়চিস্? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাইএর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল!...কোথাকার একটা পাগল, কি বক্‌ছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল—যাঃ...বক্‌ছিলাম বুঝি?...আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে...

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস্?...কত নোনা পেকেছে?...এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি?

অপু বলিল—উঃ অনেক রে দিদি!—একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা—তুই এক কাজ কর্, ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে থেকে আঁকুসিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকুসি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস্ এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আন্‌চি—

অপু আঁকুসি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার পাঁচটার বেশী ফল পাড়িতে পারিল না—খুব উঁচু গাছ, সর্ব্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুসি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল্ আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আন্‌বো—মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুসিটা নে। নোলক পর্‌বি?

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়্‌কলমীলতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলা নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমী ফুলের নোলক পরিতে ভালবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল, বলে, নোলক তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া সাদা জলের মত যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্চে? বাঃ বেশ হয়েচে, চল্ মাকে দেখাইগে—

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

চল্ না—খুলে ফেলিস্‌নে যেন—বেশ হয়েচে—

বাড়ী আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্ব্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু-জঙ্গলে অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ভাখো মা—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে চিন্‌তে তো পারচি নে?—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল!—বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্‌রে অপু, ঐ কোথায় ডুগডুগী বাজচে, চল্, বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক, শীগগির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া সে আবার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কী সন্দেশ করিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ী ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ীর লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গিয়া মাথার চাঙারী নামাইতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ীতে পাঁচ ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজ-বৌ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।—

চিনিবাস চাঙারী মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ী চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল্ দেখিগে টুনুদের বাড়ী—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ী আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর—যেমন মা তেমনি ছা—

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার। বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আমি মুড়কী কিনে খাবো—

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বজয়া ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল; পিছনে পিছনে অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও-বাড়ী হইতে আসিল। সর্ব্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল্ দিকি? ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো? কাজ কর্ত্তে দিবি না—না?

অপু বলিল—তা হোক—কাজ তুমি ও-বেলা ক'রো এখন মা, তুমি যাও ঘাটে। পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণসুরে কহিল—আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না? আজ চারদিন যে খাইনি।

—খাওনি তো করবো কি? রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাধিয়ে বসবে, বল্লে কথা কানে নাও নাকি তোমরা? ছিষ্টির কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাবো? বসে তো নেই? যা, ও-রকম দুষ্টুমি করিস্ নে—তোমাদের ফরমাজ মত কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ কর্ত্তে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি বাদ যাবে না? এক্ষুনি ঘাটে যাও—না, আমি শুনবো না···করো দিকি কেমন কাজ করবে?

সর্ব্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ও-রকম দুষ্টুমি করে না, ছিঃ—এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটুখানি সবুর করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব—দুষ্টুমি করে কি? ছাড় আঁচল, ক'খানা পল্‌তার বড়া ভাজা খাবি বল্ দিকি?

ঘণ্টাখানেক পর অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল।

গ্রাস তুলিয়া সে ঢক্ ঢক্ করিয়া অর্দ্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া, পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নীচে ছড়াইয়া বাকি জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

কৈ খাচ্ছিস্ কৈ? এতক্ষণ তো ভাত ভাত করে হাঁপাচ্ছিলে—পল্‌তার বড়া—পল্‌তার বড়া—ঐ তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে?

সর্ব্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর্—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তা ছেলের দশা দেখলে হবে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—বাঁচবে কি খেযে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বৈ তো নয়—ও-রকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ—হাঁ করো লক্ষ্মী—দেখি এই দলাটা হলেই হোয়ে গেল—আবার ওবেলা টুনুদের বাড়ী মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস্ নে বুঝি? শীগগির শীগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব—

দুর্গা বাড়ী ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক-পা ধূলা, কপালের সামনে এক-গোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ায় সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলাধূলা নাই—কোথায় কোন্ ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন্ বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট—এ সব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্ব্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কি না। যদি কোথাও বটিকাঘী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপ্‌রা লইয়া ছুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোন্‌খানায় ভাল তাক হয়—পরীক্ষায় যেখানা ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্ব্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সবঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্ব্বজয়া বলিল—এলে? এসো, ভাত তৈরী। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোনদিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে গ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপূজো করচে—আর অতবড় ধাড়ী মেয়ে—দিন-রাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এল বাড়ী—মাথাটার ছিরি গ্যাখো না। না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো—কে বল্‌বে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে কি বাগ্‌দীদের কেউ—বিয়েও হবে ঐ দুলে-বাগ্‌দীদের বাড়ীতেই—আঁচলে ওগুলো কী ধনদৌলত বাঁধা—খোল—

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—ওই রায়-কাকাদের বাড়ীর সাম্‌নে কালকাসুন্দে গাছে—পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই অনেক বেনেবৌ তাই—

বেনেবৌয়ের কথায় হৃদয় গলে না এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্ব্বজয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া কহিল—তোর বেনেবৌয়ের না নিকুচি করেছে, যত ছাই ভস্মর ভস্মো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন—আজ টান্ মেরে তোমার পুতুলের বাক্স ঐ বাঁশতলায় ডোবায় যদি না ফেলি তবে—

সর্ব্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর সেজ-ঠাকরুণ, পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের

পিছনে আর চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সেজ-ঠাক্‌রুণ কোনো দিকে না চাহিয়া বাড়ীর কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্ হন্ করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয়—বের কর্ পুতুলের বাক্স, দেখি—

এ বাড়ীর কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই টুনু ও সতু, দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল—এই গ্যাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেল্‌তে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই গ্যাখো জেঠিমা, আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেছে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ীর সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্ব্বজয়া কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিল—কি, কি খুড়ীমা? কি হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্র ভাবে উঠিয়া আসিল।

এই গ্যাখো না কি হয়েচে, কীর্ত্তিখানা গ্যাখো না একবার—তোমার মেয়ে সেদিন খেল্‌তে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে—মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বল্‌লে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম—গ্যাখো একবার কাণ্ড—তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহদ্দ চোর—আর ওই গ্যাখো না—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্ব্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিছিস্ এই মালা ওদের বাড়ি থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন,—না আন্‌লে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা গ্যাখো না? সোনামুখীর আম চেন না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্ব্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজখুড়ী, আপনার মিথ্যে কথা তা তো বলিনি! আমি ওকে জিগ্যেস করচি।

সেজ-ঠাক্‌রুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন—জিগ্যেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি—এই বয়েসে যখন চুরি বিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে। চল্ রে সতু—নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে—বাগানের আমগুলো লক্ষিছাড়া ছুঁড়ীর জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে! টুনু, মালা নিইচিস তো?

সর্ব্বজয়ার কি জানি কেমন একটু রাগ হইল—ঝগড়াতে সে কিছু পিছু হটিবার পাত্র নয়,

বলিল—পুঁতির মালার কথা জানিনে সেজ-খুড়ী, কিন্তু আমের গুটিগুলো, সেগুলো পেড়েছে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেচে, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই সেজখুড়ী—আর ছেলেমানুষ যদি ধরো এনেই থাকে—

সেজ-ঠাকরুণ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বল্‌চো? বলি আমের গুটিতে নাম লেখা না-হয় নেই-ই, তোমাদের কোন্ বাগান থেকে এগুলো এসেচে তা বল্‌তে পার? বলি টাকাগুলোতেও তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে? আজ এক বচ্ছরের ওপর হ'য়ে গ্যালো, আজ দেবো কাল দেবো—আস্‌বো এখন ওবেলা—টাকা দিয়ে দিও—ও আমি আর রাখতে পারবো না—টাকার যোগাড় করে রেখো বলে দিচ্চি।

দলবল সহ সেজ-ঠাকরুণ দরজার বাহির হইয়া গেলেন। সর্ব্বজয়া শুনিতে পাইল পথে কাহার কথার উত্তরে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিতেছেন—ওই এ-বাড়ীর ছুঁড়িটা, টুনুর বাক্স থেকে এই পুঁতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে করেচে কি নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেছে—আর ছাখো না এই আমগুলো—পাশেই বাগান, যত ইচ্ছে পাড়লেই হোল—তাই বলতে গেলাম, তা আমায় আবার কেটে কেটে বল্‌চে—(এখানে সেজ-বৌ সর্ব্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গী নকল করিলেন)—তা—এনেচে ছেলেমানুষ—ও রকম এনেই থাকে—ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি? (সুর নীচু করিয়া) মা ই কি কম চোর নাকি, মেয়ের শিক্ষে কি আর অমনি হয়েচে? বাড়ীশুদ্ধ সব চোর—

অপমানে দুঃখে সর্ব্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল-ভাত মাখা হাতেই দুড় দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ্-বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে—ম'লে আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা—যা এখ্‌খুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কী-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্ব্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখীর তলায় আম ক'টা পড়িয়া ছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে। কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ী উপস্থিত থাকার দরুণ উক্ত প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার

অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে—তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয়, দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ী, পটুদিদের বাড়ী, নেড়াদের বাড়ী—একে একে সকল বাড়ী খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ট পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে—দেখেচো জেঠিমা?

বাড়ীর পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশ-বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কী-দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহ নাই! তাহার মা বোধ হয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়ীতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুকনো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজ্‌ঝোলা হলদে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ঐ কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখী চারিদিকের বনে কিচ্‌-কিচ্‌ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বথ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—একটু একটু রাঙা রোদ গাছের মাথায় এখনও মাখানো, মগডালে একটা কি সাদা মত দুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহার ঘুড়ি ছিঁড়িয়া আটকাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিকে নির্জ্জন···কেহ কোনদিকে নাই···নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটায় কচুঝাড়ের কালো ঘনসবুজ নতুন পাতা চক্‌ চক্‌ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ী আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রাণু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আ.সিল—ভাই, অপু এসেচে···ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেলবো না রাণুদি,—দিদিকে দেখেচো?

রাণু জিজ্ঞাসা করিল,—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে! ভুবন মুখুয্যের বাড়ী হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেক দূর পর্য্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই···যদি কোনোদিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলা হইতে একটু দূরে ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁশা খেজুরের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। বকুল গাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চীৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁটশেওড়া বনে কি জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খস্‌খস্‌ শব্দ করিয়া ডোবার দিকে পলাইল।

বাড়ীর পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সাম্‌নে সেই গাব গাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্ব্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে! কেন যে তাহার এই গাছটার নীচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশী করে। এত দেরি পর্য্যন্ত সে কোনো দিন বাড়ীর বাহিরে থাকে নাই—আজ তাহার সে খেয়াল হইল না। মন ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক না থাকিলে সে কখনই এপথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ী যাইবার আর একটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পট্‌লিদের বাড়ীর উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পটুলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পটুলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাক্‌মা—বকুলতলা থেকে আস্‌তে আস্‌তে—

ঠাকুরমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ী গেল! এই কতক্ষণ যাচ্ছে—ছুটে যা দিকি—বোধ হয় এখনও বাড়ী গিয়ে পৌঁছয়নি—

সে এক দৌড়ে বাড়ীর দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটুলির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস্ অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেচি। ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায়—দুগ্‌গাকে বলিস—

তাহাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল—দুর্গা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। দুর্গা

গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল —যাও, বেরোও—একেবারে জন্মের মত যাও—আর কক্ষনো বাড়ী যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক্—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মত আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র বাড়ীতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতেই তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো?

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোন জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোনো কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মত মায়ের কথা মত কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উস্কাইয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ—কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা মোটা ভারী ইংরাজী কি বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালী, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি যোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালীখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছে, এমন সময়ে সর্ব্বজয়া এক বাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল— এস, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজী করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্ব্বজয়া বলিল—ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু দুধ ফেল্‌লে তবে বাঁচবে কি খেয়ে—

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্ব্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে কিন্তু চুমুক দিতেছে না—তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে…পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্ব্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি হোল রে? কি হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস্?—

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—দিদির জন্যে বড্ড মন কেমন করছে!…

সর্ব্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তস্বরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না, অমন করে কেঁদো না,—ঐ পটুদিদের কি

নেড়াদের বাড়ী বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও-পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি—কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আসবে—ছিঃ!

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকী দুধটুকু খাওয়াইবার জন্ত বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল—হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী, সোনা, উনি এলেই ডেকে আন্‌বেন এখন—একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ—

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েছে?—

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার উপর রাগ করেছিস্, দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল—না বৈকি! তবে সতু কি করে টের পেলে যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল। না—সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে—কাল সতু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেল্‌ছিলাম—তার পর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল—আমি বল্লাম, ভাই, তুমি দিদির বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে—সেই সময় দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্ কন্ কচ্ছে, এইখানে এই ত্থাখ্, হাত দিয়ে! এই—

এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

থাক্‌গে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুঝলি? কামরাঙা যা পেকেছে! এই এত বড় বড়, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েচি—মিষ্টি যেন গুড়—

একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক, খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের জন্যে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আল্‌পনা দিতেছে—পদ্মলতা, পাখী, ধানের শীষ, নতুন ওঠা সূর্য্য।

দুর্গা বলিল,—দাঁড়া, এই মন্তরটা বলে নিয়ে চল্‌ এক জায়গায় যাবো।

—কোথা রে, দিদি?

—চল্‌ না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—। পরে আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুকুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল—ইঃ।

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ঈষৎ লজ্জা-মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ও-রকম কচ্চিস্ কেন? যা এখান থেকে—তোর এখানে কি?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আমি সতী লীলাবতী ভাই বোন্ ভাগ্যবতী, হি হি—ভাই বোন্ ভাগ্যবতী—হি হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না? মাকে ব'লে তোমার ভ্যাংচানো বার করবো এখন—

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল্‌ গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে—তোদার মা বলছিল, চল্‌ নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন আমকাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এইখানটাতে বারো মাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকু'। মজুমদারদের বাড়ীর কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দ্যাখ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে আনবো। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়া গাছ হইতে

পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল—ও দিদি, ও ফল খাস্‌নি।—দূর—আশ্‌শ্যাওড়ার ফল কি খায় রে! ও তো পাখীতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—ছাখ্‌ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়—কে বলচে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি-কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল—খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি—

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি—

—তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক্, কেমন মিষ্টি বল্ দিকি—কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনো কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—কত নাল ফুল হয়েছে অপু। দাঁড়া তুল্‌চি। জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—ধর্ অপু। অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি ক'রে যাবি দিদি? দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলো টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল—বড্ড গড়ানো পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্চি ডুবজলে—নাগাল পাই কি ক'রে? তুই এক কাজ কর্, পেছন থেকে আমার আঁচল ধ'রে টেনে রাখ্ দিকি, আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ঐ ঝাঁকটা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হল্‌দে কি একটা পাখী ময়নাকাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া পাতা নাচাইয়া ভারি চমৎকার শিস্ দিতেছিল। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখী রে দিদি?

—পাখী-টাখী এখন থাক্—ধর্ দিকি বেশ ক'রে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো—জোর ক'রে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল; অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সাম্‌লাইয়া

হাসিয়া বলিল—দূর, তুই যদি কোন কাজের ছেলে—ধর্ কেম্ন। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলা পানিফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর্ তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদি ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল—পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—দূর!

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল—এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে! গাবের ঢেঁকি কোথাকার!

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শেওড়া গাছের দিকে আঙুল দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, দ্যাখ্ কি এখানে!…পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল—দ্যাখ্, দিদি, চকচক কচ্ছে—কি জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত একদিকে ছুঁচোলো পল-কাটা-কাটা চকচকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষ চুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হই্যা উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপিচুপি বলিল—অপু, এটা বোধ হয় হীরে! চুপ কর্, চেঁচাসনে। পরে সে ভয়ে ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে, —মায়ের মুখে দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হীরা জিনিসটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিম্বের মত, হলদে হলদে, তবে নরম নয়—শক্ত।…

সর্বজয়া বাড়ী ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলেমেয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিইছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—ভাখো দিকি কি এটা মা ?

সর্ব্বজয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, এটা ঠিক হীরে—নয় ?

সর্ব্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি ক'রে জান্‌লি হীরে ?

দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড়লোক ছিল তো মা ? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্ কচ্ছিল,—এ ঠিক মা হীরে !

সর্ব্বজয়া বলিল—আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল—হীরে যদি হয়, তবে দেখিস্ আমরা বড় মানুষ হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মত হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্ব্বজয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমত, ধারকাটা ও পলতোলা, এক মুখ ছুঁচোলো—যেন সিন্দুর কৌটার ঢাক্‌নির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সর্ব্বজয়ার মনে হইল যেন অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যে নয়—ইহা ঠিক। এ রকম ধরণের কাচ সে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল—সত্যিই যদি হীরে হয়, তা হোলে ?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিংবা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনীর কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না, আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য বোধ হয় এক টুক্‌রো হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ী ঢুকিল।

সর্ব্বজয়া বলিল—ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো ! ভাখো তো এটা কি।

হরিহর হাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলে ?

—দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুল্‌তে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েচে। কি বলো দিকি ?

হরিহর খানিকটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ, না-হয় পাথর-টাথর হবে—এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচি নে।

সর্ব্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না ? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয় তো ? দুগ্‌গা বলছিলো মজুমদার বাড়ীর গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েচে ! যদি হীরে হয় ?

—হ্যাঁ, হীরে যদি পুখেঘাটে পাওয়া যেতো তবে আর ভাবনা কি ছিল ? তুমিও যেমন !

···তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কি! মজুমদারেরা বড়লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে! কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলে চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মত ঘটিবে?

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলী-বাড়ী দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্ব্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়! এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ী ফেরে নি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—হুঁঃ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেচেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলানো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হীরে-জহরৎ পাওয়া যেত তা হলে···তুমিও যেমন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্ব্বজয়া বাট্‌না বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজিতে গিয়া বলিল—আবার জিরে-মরিচের পুঁটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি? বড্ড জ্বালাতন কচ্চিস্ অপু—রাঁধতে দিবিনে? তারপর একটু পরেই বোলো এখন—মা ক্ষিদে পেয়েছে।

অপুর দেখা নাই।

—দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার—কেন জ্বালাতন কচ্চিস্ বল্ দিকি? দেখছিস বেলা হয়ে যাচ্ছে।

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উঁকি মারিল, মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসি-ভরা টুকটুকে মুখখানা শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মত তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্ব্বজয়া বলিল—ভাখ্ দিকি কাণ্ড—কেন বাপু দিক্ করিস দুপুরবেলা? দিয়ে যা—

অপু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উঁকি মারিল।

—ঐ আমি দেখতে পেয়েচি—আর লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

হি—হি—হি—আমোদের হাসি হাসিয়া সে আবার দুয়ারের আড়ালে মুখ লুকাইল।

সর্ব্বজয়া ছেলেকে ভালরূপেই চিনিত। যখন অপু ছোট্ট খোকা দেড়-বছরেরটি, তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফর্সা ছিল। সর্ব্বজয়ার মনে আছে, সে তাহার ডাগর চোখ দুটিতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নীল রং-এর কম দামের ঘটিওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া, কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুর টানিয়া টানিয়া বলিত—

আয়রে পাখী—ই—ই লেজঝোলা,
আমার খোকনকে নিয়ে—এ—এ—গাছে তোলা···

খোকা ট্যাপা-ট্যাপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মল-পরা অসম্ভবরূপ ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত। সর্ব্বজয়া হাসিমুখে বলিত—ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকুলো? তাই তো, দেখতে তো পাচ্ছিনে! ও খোকা!···পরে সে ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ সামনের দিকে ফিরাইত এবং নির্ব্বোধের মত হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইত। যতই সর্ব্বজয়া বলিত—ওমা, কৈ আমার খোকা কৈ—আবার কোথায় গেল—কৈ দেখি, ততই শিশুর খেলা চলিত। বার বার সামনে পিছনে ফিরিয়া সর্ব্বজয়ার ঘাড়ে ব্যথা হইলেও শিশুর খেলা শেষ হইত না। সে তখন একেবারে আনকোরা টাটকা, নতুন সংসারে আসিয়াছে। জগতের অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়াই লোভীর মত বার বার আস্বাদ করিয়াও সাধ মিটাইতে পারিতেছে না—তখন তাহাকে থামায় এমন সাধ্য তাহার মায়ের কোথায়? খানিকক্ষণ এরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরে শক্তির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিত, সে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হাই তুলিতে থাকিত—সর্ব্বজয়া ছোট্ট হাঁ-টির সামনে তুড়ি দিয়া বলিত—ষাট ষাট—এই ছাখো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার ঘুম আস্‌চে। পরে সে মুগ্ধ নয়নে শিশুপুত্রের টিপ-কাজল-পরা কচি মুখের দিকে চাহিয়া বলিত—কত রঙ্গই জানে সন্তু আমার—তবুও তো এই ষেটের দেড়-বছরের! হঠাৎ সে আকুল চুম্বনে খোকার রাঙা গাল দু'টি ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু মায়ের এই গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিদ্রাতুর আঁখিপাতা ঢুলিয়া আসিত; সর্ব্বজয়া খোকার মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে রাখিয়া বলিত—ওমা, সন্দেবেলা ছাখো ঘুমিয়ে পড়লো! এই ভাবছি সন্দেটা উৎরুলে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াবো—ছাখো কাণ্ড!···

সর্ব্বজয়া জানিত—ছেলে আট বছরের হইলে কি হইবে, সেই ছেলেবেলাকার মত মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবার সাধ তাহার এখনও মিটে নাই।

এমন সব স্থানে সে লুকায় যেখান হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে; কিন্তু

সর্ব্বজয়া দেখিয়াও দেখে না—এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে—তাই তো! কোথায় গেল? দেখতে তো পাচ্ছিনে!·· অপু ভাবে—মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া মজা আছে। সর্ব্বজয়া জানে যে, খেলায় যোগ দিবার ভান করিলে এইরূপ সারাদিন চলিতে পারে, কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল—তা হোলে কিন্তু থাকলো প'ড়ে রান্নাবান্না। অপু, তুমি ঐ রকম করো, খেতে চাইলে তখন দেখবে মজাটা—

অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইরে। দেখ্‌গে যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে! গাবতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে তাখ দিকি। তার আজ নাইবার দিন—হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার যো আছে? যা তো, লক্ষী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহার দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-রত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

হু-উ-উ-উ-উম্—

সর্ব্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট্ আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

—ত্যাখো ত্যাখো, ছেলের কাণ্ড ত্যাখো একবার। ও লক্ষীছাড়া, ওতে যে সাত-রাজ্যির ধুলো। ফ্যাল্ ফ্যাল্—সাপ-খাঙ্কড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদ্দিন থেকে তোলা রয়েছে—

—হু-উ-উ-উম্—(পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর স্বরে)

—নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল্—আমার বাট্‌নার হাত—দুষ্টুমি কোরো না, ছিঃ!

থলে মোড়া মূর্ত্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাইয়া আসিল। সর্ব্বজয়া বলিল, ছুঁবি ছুঁবি—ছুঁও না মাণিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিইচি—ভারি ভয় হয়েছে আমার!

অপু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল, মুখ, চোখের ভুরু, কান ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া সে সামনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিচ কিচ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে! হ্যাঁরে হতভাগা, ধুলো মেখে যে একেবারে ভূত সেজেছিস্? উঃ—ওই পুরোনো থলেটার ধুলো! একেবারে পাগল!

ধূলিধূসরিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্ব্বজয়ার বুক ভরিয়া আসিল; কিন্তু অপুর পরনে বাসি কাপড়—নাহিয়া-ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল—ঐ গামছাখানা নে, ঐ দিয়ে ধুলোগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল্। ছেলে যেন কি একটা!

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে খাবার জন্ম বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দেখে দরজা দিয়া দুর্গা বাড়ী ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উসকো-

খুসকো, অথচ ধুলোমাখা পায়ে আলতা পরা। একেবারে মায়ের সামনে পড়াতে আঁচলে বাঁধা আম দেখাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই পুণ্যিপুকুরের জন্তে ছোলার গাছ আনতে গেলাম রাজীদের বাড়ী, আম পেড়ে এনেচে, ভাগ হচ্চে, তাই রাজীর পিসিমা দিলে।

—আহা, মেয়ের দশা ভাখো, পায়ে খড়ি উড়চে, মাথার চুল দেখলে গায়ে জ্বর আসে;—পুণ্যিপুকুরের জন্তে ভেবে তো তোমার রাত্তিরে ঘুম নেই!—পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—কেন বুঝি লক্ষ্মীর চুবড়ি থেকে আলতা বের ক'রে পরা হয়েচে?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উস্‌কোখুস্‌কো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল—লক্ষ্মীর চুবড়ির আলতা বৈকি! আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আলতা আনালাম এক পয়সার, তার দরুণ দু'পাতা আলতা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল না বুঝি?

হরিহর কল্‌কে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন লইতে আসিল।

সর্ব্বজয়া বলিল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাকে আগুন দি কোথা থেকে? সুঁদরীকাঠের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেচো কিনা একেবারে! বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন যোগাবো? পরে আগুন তুলিবার জন্ত রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সামনে ধরিল। পরে সুর নরম করিয়া বলিল—কি হোল?

—এক রকম ছিল তো সবই ঠিক, বাড়ীশুদ্ধ সবাই মন্তর নেবার কথাই হয়েছিল; কিন্তু একটু মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে। মহেশ বিশ্বেসের শ্বশুরবাড়ীর বিষয়-আশয় নিয়ে কি গোলমাল বেধেছে, বিশ্বেস মশায় গিয়েচে সেখানে চলে—সে-ই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল; আবার এদিকেও তো অকাল পড়চে আষাঢ় মাস থেকে।

—আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে, বাস করাবে বলছিল, তার কি হোল?

—এই নিয়ে একটু মুস্কিল বেধে গেল কিনা! ধরো যদি মন্তর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ও-কথা আর কি ক'রে ওঠাই?

সর্ব্বজয়া খুব আশায় আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অন্ত কোনো জায়গায় ভাখো না? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোঁছে? এই ভাখো আম-কাঁঠালের সময় একটা আম-কাঁঠাল ঘরে নেই—মেয়েটা কাদের বাড়ী থেকে আজ দু'টো আধপচা আম নিয়ে এল।—পরে সে উদ্দেশে বাড়ীর পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এই ঘরের দোর থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি আম পেড়ে নিয়ে যায়—বাছারা আমার চেয়ে চেয়ে ভাখে,—এ কি কম কষ্ট!

বাগানের কথার উল্লেখে হরিহর বলিল—উঃ, ও কি কম ধড়িবাজ নাকি! বছরে পঁচিশ টাকা খাজনা ফেলে-মেলে হোতো, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায়! আমি গিয়ে এত করে বললাম, কাকা, আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ঐ বাগানে আম-জাম কুড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। আমার তো আর কোথাও কিছু নেই। আর ধরুন, আমাদের জ্ঞাতির বাগান—আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছেয় কোনো অভাব নেই, দু'টো অত বড় বাগান রয়েচে, আম জাম

নারকেল সুপারি—আপনার অভাব কি ? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান! তা বল্লে কি জানো ? বল্লে নীলমণি দাদা বেঁচে থাকতে ওর কাছে নাকি তিনশো টাকা ধার করেছিল, তাই অমনি করে শোধ করে নিলে। শোন কথা! নীলমণিদাদার বড্ড অভাব ছিল কিনা, তাই তিনশো টাকার জন্যে গিয়েছে ভুবন মুখুয্যের কাছে হাত পাততে! বৌদিকে ভালমানুষ পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি!

—ভালমানুষ তো কত! সেও নাকি বলেছে, জ্ঞাতিশত্তুর—পরহাতে বাগান থাকলে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফল-পাকুড় এমনিই খাবে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজনাটা তো পাওয়া যাবে।

হরিহর বলিল—খাজনা কি আর আমি দিতাম না ? বাগান জমা দেবে, তাই কি আমায় জানতে দিলে ? বৌদিদিকে—লুচি-মোহনভোগ খাইয়ে হাত ক'রে চুপিচুপি লিখিয়ে নিলে।...

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ীর সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধুলা, বাঁশপাতা, কাঁটালপাতা, খড় চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শীগগির ছোট্, তুই বরং সিঁদুর-কৌটো তলায় থাক্, আমি যাই সোনামুখী-তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো। ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া-নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়্‌লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি! চীৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদিবা শোনা যায় ঠিক কোন্ জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই ছাখ্ দিদি, কত বড় ছাখ্—ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে—

এমন সময় হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, ভুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখেচিস টুনু?—যাও আমাদের বাগান থেকে ভুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়োবে বই কি! ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আস্‌বে ও? না, যাও ভুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাক্‌তে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না—কিন্তু সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে ব'য়ে গেল—বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়োবো এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতুদা। রাণুর মনে দুর্গার চোখের ভরসাহারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন্ জায়গায় বড় বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সলতেখাগী-তলায়? কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল্—। গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়িপথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌছানো যায়। অনেককালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় বন-চালতা ময়না-কাঁটা যাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এ সব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মত মোটা মোটা অনেককালের পুরানো গুলঞ্চ লতা এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে—বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবু খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বিষ্টি এল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বিষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পূবে হাওয়ার ঝাপ্‌টা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও—দিদি—বড্ড যে বিষ্টি এল।

—তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে—বিষ্টি হোল ভালই হোল—আমরা আবার সোনামুখীতলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করমচা,
হে বিষ্টি ধ'রে যা—

কড়্—কড়্—কড়াৎ…প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধারে আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগডালে থোলো থোলো বন ধুঁধুল ঘন ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

—ভয় কি রে? রাম রাম বল্—রাম রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা—

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম-গুম্-গুম্-ম্-ম—চাপা, গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার রুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত স্বরে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

—ভয় নেই, ভয় কি?—আর একটু স'রে আয়—এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হয়ে গিয়েছে—

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস্-স্-স্-স্ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের শোঁ-ও-ও-ও, বোঁ-ও-ও-ও-ও রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ—মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক-একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়-মড় করিয়া ভাঙিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি।

অপু বলিল—দিদি, বিষ্টি যদি আর না থামে?

হঠাৎ ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্ধকার আকাশের এ-প্রান্ত হইতে লক্‌লকে আলো জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপের বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও-প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড়্‌-কড়-কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিরিয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালক-বালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,—বাজ পড়িতেছে নাকি?—গাছের মাথায় বন-ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড় লোহার রুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা…ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্ব্বজয়া বাহিরের দরজার দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্ব্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেচিস্ ও দিকে?

আশালতা বলিল—না খুড়ীমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলিল—কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই ব'লে, আর তো ফেরেনি—এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হোল, ও মা, কোথায় গেল তবে?

সর্ব্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তা ভাত হইচিস্! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথা পেলি রে দুর্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ চুপ মা—সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই

গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা, ওর তলায় প'ড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি সেজজেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেচে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা স্বরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় প'ড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আম প'ড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা প'ড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম—অপু বাগলোটা নে—মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়, না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্ব্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,—এই তো হোল নারকোল! এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে। আমি ছাড়বো না—কখ্খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠাণ্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্ব্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িগে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্ সব—

খানিক পরে সর্ব্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গেল। ভুবন মুখুয্যের খিড়কী-দোর পর্য্যন্ত যাইতেই সে শুনিল সেজঠাকরুণ বাড়ীর মধ্যে চিৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতেছেন।

—একটা মুঠো টাকা খরচ ক'রে তবে বাগান নেওয়া—ফাঁপ্‌না তো নয়। তার কোনো কুটোটা যদি হাঘরেদের জন্মে ঘরে ঢুকবার জো আছে। ঐ ছুঁড়ীটা রাদ্দিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—এতে মাগীরও শিক্ষে আছে, ও মাগী কি কম নাকি?—ও মা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড়্‌দুড়্ দৌড়।—এত শত্তুরতা যেন ভগবান্ সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান্, উচ্ছন্ন যান্—এই ভর্ সন্দে বেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—একবার শীগ্‌গির যেন ছাতিমতলা-সই হন—

সর্ব্বজয়া খিড়কীর বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণ-সিক্ত রুচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল, যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা যে লোক! দাঁতে বিষ আছে। কি করি? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্ব্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুয্যেবাড়ী ঢুকিল না—আশশেওড়া বনে, বাঁশঝাড়ের তলায় বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকী জ্বলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না—ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই—তাহলেও কি পাপ লাগবে? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তাকে তো ফেরত দেওয়া হল, তা কখনো লাগে?

বাড়ীতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল—দুগ্‌গা, নারকোলটা শত্তুরের বাড়ী দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল—এখ্‌খুনি?

—হ্যাঁ—এখ্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কীর দোর খোলা আছে। চট্ ক'রে যা। ব'লে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্ব্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা ক'রে কুড়ুতে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ পাপ যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে-বর্ত্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল করো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও। দোহাই ঠাকুর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ শীগ্‌গির ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্! হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সর্ব্ব-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্ট ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনেদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্ব্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মানিক। মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ। পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ী আস্‌চিনে, দেখো।

—ষাট ষাট, বাড়ী আসবিনে কি। ওকথা বলতে নেই, ছিঃ। পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক্‌, ভাল করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই।—ওগো, তুমি গুরুমশায়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো, অপু, ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি করো না যেন। খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফনে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে, ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে?—সতে, ধ'রে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধ'রে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি

পাইল, সে ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? হ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যান্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্ত্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সেযাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব ও পেয়ারাফুলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট দশটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে, মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস্? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে। ফুটু, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ···

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটি পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথমে যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কি ভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের-ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ওপাড়ায় রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশী আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেক দিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সান্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটুসমান উঁচু স্লবিছুটি ও অর্জ্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচ যে। ক'টা মাছি পড়লো!

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুড়ির জোল বলে ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর্ হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর্ হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানা মত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আসিয়া দেখে এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর্ হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্যাল মশায়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্যাল মশায় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্যাল মশায় একটা কোন্ জায়গার গল্প করিতেছিলেন। সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যায় সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্যাল মশায় বার বার যে জিনিসটা দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকামসজিদ"। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিল একটা ভাঙা পুরানো বাড়ী। অন্ধকারপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে—চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রাণুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরির মত অন্ধকার ঘরটা।

কোন্ দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথ্‌তলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি! সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট তারা তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসতো। একশ বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাকদা থেকে গঙ্গা-চান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকৃষ্ট তারা জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন-চারেক যণ্ডামার্কাগোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধরে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমার মুখে আর রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্ পিট্ ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা ক'রে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। বেশ আছে! এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার

দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি! তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, অমনি ধ'রেই রয়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেছে গাড়ীর সঙ্গে! একেবারে পেরেক-আঁটা হয়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠালগাছের জগডুমুরগাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরণের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশুমন থৈ পায় না।

ঐ যে বাগানের ওদিকের বাঁশবন—ওর পাশ কাটিয়ে যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল—তুমি বরাবর সোজা যদি ও পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও তবে শাঁখারীপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু ওল ও বন-কলমীর চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরু মহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ

বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশে আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়……পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া…।'

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়—সেই যে বছর-দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু'ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল,—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর-দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে।

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত, ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে; রামায়ণ, মহাভারতের দেশে।

সেই অশত্থ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর-আগে-দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-পর্ব্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া-আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক্ করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেত্রসীকণ্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘ-মালায় ঘেরা সে অপূর্ব্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মীকি বা

ভবভূতিও তাহাদের স্রষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখীডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্য বালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশবমনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্কত তাহার সতত-সঞ্চরমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ায় নানাস্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখে যাই, খুড়ীমার সঙ্গেও দেখাটা হবে এখন—

অন্নদা রায়ের বাড়ী ঢুকিতেই একটা হৈ হৈ চীৎকার ও কান্নাকাটির কলরব তাহার কানে গেল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী সখী ঠাকুরুণ চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছেন :—

—তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঢের ঢের জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ দেখিচি, এমন আর কক্কনো দেখিনি যে বাপু, পায়ে গড় করি—বলে ঐ যমের মত সোয়ামী, রাগলে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু, একটু সমঝে চলি? সত্যিই তো, আজ তিন দিন ধরে বলচে ধানগুলো একটু রোদে দাও, ওগো ধানগুলো একটু রোদে দাও—কথা কি গেরাহ্যি হয় নাকি? না, কানে যায়? কার কথা কে শোনে! গেরস্ত ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না, রাত্দিন পটের বিবি সেজে বসে আছে!—'পটের বিবি' জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্ত উত্তমরূপ সাজিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত বলিয়া সখী ঠাকুরুণের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেন—এ তো বাপু কখনো কোথাও বাপের জন্মে দেখিনি, শুনিওনি—

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাকীসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পটের বিবি হয়ে সেজে বসে থাকি নাকি! কাল যে দশ সের মুগের ডাল ভাজলাম সারা বিকেল ধ'রে? দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর যখন পাঁচটার গাড়ী যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই বসে আছি, দু-ধামা ডাল ভাজা যে, ভাঙা যে—ক'রে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে তখন উঠিচি—সে কি অমনি হয়? গা-গতর ব্যথা হয়ে গেচে, রাত্তিরে বলি বুঝি জ্বর হোল, এমনি গায়ে-হাতে ব্যথা—তা কি কেউ ভাখে? তার ওপর সকাল বেলা বিনি দোষে এই মার—কেন, সংসারে কি বসে বসে খাই?

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখান কাঁচা বাঁশের পাতাসুদ্ধ ডগা ও আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ী ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া

গর্জ্জন করিয়া কহিল—এখনও তোমার হয়নি—এখনও তোমায় অদেষ্টে বেস্তর দুঃখু আছে দেখচি—আমার রাগ বাড়িও না মেলা সকালবেলা—আজ তিনদিন ধরে ধানগুলো রোদ্দুরে দেওয়ার জন্তে বলে বলে হয়রান—এই মেঘলা মেঘলা যাচ্চে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন্ বাবা এসে সামলাবে ?···সারা বছরের পিণ্ডি জুটবে কোত্থেকে ?

গোকুলের বৌ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি কোরো না ব'লে দিচ্চি—আমার বাবা কি করেচে তোমার, কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বলবে ?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন—তোমার বাপের বাড়ীর আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ—

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ীর কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—কি করেন দা-ঠাকুর—কি করেন, থামুন থামুন—পরে সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিল—দুর্গাও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাকরুণও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন—খুব একটা হৈ চৈ হইল। দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উদ্যত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্ত দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস দিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তাহার ভয়ের দৃষ্টি—কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা-খানা কাড়িয়া লইল, পরে তাহাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন দা-ঠাকুর, থামুন—আঃ—আসুন নেমে—

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্ব্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্ব্বলতাটাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল—ভাখো না—একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে ? আজ তিনদিন ধরে বলচি—আবার তেজতা দেখলে তো ?—তোমায় তেজ আমি—

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এ সময় খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্ত্তার সময় নহে বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর কাছে জামতলায় একজন লোক ঘটিবাটি সারাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লায় হাপরে গনগনে আগুন, পাড়ার লোকের অনেক ভাঙা ঘটিবাটি জড় করা। বেঁটে ধরণের লোকটা, পাকসিটে গড়নের চেহারা, বয়স কত বুঝিবার উপায় নাই, ত্রিশও হইতে পারে, পঞ্চাশও হইতে পারে, গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটার দাগ—হাতের কব্জিতে দড়ির মত শির বাহির হইয়া আছে; পরণে আধময়লা ধুতি। পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটিবাটি সারানো দেখিতেছে। দুর্গাও গেল। লোকটা বলিল—কি চাই খুকী ?

সে বলিল—কিছু না, দেখবো।

বাড়ী ফিরিয়া মা'র কাছে বলিল—আজ মা গোকুল কাকা খুড়ীমাকে যা মেরেছে সে কি বলবো—পরে সে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

সর্ব্বজয়া বলিল—গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষা একটা বৈ তো নয়!—আহা ভালমানুষ বৌটা এমন হাতে আর এমন বাড়ীতে পড়েচে—ঠেঙা খেতে খেতেই জীবনটা গেল।

—আমাকে তো বড্ড ভালবাসে—যখন যা বাড়ীতে হবে, আমার জন্তে তুলে রেখে দেবে। খুড়ীমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হোল মা। সখী ঠাকমা আবার এখন উলটে খুড়ীমাকেই বকে—

সে তিন-চার দিন আমতলায় ঘটিবাটি সারানো দেখিতে গেল। লোকটি তাহার বাড়ী, বাপের নাম সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে। বলিল—তোমাদের বাড়ীর জিনিসপত্তর সারাবে না? নিয়ে এসো না খুকী?

দুর্গা বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল—আমাদের ভাঙা ঘটি-গাড়ুগুলো দেবে মা, একজন বেশ ভালোমানুষ লোক এসেচে—ওপাড়ার পথে আমতলায় বসে সারাচ্ছে—

লোকটি তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাঁসারী। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে এক একবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে—জয় রাধে!—রাধে গোবিন্দ! সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে। সে চিমটা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভদ্রলোকদের হাতে দিতেছে—দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কাঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাৎ করিয়া বলে—হেঁ হেঁ, তামাক ইচ্ছে করুন বাবাঠাকুর!—রাধারাণী-পদ্ম ভরসা!...নারকেলের কথা আর বলবেন না বাবাঠাকুর, আর বছর জষ্টিমাসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে!—আধকাঠা-খানেক জমিতে দুগণ্ডা চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম—তা ব্যাঙের উপদ্রবে—একেবারে মূলশেকড় টুন:শকড় সবসুদ্ধ...কটা টাকাই মাটি।

মুখুয্যে মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বিনা-মূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কাণ্ড বাপু—তা—এবারও তো ভেবেছিলাম কুড়িখানেক চারা বাড়ীর পেছনে—তা এমন ম্যালেরিয়া ধরল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন)

—পরিপুন্ন—আজ্ঞে পরিপুন্ন—ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না বাবাঠাকুর—হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘড়াটা, ছটা পয়সা দেবেন—

মুখুয্যে মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হাঁ! এর জন্তে আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিস ব্রাহ্মণকে সারিয়ে অমনি কার্ত্তিক মাসের দিনটা—তার আবার—

পিতম তাড়াতাড়ি মুখুয্যে মশায়ের হাতের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে দিতে পারবো না—এখনো সকাল

বেলা বউনি হয়নি। আজ্ঞে না—তা পারবো না—বড়াটা রেখে যান্—বাড়ী গিয়ে পয়া কটা পাঠিয়ে দেবেন—

দুর্গার মা বলে—দেখিস দিকি—ভাঙা বাসন-কোসন বদ্‌লে নতুন বাসন-কোসন অনেক সময় ওরা দেয়—জিজ্ঞেস করিস তো।

পিতম খুব রাজী। দুর্গা বাড়ী হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশ পুরানো গাড়ু ঘটিবাটি বড়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে। অর্দ্ধেক দিনটা সে জামতলাতেই কাটায়—হাপর জ্বালানো, রাং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে। পিতম বলিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটি গড়াইয়া দিবে—ইহাও বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না। সর্ব্বজয়া শুনিয়া বলে—আহা বড্ড ভাল লোকটা তো! আস্‌চে বুধবার অপুর জন্মবারটা, বলিস্ তাকে আস্‌তে—আমাদের এখানে দু'টো ডাল-ভাত পেরসাদ পেয়ে যাবে এখন—

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর কোন্ সময়ে সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে—হাপরের গর্ত্ত ও পোড়া কয়লার রাশি ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল—একে ওকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না সে কোথায় গিয়াছে। ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল—মা শুনিলে কি বলিবে! সংসারের অর্দ্ধেক বাসন তাহার কাছে যে! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল, ঝিকরহাটির বাজারে তাহার কাঁসারির দোকান আছে, সেখানে সে খবর পাঠাইয়াছে—তাহার ভাই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া—আসিলেই ভাঙা-চোরা বাসনগুলা সব বদলাইয়া দিবে। কোথায়ই বা সে—আর কোথায়ই বা তাহার ভাই। কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। কেবলমাত্র তাহাদেরই জিনিস গিয়াছে—অন্য হুঁশিয়ার লোকের এক টুকরা পিতলও খোয়া যায় নাই।

সারাদিনের পরে সন্ধ্যার সময় দুর্গা কাঁদো কাঁদো মুখে মাকে সব বলিল। হরিহর বিদেশে—কেই বা খোঁজ করে, কেই বা দেখে। সর্ব্বজয়া অবাক্ হইয়া যায়! বলে—একবার তোর রায় জ্যেঠা মশায়কে গিয়ে বল্ তো! ওমা এমন কথা তো কক্ষনো শুনিনি!···হরিহর বাড়ী আসিলে ঝিকরহাটির বাজারে খোঁজ করা হইয়াছিল—পিতম নামক কোন লোকের সেখানে কাঁসারির দোকান নাই বা উক্ত চেহারার কোনো লোকও সেখানে নাই।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সত্বর করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু?—চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিও না যেন।···এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্ত ভাজিতে বলিয়াছে ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে! সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক

আবার কানে গেল—বেঙলি বুঝি! ও অপু, বা রে, তাখো মজা ছেলের। গরম গরম খাবি —আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আম বাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে —উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল…আতুরী ডাইনীর বাড়ী!…সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে। কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখের আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্ দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীর কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল…বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!…

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া, তোবড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই —যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণ সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে।

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল। সে অসহায়-ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে ও বাবারা? মোরে ভয় কি?…পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধ'রে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দেবানি এস—

আমচুর!…ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি!…ডাইনীরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে—এ-রকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে কি করে!… উপায়?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ। মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু—রিল। প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি এ বুড়ী হাসিমুখ বদলাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত। বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখ দুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসি নি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে… বাড়ী, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই…কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রুর

দৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ···আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক।···

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্ত্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, ষাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।···

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া, বুড়ী ভাবিল—মুই মাস্তিও যাইনি, ধস্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ী আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে—ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল্ দিকি? সেই বেরিওচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলিনে—খিদেতেষ্টা পায় না?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তূপাকার হইয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিল। সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়বো মা? আমার এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দিবার কোন আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল—দু'চারখানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোশের নীচেটায় চালের গুঁড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আসিস্ এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল-ছোলা ভাজা কৈ?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কৈ? এতবার ডাক্‌লাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি—ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড়া তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো—

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভালবাসে! সে বৈকালবেলা বাটীর বাইরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে—মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত ক'রে ঘাট থেকে এসে ভাজা ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলে না—হাঁ, দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই—মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া

আছে—সে-ই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল—মা, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ ক'রে আসচে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না,—ঘরে যে জল পড়ে!—সেদিনকার মত হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই,—এ সময় মনে একপ্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্ব্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল—এই বাটিটা ক'রে ওকে দে তো দুগ্‌গা।—ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি! এই শেষ কথাই কাল হইল—এতক্ষণ অপু যা হয় একরকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়া সুদ্ধ বাটিটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—আমি খাবো না তো বড়া, কখ্‌খনো খাবো না—যাও—

সর্ব্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরীবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি যোগাড় করিতে হয় সে-ই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা দু-দু'বার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল! ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি। তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেও এখন তাই গরম গরম—

এবার অপুর পালা। এ রকম কথা মা'র মুখে সে কখনও শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দুটো আদরের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা! সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? আমি—আমি কখ্‌খনো তোমার বাড়ী আর আস্‌ছিনে—আমি ছাই খাবো, কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভাল ভাল জিনিস খাবে? আমি আস্‌বো না তোমার বাড়ী, কখ্‌খনো আস্‌বো না—।

পরে সে আতুরী বুড়ীর বাড়ী হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল, এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মত ছুটিল। ভাই-এর অভিমান-ভরা দৃষ্টি, ফুলো ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরণ দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল যে, সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি হি—অপুটা—একেবারে পাগল মা, কেমন বল্লে—পরে ভাই-এর কথা বলিবার উক্তির নকল করিয়া বলিল—আমি চালভাজা খাইনি—হি হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বোকা একেবারে যা—ও অপু, শুনে যা ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থমকিয়া আছে, বাঁশবনের তলাটা ঝোপে-ঝাড়ে নির্জ্জন বর্ষাসন্ধ্যায় ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময় একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনদিনও। কিন্তু বর্ত্তমানে চারিধারের নির্জ্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়খড় শব্দ, অদূরে সলতে-খাগী আমগাছে ভূতের প্রবাদ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আমি কখ্‌খনো বাড়ী যাবো না তো!—এ জন্মে আর বাড়ী যাবো না—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছমছম করিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবার দূরের সলতে-খাগী আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একেবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে—ভাবে, কেন সন্দেবেলা ছাই খাও বল্লাম, তাইতো খোকা আমার রাগ ক'রে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চ'লে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয়-ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রায়ুদের বাড়ীর দিকে ডাকিতেছে—ও অপু-উ-উ! বাঁশঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাহাকে খোসামোদ না করিলে সে নিজেই অত রাগের মাথায় বাড়ী গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি রায়ুদের বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া দরজার সামনে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, ওই দাঁড়িয়ে রয়েচে মা!···এই দ্যাখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না)—ওরে দুষ্টু, এখানে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই দ্যাখো।

দুজনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোসাঁইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বড় জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্য্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া

থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রংএর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলে-ডিঙি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রূর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত— ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি দিদি, ভাখ্ ভাখ্ ঐদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্ব্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুণিতে গুণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল —বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সাম্‌নেই পড়বে, এখন চলো না। আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরুর গাড়ীর সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ করবি অপু, চল্ যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি? অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা—সে যে অনেক দূর! সেখানে কি করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশী দূর বুঝি! কে বলেচে তোকে—ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল—নিকটে হ'লে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল্

দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কি ক'রে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরীয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো রেলের গাড়ী যাবে এখন—মাকে বল্‌বো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই-বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্র-তলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডীহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধান-ক্ষেত, জলা আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরণের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু'তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ী ফেরাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না।

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল—ঐ ভাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুই-দিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইষ্টিশান? এদিকে কি ইষ্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আস্‌বে? আমি রেলগাড়ী দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক'রে দেখবে?……সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ী আস্‌বে, এখনও দু'ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক্ বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্‌খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ঐ জন্যে তোমায় কোথাও আন্‌তে চাইনে—এখন কি ক'রে দেখবে? সেই দুপুর এবটা অবধি ব'সে থাক্‌তে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চল্ আস্‌বার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ…তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়তে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্ব্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব। ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি। মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাহিরের মাঠ…বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে…উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে…নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টি-ধৌত, তাম্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্য্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরী হইল। তাহার বাবা বলিল—তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দেখো তাতেই হাঁ ক'রে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহাআদরে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুর পাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মত আপন মনে বকিতেছে। সে ঘাড় নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—

বধূটি বলিল—বটঠাকুরদের বাড়ী? ধুবটঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাডী পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাডী হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কি জিনিস!...তাহাদের বাড়ীতে এ রকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আল্‌না, রং-বেরংএর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি!—দু-একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মত কচি। এমন সুন্দর অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্য্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ—অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো!—মোহনভোগে কিস্‌মিস্ দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিস্‌মিস্ থাকে না? বাড়ীতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ ক'রে দিতে হবে! তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে ক'রে দেবো—পরে সে শুধু সুজি

জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাৎ!...সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়!—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ী অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুরবেলা সে-বাড়ীর একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টকটকে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মত। অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারী চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাটকা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচি পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শুইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেলরাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—অমলার হাসিভরা চোখমুখ ঘুমের ঘোরে সারারাত নিজের কাছে কাছে। ভোরে সে শুধু খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্ত ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকালে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈরী করিয়া তাহাকে খাওয়াইত—খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে বধূকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে কি অমলাদিদি এসেছিল? না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্ত ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা? অভিমানে তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল! অমলার সহিত তাহার জন্মের মত আড়ি—আর যদি সে কখনো তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, আর সকলেই আসিল—অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না! উৎসাহহীন

ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন সে বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা, কথা বলচো না কেন?···কি হয়েচে?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েচে বৈকি! তা কিছু কি আর হয়েচে? কাল আসনি কেন?

অমলা অবাক্ হইয়া বলিল—আসিনি, তাই কি!—সেইজন্যে রাগ করেচ? অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই। অমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ীর ভিতর। সেখানে বধূ সব শুনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল,—তা হোলে অমলা, তোমার আর এখন বাড়ী যাওয়ার যো নেই তো দেখ্‌চি —কি আর করবে, খোকা যখন তোমাকে ছাড়তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও—আর না হয়—

বধূর কথার ভঙ্গিতে অমলা কি জানি কি একটা ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের সুরে বলিল —আচ্ছা যাও বৌদি—ও-রকম করলে কিন্তু কক্ষনো আর তোমাদের বাড়ী—

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড় মেম-পুতুল, মোমের পাখী, গাছ, আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীরোগীর মত হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া; রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ীর দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্‌খড়্ করিয়া মেঝের উপর চলিতে থাকে—অনেক দূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রং-এর একখানা ছোট রাংতার মত কি। অপু ·িল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন?—সোনার পাত দেখনি অপু? অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল! অমলার সহিত বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার ও-সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুক্‌নো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি

ক'রে মার খায়।…তাহার দিদির বয়সী অন্ত কোনো মেয়ের খেল্‌নার ঐশ্বর্য্য কত বেশী, তাহা সে এ পর্য্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত—আর একটি রবারের বাঁদর…তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করে…

বধুর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র—অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রাণুদির বাড়ীতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না, এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব পাকা খেলোয়াড়—খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধরা পড়ে। কেউ বলে, ও বৌ, একি? এখানে টেক্কা মেরে বসলে যে! দেখলে না ওহাতে রংয়ের গোলাম কাটলে?—তোমার চোখের সামনে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়, হাসিয়া বলে, তাই তো! বড্ড তো ভুল হয়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি মোটেই তো মনে নেই। পরে সে আবার খেলিতে থাকে, মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওর দিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না—কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠে—একি বৌমা, দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে এমন বিন্তি ছিল, দেখাও নি?—তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে, আছে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে! ইচ্ছে ক'রেই দেখাই নি। সে আসলে বিন্তি কিসে হয় সব জানে না—তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে—ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট করলে? দাও তুমি তাস সেজবৌকে, দাও তোমার আর খেল্‌তে হবে না—ঢের হয়েছে। তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে…যেন কিছুই হয় নাই, সব ঠাট্টা, উহারা ঠাট্টা করিয়াই বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।…

সে যদি একজোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ীর বনের ধারের দিকের সেই জানালাটা…যেটার কবাটগুলার মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মত গুঁড়া করিয়া দিয়াছে…নাড়া দিলে ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে আবার বসে—নির্জ্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জান্‌লাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিন্তি হয় তাদের নাই-

বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিস্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে—সেজন্য কেহ কাহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোন অপমানের কথা বলিবে না, কোন হাসি-বিদ্রূপ করিবে না, যে যেরূপ পারে সেইরূপেই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা—নাই বা হইল বিস্তি দেখানো!

সন্ধ্যার পরে বধুর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়! প্রত্যেক তরকারির জন্যে খাবার আলাদা আলাদা বাটি!—তরকারিই বা কত! অত বড় গল্দা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়···কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটা-চচ্চড়ী ও লাউ-ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকেলে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনী বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য-তৈয়ারী বড় উনুনের উপর বড় লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব্ব সুধারুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভালো কাপড়-জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ীর বড় নাটমন্দির ও জলপাই-তলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই চৈত্র বৈশাখ মাসে রামনবমী দোলের দিনটি—তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ায় গাঙ্গুলি বাড়ী। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া! খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এ রকম খাইতে পায় নাই কখনো!

পরদিন সকালে আবার খেলা আরম্ভ হইল। অমলা আসিতেই অপু ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—আমি আর অমলাদি একদিকে, আর তোমরা সব একদিকে—

খানিক খেলা হইবার পর অপুর মনে হইল অমলা তাহাকে দলে পাওয়ার অপেক্ষা বিশুকে দলে পাইতে বেশী ইচ্ছুক। ইহার প্রকৃত কারণ অপু জানিত না—অপু একেবারে কাঁচা খেলুড়ে, তাহাকে দলে লওয়ার মানেই পরাজয়—বিশু ডানপিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয়। একবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সে-বার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বিস্বাদ মনে হইল—অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুশি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ী যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বার বার বলিল যে, সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষা হইল, সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল! পরে

সে মনে মনে ভাবিল—বিশু খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গেলে খেলায় খেলুড়ে কমে যাবে, তাই অমলাদি ঐরকম বল্‌চে, আমি গেলে আমাকেও বল্‌বে, ওর চেয়েও বেশী বলবে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল—বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো। অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেলে নাড়ুগোপাল বলিল—আবার ও-বেলা এসো ভাই!

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ী দাঁড়াইয়াছে—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

অপু আহত হইয়া অভিমানে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিল না।

ভারি তো অমলাদি! না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি?···

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্ব্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালরকম জমে নাই, অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুমড়ার শুক্‌নো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছামিছি এ নিয়ে ঝগড়া ক'রে তার কান ম'লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক্।

বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য্য জিনিস যে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ী যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অ-বিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগী রোগীর মত হাত পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে শুরু করে! অমলা-দি? কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জ্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন গাঁয়ে পথের ধারের কামার দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় লোয়াগুলো দেখ্‌লি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ী দেখতে পেলি? গেল?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। ঐটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ী দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া

ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দুদিক হইতে দুটা কি, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কাণ্ডটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্ব্বেই।

অল্পখানিক পরেই অপু বাড়ী আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি! বা রে আমার টেলি-গিরাফের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। কক্ষনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে কাঁঠালবীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা-দলের অভিমন্যুর মত ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশীর সপ্তমের মত রিনরিনে তীব্র মিষ্টস্বরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট ক'রে ছোটাগুলো বুঝি বন বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি?

সর্ব্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেছিস? কি হয়েছে—

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত পা ছ'ড়ে যায়নি বুঝি?

—কি বলে পাগলের মত? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে! আমি এত কষ্ট ক'রে টেলিগিরাফের তার টাঙালাম আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদ্ঘুটি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু!—পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েচে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ! কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালবাসে। অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে, সব ঠিক ঠাক, আর কি না···

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখ্খনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা ক'রে দেবেন

কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না—না খাবি যা, দেখবো খিদে পেলে কে খেতে দায়?

বাস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠালবীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মত উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস্ অমন ক'রে, কি হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যত সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হয়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আস্‌ছি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাসনয়নে ও পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া ছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যান্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকী নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ী গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ীর উঠানে, চল রেল-রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিলে রে?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেল্‌গে যা, আমি এখন যেতে পারবো না—

অপু মনে মনে বুঝিল, বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি আমি আর দিদি খেল্‌বো এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবী নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিতেছিল—এত করিয়া বলিতেও সতুদা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশী রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটেআলু ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভাল বালি আছে—মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্যে আনে! সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ করছে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন, চটকা গাছের আগ্‌ডালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড়বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে। অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নীচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, খ্যাখো না কি রকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল খ্যাখো। আমি আর দিদি পেড়ে আন্‌লাম—কি ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল! সতু আসিতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতুদা তাহাদের বাড়ীতে তো বড় একটা আসে না—তা ছাড়া সতুদা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ কি! তোমরা তো হোলে কনে-যাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো ক'রে নিয়ে যাবো—সতুদা রাণুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে। কাল সকালে নিয়ে আসবো—

দুর্গার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কি-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদিরে—নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্টগলায় চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার

বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই!···

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চার বৎসরের বেশী, তাহা ছাড়া সে অপুর মত ওরকম ছিপ্‌ছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোয়ালো হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত—তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে—তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণ ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চাল্‌তেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে—দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু?

অপু ভাল করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার স্বরে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি—চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্‌-সর্‌ দেখি—ওরকম ক'রে চোখ রগড়াস নে, দেখি?—

অপু তখনি দু'হাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল স্বরে বলিল—উঁহু ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন কচ্ছে—আমার চোখ কানা হ'যে গিয়েচে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিস্‌নে—সর্‌—পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে একটু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌?—আচ্ছা তুই বাড়ী যা ···আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে আর ঠাকুমাকে সব ব'লে দিয়ে আস্‌চি—রাণুকেও বল্‌বো—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো—তুই যা আমি আসছি এখ্‌খনি—

রাণুদের খিড়্‌কি দরজা পর্যান্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাকুরুণকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি একটুখানি সাম্‌নে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অত সাধের ফলগুলি গেল···তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস্ নে অপু—আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়—চোখে কি আর ব্যথা লাগচে ?…দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস্ ?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কাটা রংএর সেকালের বেতের প্যাট্‌রা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাকে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ী-কলসী আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব-হুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আল্‌না ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো-জঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে।

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্ব্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বাক্সকোণে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওগুলো যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো ? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বাস করবে না, এখনো ভাল ক'রে অক্ষর চিনলে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ঐ যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধরতে হবে। পুত্রগর্ব্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে—ওকি তোমাদের হবে ? কল্লে তো চিরকাল সুদের কারবার !—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিত-বংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেন নি পুঁথি লিখে,

বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায় ?

তাহাদের ঘরের জানলায় কযেক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাঁট্‌শেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চাল্‌তা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ! বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু ফটুওলের ঘন-সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্য্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্ব্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর ডাঁটা গলিয়া আসিল,—মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য্য-রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্য্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। খুঁড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্‌দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে!

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতি মুহূর্ত্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রংএর শীস্‌, আসন্ন সূর্য্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসাযাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘনবনের প্রান্তবর্ত্তী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বাঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখী বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশ ঘিরিয়া পাখী গান গায়, ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্য্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা, পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত

দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখ া ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো াক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডে. ায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্ত্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্ত্তী দস্তুরমত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্ব্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টস্বরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবে—ব'লে দিও চতুর্দ্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যার কুয়াসায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা পাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙ্‌চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্ত্তমান সমস্ত ছোট-খাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জ্জন আকাশ-পথে, এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে, নির্জ্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার

মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অদ্ভুত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

এই অপরাহ্নগুলির সঙ্গে, আজন্মসাথী সুপরিচিত, এই আনন্দ ভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা যে জড়ানো আছে! বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া কে প্রার্থী একজন তাহার অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে,—ঐ যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওইখানেই তো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জ্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা দশরথ মৃগভ্রমে যে জল-আহরণ-রত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা!—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলা সব হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে :—

অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নউরু! দেখি উচ্চে উঠিনু কাঁদিয়া
এ কি কুস্বপন নাথ দেখাইলা মোরে।

কলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুরানো, মজা পুকুরের ধারে সে বন-ভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না—চারিধারে বনে ঘেরা সেই ছোট্ট পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ঐ নির্জ্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নউরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলা-বেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানবের চিহ্ন থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনা-মুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্দ্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়! ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

তাহার বাবা বাড়ী নাই। বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়। একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায় তবুও ছুটি হয় না। তাহার মন ব্যাকুল

হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারী রাগ হয়, অভিমান হয়।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটি হইয়া যায়। বই দপ্তর কোনরকমে স্তূপ্ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুশিতে সে নাচিতে থাকে।

অপূর্ব্ব, অদ্ভুত বৈকালটা…নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর…গুলঞ্চ-লতার তাঁব টাঙানো…খেজুর ডালের ঝাঁপ…বনের দিক থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়…রাঙা রোদটুকু জেঠামহাশয়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবীলেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে…চকচকে বাদামী রংএর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে…তাজা মাটির গন্ধ…ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ।

সন্ধ্যার পর সর্ব্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝিঁ-পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পূজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল। বলিল, আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল কাপড়, আলতা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। লুচি খাইতে কেমন তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুট্‌ফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে বাঁশবনের আলোছায়ায় জাল-বুনানি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁখ বাজে, পথে লুচি-ভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। সেও অনেক খই-মুড়ি আনিতে তাহার মা দুইদিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকুরুণ বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি? ওসব দেখ্‌তে খারাপ…ওরকম আর পাঠিও না বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—তাস খেলবে?

—তা যা ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয় একটু খেলি—

দুর্গা বিপন্নমুখে অপুর দিকে চাহিল।

অপু হাসিয়া বলিল—চল্ আমি দাঁড়াচ্ছি—

তাহাদের মা বলিল—আহা-হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচি নে, সারাদিন বনে হেঁটে-মাটি ওপর ক'রে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না, আর রাত্রিতে এঘর থেকে ওঘর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট!…

পিসিবাড়ী হইতে অপুর আনা সেই তাসজোড়াটা। তাস খেলায় তিন জনেরই কৃতিত্ব সমান। অপু এখনও সব রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি রং, রুইতন? ছাখো না মা—

দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তরকারী থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারী রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন। অপু বলে—তাস খেল্‌তে খেল্‌তে সেই গল্পটা বলো না মা, সেই শ্যামলঙ্কার গল্পটা?

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা, সেই—শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ।

দুর্গা বলে—খেলার সময় ছড়া বল্‌লে খেলা কি ক'রে হবে অপু? ওঠ্—

সর্ব্বজয়া বলিল—দুগ্‌গা, পাতালকোঁড় আজ কোথায় পেলি রে?

—সেই যে গোসাঁইদের বড় বাগানটা আছে? সেই রাঙী গাই খুঁজতে একবার তুই আর আমি, অপু? সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি মা, খুব বন কি না? তা হোলে লোকে তুলে নিয়ে যেতো—

অপু বলিল—সেখানে গিইছিলি? উঃ, সে যে বড্ড বন রে দিদি!

সর্ব্বজয়া সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু—আয় চাঁদ আয় খোকনের কপালে টী-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বার বার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুঁকাইয়া দিত, সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দৃশ্যটা বড় অভিনব ঠেকে। অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া কোনো পিট্ জিতিতে না পারিলে কিংবা অপুর হাতে খারাপ তাসগুলা গিয়া নিজের হাতে ভাল তাস আসিলে, বিপক্ষদলের খেলোয়াড় হইয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল—আজ কি হয়েছে জানো মা—

অপু বলিল—যাঃ, তা হ'লে তোর সঙ্গে আড়ি করবো, ব'লে ছাখ্—

—কর্‌গে যা আড়ি—শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ী পোস্তদানা রন্দ্‌রে দিয়েচে, ও বল্লে, কি রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে ছাখ—ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝ্‌তে পাল্লে না যে পোস্ত—এমন বোকা—না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলা সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন হলো এখন? বড্ড যে কাঁদ্‌ছিলি সকালবেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে সে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলা হইতে কি দিদির মুখের, বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতা-ভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

ছক্কার খেলা" অপু, বুঝেছ্লে খেলিস ?—দুর্গা মহাখুশির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।...

—কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে, না দিদি ?

তাহাদের মা বলিল, তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিম গাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ওই ছাতিমতলায় একবার বাঘ এসেছিল বলেছিলে না ? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েচে—ভাতটা নামিয়ে দাঁড়া বলচি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতালকোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েছে মা! তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি ? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলিনে—উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্যে সর্ব্বজয়ার বুক গর্ব্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে ? লোকের বাড়ীতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজঠাকুরুণকে, ডাকুক না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকুরুণকে সে—হাঁ। সর্ব্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুগ্গা, ও কি ছেলের কাণ্ড ? ঐ রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয় ? রোজই রাত্রে তুমি ওই পথের উপর—

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখে সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মত কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ী···আরও অজানা কত কি বিভীষিকা। সে বুঝিতে পারে না যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানোটাই কি এত বেশী ?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে-পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য-ভরা। শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচা ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক-একদিন এই সময় অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণ টাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে ?

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনো ভোলেন নাই।

গ্রাম নিষুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গ-

শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাঁওরা, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন্ ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-পাপড়ি কলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডালপালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিশাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর পর তাঁহাকে কেহ কোনোদিন দেখে নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামে জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরীপের বড় কর্ম্মচারী মাঠের মধ্যে নদীর ধারে আফিস্ খুলিয়াছেন, ছোটখাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকই কিছু জমিজমার মালিক, পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কূলে জীবনতরণীর লগি কসিয়া পুঁতিয়া জড় পদার্থের ন্যায় উত্তমহীন, গতিহীন, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল, কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাম হয়ত শ্যামের জমি নির্ব্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘার খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সেই সকলের মধ্যে গোলমাল পৌঁছিল। বিপদ একরূপ সার্ব্বজনীন হইলেও অন্নদা রায়ের বিপদ একটু অন্য ধরণের বা একটু বেশী গুরুতর। তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতির আম-কাঁটালের বাগান ও জমি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরীপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততঃ পক্ষে কতকাংশ নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু কি জানি গ্রামের কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছে—ফলে অদ্য দিন দশেক হইল জ্ঞাতিভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে।

মুখের গ্রাস তো গেলই, তাহা ছাড়া বিপদ আরও আছে। ঐ আত্মীয়ের অংশের ঘরগুলিই বাড়ীর মধ্যে ভাল, রায় মহাশয় গত বিশ বৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেন, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—জ্ঞাতিপুত্রটি শৌখীন ধরণের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে—উপরের ঘরখানি হইতে লোহার সিন্দুক, বন্ধকী মাল,

কাগজপত্রাদি সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নীচের যে ঘরে পালিত-পাড়া হইতে সন্তাদরে কেনা কড়িবরগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকালবেলা। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কয়েকটি লোক আসিয়াছেন—এই সময়েই পাশা খেলার মজলিস্ বসে। কিন্তু অন্ন এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতক-পত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানের রোয়াকের ঠিক নীচেই এক অল্পবয়সী কৃষকবধূ একটা ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ হইতে ঘোম্‌টা দিয়া বসিয়াছিল, সে এইবার তাহার পালা আসিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাথা সাম্‌নে একটু নীচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে? তোর আবার কি?

কৃষক-বধূটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার যোগাড় করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন্—আর গোলার চাবীটা খুলে ছান, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বল্‌বো—

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুণে। খাতাখানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব ক'রে দেখো—

কৃষক-বধূ আঁচলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল। হরিহর গুণিয়া বলিল—পাঁচ টাকা?

রায় মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা—জমা ক'রে নাও—তার পর আর টাকা কৈ?

—ওই এখন ন্যান্, তারপর দোব—মুই গতর খাটিয়ে—শোধ ক'রে তোলবো; এখন ওই নিয়ে মোর গোলার চাবীডা খুলে ছান্, মোর মাতোরে দুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তার পর ঘরদোর ফুটো হয়ে গিয়েছে, সে না হয়—।

এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবী তাহার করতলগত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ, ভারী যে দেখচি মাগীর আব্দার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকি—পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলে ন্যান্, ছোট লোকের কাণ্ডই আলাদা—যা এখন দুপুর বেলা দিক্ করিস্ নে—

কৃষক-বধূ চণ্ডীমণ্ডপের অন্য কাহারও অপরিচিতা নহে, দীনু ভট্টাচার্য্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা?

—ওই ওপাড়ার তমুরেজের বৌ—দিন চারেক হোল তমুরেজ না মারা গিয়েচে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মঙ্গলবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবী দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে ছান্—হেন করুন—তেন করুন—

পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তমুরেজের বৌ অত চম্‌কিয়া উঠিত না—সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—ওকথা বলবেন না মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা রূপোর নিমফল ছেল, ও বছর গড়িয়ে দিইছিল। তাই তোঁহা সেক্‌রার দোকানে বিক্রী

করে পাঁচটা টাকা রেলে—ছেলেমানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কিঁ করি এখন দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এর পর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়ে দেবো ! তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিডা গিয়ে—

—যা যা—এখন যা—এ সব টাকাকড়ির কাণ্ড কি নাকে কাঁদলেই মেটে ? তা মেটে না। সে তুই কি বুঝবি, থাক্‌তো তোর সোয়ামী তো বুঝতো, যা এখন দিক্ করিস্ নি—ওই পাঁচ টাকা তোর নামে জমা রৈল—বাকী টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে—

অন্নদা রায় চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তমরেজের বৌ আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—কনে যান্ ও মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা উপায় ক'রে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই—মোর গোলা না খুলে ছ্যান্, মোর টাকা কডা মোরে ফেরৎ ছ্যান্—

রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্চে তার সঙ্গে খোঁজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরৎ দাও—গোলায় আছে কি তোর ? জোর শলি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে ? ও পাঁচ টাকাও উসুল হয়ে রৈল, আমার টাকা দেখ্‌বো না। ওর ছেলে কি খাবে ব'লে ছাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি ? যা, পারিস্ তো নালিশ ক'রে খোলাগে যা—

রায় মহাশয় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে দীনু ভট্‌চায্যি বলিলেন—হ্যাগা বৌ, তমরেজ কদিন হ'লো—কৈ তা তো—

—বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর, হাঠ থে ভাঙন মাছ আন্‌লে, পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধলাম—দেলাম —সহজ মানুষ ভাত খেলে দিব্যি—খেয়ে বল্‌লে মোর শীত করচে, কাঁথা চাপা দিয়ে ছাও, দেলাম —ওমা পইতে তারা উঠ্‌তি না উঠ্‌তি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, দুপুর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে—মোর খোকারে পথে বসিয়ে—চোখের জলে তাহার গলা আট্‌কাইয়া গেল ! মিনতির স্বরে বলিল—আপনারা এট্টু বলেন—ব'লে গোলার চাবিডা দিয়েই ছ্যান্, সংসারে বড্ড কষ্ট হয়েচে—কর্জ কি মুই বাকী রাখবো—যে ক'রে হোক্—

এই সময়ে নবাগত জ্ঞাতিপুত্রটি আসিয়া পড়াতে কথাবার্তা বন্ধ হইল। দীনু বলিলেন—এস হে নীরেন বাবাজী, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি ? এই তোমার বাপ ঠাকুরদার দেশ বুঝ্‌লে হে, কি রকম দেখ্‌লে বল ?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ বাইশের বেশী নয়, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতায় কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ—দেখিবার জন্ম পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেও কাজকর্ম সে কিছুই দেখে না বোঝেও না, দিন রাত নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটি বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের ঝোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িয়া মেজে হইতে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরের কাছে যাইতেই তাহার নজর

পড়িল, তাহার দামী বিলাতী আলোটা মেজেতে বসানো। উহার কাঁচের ডুমটা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সারা মেজেতে কাঁচ ছড়ানো। দোরের কাছে জুতার শব্দ পাইয়া গোকুলের স্ত্রী চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেজে হইতে কাঁচের টুকরাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিল,—ভাবে মনে হয় প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জ্বালিতে গিয়াছিল, কি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, এবং আলোর মালিক আসিবার পূর্ব্বেই নিজেই অপরাধের চিহ্নগুলি তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। ক্ষতিকারিণীর লজ্জার ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটা ভেঙে ব'সে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা প'ড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি। আচ্ছা এখন একটু চা ক'রে নিয়ে আসুন তো বৌদি, চট্ করে, দেখি কেমন কাজের লোক। দাঁড়ান, আলোটা জ্বেলে নিই, ভাগ্যিস বাক্সে আর একটা ডুম্ আছে!

গোকুলের স্ত্রী সলজ্জ স্বরে বলিল, দেশলাই আন্‌বো ঠাকুরপো?

নীরেন কৌতুকের স্বরে বলিল—দেশলাই আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধূ এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নস্বরে বলিল—ঝুল প'ড়ে রয়েচে, ভাবলুম একটু মুছে দিই, তা যেমন কাঁচটা নামাতে গেলাম কি জানি ও সব ইংরিজি কলের আলো—কথা শেষ না করিয়াই সে পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া নীচে পলাইল।

নীরেন দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ ভাঙার সন্ধ্যা হইতে কিন্তু উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল। নীরেন অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ আনন্দহীন প্রবাসে দিনগুলি কাটিতেছিল না! সমবয়সী বৌদির সহিত পরিচয়ের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর হইতে সকাল-সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি, সহজ আদান-প্রদানের মাধুর্য্যে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল!…

দুপুরে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলিল—কি রাঁধ্‌চো ও খুড়ী মা? বধূ বলিল—আয় মা আয়, একটু কাজ ক'রে দিবি? একা আর পেরে উঠ্‌চিনে।…দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়ীমার কার্য্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল—হাঁ খুড়ীমা, এ কাঁক্‌ড়া কোথায় পেলে? এ কাঁক্‌ড়া তো খায় না।

—কেন খাবে না রে, দূর! বিধু জেলেনী ব'লে গেল এ কাঁক্‌ড়া সবাই খায়।

—হ্যাঁ খুড়ীমা, ওমা সেকি, একি তুমি কিন্‌লে?

—কিন্‌লামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ-পয়সায় দিয়েচে বিধু।

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা! এ কাঁক্‌ড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে? ভালমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে

নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলা খুড়ীমাটির উপর তাহার স্নেহ নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

সেদিন নাকি গোকুল-কাকা খুড়ীমার মাথায় খড়মের বাড়ি মারিয়াছিল—স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ী গল্প করে। সে-ও সেদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। খুড়ীমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না পাছে জ্বালা করে। সেদিন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়ীমা অপ্রতিভ হয়—এক ঘাট লোকের সাম্‌নে লজ্জা পায়। তবুও রায়-জেঠি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৌমা নাইলে না?···খুড়ীমা হাসিয়া উত্তর দিল—নাবো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভাল নেই।···

খুড়ীমা ভাবিয়াছিল তাহার মার খাওয়ার কথা বুঝি কেহ জানে না। কিন্তু খুড়ীমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায়-জেঠি বলিল—দেখেচো বৌটাকে কি রকম মেরেচে গোক্‌লো, মাথাব চুলে রক্ত একেবারে আটা হয়ে এঁটে আছে। রায়-জেঠির ভারি অন্যায়। জানো তো বাপু, তবে আবার জিজ্ঞেস করাই বা কেন, আর সকলকে বলাই বা কেন?···

মাছ ধুইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়ীমা, তোমাদের চিঁড়ের ধান আছে? মা বলছিল অপু চিঁড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়-নি।···গোকুলের বউ চুপি চুপি বলিল—আসিস এখন দুপুরের পর।···দালানের দিকে ইশারায় দেখাইয়া কহিল—ঘুমুলে আসিস্!

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমা, তোমাদের বাড়ী কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি কিন্তু।

—ঠাকুরপোকে দেখিসনি? এখন নেই কোথায় বেরিয়েচে, বিকেলবেলা আসিস্, দেখা হবে এখন।···তারপর গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়।

দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—দূর্‌!

গোকুলের বউ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে দূর কেন? কেন আমাদের মেয়ে কি খারাপ? দেখি?···সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—ভাখ তো এমন দুগ্‌গা-প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি? হোলই বা বাপের পয়সা নেই।

দুর্গা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও, খুড়ীমা যেন কি···পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা, নৈলে ভাখো না···দূর!···

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দুধ দুহিতে আসিল। বধূ ঘর হইতে বলিল—ও সয়, আমার হাত জোড়া, বাছুরটা ওই বাইরের উঠোনে পিটুলি-গাছে বাঁধা আছে—নিয়ে আয়, আর রোয়াকে ঘটিটা মাজা আছে ভাখ্‌।···

সর্বী ঠাকরুণের এতক্ষণে পূজাহ্নিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালীমন্দিরের উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির সুরে বলিতে লাগিলেন—দোহাই মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিও মা, ভবসমুদ্দুর পার কোরো মা—মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো, মা-গো।

গোকুলের বউ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল—ও পিসিমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি, দুটো খেয়ে জল খান।

হঠাৎ সখী ঠাক্‌রুণ রোয়াক হইতে ডাক দিলেন—বৌমা, দেখে যাও তো এদিকে।

স্বর শুনিয়া গোকুলের বউএর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখী ঠাক্‌রুণকে সে যমের মত ভয় করে। মায়াদয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাক্‌রুণের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই —একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রোয়াকের কোণে জড়ো-করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—গ্যাখো তো চক্ষু দিয়ে, দেখ্‌তে পাচ্ছো? একেবারে সপষ্ট জলের দাগ দেখ্‌লে তো? এইখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়ে গিয়েচে, তারপর সেই শূদ্দুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত-রাজ্যি জজানো হয়েচে! হাঃ! জাতজন্মো একেবারে গেল!

সখী ঠাক্‌রুণ হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইলে ইহার চেয়ে বেশী হতাশ হইতে পারিতেন না।

—হাঘ'রে হাডহাভাতে ঘরের মেয়ে আনলেই অমনি হয়, ভদ্দর লোকের রীত শিখ্‌বেই বা কোথা থেকে - জান্‌বেই বা কোথা থেকে? বাসন মাজলি তা দেখলি নে এঁটো গেল কি রৈল? তিনপহর বেলা হয়েচে, ভাব্‌লাম একটু জল মুখে দিই। শূদ্দুরের এঁটো, এখ্‌খুনি নেয়ে মরতে হোত—ভাগ্যিস ঘটিটা ছুঁইনি!

গোকুলের বউ বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—কেন মরে সন্ন পোড়ারমুখীকে ঘটি তুলে নিতে বল্লাম, নিজে দিলেই হোত।

সখী ঠাক্‌রুণ মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—ধিঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে দাও গিয়ে। বাসন-কোসন মেজে আনো ফের্। রান্নাঘরে গোবর দিয়ে নেয়ে এসো। যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটাকে ছারখারে দিলে!···সখী ঠাক্‌রুণ রাগে গরগর্ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন, বাহিরের খররৌদ্র তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

হুকুম-মত সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্রে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে!

ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারের বড় শিমুল গাছটায় রোদ চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর বাঁকে একখানা পাল-তোলা নৌকা দাঁড় বাহিয়া বাঁক ঘুরিয়া যাইতেছে। হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মত উড়িতেছে। মাঝনদীতে একটা বড় কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস লইয়া আবার ডুবিয়া গেল—গো-ও-ও-ও-ভুস্!

নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সুন্দর গন্ধ আসে, ছোট্ট নদী, ওপারের চরে একটা পানকৌড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া আছে।

এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি, ডাঙায় ওঠোসে···

গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পানকৌড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে আর কেহ নাই যে, মুখের দিকে চায়। মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? গরীব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখোর ভাই আছে, সে কোথায় কখন্ থাকে—তার ঠিকানা নাই। গত বৎসর পূজার সময় এখানে আসিয়া চার দিন ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাইকে নিজের বাক্স হইতে যাহা সামান্য কিছু পুঁজি—সিকিটা দুয়ানিটা বাহির করিয়া দিত। পরে একদিন সে হঠাৎ এখান হইতে উধাও হয়। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে, এক কাবুলি আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল। পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান! ভাইটির সেই হইতে আর কোন সন্ধান নাই।

নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হু-হু করে। নির্জ্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো দূরের কোন জনহীন আঁধার মেঠো-পথ বহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে, রাত্রে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই।···

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়াভরা নদীর জল, মাঠ, ঘাট, ওপারের শিমুল গাছটা, বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা—সব ঝাপ্সা হইয়া আসে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ি গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলায় বাখারী চাঁচিতেছিল; অপু বলিল—এই, কড়ি খেলবি? খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল তাহাকে এখনি নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে। সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ী। রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল—হৃদয় বাড়ী আছে? রামচরণ বলিল—হৃদয়কে কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও, হৃদে বাড়ী নেই।

ঠিক্-দুপুর বেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফলমনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়িখেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণ-পাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ী, অপুদের বাড়ি হইতে তাহা অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়সে পটু কিছু ছোট; অপুর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরু-মশায়ের পাঠ-

শালায় ভর্ত্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল।…অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি?…পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সূতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি—তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেছি—সাতটা সোনা-গেঁটে; হেরে গেলে আরও আন্‌বো।…পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন দেখছিস? গেঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে সুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি-খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক্ করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক্ ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্ত্তি হইতে আর কত বাকী!

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাৎ থেকে তোমার মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ্ বেশী!

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ্ বেশী থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেত না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল —এত বেশী কড়ি আমি কোনদিন জিতি নি, আজ আর খেল্‌চি নে—খেলে কি আর এই কড়ি নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধ্ বেশী! সব হেরে যাব।…হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি একহাত বেশী নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ী যাচ্ছি।… পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গী ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি?…সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না, বিষণ্ণমুখে বলিল—বা রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত।—পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারিবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন্ ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দ্দশায় খুশী না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে

পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো। পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, তারপর ঠেলাঠেলিতে সে ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপুকেও সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেয়েলি ধরণের হাতে পায়ে কোন জোর ছিল না, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষ-দল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেশী, নীরেন তাহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলার দু' একটি ছাড়া বাকীগুলি অদৃশ্য, মায় কড়ির থলিটি পর্য্যন্ত। পরে সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপুদা, তোমার বেশী লাগেনি তো?

এতদূরে ঠিক দুপুর বেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দু'জনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দু'জনকে বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গেঁজেটা আমার, সেদিন অত ক'রে ছিবাসের কাছে চেয়ে নিলাম—গেল। আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে।

বাড়ী ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল—দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা কঞ্চি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু'খণ্ড ক'রে রেখেচিস্?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই।—আহা ভারি তো একখানা বাঁকা কঞ্চি। তোর যত পাগলামী—বাঁশ-বাগান খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি? কঞ্চির ভারী অমিল কিনা।

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি। আমি কত খুঁজে পেতে নিয়ে আসবো, আর তুই সব ভেঙে চুরে রাখবি—বেশ তো।

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দেবো এখন এনে যত চাস, কান্না কিসের?

বাঁকা-কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস। একখানা শুকনো, হালকা, গোড়ার দিক মোটা আগার দিক সরু, বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া এক দিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়, কখনো রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জ্জুন—কল্পনা করে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মত হাল্কা হইবে ও পরিমাণমত বাঁকা হইবে, তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ

করে ; কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা-কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, এ কথা কেউ না শুনিতে পারে অপুর সে-দিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জনসমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সে সব দিকে না গিয়া নদীর ধারে—নির্জ্জন বাঁশবনের পথে—নিজেদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুল-তলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। কচিৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনি সে জিভ্ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয়—পাছে কেহ কিছু মনে করে—এজন্য তাহার ভারী লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। দিদি তাহাকে এ অবস্থায় দু'একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে বাঁকা-কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে, লজ্জায় অপু কখনই একথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা-কঞ্চির কি রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপুর মনে হয় সকলেই সেৎবা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। কে বুঝিবে—একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কি অপূর্ব্ব আনন্দেই সারাদিন একা-একা কাটাইয়া দিতে পারে।...

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল—মাকে যেন এসব বলিসনে দিদি। দুর্গা বলে নাই। সে জানে, অপু একটা পাগল। ভারী মমতা হয় ওর ওপর, ছোট্ট বোকা আদুরে ভাইটা—এসব মাকে বলিয়া কি হইবে?..

মধুসংক্রান্তির ব্রতের পূর্ব্বদিন সর্ব্বজয়া ছেলেকে বলিল—ক'স তোদের মাষ্টার মশায়কে নেমন্তন্ন ক'রে আসিস—বলিস দুপুর-বেলা এখানে খেতে।

মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুমুরের শুক্তনি, থোড়ের ঘণ্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস।

দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। নিতান্ত আনাড়ি,—ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণে সে ডালের বাটি নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল—যেন তাহার ভুল হইতেছে এখনি কেহ বকিয়া উঠিবে। অত মোটা চালের ভাত নীরেনের খাওয়া অভ্যাস নাই, এত কম তৈলঘৃতের রান্না তরকারি কি করিয়া লোকে খায়, তাহা সে জানে না। পায়েস পানসে—জল-মিশানো দুধের তৈরী, একবার মুখে দিয়াই পায়েস-ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। অপু মহা খুসি ও উৎসাহসহকারে খাইতেছিল, এত সুখাদ্য তাহাদের বাড়ীতে দু'একদিন মাত্র হইয়াছে—আজ তাহার স্মরণীয় উৎসবের দিন।—আপনি আর একটু পায়েস নিন্ মাষ্টার মশায়। ...নিজে সে এটা-ওটা বার বার দিদির কাছে চাহিয়া লইতেছিল।

বাড়ী ফিরিলে গোকুলের বউ হাসিমুখে বলিল—দুগ্গাকে পছন্দ হয় ঠাকুরপো? দিবি

দেখতে-শুনতে! আহা! গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের পয়সা নেই। কার হাতে যে পড়বে? —সারা-জীবন প'ড়ে প'ড়ে ভুগ্‌বে। তা তুমি ওকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো, তোমাদেরই পালটি ঘর—মেয়েও ঢিবি; ভাইবোনের দু'জনেরই কেমন পুতুল-পুতুল গড়ন!…

অন্নীপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সেদিন গ্রামের পিছনের আম-বাগানের পথ ধরিয়াছিল। একটা বনে-ঘেরা সরু পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপর আসিয়া উঠিতেছে, সে চিনিল—অপুর বোন দুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল—কি খুকি, তোমাদের বাগান বুঝি এইটে?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল। নীরেন বলিল—না না খুকী, তুমি চল আগে আগে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হোল। ঐদিকে পুকুরের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুঁজে হায়রান। যে বন তোমাদের দেশে!

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নীরেনের মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথের উপর পড়িয়া গেল।

নীরেন বলিল—কি যেন পড়ে গেল খুকী! কিসের ফল ওগুলো?

দুর্গা নীচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সঙ্কুচিতভাবে বলিল—ও কিছু না, মেটে আলু।

—মেটে আলু? খেতে ভাল লাগে বুঝি? কি করে খায়?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অত্যন্ত কৌতুহলজনক ঠেকিল। একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চশ্‌মা-পরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না। সে বলিল—এ ফল তো খায় না, এ তো তেতো।

—তবে তুমি যে—

দুর্গা সলজ্জস্বরে বলিল—আমি নিয়ে যাচ্ছি এমনি—খেল্‌বার জন্যে!…একথা তাহার মনে ছিল যে, এই চশমা-পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়ীমা ঠাট্টাচ্ছলে তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহার ভারী কৌতুহল হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভাল করিয়া দেখে। কিন্তু মধুসংক্রান্তির ব্রতের দিনও তাহা সে পারে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে ব'লো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—বল্‌বে তো?

দুর্গা চলিতে চলিতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

আর একটু গিয়া পাশের একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই পথ দিয়ে গেলে আপনার খুব সোজা হবে।

নীরেন বলিল, আচ্ছা, আমি চিনে যাব এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই, তুমি একলা যেতে পারবে?

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল—ঐ তো আমাদের বাড়ী একটু এগিয়ে গিয়েই, আমি তো—এইটুকু একলা যাবো এখন। আপনি আর—

দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই,—চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুর মধ্যে। যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যাম-স্নিগ্ধতা তাহার চোখ দু'টির মধ্যে অর্দ্ধসুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনো হয় নাই, রাত্রি শেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে—, কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসব—জানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিতে পারিতেছে না। সে বলিল—না খুকী, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল, তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই যাই।

দুর্গা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের মনে হইল এইবার সে কথা বলিবে। পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বউ নীরেনের ঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল। গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা এপাশ ওপাশ করিবার পর, নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—ঘুমোও নি যে ঠাকুরপো? আমি ভাবলাম ঠাকুরপো ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি, আজ মোচার ঘণ্ট যে বড় খেলে না—পাতেই রেখে এলে, সেদিন তো সব খেয়েছিলে?

—আসুন বৌদি। মোচার ঘণ্ট খাবো কি? বাঙালে কাণ্ড সব, যে ঝাল তাতে খেতে ব'সে কি চোখে দেখতে পাই—কোন্‌টা ঘণ্ট, কোন্‌টা কি?

গোকুলের বউ ঘরের দুয়ারের গব্‌রাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া, অভ্যস্তভাবে মুখের নীচু দিকটা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

—ইস, ঠাকুরপো, বড্ড শহুরে চাল দিচ্ছ যে। ওইটুকু ঝাল আর তোমাদের সেখানে কেউ খায় না—না?

—মাপ করবেন বৌদি, এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে আপনাদের বেশীটা একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্ছি নে! যা থাকে কপালে—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন! দিন্ এক-দিন চক্ষুলজ্জায় মায়া কাটিয়ে যত খুশি লঙ্কা।

—ওমা আমার কি হবে! চক্ষুলজ্জার ভয়েই শিল-নোড়ার পাট তুলে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি না কি ঠাকুরপো? শোনো কথা ঠাকুরপোর—বলে কিনা যাঁহা বায়ান্ন...হাসির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুরপো?

—সেখানে, কোথায়? কলকাতায় না পশ্চিমে? পশ্চিমের গরম কি রকম সে এখান

থেকে কি বুঝতে পারবেন! সে বাংলাদেশ থেকে বোঝা যাবে না। বোশেখ মাসের দিকে রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শুতে পারে? ছাদে বিকেলে জল ধ'রে ছাদ ঠাণ্ডা ক'রে রেখে তাইতে রাত্রে শুতে হয়।

—আচ্ছা, তোমরা যেখানে থাক এখান থেকে কত দূর?

—এখান থেকে রেলে প্রায় দু'দিনের রাস্তা। আজ সকালের গাড়ীতে মাঝের পাড়া ষ্টেশনে চড়লে কাল দুপুর-রাত্রে পৌঁছোনো যায়।

—আচ্ছা, ঠাকুরপো, শুনিচি নাকি গয়াকাশীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি?

—সত্যি। অনেক বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে যখন রেলগাড়ী যায়—একেবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, গাড়ীর মধ্যে আলো জ্বেলে দিতে হয়।

গোকুলের বউ উৎসুকভাবে বলিল—আচ্ছা, ভেঙে পড়ে না?

—ভেঙে পড়বে কেন বৌদি? বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে সুড়ঙ্গ তৈরী করেচে, কত টাকা খরচ করেচে, ভাঙ্‌লেই হোল! একি আপনাদের রায়পাড়ার ঘাটের ধাপ যে দু'বেলা ভাঙচে?

এঞ্জিনিয়ার কোন্ জিনিস গোকুলের বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—পাহাড়টা মাটির না পাথরের?

—মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে। না বৌদি, আপনি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। আচ্ছা, আপনি রেলগাড়ীতে কতদূর গিয়েছেন?

গোকুলের বউ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুজিয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল—ও:, ভারী দূর গিইচি, একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ওবছর পিস্‌শাশুড়ী আর সতুর মার সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগল-কিশোর দেখ্‌তে গিইছিলাম। সেই আমার জন্মের মধ্যে কম্ম—রেলগাড়ীতে চড়া!

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহার চারিপাশে এমন একটা হাসি-কৌতুকের জাল বুনিতে পারে—যাহা নীরেনের ভারী ভাল লাগে। যে ধরণের লোকের মনের মধ্যে আনন্দের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে, যার কারণে-অকারণে অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পাত্র উপচাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে, এই পল্লীবধূটি সেই দলের একজন। আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে—না আসিলে নিরাশ হয়, এমন কি যেন একটু গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আচ্ছা, বৌদি, আপনাদের সবাই চলুন, একবার পশ্চিমে সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এবাড়ীর লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিমে! তুমিও যেমন ঠাকুরপো! তাহোলে উত্তর মাঠের বেগুন ক্ষেতে চৌকি দেবে কে?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া নীচু সুরে বলিল—ভাখো ঠাকুরপো, একটা কথা রাখ্‌বে?

—কি কথা বলুন আগে।

—যদি রাখো তো বলি।

—ও সাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না, বৌদি! জানেন তো আইন পড়ি। আগে কথাটা শুনবো, তারপর কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বউ দুয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল—এই মাকড়ী দু'টো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?

নীরেন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কেন বলুন তো?

—সে এখন বলবো না। দেবে ঠাকুরপো?

—আগে বলুন টাকা দিয়ে কি হবে? নৈলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিম্নস্বরে বলিল—আমি এক জায়গায় পাঠাবো। ছাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরিজিতে কি লেখা আছে।

নীরেন পড়িয়া বলিল—আপনার ভাই, না বৌদি?

—চুপ চুপ, এ বাড়ীর কাউকে বোলো না যেন। পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায় পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো? তাই ভাবলাম এই মাকড়ী দু'টো—টাকা পাঁচটা দাও গিয়ে ঠাকুরপো—হতভাগা ছোঁড়াটির কি কেউ আছে ভূভারতে?…গোকুলের বউ-এর গলার স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল

নীরেন বলিল—টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয় দশটা হয়, আপনি যখন হয় শোধ দেবেন, কিন্তু মাকড়ী আমি নিতে পারবো না—

গোকুলের বউ কৌতুকের ভঙ্গীতে ঘাড় দুলাইয়া হাসিমুখে বলিল—তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ধার রেখে ম'রে যাই আর তুমি—সে হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে। আচ্ছা যাচ্ছি ঠাকুরপো, নীচে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েচে—

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ির মুখ পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল—কিন্তু টাকার কথা যেন কাউকে বোলো না ঠাকুরপো! কাউকে না—বুঝলে?

·

দুর্গা কাঁথার তলা হইতে অত্যন্ত খুশির সহিত ডাকিল—অপু, ও অপু!

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল—দিদি, জানালাটা বন্ধ ক'রে দিবি? বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে।

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—রাণুর দিদির বিয়ে হবে জানিস্? আর কিন্তু বেশী দেরী নেই। খুব ঘটা হবে, ইংরিজি বাজনা আসবে। দেখিচিস্ তুই ইংরিজি বাজনা?

—হাঁ, সব মাথায় টুপি প'রে বাজায়, এই বড় বড় বাঁশি—মস্ত বড় ঢাক আমি দেখিচি—আর একরকম বাঁশি বাজায়, কালো কালো, অত বড় নয়, ফুলোট্ বাঁশি বলে—এমন চমৎকার বাজে। ফুলোট্ বাঁশি শুনিচিস্?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ওপাড়ায় খুড়ীমার কাছে বেড়াইতে যায়। একথা সেকথার পর খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্‌গা, তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল—কেন খুড়ীমা?···পরে সে সেদিনের কথা বলিল। কৌতুকের সুরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়ীমা ওডেই—একেবারে গড়ের পুকুর—সেই বনের মধ্যে—

খুড়ীমা হাসিয়া বলিল—আমি কাল ঠাকুরপোকে বলছিলাম তোর কথা—বলছিলাম—গরীবের মেয়ে ঠাকুরপো, কিছু দেবার থোবার সাধ্যি তো নেই বাপের—বড্ড ভাল মেয়ে—যেন একালেরই মেয়ে না—তা ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুরপো তোর কথা-টথা জিগ্যেস করছিল—বল্লে, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হোল—পথ ভুলে ঠাকুরপো কোথায় গিয়ে পড়েছিল—এই সব। তারপর আমি আজ তিনদিন ধ'রে বলচি শ্বশুর-ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হোল, তোকে যেন মনে লেগেচে—

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ীর কাজ তবু তো যাহোক্ কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয়, সেদিন সে কিছুতেই বাড়ীর গণ্ডীতে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে না—কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না-গরম-না-ঠাণ্ডা, কেমন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় নেবুফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ীর বাহির হইয়া সে রাণুদের বাড়ী গেল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই তাঁর প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজিওয়ালা আসিয়া বাজির দরদস্তুর করিতেছে। সীতানাথ ও-অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনচৌকী বাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কুটুম্বের দল আসিতে সুরু করিয়াছে। তাহাদের ছেলে-মেয়েতে বাড়ীর উঠান সরগরম।

দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল—আর দিনকতক পরে ইহাদেরই বাড়ীতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই, কেবল একবার গাঙ্গুলী বাড়ীর দোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল, হুস্ করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে, সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায়, এমন চমৎকার দেখায়!···অপু বলে হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আঁচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িলে, সে সুড়ুৎ করিয়া পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রৌদ্রের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় রাণুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হলদে পাতাগুলা ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে—কেহ কোনদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ীর দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

কাঁচপোকা নয় সুদর্শন পোকা।

তাহার মুঠার আঁচল আপনা আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়াছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মত বিন্দু বিন্দু দাগ।

সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ—তাহার মায় মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে ধূলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো···সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এইরূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভাল রেখো, মাকে ভাল রেখো, ওপাড়ার খুড়ীমাকে ভাল রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল—নীরেনবাবুকে ভাল রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রাণুর দিদির মত বাজি-বাজনা হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধূলার উপর বিপন্নভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম ফাল্গুনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়ূর-কণ্ঠি রংএর আকাশ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে।

শেওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ। সুঁড়ি পথের দুধারেই আমবাগান। তপ্ত বাতাস আম্র-বউলের মিষ্ট গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও কাচপোকার গুঞ্জনরবে, ছায়াগহন আম বনে কোকিলের ডাকে, স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়কতলার মাঠ। ঘাসে-ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গা ঝোপের মধ্যে মধ্যে সৈঁয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—সৈঁয়াকুল এখন আর বড় থাকে না, শীতের শেষে ঝরিয়া যায়। ওই উঁচু ঢিবিতে ঝোপের মধ্যের একটা গাছে অনেক সৈঁয়াকুল সেদিনও ত সে খাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আর নাই, সব ঝরিয়া গিয়াছে, গোলমরিচের মত শুক্‌না সৈঁয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক ঝাঁক শালিক পাখী ঝোপের মধ্যে কিচ্‌ কিচ্‌ করিতেছিল, দুর্গা নিকটে যাইতে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে খুশির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল। উৎসবের নৈকট্য, রাণুর দিদির বাসরে রাত জাগা ও গান শুনিবার আশা—

খুশিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়। একবার সে হাত দুটা ছড়াইয়া ডানার মত লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল। সে উড়িতে চায়!···শরীর তো হালকা 'ফনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া হইত!

শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শুক্‌না ঝরাপাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া মচ্‌ মচ্‌ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙিয়া গিয়া শুক্‌না শুক্‌না ধূলা মিশানো, খানিকটা সোঁদা সোঁদা খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল।

সামনে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক। একখানা গরুর গাড়ী ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে মাঠের পথের দিকে যাইতেছে। টাট্‌কা কাটা কঞ্চির ঘেরা বাঁধিয়া তাহার উপর কাঁথা ও ছেঁড়া লাল নক্সা পাড় কাপড় ঘিরিয়া ছই তৈয়ারী করিয়াছে। ছইএর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমানুষ ধরণে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে—কোন্ গাঁয়ের চাষাদের মেয়ে বোধহয় বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছে।

দুর্গা অবাক হইয়া একদৃষ্টে গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিয়ের পর মা, বাবা, অপু—সব ছাড়িয়া এই রকম কোথায় কতদূর চলিয়া যাইতে হইবে হয়ত—যখন তখন সেখান হইতে তাহারা আসিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বাগান, বাঁশফুলের ঝাড়, বাড়ী গাছটা, উঠানের কাঁঠালতলাটা যাহা সে এত ভালবাসে, এই শুক্‌না পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ এইসব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের, চিরকালের জন্য। ছইএর মধ্যের ছোট্ট মেয়েটা বোধহয় সেই দুঃখেই কাঁদিতেছে।

কাঁচা সড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী।

ওপারে জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে? খয়রা? এপারে আসিলে দু'পয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। অপু খয়রা মাছ খাইতে বড় ভালবাসে!

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গোছাইল। ঘরের মেঝেতে তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম। পুতুল-গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে, অপু আসিয়া বলিল—তুই বুঝি আমার বাক্স থেকে ছোট আর্সিখানা বের করে নিয়েচিস্ দিদি?

—হুঁ—আর্সি তো আমার—আমিই তো আগে দেখতে পেইছিলাম, তক্তাপোশের নীচে পড়েছিল। যাও, আমি আর্সি আমার বাক্সে রাখবো। বেটাছেলে আবার আর্সি নিয়ে কি হবে?

—বা রে তোমার আর্সি বই কি? ও-পাড়ার খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে মা তো কি বের্তোতে আর্সি এনেছিল, আমি তো আগেই মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। না দিদি, দাও—

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আর্সি খুঁজিতে লাগিল।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল—দুষ্টু কোথাকার—আমি পুতুল গুছিয়ে রাখচি আর উনি হাতুল পাতুল করচেন—যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমার—দোবো না আমি আর্সি।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার রুক্ষচুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কান্না-আটকানো গলায় বলিতে লাগিল—কেন তুমি আমাকে মারবে? আমার লাগে না বুঝি?—দাও আমায় —মাকে বোলে দেবো—লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ি থেকে আল্‌তা চুরি কোরেচ—

আল্‌তা চুরির কথায় দুর্গা ক্ষেপিয়া গেল। ভাইএর কান ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া

উপরি উপরি পটাপট কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল—আল্‌তা নিইচি ?—আমি আল্‌তা নিইচি ? লক্ষীছাড়া দুষ্টু বাঁদর ! আর তুমি যে লক্ষীর চুপ্‌ড়ির গা থেকে কড়িগুলো খুলে লুকিয়ে রেখেচ, মাকে ব'লে দোবো না ?—

চীৎকার, কান্না ও মারামারির শব্দ শুনিয়া সর্ব্বজয়া ছুটিয়া আসিল।

ততক্ষণে দুর্গা অপুর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলিয়াছে—অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের গোছা মুঠি পাকাইয়া টানিয়া এরূপ ধরিয়া আছে যে দুর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল- -ত্থাখো না মা, আমার আর্সিখানা বাক্স থেকে বের ক'রে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েচে—দিচ্চে না—এমন চড় মেরেচে গালে—

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—না মা, ত্থাখো না আমার পুতুলের বাক্স গোছাচ্ছি, ও এসে সেগুলো সব—

সর্ব্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম্ দুম্ করিয়া সজোরে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—ধাড়ী মেয়ে—কেন তুই ওর গায় হাত দিবি যখন তখন ?—ওতে আর তোতে অনেক তফাৎ জানিস ?- -আর্সি—আর্সি তোমার কোন্ পিণ্ডিতে লাগবে শুনি ? কথায় কথায় উনি যান ওকে তেড়ে মার্ত্তে ! মরণ আর কি ! পুতুলের বাক্স—রোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া এক টান্ মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—ধাড়ী মেয়ের কোনো কাজ নেই, কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো ক'রে বেড়ানো—আর কেবল পুতুলের বাক্স আর পুতুলের বাক্স ! ও সব টেনে এক্ষুণি বাঁশ-বাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্চি তোমার খেলা ঘুচিয়ে একেবারে—

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্র`·, দিনের মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়—পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আল্‌তা, কত কষ্টের সংগ্রহ করা নাটফল, টিনমোড়া আর্সিখানা, পাখীর বাসা—সব অন্ধকার উঠানের মধ্যে কোথায় কি ছড়াইয়া পড়িল ! মা যে তাহার পুতুলের বাক্স এরূপ নির্দ্দয়ভাবে ফেলিয়া দিতে পারে একথা কখনো সে ভাবিতে পারিত না। কত কষ্টে কত জায়গা হইতে জোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে !

কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেমন অবাক হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধ হয় শাস্তিটা কিছু বেশী কঠোর বলিয়াই ঠেকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে, মেজেতে কেরোসিন তেলের গন্ধ বাহির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাঁশ-বাগানের মশা বিন্ বিন্ করিতেছে। খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দুর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানালা দিয়া ফাল্গুন জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় পড়িয়াছে, পোড়ো ভিটার দিক হইতে ভুর ভুর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে।

একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সটা ও ছড়ানো জিনিসগুলা তুলিয়া আনে—কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের জিনিসগুলা! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মারে?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ সে গায়ের উপর কাহার হাত অনুভব করিল। অপু ভয়ে ভয়ে ডাকিল—দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার পূর্ব্বেই অপু বালিশে মুখ গুঁজিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি আর করবো না—আমার ওপর রাগ করিসনে দিদি—তোর পায়ে পড়ি। কান্নার আবেগে তাহার গলা আটকাইয়া যাইতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল—পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভায়ের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।—কাঁদিসনে, চুপ চুপ, মা শুনতে পেলে আবার আমায় বকবে, চুপ, কাঁদতে নেই—আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কেঁদো না ছিঃ—চুপ—

তাহার ভয় হইতেছিল অপুর কান্না শুনিলে মা আবার হয়তো তাহাকেই মারিবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে শুইয়া শুইয়া তাহাকে নানা গল্প, বিশেষত রাণুর দিদির বিয়ের গল্প বলিতে লাগিল। একথা-ওকথার পর অপু দিদির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বলবো দিদি?—তোর সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের বিয়ে হবে—

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল, কিন্তু ছোট ভাইএর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্ত্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়ীমা বল্‌ছিল রাণুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাষ্টার মশায়ের নাকি অমত নেই—

কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ—বল্‌ছিল—যাঃ—তোর সব যেমন কথা—

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল,—সত্যি বল্‌চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠ্‌ল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সেই মাষ্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে—

—মা জানে?

—আমি এসে মাকে জিগ্যেস করবো ভাবলাম—ভুলে গিইচি। জিগ্যেস করবো দিদি? মা বোধ হয় শোনে নি, কাল খুড়ীমা মাকে ডেকে নিয়ে বল্‌বে বল্‌ছিল—

পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাষ্টার মশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূর—রেলে যেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ীর ছবি দেখিয়াছে—অপুর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলা চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেলগাড়ীখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই—গরুর গাড়ীর মত কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই, থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ী যখন

চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয় কিনা! সে ভাইএর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া ঘুমাইবার যোগাড় করিল। ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বার বার দুর্গার মনে হইতেছিল—ঠাকুর সুদর্শন তাহার কথা শুনিয়াছেন! আজই তো সুদর্শনের কাছে সে—ঠাকুরের কত্ত দয়া—যা তো ঠিক কথা বলে!

অপু বলিল—লীলাদির জন্যে কেমন চমৎকার শাড়ী কেনা হয়েচে, আজ লীলাদির কাকা বিয়ের জন্যে কিনে এনেচে রাণাঘাট থেকে, সেজ জেঠিমা বল্লে—বালুচরের শাড়ী—

দুর্গা হাসিমুখে বলিল—একটা ছড়া জানিস্?···পিসি বল্‌তো,

বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই—
মোষের পেটে মযুর ছানা দেখে এলাম সই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যের একখানা বইএর মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে!

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক-দুপুরে সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশথ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইএর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইএর মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব্ব-দর্শন সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা-উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বইএর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা! হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ভাঙাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক্ হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস্ দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়, উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস্। অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য্য। এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠা পাতের ভাত বইয়া বাড়ীর খিড়্কিদোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া থাকে, যেন কি অপূর্ব্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়। হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেচে। কোত্থেকে এলো দেখ্‌লি?—খুশিতে সে হিহি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী।—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ। ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ্ করে; মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আস্‌বে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে। আজ কি আর শুন্‌তে পেয়েছে!—

হঠাৎ বনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতা পাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা বিদ্যুতের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়। মনে মনে ভাবে—ঠিক শুনতে পায় তো, আসে কোত্থেকে। আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুনতে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁটাল তলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দু' পয়সা দেবো।

দিন-চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রং-এর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই ভাখো ঠাকুর এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি? পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইতে পাল্টাইতে বলিল—শকুনির ডিম। ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন্ উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এই টিনের কৌটো কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনা গেঁটে—দেখ্‌বি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলো অপুর প্রাণ, অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়, কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবীচি খেলা।

ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না, ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব

অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ীর দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ্ পাখী ময়না পাখীর মত ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?···

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসীর পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে কি যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে! এঃ, প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখেচো কি পাখী ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না···কান্না ···হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা, বস্বোয়েদের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে—এই নেও শকুনির ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বল্‌বো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি।

কিন্তু বেচারী সর্ব্বজয়া কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

জানিলে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলি পাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালবাসেন না, প্রায়ই নির্জ্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত —সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো—

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের

সঙ্গে আলাপের মত ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা! নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওই রকম ভাব-মাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়ত লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু তা হোলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দুখানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ওসব আমায় শুনিও না বাপু, পদকর্তা ছিলেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—তাঁদের পর ও সব আমার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখী, গাছপালার সাহচর্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল।

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পরে সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টা-খানেকের বেশী কোনো-দিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলাধূলা সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচুকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহমনকে, খেলাধূলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি করবি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়, তাহার মাও যায়। কিন্তু তাহাকে লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের নিজের জিনিস-পত্র। অত চাল-ডাল তাহাদের নাই। আর বন-ভোজনে গিয়া সকলে বাহির করে কত কি জিনিস, ভাল চাল, ডাল, ঘি, দুধ—তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের-ডাল-বাটা, আর দুই একটি বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুয্যের সেজ ঠাকুরুণের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায়, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে।

তাহার অপুও ওই-রকম দুধ কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে ভালবাসে।…

শান্ত মাঠের ধারের বনে রাঙা সন্ধ্যা নামে, শশবনের পথে ফিরিতে শুধু ছেলের মুখই মনে পড়ে। নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাড়িয়ে ছাখ্‌ তেঁতুলতলায় মা আস্‌চে কিনা—আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শীগ্‌গির ক'রে—

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আসিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শীগ্‌গির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গরু-টরুতে খেয়ে ফেলে না—

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়কীর দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোত্থেকে তমুরেজের বৌ ?

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশী না, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠীর মাঠে গিযাছিলাম কাঠ কুড়ুতি—বুঁইচের মালা নেবা ?

দুর্গা তো বন বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈঁচিফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—সে কিনিবে না।

মাতোর মা বলিল—নেও না দিদি ঠাক্‌রোণ, বেশ মিষ্টি বুঁইচি মধুখালির বিলির ধারে থে তুলেলাম—কোঁচড় হইতে এক গাছা মালা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখো কত বড় বড়। কাঠ নিয়ে বাজারে যেতি, বিক্রী কত্তি, পয়সা পেতি বড্ড বেলা হয়ে যাবে, মাতোরে ততক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেতাম। নেও, পয়সায় দু গাছ দেবানি—

দুর্গা রাজি হইল না, বলিল—অপু, ঘটিতে একগাল খানিক চালভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দে তো।

উহারা খিড়কী দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটি হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই ছাখ অপু কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো…

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলাঘরের বন-ভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে,—ধূলার ভাত, খাপরার আলু-ভাজা, কাঁটাল পাতার লুচি?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি!—বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধ পোড়া কটা দূর্ব্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জ্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটায় কয়-দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অস্থি-সন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু-হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিতম পিসির মত হয়?

এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই। অনেককাল আগের কথা—ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে! সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়,—সে কতদূরে? কোথায়? কেহ আর তাহার খোঁজ-খবর করে না; আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই, মাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না। সব একে একে মরিয়া গিয়াছে। মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে করে নাই! কতদিন সে নির্জ্জনে এই নিতম পিসির কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে। আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে—এই ঘোর জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবে?

তাহারও যদি ঐ রকম হয়? ঐ তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয়া—আর কখনো দেখা হইবে না—কখনো না—কখনো না—এই তাহাদের বাড়ী, গাবতলা, ঘাটের পথ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকার নাই। কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে নাই। দিন-রাতে, খেলা-ধূলার, কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে একথা তাহার প্রায়ই মনে হয়—ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে…আসিতেছে…শীঘ্রই আসিতেছে…

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল —বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্চে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরণে আধময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখ্ তো—আগুনটা জ্বলচে না ভাল—

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে একবোঝা শুকনা বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না আর আন্‌বো?...দুর্গা যখন বলিল— বিনি এসেচে—ও-ও তো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারী দুগ্‌গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত রং হচ্চে দেখচিস্ অপু। ঠিক যেন মার রান্না বেগুন-ভাজা, না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে। তাহার পর দুজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-ভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েচে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে,—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয় নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অভ্র একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোনো মেটে আলুর ফল ভাতে ও পান্‌সে আধপোড়া বেগুন ভাজা দিয়া চড়ুই-ভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনা আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারী খাওয়া!

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন! বিনি খাইতে পাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেচে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম।

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষার-মৌলী গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ। আজকের আনন্দ! সামান্য, সামান্য, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ।

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর, মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ার জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দুএকবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জল তেষ্টা পেয়েছে!

অপু বলিল—নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না!

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বনভোজন কর্‌বো—কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো?

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? ম'তোর মা কাঠ কু াতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর—

একটা ভাঙা পাচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

অপুর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। ঐ ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে!

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ী। খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সায় রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই বন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা সিগারেট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই, তেতো, তেতো, কেমন একটা ঝাঁঝ—দুটান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী

চারটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার জন্মীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুরুটের বাক্সে সে-কয়টি সে ওই পোড়োভিটের জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়। পাকা কুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্ব্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়া!

কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাটা সর্ব্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনিল।

আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছেলে গোকুলের মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিসপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘ্ড়ীর স্ত্রী হরিমতি বলিতেছিলেন—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক'দিন থেকে তো নানারকম কথা শুনতে পাচ্ছি—আমি বাপু বিশ্বেস্ করিনে, বৌটা তেমন নয়। আবার নাকি শুন্লাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, বৌ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল্, নীরেনের হাতের লেখা রসিদ ফিরে এসে গোকুলের হাতে পড়েচে এই সব।—যাক্ বাপু, সে সব পরের কুচ্ছ শুনে কি হবে? নীরেন শুন্লাম বল্চে—আপনারা সকলে মিলে একজনের ওপর অত্যাচার কর্ত্তে পারেন, তাতে দোষ হয় না?—আপনারা যা ভাবেন ভাবুন, বৌ ঠাকৃরুণ একবার হুকুম করুন আমি ওঁকে এই দণ্ডে আমার হারানো মায়ের মত মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হোল—সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ী ডেকে আনলে, জিনিস-পত্তর নিয়ে চ'লে গেল।

সর্ব্বজয়া কথাটা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্বামীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীরেনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিহর তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে নীরেনের পিতা বড়লোক—তাহাদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্ব্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সাহস পাইয়াছে—এ বিবাহের যোগাযোগ যেন দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে। হরিহর মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়কে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল!

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোকুলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরেন কেন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস। বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম ঝাঁটালাথি খেয়েই দিন যাবে—কেউ নেই দুগ্‌গা—তাই কি ভাইটা মানুষ? কোথাও যে দুদিন জুড়ুবো সে জায়গা নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়ীমার কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার দুঃখে সান্ত্বনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক! বলুক গে না, সে করবে কি? কেঁদো না খুড়ীমা লক্ষীটি, আমি রোজ যাবো তোমার কাছে—

সর্ব্বজয়া শুনিয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, বৌমা কি বল্লে-টল্লে দুর্গা?…তা নীরেনের কথা কিছু হোল না কি?

দুর্গা লজ্জিত সুরে বলিল—তুমি কাল জিগ্যেস্ কোরো না ঘাটে? আমি জানি নে—

অপু এবার জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমার কাছে কি শুনলি মাষ্টার মশায় আর আস্‌বেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—

পড়ন্ত রোদে ছায়াভরা পথটি কেমন যেন মন-কেমন-করা-করা। সে তাহার ভাইএর জন্য। এ-রকম তাহার হয়, কতবার হইয়াছে, বেশীক্ষণ ধরিয়া যদি সে বাড়ী না থাকে, কি ভাইকে না দেখে, ভাইএর রাশ রাশি কাল্পনিক দুঃখের কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।

তাহার অমন দুধে-আল্‌তা রংএর সোনার পুতুলের মত ভাইটা ময়লা আধছেঁড়া মত একখানা কাপড় পরিয়া বাড়ীর দরজার সামনে আপনমনে একা একা কড়ি চালিয়া বেগুন-বীচি খেলিতেছে। তাহার কাছে পয়সা চায় এটা-ওটা কিনিতে, সে দিতে পারে না—ভারী কষ্ট হয় মনে—

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ী রানুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলে মেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম টুনি। তাহার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টা খানেক পরে, সেজ ঠাকরুণ এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাহার কানে গেল। সেজ ঠাকরুণ দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে হাসি, কি? টুনির মা উত্তেজিত-ভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিসের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোশক উল্টাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল—এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুরের কৌটোটা

এই বিছানার পাশে এইখানটায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, উনি বাড়ী থেকে এলেন—আর তুলতে মনে নেই—কোথায় গেল আর তো পাচ্ছি নে ?—

সেজ ঠাকুরুণ বলিলেন—ওমা সে কি ? হাতে করে নিয়ে যাস্‌নি তো ?

—না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাকুরুণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে ছিল, তারপর খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাকুরুণের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম দুগ্‌গাদি তখন দেখি যে খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবার এসেচে—

সেজ ঠাকুরুণ চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে রুক্ষস্বরে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেচিস্ বল্—বার কর্ এখ্‌খুনি বল্‌চি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাকুরুণের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভাল বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব ? সে বলিল—ও নেয় নি বোধহয় সেজদি—ও কেন—

সেজ ঠাকুরুণ বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না ? তুমি ওর কি জানো, নিয়েচে কি না নিয়েচে আমি জানি ভাল ক'রে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের ক'রে দে, নয়তো কোথায় আছে বল্,—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনে কাকীমা—আমি তো—

সেজ ঠাকুরুণ বলিলেন—বল্লেই আমি শুনবো ? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভাল কথায় বল্‌চি কোথায় রেখেচিস্ দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে যাও ত কিছু বোল্‌বো না—আমার জিনিস পেলেই হোল—

পূর্ব্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দর লোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনিনি তো কখনো। এই পাড়াতেই বাড়ী নাকি ?

সেজ ঠাকুরুণ বলিলেন, তুমি ভালকথার কেউ নও! দেখবে তুমি মজাটা একবার ? তুমি আমার বাড়ীর জিনিস নিয়ে হজম কর্ত্তে গিয়েচো—একি যা তা পেয়েচ বুঝি ?—তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক

মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা, বল্ এখনও কোথায় রেখেছিস্?…বলবি নে?…মা, তুমি জানো না, তুমি খুকী—তুমি কিছু জানো না—শীগ্ গির বল্, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ফেলবো এখুনি! বল্ শীগ্ গির—বল্ এখনো বলচি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখ্ চো না ওই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল,—কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুক্‌নো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকীমা, ওরা সব চ'লে গেল আমিও তো—কথা বলিবার সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজ ঠাক্‌রুণের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর—

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার যো নেই কাকীমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ ঠাক্‌রুণের কোন ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে রে পাজি, নচ্ছার, চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল্ কোথায় রেখেচিস্—বল্ এখুনি—বল্ শীগ্ গির—বল্।

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাক্‌রুণকে হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেজদি—থাক্‌গে আমার কৌটো—ওরকম ক'রে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক্, হয়েছে, ছাড়ুন ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন …এঃ, রক্ত পড়ছে যে…

দুর্গার নাক দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন, শীগ্ গির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি—রোয়াকের বাল্‌তিতে আছে ভাখ্—

চেঁচামেচি ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ীর কামারদের ঝি-বৌয়া ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। রাণুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কামার-বাড়ী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কি দেখিল।

জল আসিলে রাণুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার

মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রাণুর মা বলিলেন—অমন ক'রে কি মারে সেজদি?…রোগা মেয়েটা—ছিঃ—

—তোমরা ওকে চেনো নি এখনো। চোরের মার ছাড়া ওষুদ নেই এই ব'লে দিলুম—মারের এখনো হয়েছে কি—না পাওয়া গেলে ছাড়্বো নাকি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর—

রাণুর মা বলিলেন—হয়েচে, এখন একটু সাম্লাতে দেও সেজদি—যে কাণ্ড করেচো—

টুনির মা বলিল, ওমা, এত হবে জান্লে কে কৌটোর কথা বল্তো?…চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজ্দি—

সেজ ঠাকরুণ এত সহজে ছাড়িতেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাণুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কীর উঠানে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—খুব কেপে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা, আস্তে আস্তে যা—টে পি খিড়কীটা ভাল ক'রে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারা ভাবে খিড়্কী দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েছেলে ও যাহারা উপস্থিত ছিল—সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বীকার করে না—কি রকম দেখচো একবার?…চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়লো না—

রাণুর মা বলিলেন—জল পড়্বে কি, ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি আর জল আছে? ওইরকম ক'রে মারে সেজ্দি!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অন্যেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা? বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি! এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ সেকরার বালক-কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবন-মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভালো কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে আন্লাম—পরে সে

হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, হবে না বাবা তোমার কলম ? কেমন পাকা, না ?

চড়কের আর বেশী দেরি নাই। বাড়ী বাড়ী গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্ত অন্ত গৃহস্থ বাড়ী হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চাল ছাড়া—এজন্ত তাহাদের বাড়ীতে এ দল কোনো বারই আসে না। দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্ব্বরাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্তান্ত জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণী, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়ীতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মত টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে ? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসবে—ছড়া বল্‌তে বল্‌তে আস্‌বে—ওর সব মন্তর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুন্‌বি বোন্‌বো ?

স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ
নাম্‌লো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি,
শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্ঠবিহারের পুতুল হয়েচে নীলুদা ?···হারু কুমোরের বাড়ী দেখে এলাম—দেখিস্‌নি রাণু ?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুণ্ড রাণুদি ?

—নয় তো কি ?···অনেক রাত্রে যদি আসিস্ তো দেখ্‌তে পাবি। চল্ ভাই আমরা বাড়ী যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রাণুদি ? কি আজ হবে রাতে ?···

রাণী বলিল—সে সব কথা বলতে নেই—তুই আয় বাড়ী। অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের

দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুত পদে চলিতে লাগিল আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েচে ঠাকুরমা ?

বুড়ী বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা ?…তারই গন্ধ আর কি—

অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা !

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওঁদের নাম করতে নেই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কি করে বাড়ী যাবো ঠাকুমা !…

বুড়ী বকিয়া উঠিল।—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে ?… এসো আমার সঙ্গে। নীল পূজার থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক্—

বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়িতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত কৌতূহল ও খুশির যে কি প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস ! বিছানায় ছট্‌ফট্ এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে ! যাত্রা হবে ! যাত্রা হবে !

মায়ের বারণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে, অপুর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু'বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মত একটা অভূতপূর্ব্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব ? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চলকাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে !…

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ী তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ী এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খানা ! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুশির সুরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের

পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি ? সাজের গাড়ীগুলার পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ-হয় রাজা সাজে, না অপুদা ?

আকাশ-বাতাসের রং একেবারে বদলাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা ! এ রকম দল !—

হরিহর শিষ্যবাড়ী বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা ? অপু আশ্চর্য্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই ! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারী তলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্ছে আর আমি এখন বুঝি ব'সে ব'সে পড়বো ? এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয় ?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন ব'সে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হ'লে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে ? তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখ ছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যত দিন তার পড়ে কত ?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে। সর্ব্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে ? বছরকারের দিনটা—তোমার ন মাস বাড়ীতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তক্কালংকার ঠাকুর হয়ে উঠ্‌বে কিনা ?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারী তলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশী রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে, খোকা চট্ করে শিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐ ভূত বাপ্‌রে !...অপু সব অদ্ভুত ধরণের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে—বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চ'লে যাবো...তাহার বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন, খোকা—আচ্ছা চট্ ক'রে লিখে আনো দিকি—আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জ্জন ছায়া-ভরা বৈকালে

বাঁশবন ঘেরা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এস পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, এ হয় না! এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে!…কোন উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায়, নিরীহ, দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্য্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে। বাবার জন্ত অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল না আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? চিক্ দিয়ে ঘিরে দিয়েচে সেইখানে বসবে? মা বলে—এখন থাক্; আমি, ওই ওদের বাড়ির মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারী তলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন্ অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসিহাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু পয়সার মুড়কী কিনে খাস্, নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস্। ইহার দিনসাতেক পূর্ব্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাবো—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জায় হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে,—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে, দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-খুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা! সতু কিন্‌লে, নীধন কিন্‌লে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি? দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মত ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারী মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে দুগ্‌গা একটা কাজ কর তো! রাণুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব!—

মায়ের কথায় সে একছুটে রাণুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটা ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজ্‌রার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন্ আলাপ করে। ভাল বেহালাদার, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভাল জিনিস শোনে না—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে…মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়ীতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই! বাবা কেন এখনো…? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্ত্তনের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!…

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছ তো?…তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি এসেচে?…চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাস-গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী!…ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাঁহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জ্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণপাখী রে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!…যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়! রব ওঠে—ঝাড় সামলে—ঝাড় সামলে!…কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরৎ-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে···বাড়ী যাবে খোকা?···ঘুম! সর্বনাশ!···না সে বাড়ী যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি বাড়ী গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে একপয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া ছাখে, অবাক। সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া খাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য!···রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইএ হাত দিয়া বলিল—একপয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা?···রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিষভতার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবানখানা যে তুজনে মাখ্‌লে আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুর সমবয়সী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে—পান খাবে?···অজয় একটু অবাক্ হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এস না। তুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়। ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে। তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্যে দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই?··· আমাকে একজনের বাড়ী খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ীতে খায় কে?···

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়ীতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্চে—তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়ীতে আগে খেতে, সেখানে খাবে—

খানিকক্ষণ তু'জনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগ্‌চে তোমার?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ী আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার একটা হইতেছে। বাড়ীতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুন্‌লি?···অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ী খেতে আস্‌বে—

তাহার মা বলে—তুজনে খাবে?—তুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে, তা না, একজন তো চ'লে যাবে, শুধু অজয় থাবে—

দুর্গা বল্লে—কেমন যাত্রা রে অপু ?···এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যা ম'রে গেল ? অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সঙ্গীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সূঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরায় ঐকতান বাজ্‌না তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ লীলাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারাণী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো! কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ঐ রকম গায়ের রং, অমনি বড় বড় চোখ, অমন সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন্ সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গীতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া নির্জ্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুর বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্ব্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশী কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বল না—সেই "কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণ-সাথীরে"—

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল—সর্ব্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্ব্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজ্‌বো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা করো না যেন—যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ীর মত, বুঝ্‌লে ?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই, তোমার তো গলা মিষ্টি—একটা গান গাও না ?···অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরী লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর

কাছে তার গান গাওয়া ? নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চল্‌তির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশ ঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান ধরে—শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত—দাশু রায়ের পাঁচালির গান বাবার মুখে শুনিয়া সে শিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক্ হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই ? তা তুমি গান গাও না কেন ?…আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—খেয়ার আশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে হে কোনো দলে ঢুক্‌লে পোনেরো টাকা ক'রে মাইনে সেধে দেবে বল্‌চি তোমায়—এর ওপর একটু যদি শেখো!

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে ? গান হবে ?…দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হোক, আজ একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শেখাও না ? তাহার পর দুইজনে গলা মিশাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বহিয়া ছপ ছপ করিযা নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজচো ভাই ? অপু বলিল—ও ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে—তাহার পর বলিল—আচ্ছা ভাই তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন ?…যেও না কোথাও, থাক্‌বে ?…

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়! কোন্ বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান্ রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়।

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকী দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ী আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি "পরশুরামের দর্প-সংহার" হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই।

পথেঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বহিতে বহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ী ডাকাইয়া যাহার যে গান ভাল লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাইস করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল—এস না খোকা, দলে আসবে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্ব্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রার দলে কাজ করা মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্য্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল,—আচ্ছ' ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে? অজয় বলিল—এখন এই সখী ঠখী, কি বালকের পার্ট এই রকম, তারপর ভাল ক'রে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টিপাথরের-রং একটা ছোক্‌রাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখচো, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমার নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুরুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অন্ধকারে মন ছম্ ছম্ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম ব'লে এমনি থাবড়া একটা মেরেচে! নাচে ভালো বলে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বলবারও যো নেই—

দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ীর ছেলের মত যখন তখন আসিত যাইত, এই কয়দিনে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্ব্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মত যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশী খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় দ্যাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, আহা বলিবার কেহ নাই; গৃহ-সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিতভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্ব্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড়—

সর্ব্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বল্‌লে এই খুব হোল, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ীর দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্ত্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্ব্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্ত্তে। অপুর আমার যদি ঐরকম হোত—মাগো!…

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিত তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্ব্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভাল চাকুরি দিবে (কাহারা চাকুরি দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্র-বক্ষের মত অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্দ্ধরাত্রির মাথায় কোনো জরির পোষাক-পরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ-পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা একটা আশার কথা এমন ভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয় কৈ?…

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, এই মাধুর্য্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক্ না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক্ তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ী হইতে গিয়াছে প্রায় দুই তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্র অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশী, খায় দায় অসুখ হয়, দুদিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্ব্বজয়া মেয়ের বিবাহের জন্য স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়। স্বামীকে দিয়া দুই তিন খানা পত্র নীরেন্দ্রের পিতা রাজ্যেশ্বরবাবুর নিকট লিখিয়াছে। সেদিকের আশাও সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে, তুমি কি খেপ্‌লে নাকি? ওসকল বড় লোকের কাণ্ড, রাজ্যেশ্বর কাকা কি আর আমাদের পুঁছবেন? তবুও সর্ব্বজয়া ছাড়ে না, বলে, লেখো না আর একখানা, লিখেই ছাখো না —নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েছেন। দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবার সে স্বামীকে পত্র লিখিবার তাগাদা দিতে সুরু করে।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকনো পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু' তিনখানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালী, গোলা ভরা ধান। মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখী ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটির ভাঁড়ে দোয়া একপাত্র তাজা সফেন কালো গাই-এর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধুলা লয়। গরীব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

...শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্ব্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এত-কাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলেবেলাকার দিনে জামতলায় সজনে-তলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলপনা আঁকার মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আল্‌তা-পরা পায়ের দাগ আঁকা আঙিনায় শ্বশুর-বাড়ীর ঘর-সংসার পাতাইবে। এরকম ভাঙা পুরানো কোঠা বাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হোল কি দুগ্‌গা? আজ কি ব'লে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যে বেলাও তো জ্বর এসেচে? দুর্গা বলে, তা হোক্ মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো?...তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—। তাহার মা বলে—যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজ কাল ভাল যদি থাকিস্ তো পরশু বরং দেবো—

অনেক কাকুতি মিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভাল আছি, আজ আর জ্বর আস্‌বে না আমার—ওবেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে

ইহা জর আসার পূর্ব্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এম্‌নি তো কত হাই ওঠে, জর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হু-হু করে, ভাবে—জর জর ভেবে এরকম হচ্চে, সত্যি সত্যি জর হয় নি—

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস্ দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজ ঠাকুরুণদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট্ করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হঠিয়া বাঁ পা খানা যেখানে রাখিল, সেখানে বাঁ পায়েও পট্ করিয়া আর একটা!...সকাল বেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সত্ তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেল-কাঁটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য্য ব্যাপার!...

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙাল মুসলমান একটা বড় রং-চং-করা কাচ-বসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ায় জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া কি সব দেখিতেছিল।

বুড়ো মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো! এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ! সে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না!...কি সে সব!

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকী?...দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নেই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকী, দেখে যাও—পয়সা লাগ্‌বে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল, নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতূহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল—এসো এসো, দোষ কি?...এসো, ভাখো—

দুর্গা উজ্জ্বলমুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া

মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়ে তাকাও দিকি খুকী ?

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায় ? কত সাহেব, মেম, ঘর বাড়ী, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না। কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল !

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকাল বেলা সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেছে—তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠ্‌লো ? এবার বাড়ী এলে সব কথা ব'লে দেবো, দেখো এখন তুমি—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলা খুব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি চক্ চক্ করে—অপু মহাখুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কী চকচক্ করছে দেখো একবার !···পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুখাইতে দিয়া কতটা আজ জল্‌জল্ করে দেখিবার জন্ত কৌতুহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা যদি আর একটু দি ?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল জ্যালা জ্যালা খয়েম রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি ?···আমি বুঝি এমনি এমনি—

—না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন ? এইসব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ যোগানো রয়েচে যে দোকানে ! যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্টি হইবার অল্প পরেই বিশেষ

কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় যাঁহারা বলেন যে, গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া মূলতঃ কোনো অংশই পৃথক্ নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিতদীপশয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মত দৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের ভ্রমণ বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি ?...সে বিস্মৃত শুভ-যামিনীর বন্দনা মানুষে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাই-এর ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে ?...

দপ্তরে একখানা বই আছে,—বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে এখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানিতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়! হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চ্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া এক মনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়।...'বীজগণিত' কি জিনিস ? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মত। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি ভয়ঙ্করী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐ রকম নির্জ্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে "ভূচিত্র" (জিনিসটা কি ?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ঐ রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস ? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত', কোথায়ই বা লাটিন ব্যাকরণ ?—এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্য্যা, আর তৃতীয় নামতা!

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই ?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠির ভুয়ো গল্প হইতে সুরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাথায় পাঁচ মণ ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্ত্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি—আরব্য উপন্যাসের

গল্পের মত নানা আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এরকম আজগুবি গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ী যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শীঘ্রই গল্পের ধারা আসিয়া জ্যোতিষে পৌছিল। দীনু চৌধুরী বলিতেছিলেন—ভৃগু—সংহিতার মত অমন বই তো আর নেই! তুমি যাও, শুধু জন্মরাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন্ কুলে জন্ম, ভূত ভবিষ্যৎ সব ব'লে দেবে—তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশিচক্রের যত রকম হয়ে হয়—তা সব দেওয়া আছে কি না? মায় তোমার পূর্ব্বজন্ম পর্য্যন্ত—

সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না ওঠা যাক্, এর পর যাওয়া যাবে না - দেখচো না—দেখচো না কাণ্ডখানা? একটা বড় ঝট্‌কা টট্‌কা না হোলে বাঁচি, গতিক বড় খারাপ. চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার অমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোয়া ধোয়া।

হরিহর মোটে পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্ব্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস ব'লে দেখতে পাস্‌নে, ডাক বাক্সটার কাছে ব'সে থাক্‌বি—পিওন যেমন আস্‌বে আর অম্‌নি জিগ্যেস্ করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি ব'সে থাকি নে? কালও তো এলো পুঁটিদের চিঠি আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগ্যেস্ করে এস দিকি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি ক'রে এল? আমি থাকিনে বৈ কি?

বর্ষা রীতিমত নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় রোজ রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্ম্মকারের ঘরে চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট্ করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া ভাখে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কিরকম নলপাচ্চে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাক্‌বে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া ভাখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড় করিয়াছে।

অপু বলে—কোত্থেকে আন্‌লে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত—! উ-উঃ! তোমার তো ব'সে ব'সে বড় সুবিধে!…ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে—এই এতটা একহাঁটু জল! যাও দিকি?…

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্ব্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা রেকাবী বাহির করিয়া বলে, এই ভাখো জিনিসখানা, খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে—এ সে জিনিস নয়, এ আমার

বিয়ের দান—এখন এ জিনিস আর মেলে না—

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবী-খানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে—সর্ব্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পুবে হাওয়া, খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিন রাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু উড়িয়া পুব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল-আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্যসৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক্-ওদিক্ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল!…নদী-নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গরু-বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ীর ছাঁচতলায় অঘোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে! চার পাঁচ দিন সমান ভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ।—অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে রে?…অপু বলে, তোর জ্বর সারুলে কাল দেখে আসিস্।…তেঁতুল তলার পথে হাঁটু জল! পরে জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে?…

ঘরে একটা দানা নেই—দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে, —তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি—আমি ছুটি ভাত খাবো—হঁ-উ—

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মাণিক আমার—ও রকম কি করে!…অনেক ক'রে চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন ক'রে, দেখচিস্ নে কি রকম সেঁওটা করেচে?—উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই ভাখ্ একটা কইমাছ বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্চে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কিনা?…তাই সব উঠে আসচে—

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে—অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা? হাঁ মা, কইমাছ

বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে?...অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল্ অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো এখন। পরে সে অবাক্ হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ! কি ক'রে এল? বাঃ তো!—মা কি আর ভাল ক'রে খুঁজেচে? খুঁজলে আরও সেখানে আছে—দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাঁটে—কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে—

চারিদিকের বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার। দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্বজয়া ভাবে—আজ যদি এখ্খুনি একখানা পত্তর আসে নীরেন বাবাজির? ...কি জানি, তা হ'তে কি আর পারে না? নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েচেন—কি জানি কি হোল অদেষ্টে। নাঃ, সে সব কি আর আমার অদেষ্টে হবে? তুমিও যেমন! তা হোলে আর ভাবনা ছিল কি?

ওদিকে ভাই-বোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেই—শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?...

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে—দূর—হাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ?—কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্ব্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মত বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা-নয় পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেষ্ট যে ক'রে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নিনকি!...আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হোলে আর এ দুঃখ থাকবে না—ভগবান তাকে মানুষ কোরে তোলেন যেন।...

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দিপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এই রকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখুয্যেবাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

অপু বলে—কত বড় নৌকো মা?

—মস্ত—ওই যে খোট্টাদের চুণের নৌকো, সাজিমাটির নৌকো মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস্ তো—অত বড়—

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুছির বিনুনি কর্ত্তে জানো?

অনেক রাত্রে সর্ব্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়—অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা ওঠো—আমার গায়ে জল পড়ছে—

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে—ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায় হাত দিয়া জাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুর্গা—ও দুর্গা শুন্‌ছিস?…একটু ওঠ দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি—ও দুর্গা—শীগ্‌গির, একেবারে ভিজে গেল যে সব?…

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এই ঘন বর্ষা… তাহার মন ছম্‌ছম্‌ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে…কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হোল? কেন পত্তরও আসে না—টাকা মরুকগে থাক্। এরকম তো কোনোবার হয় না?…তাঁর শরীরটা ভাল আছে তো? মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভাল খবর এনে দাও মা—

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাটীর বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোট ডোবাটা জলে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন্—পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি?…

নিবারণের মা বলিল—আছে?—দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে ক'রে এখনি আস্‌বো এখন—নতুন আছে মা-ঠাকরুণ, না পুরোনো?…

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না—এখুনি দেখ্‌বি?…একটু পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয় নি—ধোয়া তোলা আছে—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্‌চিস্ নে?…

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা ঠাক্‌রোণ…খাবার ব'লে দুটোখানি রেখে দিইচি অম্‌নি—

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর না—তাই গিয়ে আমায় আধকাঠা খানেক আজ দিয়ে যাবি?…একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বিষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছিনে—টাকা নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি তা কেউ যদি রাজি হয়—বড় মুস্কিলে পড়িচি মা—

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আস্‌বো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা-ঠাক্‌রোণ?…বড্ড মোটা—

নিরম্ভাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোন্‌তা, মুখে বেশ লাগে।

সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট!

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশী করিয়া

আসে—ঘোর বর্ষণমুখর নির্জ্জন, জলে থৈ-থৈ, হু-হু পুবে হাওয়া বওয়া, মেঘে অন্ধকারে একাকার ভাদ্র-সন্ধ্যা! আবার সেইরকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মত মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে…বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না—দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ হু-হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কবাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশী রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশী বৃষ্টি নামিল। সর্ব্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস্ হুস্ জলের শব্দ; ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত গর্জ্জমান একটানা গোঁ গোঁ রবে ঝড়ের দমকা বাড়ীতে বাধিতেছে!…জীর্ণ কোঠাখানা এক একবারের দম্‌কায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে…ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়…গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায়!…মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেতি নেই—এদের কি করি? এই রাত্তিরে যাই বা কোথায়? মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেওয়ালটা বোধ হয় আগে পড়্‌বে—যেমন শব্দ হবে অম্‌নি পাল্‌চালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার ক'রে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্ব্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝটিকা আসিল! উপায়! একবার বড় একটা দম্‌কায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল…বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে আকাশে-বাতাসে গাছপালায় সব একাকার!…ঝড়বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না।

এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রূর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম ভৈরব বেগে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে—হু-উশ হু-উ-উ-ইশ্ হু উ উ উ ই শ…এই শব্দের প্রথমাংশের দিকে বিশ্বগ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বলসঞ্চয় করিতেছে—হু উ উ—এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুস্তরে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্ব্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে—ই-ই-শ্…কোঠা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে…আর থাকে না! ইহার মধ্যে যেন কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রমভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্ত, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্ত্তব্য-কার্য্য!…বিশ্বটাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে, যুগে যুগে এরকম কত হাস্যমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে ভারাবাজির মত

ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে যে মহাশক্তিমান্ ধ্বংসদূত—এ তার অত্যন্ত কার্য্য…এতে তার অধীরতা উগ্রতা সাজে না…

আতঙ্কে সর্ব্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল—আচ্ছা যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কি অন্য কোনো জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো! জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে…হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া স্যাতা হইয়া যাইতেছে…সে কি করে? আর কত রাত আছে? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু ওঠ্ তো? জল পড়চে—। অপু ঘুমচোখে জড়িত গলায় কি বলে বোঝা যায় না। আবার ডাকে—অপু? শুনচিস্ ও অপু? ওঠ দিকি! দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্গা। বড্ড জল পড়চে—একটু স'রে, পাশ ফের দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে!…তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার বুঝি পুরাণো কোঠাটা—? কে আছে কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকার রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোয়ালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়্কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—নতুন বৌ! …সর্ব্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন দি, একবার বট্ঠাকুরকে ডাকো দিকি?… একবার শীগ্গির আমাদের বাড়ীতে আস্তে বলো—দুগ্গা কেমন করচে।

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—দুগ্গা? কেন কি হয়েছে দুগ্গার?…

সর্ব্বজয়া বলিল—কদিন থেকে তো জ্বর চল্ছিল—হচ্ছে আবার যাচ্চে—ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্ধে থেকে জ্বর বড্ড বেশী—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শীগ্গির বট্ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ—দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি—চল আমিও যাচ্চি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল—বাবা কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা?… দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণী, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়ীতে আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—ভাঙা, গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়,

কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝাড়ের গাঁশ নুইয়া পথ আটকাইয়া রাখিয়াছে। ফণি বলিল—দেখেছেন বাবা কাণ্ডখানা? সেই নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা থেকে বিলিতি চট্‌কা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!…নীলমণি মুখুয্যের ছোট ছেলে একটা মরা চড়ুই পাখী বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে বাবা অপু?

অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বক্‌ছিল জ্যেঠা মশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা?…জ্বরটা একটু বেশী, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট ক'রে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আস্‌বে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল প'ড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েচে…তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠ্‌লেই হোত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এই রকম ঘরদোর সারানোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিরকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়? আহা, রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু জল গরম করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি?

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই, জ্বর বেশী হইয়াছে, মাথায় জলপটি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে সুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দুবেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুনছিস্, কেমন আছিস্, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্য্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে ?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রদ্দুর উঠেছে আজ দেখিচিস্ দিদি ? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রদ্দুর রয়েচে—

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন্ অপু—একটা কথা শোন্—

—কি রে দিদি ? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ী দেখাবি ?

— দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে ব'লে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী ক'রে—

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত স্বর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শীগ্গীর—অপুদের বাড়ীর দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্ব্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্গা চা দিকি—ওমা ভাল ক'রে চা দিকি—ও দুগ্গা—

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো সব সরো দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও ?

সর্ব্বজয়া ভাসুর-সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল, মেয়ে অমন করচে কেন ?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে !

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল—বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি

—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল ক'রে—ঠিক এরকম একটা case হ'য়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহর বাড়ীর চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় তাহার পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়ীতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ী হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হয় না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই—খোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। এক জনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় সমাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমন কি গভীর রাত্রিতে এক-একদিন এমন ধরণের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহা দয় ঠিক হরিমন্দির-দর্শন-প্রার্থিনী ভদ্রমহিলা বলিয়া মনে হয় না।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড় বড় উকীল ও ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভার সেক্রেটারীর কাছে গিয়া কি লাগাইল তাহারাই জানে—সেক্রেটারী বাবু নিজ বাড়ীতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জ্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত-মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই—সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া ভামাবিষয় গান করিয়াছিল—গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না—মাত্র দিনদশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্য্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই—এতদিন কি করিয়া তাহাদের চলিতেছে। অপু বাড়ী হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালবাসে—মাঝে মাঝে সে যে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে—বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের গোলাগোছা করা থাকে—কোন্ বই বাবা বাক্সর কোথায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না—উল্টাপাল্টা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ী ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্ত্তি।

তাহার বাড়ী হইতে আসিবার পূর্ব্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পত্ত পদ্ম-পুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে—অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—রোজ রোজ পড়ে—ফুচুনী পাড়ায় শিবুঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারী আমোদ—হরিহর বলে—বইখানা দাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে! অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই সর্ত্তে বাবাকে রাজী করাইয়া তবে সে বই ফেরৎ দেয়। আসিবার সময় বারবার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা তাল দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়ীতে সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা? সন্ধ্যার পর পূর্ব্বপরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় লইল। ভাল ঘুম হইল না—বিছানায় শুইয়া বাড়ীতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথের একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে একটা লাল ইঁটের লোহার ফটক-ওয়ালা বাড়ী। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল এই বাড়ীতে গিয়া দুঃখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মত সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্ব্বেল পাথরের ধাপে স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম্, দরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন—অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার?

হরিহর বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাঠ করি—তা ছাড়া ভাগবত কি গীতাপাঠও—

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভাল করিয়া কথা না শুনিয়াই তাঁহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন—না এখানে ওসব কিছু

এখন সুবিধে হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন।

হরিহর মরিয়া ভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন শহরে এসেচি, একেবারে কিছু হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িচি, কদিন ধ'রে কেবলই—

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার ভঙ্গীতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই নিন্, যান্, অন্য কিছু হবে টবে না, নিন। সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই হউক সেইটাই অন্য সুরে দিতে আসিলে হরিহর লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত না—এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও; কিন্তু সে বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে ও আপনি রাখুন, আমি এম্‌নি কারুর কাছে নিইনে—আমি শাস্ত্র পাঠ-টাট্ করি—তা ছাড়া কারুর কাছে—আচ্ছা থাক্—

একটু শুভযোগ বোধহয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগা-যোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ীর কর্ত্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ী যাইবার সময় বাড়ীর কর্ত্তা দশটাকা প্রণামী ও যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিলেন, গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সরস সবুজ লতাপাতায়, পথিকের চরণ-ভঙ্গীতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ীর বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই বাড়ীর কথা মনে হয়।

একজন শান্তিপুরের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্ব্বে কাপড়ের গাঁট ক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, চূর্ণীঘাটের খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে—সর্ব্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভাল কাপড়, ভাল দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহবাসীর টুকটাক দু একটা জিনিস সর্ব্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল—একটা কাঠের চাকী-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্ হন্ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ ছাখো কাণ্ডখানা, বাঁশ-ঝাঁড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর,

ভুবন কাকা কাটাবেনও না—মুস্কিল হয়েচে আচ্ছা—পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল—ওমা দুগ্‌গা—ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্ব্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল,—বাড়ীর সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ী নেই বুঝি?

সর্ব্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো—ঘরে এসো। স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্তদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়ীটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠালের চাকী-বেলুন এনিচি এবার—পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ-নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ—অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্ব্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েচে গো—এতদিন কোথায় ছিলে।

গাঙ্গুলী বাড়ীর পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদি বন্দোবস্ত, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুমোর আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ যোগায়, বারাসে-মধুখালির দ' হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

আসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মত রসুনচৌকী বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে—আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহ-অভ্যর্থনা—নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালিদলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া আসা পথিক-পাখী ঝাঁকের, শিশির-স্নিগ্ধ মৃণালফোটা হেমন্তসন্ধ্যার।

নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের অনির্ব্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে বাবা—

গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণ উৎসববেশে সজ্জিত হাসিমুখ ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অপু চাহিয়া দেখিল সতু ও তাহার ভাই কেমন কমলালেবু রংএর জামা গায়ে দিয়াছে—সবুজ শাড়ী পরিয়া ও দিব্য চুল বাঁধিয়া রাণুদিদিকে যা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ে সুনয়নী

খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল গুঁজিয়া আর পাঁচ ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। সুনয়নী বাদে বাকী মেয়েদের সে চেনে না, বোধহয় অন্য জায়গা হইতে উহাদের বাড়ী পূজার সময় আসিয়া থাকিবে—শহরের মেয়ে বোধহয়, যেমন সাজগোজ, তেমন দেখিতে! অপু একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চেঁচাইয়া বলিতেছে—বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা এখনও হোল না? বাঃ—তোমাদের যা কাজ কর্ম্ম, দেখো এখন এর পর মজাটা। তারপর ব্রাহ্মণ খেতে বস্‌বে কি বেলা পাঁচটায়?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতেই সর্ব্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোন ত্রুটী করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোন সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্ব্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুয্যের বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিকে আনিয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজী হন নাই। এখানে বর্ত্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভাল নয়, কিন্তু অতসী বেশী সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহারা লাহোরে কাটাইয়াছে, নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়েটে চাকরি করিতেন, সেখানেই ইহাদের জন্ম, সেখানেই লালিত-পালিত; কাজেই পশ্চিম-প্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা এখানে প্রথম আসিলে সর্ব্বজয়া বড়মানুষ জা'য়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশহাজার টাকার মালিক একথা জানিয়া জা'য়ের প্রতি সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বজয়া নির্ব্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাকরী করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সুরু হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি পরিবার হরিহরের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে, সর্ব্বজয়া আপনিই হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায়, ব্যবহারে, কাজে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে,

সর্ব্বজয়া কোনক্রমেই তাঁহাদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায়, পোষাক পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলে মেয়ে সর্ব্বদা ফিটফাট্ সাজিয়া আছে, কাপড় এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্ব্বদা আঁচড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সেই সব গৃহকর্ম্ম করে—মোটের উপর সব বিষয়েই সর্ব্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চালচলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়—পাছে, পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত, অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরীপের সময় নিজেদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুয্যেরা ইহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দুখানা ঘর ইহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুয্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, কারণ ভুবন মুখুয্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্ব্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ী রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সী, ইংরাজী ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়। সুরেশও এপাড়ার ছেলের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ায় গাঙ্গুলী বাড়ীর রামনাথ গাঙ্গুলীর ছেলে তাহার সহপাঠী। গাঙ্গুলীবাড়ী রামনবমী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে সেও মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সুরেশ অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাটায়, গাঁয়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ীর পাশে পড়িয়া থাকিত সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা। সে হিসাবে ইহাদিগের প্রতি অপুর একটা বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সী সুরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটিতে বাড়ী আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তা ছাড়া সুরেশের চালচলন ও কথাবার্ত্তার ধরণ এমনি যে, সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু। সমবয়সী হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁষে না।

অপু এখনও পর্য্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলীদের পুকুরে

বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গীতে এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। অপুকে বলিল—বলতো ইণ্ডিয়ার বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল্ ফ্র্যাক্‌শান কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটাতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এই সব। সে ঐ সব বই পড়িয়াছে,—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য, অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিয়া দিবার মত সঙ্গতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ী থাকে নিজে কাছে বসিয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে বঙ্গবাসীর গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো 'বঙ্গবাসী' তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধূলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে —হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন্ করে।

অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—জিউকা ও রাফেল, মার্টিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা যাদুকরের গল্প, আরও কত কথা। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির ফোর্ড ফার্স্ট বুকের যোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্ব্বজয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখনো স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহাদের যে সব শিষ্য-বাড়ী আছে, ছেলে আর কিছুদিন

পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্ব্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রাণীর মা, গোকুলের বৌ, গাঙ্গুলী বাড়ীর বড়বধূ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্য্যের অবর্ত্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্ত্তে নিষ্পাপ, সরল, সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালবাসে। ঘাটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্ব্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে, এবং এইটাই বর্ত্তমানে তাহার সব চেয়ে উচ্চ আশা। সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলেই শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠায় পায়।

একদিন একথা ভুবন মুখুয্যের বাড়ীতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বজয়া সকলের মন যোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ী আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সামনের ফাল্গুনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পূজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তা'হলে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিষ্যবাড়ী আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় গাঙ্গুলী-বাড়ীর পূজোটা বাঁধা হয়ে যায় তাহ'লেই—

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাঁহার ছেলে সুরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া—তাঁহার জ্যেঠতুত ভাই পাটনার বড় উকীল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতী করিবে। সুরেশের সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসারওয়ালা উকীল। এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে সুরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান,—কিন্তু সুনীলের মা পরের বাড়ী ছেলে রাখিতে যাইবেন কেন ইত্যাদি সংবাদ নির্ব্বোধ সর্ব্বজয়ার মত হাউ হাউ না বকিয়াও, ইতিপূর্ব্বে মাঝে-মিশালে কথা-বার্ত্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সর্ব্বজয়া ছেলেকে বলিল—শোন একটা কথা—পরে চুপি চুপি বলিল—তোর জ্যেঠীমার কাছে গিয়ে বলিস্ না যে, জ্যেঠীমা আমার জুতো নেই, আমায় এক জোড়া জুতো দাও না কিনে?

অপু বলিল, কেন মা?

—বলিস্ না, বড়লোক ওরা, চাইলে হয়তো ভালো এক জোড়া জুতো দেবে এখন—দেখিস্ নি যেমন ঐ সুরেশের পায়ে আছে? তোর পায়ে ওই রকম লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল—আমার বড় লজ্জা করে, আমি বল্‌তে পারবো না—কি হয়তো ভাববে—আমি···

সর্ব্বজয়া বলিল—তা এতে আবার লজ্জা কি!···আপনার জন—বলিস না—তাতে কি?

—হুঁ···উ—আমি বল্‌তে পারবো না মা। আমি কথা বল্‌তে পারিনে জ্যেঠীমার সামনে···

সর্ব্বজয়া রাগ করিয়া বলিল—তা পারবে কেন? তোমার যত বিদ্যি সব ঘরের কোণে—খালি পায়ে পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, আজ দু'বছর পায়ে নেই জুতো সে ভালো, বড় লোক, চাইলে হয় তো দিয়ে দিত কিনে—তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্যি বেরুবে না—মুখচোরার রাজা—

পূর্ণিমার দিন রাণীদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রাণী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ী তো আগে আগে কত আস্‌তিস্, আজকাল আসিস্ নে কেন রে?

—কেন আসবো না রাণুদি,—আসি তো?

রাণী অভিমানের সুরে বলিল, হ্যাঁ আসিস্! ছাই আসিস্! আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস্ আমার, আমাদের কথা?

—না বৈ কি। বা রে—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো দিকি?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার যোগাইল না। রাণী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল,—থালা সুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়ীমার কাছ থেকে নিয়ে আস্‌বো—

রাণীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা পরম নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রাণুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রাণুদির মত সুন্দরী এ পর্য্যন্ত অন্য কোনো মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্ব্বদা বেশ ফিটফাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রাণুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রাণুদির মত মন কোনো মেয়ের নয়। দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালবাসে তো সে রাণুদি। রাণুদিও যে তাহার দিকে টানে, তাহা কি আর অপু জানে না?

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—রাণুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না! একখানা দেবে পড়তে? প'ড়েই দিয়ে যাবো।

রাণী বলিল—কোন্ বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে বলিল—আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস্। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে,—জ্যেঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুর বেলা চৌকী দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভাল লাগে না, তুই যদি যাস্ আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রাণী প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—বেশ তো? ও ছেলেমানুষ সেই বনের মধ্যে ব'সে মাছ চৌকী দেবে বৈ কি? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে? যাও তোমার বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজী হইল। রাণীর বাবা ভুবন মুখুয্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার

অনেক বেশী অথচ এই বইগুলার উপর তাহার বড় লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, তাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সঙ্কটময় মুহূর্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—রেখে দে অপু, এ সব ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারী হইতে বাছিয়া এক একখানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলা সেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে—প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুম-কুমারী, সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক, দস্যু-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃতে গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকথা…সে কত নাম করিবে। এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া উঠে, রগ টিপ্‌টিপ করে, পুকুরধারের নির্জ্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোন্ দিক দিয়া বেলা গেল।

কি গল্প! সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে যাইতেছেন, পথে নবাবের লোকে নৌকা লুটিয়া তাহাদের বন্দী করিল। নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া গেল প্রাণদণ্ড, সরোজিনীকে একটা অন্ধকার ঘরে চাবিতালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুন্দরি, আমার হুকুমে সরোজ মরিয়াছে, আর কেন…ইত্যাদি। সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—রে পিশাচ, রাজপুত রমণীকে তুই এখনও চিনিস্ নাই, এ দেহে প্রাণ থাকিতে…ইত্যাদি। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙিয়া গেল। নবাব চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন—একজন জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী, সঙ্গে যমদূতের মত বলিষ্ঠ চারি-পাঁচজন লোক। সন্ন্যাসী রোষকষায়িত-নয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নরাধম, রক্ষক হইয়া ভক্ষক? পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু—যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কমণ্ডলুর জলে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে, বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে।… গ্রন্থকারের লিপিকৌশল সুন্দর,—সরোজের এই বিস্ময়জনক পুনরুজ্জীবন আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া বলিতেছেন—এইবার চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদণ্ড হইবার পর কি উপায়ে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ সম্ভব হইল…ইত্যাদি।

এক-একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখ ঝাপসা হইয়া আসে,—গলায় কি যেন আটকাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দুই-এক মিনিট কি ভাবে,—আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, পরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্ত্তী

অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কী পাখীর ডাক শুরু হয়, উঠি-উঠি করিয়াও বইএর পাতার এক ইঞ্চি ওপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে—যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এই রকম বই তো সে কখনো পড়ে নাই? কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প?

বাড়ী আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পয়ের মাছ চৌকি দিস্ -গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে ব'সে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে।

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। আজকাল সে দুইখানা বই পাইয়াছে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'···উইঢিবি, বৈঁচেবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ায় দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া চলে—জেলেখা নদীর উপর বসিয়া আহত নরেনের শুশ্রূষা করিতেছে, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মনসবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেছেন—শিবাজী পাঁচ-হাজারী? একবার পুনায় যাও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচ হাজারী মনসবদার আছে গণিয়া আসিবে!···

রাজবারার মরুপর্ব্বতে, দিল্লীআগ্রার রঙ্‌মহালে শিশ্‌মহালে, ওড়্‌না-পেশোয়াজ-পরা সুন্দরীদলের সঙ্গে তাহার সারাদিনমান কাটে। এ কোন্ জগৎ—যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার-খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘ বর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া উবর উপত্যকা ও ভুট্টাক্ষেত্র পার হইয়া ছোটা?···

বীরের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, মানুষের যাহা সাধ্য—প্রতাপসিং তাহা করিয়াছিলেন। হলদিঘাটের পার্ব্বত্য বর্ত্মের প্রতি পাষাণ-কলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের রণক্ষেত্রের দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের হৃদয়-রক্তে তাহার কাহিনী অক্ষয় মহিমায় লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন যোদ্ধৃগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া পৌত্রপৌত্রিগণের নিকট হলদিঘাটের অদ্ভুত বীরত্বের কথা বলিত!···

অলক্তহস্তনিক্ষিপ্ত একটি বর্শা আসিল।···অপু এই গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজা মাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে—তবুও সে জানে রাজপুতনার ভীল-প্রদেশের বা আরাবল্লী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান, নাহারা মগ্‌রোর অপূর্ব্ব বন্য সৌন্দর্য্য সে ভাল করিয়াই চেনে।···পর্ব্বত হইতে অবতরণশীল "রূপানি তেজসিংহের মূর্ত্তি কি সুন্দর মনে হয়!···

"সেই চঞ্চল প্রদেশে অনেক দিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জ্জন কন্দরে ও উন্নতশিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যূষে নির্জ্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও চঞ্চল-নয়ন দেখিতে পাইত; লোকে

বলিত কোন বিশ্রামশূন্যা উদ্বিগ্ন বনদেবী হইবে।"...সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্চ্ছনা যেন অপুর কানে বাঁশবাগানের পিছন হইতে ভাসিয়া আসে!...

কমলমীর, দুর্গগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সুন্দরী নূরজাহান, পুষ্পকুমারী, বন্য ভীল-প্রদেশ, বীর বালক চন্দনসিংহ—দূর সুদূর কল্পনা।—তবু কত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়। রাজবারার মরুভূমি আর নীল আরাবল্লীর উন্নত পর্ব্বতের শিখরে শিখরে চেনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, দেবী মিবারলক্ষ্মীর অলক্ত-রক্ত—পদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে বুনাস ও বরী নদীর তটভূমির শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপলরাশির উপরে, বাজ্‌রা ও জওয়ার-ক্ষেতে ও মৌউল বনে।...

চিতোর রক্ষা হইল না! রাণা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বহারা পিতা প্রতাপসিংহ যিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বনে পর্ব্বতে ভীলের পাল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যথাক্ষুব্ধচিত্তে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এ সব?...

তপ্ত চোখের জলে পুকুর, উইঢিবি, বৈচিবন, বাঁশবাগান—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—ছাখো তো খোকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ীর নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু'টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোন মতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে, 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্ব্বে সে তীর্থের কাকের মত অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ। খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোন বন্ধকী মাকড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশী হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—ছাখো বাবা, একজন 'বিলাত যাত্রী'র চিঠি বেরিয়েছে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেছে—না বাবা?

তবুও তার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে, গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায়

যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।...

একদিন রাণী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখচিস্ রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায়? তুমি কি ক'রে—

—আমি তোদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়ীমার সঙ্গে কতক্ষণ ব'সে কথা বোল্লাম। কেন, খুড়ীমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বইএর দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস্—আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিংহ না কি একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কি গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রাণী একখানা ছোট বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস্—একটা বেশ ভাল দেখে। দিবি তো? অতসী বলছিল তুই ভাল লিখতে পারিস নাকি। লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো।...

অপু রাত্রে বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ।... তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু'পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধবো কি দিয়ে? এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে ব'সে পড়।...অপু ঝগড়া করে।

মা বকে—এঃ, ছেলের রাত্তির হোলে যত লেখা-পড়ার চাড়্—সারাদিন চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। সকালে করিস্ কি? যা, তেল দেবো না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্ব্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হোলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ী উঠ্‌বে। আসচে বছর পৈতেটা দিয়ে নি, তারপর গাঙ্গুলী-বাড়ীর পুজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

... চার-পাঁচদিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিলে রাণী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস?

অপু হাসি-হাসি মুখে বলিল—ভাখো না খুলে?

রাণী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ, অনেক লিখেচিস যে রে। দাঁড়া, অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু—ইস্! এ সব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বই কি? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস্ ক'রো দিকি অতসীদি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে ব'সে ব'সে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রাণী বলিল—না ভাই, ও লিখেচে আমি জানি। ও ওই রকম লেখে। খালা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে।...পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্‌নি

তোর ? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরণে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই ; অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলে রাণুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই লেখানা ফেরৎ দিয়াছে।···

তাহার বাবা বাড়ীতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহাদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামে এক আগুশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল। সুনীলও গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর হইতেও হাঁটিয়া আসিয়াছে। এক-এক ব্যক্তি পাঁচ-ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে, সকলকে সুবিধামত স্থানে বসাইতে গিয়া একটা দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম। প্রত্যেকের পাতে চারিখানি করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুন-ভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই, —সকলেই পার্শ্ববর্ত্তী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে।···ছোট ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্‌চায্ চোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—এগুলো রেখে দাও না। আবার এখুনি দেবে, খেও এখন।

তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ শোরগোল হইতে লাগিল—"লুচির ধামাটা এ সারিতে," "কুমড়োটা যে আমার পাতে একেবারেই," "ওহে, গরম গরম দেখে," "মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি স্রেফ্‌ কাঁচা ময়দা"···ইত্যাদি। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তুমুল বিবাদ। কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তা হোলে সেখানে ভদ্দর লোকেদের নেমন্তন্ন করতে নেই। স'-পাঁচ গণ্ডা লুচি এ একেবারে ধরা-বাঁধা ছাঁদার রেট্—বল্লাল সেনের আমল থেকে বাঁধা রয়েচে। চাইনে তোমার ছাঁদা, কন্দপ্পো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্মকর্ত্তা হাতে-পায়ে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটুলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওমা, এ যে কত এনেচিস—দেখি খোল্ তো ? লুচি, পানতুয়া, গজা—কত রে ! ঢেকে রেখে দি, সকাল বেলা খেও এখন।

অপু বলিল—তোমারও কিন্তু মা খেতে হবে—তোমার জন্যে আমি চেয়ে দু'বার ক'রে পানতুয়া নিইচি।

সর্ব্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই বলি নাকি আমার মা খাবে দাও ?—তুই তো একটা হাবলা ছেলে।

অপু ঘাড় ও হাত নাড়িয়া বলিল—হাঁা, তাই বুঝি আমি বলি ! এমন ক'রে বল্লাম, তারা ভাবলে আমি খাবো।

সর্ব্বজয়া খুশির সহিত পুঁটুলিটা তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে অপু সুনীলদের বাড়ী গেল। উহাদের ঘরের রোয়াকে পা দিয়াই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন ব'য়ে আনলি বাড়ীতে? কে আনতে বলেচে তোকে? সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে।

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ও ফলারে বামুনের ছেলে। ও এর পর ঠাকুর-পুজো ক'রে আর ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে,—ওই ওদের ধারা। ওর মা-টাও অমনি হ্যাংলা। ঐজন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাঁয়ে আসতে চাইনি। কুসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষে হচ্ছে। যা, ও সব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা, না হয় ফেলে দিগে যা। নেমন্তন্ন করেচে নেমন্তন্ন খেলি—ছোটলোকের মত ও সব বেঁধে আনবার দরকার কি।

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলদের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল—যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশি হইল, জ্যেঠাইমা তাহা দেখিয়াই এত রাগিল কেন? খাবারগুলো কি ঢেলামাটি যে, সেগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে? তাহার মা হ্যাংলা? সে ফলারে বামুনের ছেলে? বা রে, জ্যেঠিমা যেন অনেক পানতুয়া-গজা খাইয়াছে, তাহার মা তো ও সব কিছুই খাইতে পায় না। আর সে ই বা নিজে এ সব ক'দিন খাইয়াছে? সুনীলের কাছে যাহা অন্যায়, তাহার কাছে সেটা কেমন করিয়া অন্যায় হইতে পারে।

লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়। ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্যবাড়ী যাওয়া, মাছধরা। সেই ছোট্ট ছেলে পটু—জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়া যে সে-বার মার খাইয়াছিল—সে এ সব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে, মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ওপাড়া হইতে এপাড়ায় আসে শুধু অপুদার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলেব ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল, সেকথা সে এখনো ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশী। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইছামতীর ধারে কাঁচি কাটা খালের মুখে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটি গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটি তাহার ভারি ভাল লাগে, একবারে নির্জ্জন, দুধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম শিমুল গাছ, বেগুনী রংএর বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধব পুর গ্রামের বাঁশবন, পাখীর ডাকে বনের ছায়ায়, উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জ্জনতা।

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠীর-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে

চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ভাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে-ডালে অভ্র-আবীর ছড়াইয়া সূর্য্যদেব সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে, পুলক-ভরা চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে; মনে হয়—মাছ না পাওয়া গেলেও রোজ রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিম গাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাৎনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহার থাকে না, সে এদিকে-ওদিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসার খোঁজে ফিরিয়া আসিয়া হয়ত চোখে পড়ে ফাৎনা একটু একটু ঠুক্‌রাইতেছে। ছিপ তুলিয়া বলে—দূর। ঝোয়া মাছের ঝাঁক লেগেচে, এখানে কিছু হবে না।...পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শেওলা দামের পাশে গিয়া টোপ ফেলে। জলটার গভীর কালো রংএ মনে হয় বড় কই কাৎলা এখনি টোপ গেলে আর কি! ভ্রম ঘুচিতে বেশী দেরী হয় না, শরের ফাৎনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।...

এক একদিন সে এক-একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নীচের ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরাজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে। দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্বের কাহিনী খুব ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরণের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিষ্টোফার কলম্বস কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—এমনি সব গল্প। যে দু'টি ইংরাজ বালক-বালিকা সমুদ্রতীরের শৈলগাত্রে গাঙচিলের বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, যে সাহসিনী বালিকা প্রাস্‌কোভিয়া লপুলফ নির্ব্বাসিত পিতার নির্ব্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার করিবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে একা বাহির হইয়াছিল—তাঁহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে।

স্যার ফিলিপ সিডনীর ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—সুরেশদা, এই গল্পটা জানো তুমি? বড় ক'রে বলো না?

সুরেশ বলে—ও, জুটফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে—কি সুরেশদা? জুটকেন! কোথায় সে?

সুরেশ ঐটুকুর বেশী আর বলিতে পারে না…

মাসখানেক পরে একদিন।

মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড় সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ের মাঠের পারে সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে, কাশ-ঝোপে, কদম-শিমুল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্ত্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী—বৈকালের মিলাইয়া-যাওয়া শেষ-রোদ!

বঙ্গবাসীতে 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে পড়া সেই সুন্দর গল্পটি তাহার মনে পড়ে…

সে সুরেশদাদার ইংরাজী ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠ-তরাজ! জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন্ প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক দুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায়, আর মেষের দলকে ইতস্ততঃ ছা'ড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন দু'টি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জ্জনে দেশের দুর্দ্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল, কে তাহাকে বলিতেছে —তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড় কর, অস্ত্র ধর, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে! দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী,—দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নবতেজোদৃপ্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাঁহাকে ডাইনী অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটি ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব্বভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়!—কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু যে ছবিটি তাহার বার বার মনে আসে, তাহা শুধু নির্জ্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছ-বিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্দ্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত,—অপরদিকে এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী, নীলনয়না পল্লীবালিকা। ছবিটি তাহার প্রবর্দ্ধমান বালক-মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে। কতদূরের নীল সমুদ্রে ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে

আখের ক্ষেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু—বহু দূর—নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র।—শুধু নীল আর নীল। আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাব্‌লা ও সাঁইবাব্‌লার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছে,—যেন কোন্ দেবশিশু অলকার অলক্ত ফেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফুঁ দিয়া একটা বুদ্‌বুদ্ তুলিয়া খেলাচ্ছলে আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিল, এইমাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে!

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল খিল করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা, তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্ত্তে এইছিস্, তাই এলাম। মাছ হয় নি?… একটাও না? চল্ বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

কদমতলায় সায়েবের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে,—গোলপাতা-বোঝাই, ধান-বোঝাই, ঝিনুক-বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক-তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে, মাঝ নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে। অপু ডাঙায় বসিয়া দেখিতেছিল,—একজন কালোমত লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু'চারিখানা কুড়ানো ঝিনুক বালি-কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুশির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখছিস্ পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে? আয় গুণে দেখি এক-দুই ক'রে। পারিস্ তুই অতক্ষণ ডুবে থাক্‌তে?…

নদীর দূর্ব্বাঘাস-মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকায় খোঁটা পোঁতা—নোঙর ফেলা। ইহারা কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া, বড় বড় নোনা গাঙের জোয়ার-ভাঁটা-তুফান খাইয়া বেড়ায়,—অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে। তাহার কেবল নদীতে নদীতে, সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবধি ঐ ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পটু ও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা একপাটি কি দর?…তোমার এই ধানের নৌকো কোথাকার, ও মাঝি?…ঝালকাটির? সে কোন্ দিকে, এখেন থেকে কতদূর?…

পটু বলিল—অপু-দা, চল্ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল্।

দু'জনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট-ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা

দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠাণ্ডা আর্দ্র-গন্ধ উঠিতেছে, কলমী-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙ্‌শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পূব আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা না। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভাল গানের। সেইটে গাইবো, আর এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে —দূর, ধর্ সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান সুরু করে। পটু বাঁশের চটার বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুইএ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে, নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছে। নৌকা কম দূরে আসে নাই—লা-ভাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখচিস্? এখুনি ঝড় এলো ব'লে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোকগে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে—গান গাইতে লাগে ভালো, চল্ আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল; তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল, পাখাওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া, ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাব্‌লা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, শাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পলাইল। অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মত উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল!

পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা, সাম্‌নে আর নৌকো যাবে না। কিন্তু যদি উল্টে যায়? ভাগ্যিস্ সুনীলকে সঙ্গে ক'রে আনি নি!

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না।

সে নৌকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে সম্মুখের কাটিকাক্ষক নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্ত্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, খোভো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিঙকের তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায়। নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে। কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে, বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া, সমুদ্র-মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্রদ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব্ব দেশের নীল পাহাড় দূর চক্রবালে রাখিয়া, সূর্য্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে।—চলিয়াছে।—চলিয়াছে।

এই ইছামতীর জলের মতই কালো, গভীর, রুদ্র, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ, এই রকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যার গাছতলায় বসিয়া এডেন্ বন্দরে সেই বিলাত যাত্রী লোকটির মত সে রূপসী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চালতেপোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজে বর্ণিত জাহাজের পিছনের সেই উড্ডনশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন।...

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে, চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মন-মাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবু-ডুবু হইলে "আমার অপূর্ব্ব ভ্রমণ"-এ পঠিত নাবিকদের মত সেও জালি-বোটে করিয়া ডুবোপাহাড়ের গায়ে-লাগা গুগ্‌লি শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে। ওই যে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবনের মাথায় তুঁতে রংএর মেঘের পাহাড় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়াছিল—ওরই ওপারে সেই সব নীল-সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষারবর্ষী প্রান্তর, জেলেখা, সরযূ, গ্রেস্ ডার্লিং, জুট্‌ফেন, গাঙচিল-পাখীর-ডিম-আহরণরতা সেই সব সুশ্রী ইংরাজ বালক-বালিকা, সোনাকর যাদুকর বটগার, নির্জ্জন-প্রান্তরে চিন্তারতা লোয়েনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান—আরও কত কি আছে। তাহার টিনের বাক্সের বই কখানা, রাণু-দিদিদের বাড়ীর বইগুলি, সুরেশ-দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন 'বঙ্গবাসী' কাগজগুলা ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে, সেসব দেশে কোথায় কাহারা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেইখান হইতে তাহারও ডাক আসিবে একদিন,—সে-ও যাইবে।...

একথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে। আর দিনকতক পরে বাড়ী-বাড়ী ঠাকুর-পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্য্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভাল কাপড়, ভাল জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে

যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে ?

এ সব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়ত তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগে—তাহার আশাভরা জীবন-পথের দুর্বার মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত ; কিন্তু এসকল কথা তাহার মনেই ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে…এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র! সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙীন্ ভবিষ্যৎজীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে, নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়া ছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই,—দুঃখ এদেশে বারো-মাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।…

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ীতে সর্ব্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্য এ-পর্য্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্ব্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল—সে পূজা দিয়া আসিবে ও ঐ গ্রামে তাহার পিসিমা থাকেন, তাঁহার সহিত কখনও দেখাশোনা হয় নাই, অমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ, বকিস নে তুই, একলা যাবি বৈ কি ? এখান থেকে প্রায় চার-ক্রোশ পথ।

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক সুরু করিল—আমি বুঝি সবদিন এইরকম বাড়ীতে বসে থাক্‌বো ? যেতে পারবো না কোথাও বুঝি ? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই ?

—সব আছে, উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর—বড় সাহসী পুরুষ কিনা!

অবশেষে কিন্তু অপুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দূর্ব্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অল্পই দেরি আছে, গাছপালার ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে। অপুর খালি পায়ে বেলে মাটির তাত লাগিতেছিল—তাহাতে বেশ আরাম হয়। পথের ধারের বনে ঝোপে কত কি ফুল ফুটিয়াছে, শাঁই বাবলাগাছের নতুন ফোটা ফুলের শীষ্ সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, ছোট এক রকমের গাছে রাঙা রাঙা বনডুমুরের মত কি ফল অজস্র পাকিয়া টুক্‌টুক্ করিতেছে, মাটির মধ্য হইতে কেমন রোদ-পোড়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে। সে মাঝে মাঝে নীচু হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈঁচিফল তুলিয়া হাতে-সেলাই-করা রাঙা সাটিনের জামাটায় দু'পকেট ভর্ত্তি করিয়া লইতেছিল।

যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দূর্ব্বাঘাস, সূর্য্যের আলোমাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখী, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুল-ফলের থোলো, আলকুশী, বনকলমী, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারী মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে—খোকা তুমি শুধু পথে-পথে বেড়িয়ে বেড়াও—তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন-ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে।···মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনে কঞ্চির ডালে ডালে শব্‌-শব্ শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রং-বেরঙএর পাখীর গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে—গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখীর কাকলীতে তাহার বার্ত্তা রটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্ত্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন্ ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে-শূন্যে ফুলে ফলে কি পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহা সে ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গুমটের অবসানে সারা দিকচক্রবাল্ জুড়িয়া ঘননীল মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্ত-বেলায় সোনাডাঙার মাঠের উপরকার আকাশে কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশ-ফুলে ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদিনী রাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপ্‌রি-কাটা বাঁশবনের তলা,—অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব্ব বিশাল সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র

শুনাইয়া ছিল।—অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্য্যের পূজারী হইবার ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।...

নতিডাঙ্গার বাওড়ে কাহারা মাছ ধরিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। গ্রামের মধ্যে একটা কানা ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে—ও গান তো অপু জানে—কতবার গাহিয়াছে :—

'দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো হোল ভার।...'

বোষ্টম দাদু গানটা খুব ভাল গায়।

হরিশপুরের মধ্যে ঢুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরে পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা সুর করিয়া নামতা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশী নয়, তাহাদের গাঁয়ের প্রসন্ন গুরুমশায়ের চেয়ে অনেক কম।

আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এই তো সে বড় হইযাছে, আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথাও ছাড়িয়া দিত?...এখন কেবলই চলা, কেবলই সাম্‌নে আগাইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আস্‌চে মাসের এই দিনটিতে তাহারা কতদূর, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কাশী—সেখানে!

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল। পাড়ার মধ্যে পৌঁছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনোরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে, হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে, ছাখ্ ছাখ্ চেয়ে।...সে যে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল-নাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলেই জানে। তাহার পিসেমশায় কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটা কোন্‌দিকে একথাটা পর্য্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়ীকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। দু একবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধ্য কি? কতক্ষণ সে চৈত্রমাসের খররৌদ্রে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল—দরজার কাছে কাহাদের একটি অপরিচিত, প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলি-হাতে লজ্জাকুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলিল—তুমি কে খোকা? কোত্থেকে আস্‌চো?...অপু আনাড়ির মত আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এই আমার বাড়ী—নিশ্চিন্দিপুরে, আমার—নাম অ-পু।

তাহার মনে হইতেছিল না-আসিলেই ভাল হইত! হয়তো তাহার পিসিমা তাহার এরূপ

অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা হইতে আবার এক আপদ আসিয়া জুটিল !···তাহা ছাড়া,—কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ ? তার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা-বাবা কেমন আছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দিদিকে যদিও কখনও দেখে নাই তবুও দিদির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া, হাতমুখ ধোয়াইয়া শুকনা গামছা দিয়া মুছাইয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির শরবৎ করিয়া আনিল। পিসি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্পবয়স, রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসিও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। জ্ঞাতিসম্পর্কের ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসি বোধহয় ইতিপূর্ব্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ী হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে একটু গর্ব্বের সহিত বলিল—আমার ভাইপো, নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ী, খুড়তুতো ভায়ের ছেলে; সম্পর্কে খুবই আপন, তবে আসা যাওয়া নেই তাই !···পরে সে পুনরায় গর্ব্বের চোখে অপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা এই—ভাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা, এখন বোঝ কি ঘরের—কি বংশের মেয়ে আমি।···

সন্ধ্যার পর কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বাড়ী আসিল। পাকশিটে-মারা চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা, বয়স বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পিসিকে দেখিয়া তাহার যেমন লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেবেলায় সে যে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত, তেমনি যেন চেহারাটা। মনে হইল এ লোক যেন এখনই বলিতে পারে—বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখচি তো তুমি ?···

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরিয়া আসিল। চারিদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি—দুর্ব্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ী, আবার বনে-ঘেরা সুঁড়ি পথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ী। অনেক সময় লোকের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সী দু'চারজনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পিসির বাড়ীর দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। এরূপ সকালে মার কাছে সে চিঁড়া, মুড়ি, নাড়ু বা বাসি-ভাত খাইয়া থাকে। এখানে কি উহারা দিবে ? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় দুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উহারা ভাবিবে ছেলেটা ভারী পেটুক; খাবার খাইবার লোভে-লোভে এত সকালে বাড়ী ফিরিল। রোজ রোজ খাবার খাওয়া কি ভাল ?···এখন সে কি করে ? নাঃ, বাড়ী ফিরিবে না। আরও খানিক পথে-পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের

একটু আগে বাড়ী যাইবে। অপরিচিত জায়গায় এতক্ষণ পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে?

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়ীতেই আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ছয়-সাত বছরের মেয়ে একটা কাঁসার বাটি হাতে বাড়ী ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—লাউ রেঁধেচো জ্যেঠিমা, মোরে একটু দেবে?···অপুর পিসিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—কে রে, গুল্‌কী? না, ওবেলা রাঁধবো, এসে নিয়ে যাস।···গুল্‌কী বাটি নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, ছেলেদের চুলের মত খাটো। ময়লা কাপড় পরণে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুর দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া সে বাটি উঠাইয়া চলিয়া গেল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কাদের পিসিমা?

তাহার পিসি বলিল—কে, গুল্‌কী? ওদের বাড়ী এখানে না—ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখুয্যের বৌ—এই যে পাশের বাড়ী, ওর দূর সম্পর্কের জ্যেঠী—সেখানেই থাকে।

পরদিন পাড়ার একটা ছেলে আসিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল—সেই অনাথা মেয়ে গুল্‌কী পথের ধারে পা ছড়াইয়া একলাটি বসিয়া কি খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল গুটাইতে গেল—আঁচলে একরাশ আধপাকা বকুল ফল। অপু ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে তাহার আরও পরিচয় লইয়াছে, নিবারণ মুখুয্যের বৌ ভাল ব্যবহার করে না, লোক ভাল নয়। পিসিমা বলিতেছিল—জ্যেঠী তো নয় রণচণ্ডী, কত দিন খেতেও দেয় না, এর ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়। নিজের পুষ্যিই সাতগণ্ডা—তাদেরই জোটে না, তার আবার পর!···গুল্‌কীকে দেখিয়া অপুর মোটেই লজ্জা হয় না—ছোট্ট একটুকু মেয়েটা, আহা কেহ নাই! তাহার সঙ্গে ভাব করিতে অপুর বড় ইচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল—আঁচলে কি লুকুচ্চিস্ দেখি খুকী?···গুল্‌কী হঠাৎ আঁচল গুটাইয়া লইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া নীচু হইয়া দৌড় দিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া অপুর হাসি পাইল। ছুটিবার সময় গুল্‌কীর আঁচলের বকুলফল পড়িতে পড়িতে চলিয়াছিল, সেগুলি সে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—প'ড়ে গেল, সব প'ড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও খুকী, কিছু বোলবো না, ও খুকী।···গুল্‌কী ততক্ষণে উধাও হইয়াছে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়্‌কী-দরজার আড়াল হইতে গুল্‌কী একবার একটুখানি করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে গুল্‌কী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দাঁড়া, তোকে ধর্‌চি এক দৌড়ে—বলিয়া সে খিড়কী-দরজার দিকে ছুটিল। গুল্‌কী আর পিছন দিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুরপাড়ের দিকে ছুট দিল। কিন্তু অপুর সঙ্গে পারিবে কেন? নিরুপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই

অপু তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলা মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বড় ছুট দিচ্ছিলি যে? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি, তুই পারবি খুকী?...গুল্‌কীর প্রথমটা ভয় হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে! কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলায়, সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই রকম হাসিয়া ফেলিল।

অপুর বড দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা আভাস ছিল যাহাতে অপুর মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়—খেলা করিতে চায়, কিন্তু ছেলেমানুষ কথা কহিতে জানে না বলিয়া এইরকম উঁকিঝুঁকি মারিয়া—ফিক্ করিয়া হাসিয়া—দৌড়িয়া পলাইয়া—তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্য উপায় ইহার জানা নাই। এ যেন ঠিক তাহার দিদি। এই বয়সে দিদি যেন এই রকমই ছিল—এই রকম আঁচলে কুল-বেল-বৈঁচি বাঁধিয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কেহ বুঝিত না, কেহ দেখিত না, এই রকম পেটুক—এই রকম বুদ্ধিহীন ছোট মেয়ে।

অপু ভাবিল—এর সঙ্গে কেউ খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি। আহা, মা-বাপ হারা দুঃখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায়।—সে গুল্‌কীর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়াছিল, বলিল—খেলা করবি খুকী? চল্ ঐ পুকুরের পাড়ে। না, এক কাজ কর খুকী, আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে যাবি, ঐ কাঁঠাল গাছটা বুড়ী। আয়—

মুঠা ছাড়িয়া দিতেই গুল্‌কী আর না দাঁড়াইয়া আবার নীচু হইয়া দৌড় দিল। অপু চেঁচাইয়া বলিল—আচ্ছা যা, যা দেখি কদ্দূর যাবি—ঠিক তোকে ধরবো দেখিস্। আচ্ছা, ঐ গেলি তো এই ছাখ্—বলিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল—চু-উ-উ-উ-উ। গুল্‌কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ভারী ছুটতে শিখিচিস খুকী, না? তা-কি তুই আমার সঙ্গে পারিস? চল চোর-চৌকীদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁটাল পাতা চুরি করে পালাবি বুঝলি?...আর আমি হবো চৌকীদার, তোকে ধরবো।

গুল্‌কীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না—হয়তো সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে। মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—কাঁইবিচি নেবে? অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া ও এই সব কথা শিখিয়াছে—তাহাদের গ্রামে যেমন গোয়ালা কি সদ্‌গোপের ছেলেমেয়েরা কথা বলে তেমনি।

দুপুরবেলা তাহার পিসিমা ডাকিলে পিছনে পিছনে গুল্‌কী আসিল। অপুর খাওয়া হইয়া গেলে তাহার পিসি জিজ্ঞাসা করিল—ভাত খাবি গুল্‌কী? অপুর পাতে বোস্—মোচার ঘণ্ট আছে—ডাল দিচ্ছি, অপু ভাবিল—আহা, ও খাবে জান্‌লে দুখানা মাছ ওর জন্যে রেখে দিতাম। গুল্‌কী দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্লজ্জভাবে খাইতে বসিল। অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ডাল দিয়া সেগুলি মাখিল, পরে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে রাশীকৃত ঠেলিয়া রাখিল। তবুও উঠিবার নাম করে না। অপুর

পিসিমা হাসিয়া বলিল—আর খেতে হবে না গুল্‌কী—হাঁস ফাঁস্ কচ্চিস্—নে ওঠ্, কত ভাত নিয়ে ফেল্‌লি ছাখ্ তো? তোর কেবল দিষ্টি খিদে—পরে বলিল, জ্যেঠিমার কাণ্ড ছাখো—এতখানি বেলা হয়েচে—কাঁচা মেয়েটা—ভাত খেতে ডাকেও না?—হলোই বা পর—তা হলেও কচি তো?…

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল। আচার্য্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা। তাঁহার বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বৃদ্ধ বাপকে খুব সাহায্য করে। মেয়েটি বলিল· চার পয়সা দক্ষিণে কেন খোকা? এতে তো হবে না, বারের পুজোতে দু'আনা দক্ষিণে লাগ্‌বে—। অপু বলিল—আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই? মেয়েটি খানকতক কলা মূলা বাছিয়া একখানা পাতায় মুড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—ঠাকুরের প্রসাদ এতে রৈল, বেলপাতা আর সিঁদুরও দিলাম, তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের দিও। অপু ভাবিল—বেশ লোক এরা, আমার যদি পয়সা থাক্‌তো আরও দু'পয়সা দিতাম—

পিসিমার পল্লী ফিরিয়া সে বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া পিসিমার সঙ্গে পূজার গল্প করিতেছে, পাশের গুল্‌কীদের বাড়ীতে হঠাৎ গুল্‌কীর সরু গলার আকাশ-ফাটানো চীৎকার শোনা গেল—ওরে জ্যেঠী, অমন করে মেরো না—ওরে বাবারে—ও জ্যেঠী, মোর পিঠ কেটে রক্ত পড়্‌চে—মেরো না জ্যেঠী—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলায় চীৎকার শোনা গেল—হারামজাদী—বদমায়েস—চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েচো নেমন্তন্ন খেতে, এমনি তোমার নোলা? তোমার নোলায় যদি আজ হাতা পুড়িয়ে চেঁকা না দিই—লোকের বাড়ী খেয়ে খেয়ে বেড়াবে আর শতেকখোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পায় না, বলে কি না খেতে দেয় না—আপদ্ বালাই কোথাকার—বাড়ীতে তোমায় খেতে দেয় না?… তোমায় আজ—

অপুর পিসিমা বলিল—দেখচো ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বলচে? সত্যি কথা বল্লেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না—তা হলেই তুমি খারাপ—।

অপুর মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুণ কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালা-পাড়ার দিকে চলিল। আগের দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ী যাইবে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে।

অল্পদূরে গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুল্‌কীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অপু বলিল—বাড়ী চলে যাচ্ছি রে খুকী আজ—সারাদিন ছিলি কোথায়?

খেলতে এগিলে কিছু না—। পরে গুল্‌কী অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল—সত্যিয়ে, সত্যি বল্‌চি, এই ভাখ্‌ পুঁটলী, কার্ত্তিক গোয়ালার বাড়ী গিয়ে উঠবো—আয় না আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে দিবি ?

গুল্‌কী পিছনে পিছনে অনেকদূর চলিল। বামুনপাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালাপাড়া। গুল্‌কী মাঠের ধার পর্য্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই আঙা জামাটা ক'পয়সা ?

অপু হাসিমুখে বলিল—দু'টাকা—তুই নিবি ? গুল্‌কী ফিক্ করিয়া হাসিল। অর্থাৎ—তুমি যদি দাও, এখ্‌খনি···

হঠাৎ সামনের পথে চোখ ফিরাইতেই শুধু দেখিতে পাইল, মাঠের শেষে গাছপালার ফাঁকে আলো হইয়া উঠিয়াছে—অমনি কেমন করিয়া তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে! পরে গুল্‌কীকে বলিল—আর আসিস্‌ নে খুকী তুই চলে যা—অনেকদূরে এসে গিইচিস—তোর বাড়ীতে হয়তো আবার বকবে—চলে যা খুকী—আবার এলে দেখা হবে কেমন তো ? হয়তো আর আস্‌বো না, আমরা কাশী চলে যাবো বোশেখ মাসে, সেখানে বাস করবো—। গুল্‌কী আর একবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দ্দশী এম্‌নি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন-সম্পর্কিত একটা ছবি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথের দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, (বা চতুর্দ্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না) পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ, ঝাঁকড়া-চুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্য্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বলিলেন—বাপু আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বোল্‌বো—তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ

হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আস্‌বো, যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিজ্ঞেস্ করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্ব্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক্ হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল, কবে যাবি রে?

—সাম্‌নের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আস্‌বি নে আর কখনো?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস্ নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি করে?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণুদি, বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও কোরে দিলি নে, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট্ কাট্‌লাম, একদিনও মাছ ধরবি নে তাতে?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব্ব, অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ী মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ীর সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড় হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনীর ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল।—তখন সে ছোট ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ী ডাইনী নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরীব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক

হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া চালিল—এক হাঁড়ি শুক্‌না আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ী আম্‌সি আমচুর তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আম্‌সি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপু একখানা সীতা-হরণের পট দেখিস্ যদি মেলায় পাস্? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পান্‌সে পুতু পুতু পট তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারবো না যা—কেন রাম রাবণের যুদ্ধ একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ—ছেলের যা কাণ্ড! কেন ঠাকুর দেবতার পট বুঝি ভাল হোল না? দিদির শিল্পানুভূতি-শক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখীর ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কলমীর ফুলের ঝুলুনীতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশী হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর!...আর কখনো, কখনো—সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।...

মেলায় গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশী বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড় ভাল লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল—মালপাড়ার হারাণ মাল এক বাণ্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটি বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক' পয়সা? হারাণ মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা নাকি শোন্‌লাম খোকা গাঁ ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্চ—হ্যাগা? অপু দেড় পয়সা দিয়া সরু বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল—কোন্ কোন্ ফুটোতে আঙুল টেপো হারাণ কাকা! একবার দেখিয়ে দাও দিকি?

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল। দূরে নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠির মাঠের পথের দিকে অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠির মাঠের পথে বেশী রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না, তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছে—কিন্তু সেবার যাহা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নতুন। সুরটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই—আধ-জাগরণের ঘোরে সুরমায়ী স্বরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায়

অন্তর্হিত হইয়াছিলেন কোনোদিন আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই—কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙীন কাপড় জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ী পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখী, কাঠের পুতুল, রঙীন্ কাগজের পাখা, রং-করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি ফুলুরীর দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু' পয়সার তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না! মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বোল্‌বো, আমি মেলা দেখ্‌বো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চল যাই—না হয় দু'দিন এসে খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে যাবো?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জ্যেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে —চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের স্বরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়ী ঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুই ভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়। সুমুখ জ্যোৎস্না-রাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশপঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর। যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার সাহেবের ঘাটের মত ঘাট কি সে দেশে আছে? রাণুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে। অপু ঘরের মধ্যের তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কি লওয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপর একটা মাটির কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কি জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ধুলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা আর বছর যেটা সেজঠাকুরুণদের বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছিল!

দুপুরে কেহ বাড়ী নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জ্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্ত্তার মত কানে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি ক'রে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়্‌কী দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্য্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন্ গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগাহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরকে ডাক দিলে যে ঘন বন ঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহারই পাশে রাশীকৃত শুকনা বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈচি-ঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জান্‌তে পার্‌বে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কি মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে কিন্তু বেলা দশটার পূর্ব্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ, প্রচুর, বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপু-দা, এবার বারোয়ারীতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুনতে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী ক'রে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্ন স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে র‍াঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে

কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভাল হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও-বা মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল! তাহার পরই একটা বড় খেজুর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!···

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ী তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যে একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—ওই ভাখো ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার শ্বশুরের পূর্ব্বপুরুষ এই রকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অবোধ পুত্রকে অর্থলোভে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পাশের ওই নাবাল জমি, যেটা সেকালের ঠাকুরঝি পুকুর ছিল—ওইখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয় তো পুত্রের বাড়ী ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত, সে-ছেলে আর ফিরে নাই—মাগো! সর্ব্বজয়ার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আট্‌কাইয়া যায়!

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমুল বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুর কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রংএর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়ীতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপটে আবার কত

কি শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া। এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে। এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব্ব জীবন।

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হোল ধকে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগা তলায় শ্রাবণ মাসে ভারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢ়ু বাজারের নীচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্ চিক্ করিতেছিল আজ আষাঢ়ুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়ীসুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ়ুর বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি বাঁশতোলা দোকান, সেকরার দোকানে ঠুকঠাক শুনা যাইতেছে, একটা খেজুরগুড়ের আড়তের সামনে বহু গরুর গাড়ীর ভিড়। মাঝেরপাড়া স্টেশন এখনও প্রায় চারিক্রোশ, রাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠীর সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্শ্বের বট অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারা পথটা প্রাচীন বটের সারির ঝুরি দোলানো। কচি পাতায় রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত, চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে সেখানে, কোকিলের এলো-মেলো ডাকে, নতপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দনৃত্য সুরু করিয়াছে। এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এত অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামূর্ত্তিগুলি মাধুর্য্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ী স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়াছিল, গাড়ী থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারা রাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্ম্মে এক রাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মত দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক্ চিক্ করিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার

ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক রাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট্ খট্ শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান! বেশী দেরী নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ী শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!...

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার যোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল বৌটি হরিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ীর চাল ডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ী দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসীও লোকজনদের হঠাইয়া দিতেছিল।

কতবড় ট্রেনখানা! কি ভয়ানক শব্দ! সামনের এরেই ইঞ্জিন বলে? উঃ! কী কাণ্ড!

হরিবপুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়ীতে হৈ হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ীর মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালা দরজা সব হুবহু। এই ভারী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ী আজ আর চলিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুখাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব্ব তুলনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সটপট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পালাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ী! উঃ মাঠখানা যেন

ঘুরাইয়া ফেলিতেছে। ঝোপঝাপ গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি, ছোটখাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ীর তলায় জাঁতা-পেষার মত একটা একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে।...

অনেক দিন আগের সে দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো আমতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দু'জনের খেলা করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্ত্তের মধ্যে... আতুরী ডাইনী...নদীর ঘাট,...তাহাদের কোঠাবাড়ীটা...চালতে তলার পথ...রাণুদি... কত বৈকাল, কত দুপুর...কতদিনের কত হাসিখেলা...পটু...দিদির মুখ...দিদির কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক্ ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে ক'রে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে—

সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গভীর পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক্ হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত,

হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী স্বপ্নস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—

—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি ?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

অক্রুর সংবাদ

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুরের পর রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইল। অপুর চোখে দু-দুবার কয়লার গুঁড়া পড়া সত্বেও সে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সারাদিনটা বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। স্টেশনে স্টেশনে ওগুলাকে কি বলে? সিগ্‌ন্যাল? পড়িতেছে উঠিতেছে কেন? গাড়ী যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উচুমত ইটের গাঁথা, ঠিক যেন রোয়াকের মত। তাকে প্যাটফর্ম বলে? কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী ও বাংলাতে সব স্টেশনের নাম লেখা আছে—কুড়লগাছি, গোবিন্দপুর, বানপুর। গাড়ি ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পড়ে—ঢং ঢং ঢং ঢং—চার ঘা, অপু শুনিয়াছে, একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগ্‌ন্যাল পরে—কুড়লগাছি স্টেশনে অপু লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

সর্ব্বজয়া এবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল। আর একবার সেই কোন্ কালে—উনি তখন নতুন কাশী হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন—জ্যৈষ্ঠমাসে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি আজকার কথা? সে খুশির সহিত স্টেশনে স্টেশনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের ওঠা-নামা লক্ষ্য করিতেছিল। বউঝিরা উঠিতেছে নামিতেছে—কেমন সব চেহারা, কেমন কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র! জগন্নাথপুর স্টেশনে ভাল মুড়ির মোয়া ফিরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু, মুড়ির মোয়া খাবি? তুই তো ভালবাসিস্, নেবো তোর জন্যে? স্টেশনে টেলিগ্রাফের তারের ওপর কি পাখী বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ত্যাখো মা, কাদের বাড়ীর খাঁচা থেকে একটা ময়না পাখী পালিয়ে এসেচে!

নৈহাটী স্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া গঙ্গার প্রকাণ্ড পুলটার উপর দিয়া যাইবার সময় সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল, সর্ব্বজয়া একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল—ওপার হইতে হুহু বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভাল ভাল বাড়ী বাগান, এ সব দৃশ্য জীবনে সে কখনো দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস্ অপু, একখানা ধোঁয়ার জাহাজ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল—মা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্চি, অপরাধ নিও না মা, কাশীতে গিয়ে ফুল-বিল্বিপত্রে তোমায় পূজো করবো, অপুকে ভাল রেখো, যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা—

আনন্দে, পুলকে, অনিশ্চিততার রহস্যে তার হৃদয় দুলিতেছিল—এরকম মনোভাব এর আগে সে কখনো অনুভব করে নাই। সুবিধায় হোক, অসুবিধায় হোক, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম, তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লী-জীবনে এরকম সচল দৃশ্যরাজি, এরকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে

আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে—ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া—নদ-নদী, দেশ-বিদেশ—ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ!—এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত রাত্রে শুইয়া যখনই সে ভাবিত, সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে—আর আজ?

ব্যাণ্ডেল স্টেশনে গাড়ি আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ী হুহু শব্দে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপু বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ!—উঃ—। ব্যাণ্ডেল স্টেশনে পৌঁছিয়া তাহারা গাড়ী হইতে নামিল। এদিকে-ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়ীগুলা স্টেশন কাঁপাইয়া প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে। হৈ হৈ শব্দ—এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তালা-ধরা আওয়াজ, ওদিকে আর একখানা যাত্রীগাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড সবুজ নিশান দুলাইতেছে—সন্ধ্যার সময় স্টেশনের পূর্ব্বে পশ্চিমে লাইনের ওপর এত সিগ্‌ন্যাল ঝাঁকে ঝাঁকে—লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে—রেল, এঞ্জিন, গাড়ী, লোকজন!—

একটু রাত্রি হইলে তাহাদের কাশী যাইবার গাড়ী আসিয়া বিকট শব্দে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। বিশাল স্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়—সর্ব্বজয়া কেমন দিশেহারা হইয়া গেল—তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত আড়ষ্ট পায়ে পায়ে স্বামীর পিছনে একখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকষ্টে দুর্জ্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমানা স্ত্রীকে ও দিশাহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ীর বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলীর সাহায্যে মোটগাট্ উঠাইয়া দিল।

ভোরের দিকে সর্ব্বজয়ার তন্দ্রা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে—মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করিয়া ছুটিয়াছে—রাত্রের গাড়ী বলিয়া তাহারা সকলে এক গাড়ীতেই উঠিয়াছে—হরিহর তাহাকে মেয়ে-কাম্‌রায় দেয় নাই। গাড়ীতে ভিড় আগের চেয়ে কম—এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। উপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হাঁ করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল—ওরকম ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকো না খোকা, এখ্‌খুনি চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে—

কয়লার গুঁড়ো তো নিরীহ জিনিস, চোখ দুটা যদি উপড়াইয়া চলিয়াও যায় তবুও অপুর সাধ্য নাই যে, জানালার দিক হইতে এখন সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে। সে প্রায় সারারাত্রি ঠায় এইভাবে বসিয়া। বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল—সে যে কত কি দেখিয়াছে! কত স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় নাই, আলো লোকজন সুদ্ধ স্টেশনটা হুস করিয়া হাউইবাজীর মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল—রাত্রে কখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় রেলগাড়ীখানা

ঝড়ের বেগে একটা কোন নদীর ছোট সাঁকো পার হইতেছে,—সামনে খুব উঁচু একটা কালোমত ঢিবি, ঢিবিটার ওপরে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, আকাশে সাদা সাদা মেঘ—তারপর সেই ধরণের বড় বড় আরও কয়েকটা ঢিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় স্টেশন, লোকজন, আলো—পাশের লাইনে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—একজন পানওয়ালার সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল!—স্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল—সে তাহার মাস্টার মশায় নীরেন বাবুর কাছে ঘড়ি দেখিতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ী ছাড়িল—আবার কত গাছ, আবার সেই ধরণের উঁচু উঁচু ঢিবি—অনেক সময়ে রেলের রাস্তার দুধারেই সেইরকম ঢিবি—গাড়ীতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না তবে রেলগাড়ী চড়িয়াছে যে কেন। কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে অত ঢিবি কিসের? এক একবার সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল গাড়ীখানা কত জোরে যাইতেছে—চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া চলিয়াছে,—উঃ! রেল-গাড়ী কি জোরে যায়!—কৌতূহলে, উত্তেজনায় সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাঝে মাঝে পূর্ব্বদিকের দ্রুতবিলীয়মান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কত দূরে তাহারা আসিয়াছে। এসব কোন্ দেশের উঁচু নীচু মাঠ দিয়া তাহারা চলিয়াছে?

সকালের দিকে সে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকাণ্ড স্টেশনে সশব্দে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—প্ল্যাটফর্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে—পাটনা সিটি।

তাহার পর কত স্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল। গাড়ী চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুলটা শেষ হইবে না—কত ধরণের সিগ্‌ন্যাল, কত কল-কারখানা, একটা কোন্ স্টেশনের ঘরের মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙ্ লাগানো মত—তাহারই মধ্যে মুখ দিয়া একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে—প্রাইভেট নম্বর?...হাঁ আচ্ছা—সিক্স্‌টি নাইন্—সিক্স্‌টি নাইন্—হাঁ? ঊনসত্তর...ছয়ের পিঠে নয়—হাঁ—হাঁ—

সে অবাক্ হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি বল বাবা? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বল্‌চে কেন?

তখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় হরিহর বলিল—এইবার আমরা কাশী পৌঁছে যাবো, বাঁ দিকে চেয়ে থেকো, গঙ্গার পুলের ওপর গাড়ী উঠলেই কাশী দেখা যাবে—

অপু একটা কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিল। আজ সে সারা পথ টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে—সেই একটিবার ছাড়া এমন করিয়া এর আগে কখনও দেখে নাই জীবনে। এইবার যদি সে রেল-রেল খেলার সুযোগ পায়, তখনই সে ওই ধরণের

তারের খুঁটি বসাইবে। কি ভুলটাই করিত আগে! যেখানে যাইতেছে, সেখানকার বনে গুলঞ্চ-লতা পাওয়া যায় তো?

•

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফট্‌কা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ীর একতলায় হরিহর বাসা লইয়া আছে। কোনো পূর্ব্ব-পরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই। আগে যাহারা যেসব জায়গায় ছিল, এখন সেসব স্থানে তাহাদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের গলির পুরাতন হালুইকর রামগোপাল সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে।

বাড়ীর ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙালী ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তাঁর দোকান ও গুদাম—আশেপাশের দু'তিন ঘরে তাঁর রন্ধন ও শয়নঘর।

এ পাঁচছয় দিনে সর্ব্বজয়া নিকটবর্ত্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। স্বপ্নেও কখনো সে এমন দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,—এমন মন্দির! এমন ঠাকুর-দেবতা! এত ঘরবাড়ী!—আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মন্দির এতদিন তাহার কাছে স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন জানা ছিল—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির?—অন্নপূর্ণার মন্দির? দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপরকার লালপাথরের মন্দিরগুলা?

মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছিল—সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মুখে বলিতে পারে না। ধূপধুনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল—সাত আটজন পূজারী একসঙ্গে মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়, কি জাঁক-জমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের বেশভূষারই বা কি বাহার! কোথাকার একজন রাণী আসিয়াছিলেন—সঙ্গে চার-পাঁচজন চাকরাণী। দামী বারাণসী শাড়ী পরণে, সোনার কল্কাবসানো আঁচলটা আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মত জ্বলিতেছিল—কি টানা ডাগর চোখ—কি ভুরু কি মুখশ্রী—সত্যিকার রাণী সে কখনো দেখে নাই—গল্পেই শুনিয়াছে—হাঁ, রাণীর মত রূপ বটে! তাঁহাকে বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে কি ঠাকুরের আরতি বেশীক্ষণ দেখিয়াছে, তাহা সে জানে না।

ঠাকুর-দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসত বাড়ীই বা কি!…দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দিপুরের গাঙ্গুলী বাড়ী গিয়া সে গাঙ্গুলীদের নাট্‌মন্দির, দো মহলা বাড়ী, বাঁধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—মনে আছে একবার দুর্গাকে বলিয়াছিল…দেখেছিস্ বড়-লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষ্মীছিরি?—এখন সে যেসব বাড়ী রাস্তার দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে গাঙ্গুলীবাড়ী—

এত গাড়ীঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনও সে দেখে নাই। গাড়ীই বা কত ধরণের! আসিবার দিন রাণাঘাটে, নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এত ধরণের গাড়ী সে আগে কখনো দেখে নাই। দু-চাকার গাড়ীই যে কত যায়! তাহার তো ইচ্ছা

করে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ত্বদণ্ড এইসব ভাবে—কিন্তু স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না।

অপু তো একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। এরকম কাণ্ডকারখানা সে কখনো কল্পনায় আনিতে পারে নাই। তাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট বেশী দূর নয়, রোজ বিকালে সে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, ওখানে কথা হইতেছে, ওদিকে কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব, অপু সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া মহা-উৎসাহে গল্প করে।

কাহাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রোজ বেড়াইতে আনে, অপু ভাব করিয়াছে,—তার নাম পল্টু, ভাল কথা কহিতে জানে না, ভারী চঞ্চল, তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ীর লোকেদের এই জেল-কয়েদীর মত ব্যবস্থা। অপু হাসিয়া খুন। চাকরকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সে ভয়ে দড়ি খুলিতে চাহে না। বন্দী নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ—এ ধরণের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য, সে জ্ঞানই তাহার নাই। আসিলে সর্ব্বজয়া রোজ তাহাকে বকে—একলা একলা ওরকম যাস কেন? শহর বাজার জায়গা, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস্?···মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, একথা সে মাকে হাত নাড়িয়া ত্ববেলা অধ্যবসায়সহকারে বুঝায়।

কাশীতে আসিয়া হরিহরের আয়ও বাড়িল! কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ-পাঠের কার্য্য যোগাড় করিল। তাহা ছাড়া একদিন সর্ব্বজয়া স্বামীকে বলিল, —দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল ব'সে ব'সে পরামর্শ আঁটা—

স্ত্রীর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশীখণ্ডের পুঁথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পুরাণ পাঠ করা তাহার কিছু নূতন ব্যবসায় নহে, দেশে শিষ্যবাড়ী গিয়া কত ব্রত-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া সুস্বরে সে বন্দনা গান সুরু করে—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
·········স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুং
·········ব্রজগোপালবেশং।

ভিড় মন্দ হয় না।

বাসায় ফিরিয়া বালির কাগজে কি লেখে। স্ত্রীকে বলে শুধু শ্লোক প'ড়ে গেলে কেউ শুনতে চায় না—ওই বাঙাল কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশী ভিড় হয়—ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখবো, গান থাক্‌বে। কথকতার মতও থাক্‌বে, নৈলে লোক জমে না—বাঙালটার সঙ্গে পরশু আলাপ হোল, দেবনাগরীর অক্ষরপরিচয় নেই, শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়···আমার রেকাবী কুড়িয়ে ছ' আনা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়···শুনবে একটু কেমন লিখ্‌চি?

খানিকটা সে পড়িয়া শোনায়। বলে—ওই কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি—তা কি দেবে?

—তুমি কোন্ খানটায় ব'সে কথা বলো বল তো? একদিন শুনতে যেতে হবে—

—যেও না, ষষ্ঠীর মন্দিরের নীচেই বসি—কালই যেও, নূতন পালাটা বল্‌বো, কাল একাদশী আছে, দিনটা ভালো—

—আস্‌বার সময় বিশ্বেশ্বরের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পানফলের জিলিপী এনো দিকি অপুর জন্যে—সেদিন ওপরের খোট্টা বউ কি পুজো ক'রে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পানফলের জিলিপী, বিশ্বেশ্বরের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাব্‌লাম অপু জিলিপী খেতে বড় ভালবাসে—তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি ব'লে নিয়ে আসি—এনো দিকি আজ চার পয়সার।

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড় হইতেছে। একখানা বড় বারকোষে করিয়া নারদঘাটের কাশীবাড়ীর ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সর্ব্বজয়া হাসিমুখে বলিল—আজ বুঝি বারের পুজো? উনি বাড়ী আস্‌চেন দেখ্‌লে হ্যাঁ ঝি? ঝি চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—এদিকে আয় অপু—এই স্তাখ্ তোর সেই নারকেলের ফোঁপল—তুই ভালবাসিস্? কিশমিশ, কলা, কত বড় বড় আম দেখেছিস্, আয় খাবি, দিই—বোস্ এখানে—

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে। সর্ব্বজয়া বলে—ধ্রুবচরিত্র শুন্‌তে শুন্‌তে লোকের কান যে ঝালাপালা হোল, নতুন একটা কিছু ধরো না? সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড়ভরতের উপাখ্যানকে কথকতার পালার আকারে লিখিয়া শেষ করে। মনে পড়ে এই কাশীতেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সে গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করে, তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাশীতে এত ছিল না—দেশে ফিরিয়া চারিধারে দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরণের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত—বাজারের বারোয়ারীতে কবির গান হচ্ছে বুঝ্‌লে? ব'সে ব'সে শুন্‌লাম বুঝলে?…সোজা পদ সব…কিছুই না, রসও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে যদি ভাল হ'য়ে—নতুন ধরণের পালা বাঁধবো—এরা সকলে গায় সেই সব মান্ধাতা আমলের পদ—রাজুকে তাই কাল বল্‌ছিলাম—

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক একদিন হরিহর বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দ্দিষ্ট কোন আনন্দে তাহার মন যেন পালকের মত হালকা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে!

ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে

তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূর-দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোকে খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ী আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ! ভারী চমৎকার তো! . কার বাঁধা ছড়া?—"কবির গুরু ঠাকুর হরু—" হরু ঠাকুরের? —না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই বসিয়া তো বাইশ বৎসর পূর্ব্বে মনে মনে কত ভাঙা গড়া করিয়াছে —তারপর কবে সে সব ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল—কবে ধীরে ধীরে নূতন খাতাপত্রের তাড়া বাক্সের অনাদৃত, গুপ্ত কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল—যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াশার মত দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

হারানো যৌবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে—জীবনের সে সব দিনকে আর একটিবারও ফেরানো যায় না?

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপুর ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার বয়সী সব ছেলেই স্কুলে পড়ে, সে-ই কেবল এখনো স্কুলে পড়ে নাই, নিশ্চিন্দিপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকায় বেড়াইয়া দিন কাটানো চলিত বটে, কিন্তু এখানে সমবয়সীদের কাছে কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে।

তাহা ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যেসব ছেলের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পল্টুর দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল—কেন তোমাদের বুঝি খুব শিষ্য-বাড়ী আছে? পল্টুর দাদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—শিষ্য-বাড়ী? কিসের ভাই?...

অপু সদুত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে বলিল—আমার বাবা কণ্ট্রাক্টরী করেন কি না? তা ছাড়া কাঁথিতে ছোট জমিদারী আছে—তবে আজকাল কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

এক একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণ-পাঠ শোনে। হরিণশিশু শ্বাপদ কর্ত্তৃক নিহত হইলে হরিণবালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভরতের করুণ বিরহবেদনা ও পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কাহিনী ষষ্ঠী-মন্দিরের পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে—এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহুগণ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া ব্রহ্মর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে, ঠিক ঘটিবে। কথকতার শেষে পূরবী সুরের আশীর্ব্বচনটি তাহার ভারী ভাল লাগে—

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ......

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে অস্তসূর্য্যের রাঙা আভা ও পূরবীর মূর্চ্ছনার সঙ্গে হরিণ-বালকের বিয়োগবেদনাতুর রাজর্ষির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়ীতে কাগজ কলম বাবার কাছে লইয়া গিয়া বলে—আমায় লিখে দাও না বাবা, ঐ যে তুমি গাও—কালে বর্ষতু পর্জন্যং ?

হরিহর খুশি হইয়া বলে—তুই বুঝি শুনিস্ খোকা ?

—আমি তো রোজই থাকি—তুমি কাল যখন ভরতের মা মারা যাওয়ার কথা বল্‌ছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে বসে—ষষ্ঠীর মন্দিরের ধাপে—

—তোর কি রকম লাগে—ভাল লাগে ?

—খু-উ-উ-উব। আমি তো রোজ রোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল—খোকা, ও খোকা—

তাহার সঙ্গের বন্ধুটি বলিল—তোমাকে চেনে না কি ?

অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ। সে বাবার কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়। সে পণ্টুর দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে কাশীতে তাহাদের বাড়ী আছে, তাহারা কাশীতে হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিয়াছে, দেশে খুব বড় বাড়ী, তাহার বাবা কণ্ট্রাক্টরী করেন, তা ছাড়া দেশে জমিদারীও আছে। শেষে বলে—কিন্তু জমিদারী থাকলে কি হবে, কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে ?

তাহার বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বর্ণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, বিশেষতঃ তাহার সুন্দর মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরের ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পর হরিহর কথা শেষ করিয়া ঘাটের রাণায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কথক ঠাকুর জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল—এই যে আপনিও আছেন, দেখ্‌লেন তো কাণ্ড, পূন্নিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভাল আছে, বামন-ভিক্ষে লাগাই—মাসে মাসে এই কাশীতে বামন-ভিক্ষা হোলে পরে পনের সের আধমণ ক'রে চাল পড়্‌তো—আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষেতেও লোকে আর ভেজে না—চালের তো একটা দানাও না—এদিকে সিকে পাঁচেক হবে, তার মধ্যে আবার দুটো অচল দোয়ানি—।...মশায়ের শিক্ষা কোথায় ?

—শিক্ষা তো ছিল এই কাশীতেই, অনেকদিন আগে। তবে এত দিন দেশেই ছিলাম—এইবার এখানে এসে বাসা ক'রে আছি...

—মশায়ের বাসা কি নিকটে ?...একটু চা খাওয়াতে পারেন ?...কদিন থেকে ভাব্‌চি একটু চা খাবো—এই দেখুন না, চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুইকরের দোকানে একটু গরম জল করিগে...গলা বসে গিয়েচে, একটু লোন্-চা খেলে গলাটা...

—হাঁ হাঁ, আসুন না এই তো নিকটেই আমার বাসা···চলুন না? কথককে লইয়া হরিহর বাড়ী আসিল।

চা খাওয়ার পাট কোন কালে নাই। কড়ায় জল গরম করিয়া চা তৈরী হইল। অপু কাঁসার গ্লাসে চা ও রেকাবিতে কিছু খাবার কথকের সামনে লইয়া আসিল। খাবার দেখিয়া কথক ঠাকুর ভারি খুশি হইল—খাবারের আশা সে করে নাই।

—এটি ছেলে বুঝি! বাঃ, বেশ ছেলে তো আপনার? ভারী সুন্দর দেখতে—বাঃ—এস এস বাবা, থাক্ থাক্ কল্যাণ হোক্—লোন্-চা করিয়েচেন তো মশায়?···দেখি—

হরিহর বলিল—আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই—

—সংসারই নেই তো ছেলেপিলে?···দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচ ও মূলেও হাভাত—জমি ক'বিঘে যদি আজ থাক্‌তো—তো আজ কি এই এতদূরে আসি—আপনিও যেমন।··· এসব কি আর দেশ মশাই?···বিশ্বেশ্বর অবিশ্যি মাথায় থাকুন—এমন শীতকাল যাচ্ছে মশাই—না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি—আমার নিজের মশাই দু'কুড়ি খেজুর গাছ—

—মশাইয়ের দেশটা কোথায়?···

—সাতক্ষীরের সন্নিকট,—বাদুড়ে-শীতলকাটি জানেন? শীতল-কাটির চক্কত্তিরা খুব ঘরানা—

হরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান্ দিয়া কথক ঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল—খান—

—কিছু না মশায়, ফাগুন মাসের দিকে তো যাই—একটা বাগান আছে, দিয়ে আসি বিক্রি ক'রে—আমরা আবার শ্রোত্রিয় কিনা?···তা জমি দশ বিঘে ছিল তাই বন্ধক দিয়ে পণ যোগাড় করলাম—বিয়েও করলাম,—মশাই দশ বছর ঘর করলাম—হোল কি জানেন?··· সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরে চাল থেকে কুমড়ো কাটতে গিয়েচে—ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরী হয়ে—হাতে দিয়েচে কামড়ে—আমি আবার নেই সেদিন বাড়ী—কেউ বা বদ্যি কবরেজ দেখিয়েচে, কেউ বা কি করেচে—পাটুলির ঘাট পার হচ্চি—গাঁয়ের মহেশ সাধুখাঁ ওপার থেকে আসচে, আমায় বল্লে—শিগ্‌গির বাড়ী যান মশায়—আপনার বাড়ী বড় বিপদ—কি বিপদ তা বলে না—বাড়ী পৌঁছে দেখি আগের রাত্রিতেই বৌ তো গিয়েচে মরে।—এই গেল ব্যাপার মশাই···জমিকে জমিও গেল—এদিকেও—। সেই থেকে বলি যাই, দেশে থেকে আর কিই বা হবে—কোত্থেকে পাবো তিন চার শ টাকা যে আবার বিয়ে করবো?···যাই বিশ্বনাথের ওখানে···অন্নকষ্টটা তো হবে না···আজ বছর আটেক হয়ে গেল—এক খুড়্‌তুতো ভাই আছে—জমিজমা সামান্য যা একটু আছে, দখল ক'রে ব'সে আছে—বলে তোমার ভাগ নেই—বেশ বাপু নেই তো নেই—গোলমালের মধ্যে কখ্‌খনো আমি যাবো না—করগে যা দখল। উঠি মশাই,—আপনার এখানে বেশ চা খাওয়া গেল—আপনার ছেলেটি কোথায় গেল?···বেশ ছেলে, খাসা ছেলে—

পুরানো চামড়ায় তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথক ঠাকুর পায়ে দিয়া দরজার কাছে আসিল—যাইতে যাইতে বলিল—কালও লাগাবো বামন-ভিক্ষে—দেখি কি হয়—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভাল নয়। নীচের তলায় স্যাঁৎসেঁতে ঘর, তাও মাত্র দুখানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। এরকম স্থানে সর্ব্বজয়া কখনো বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ী পুরানো হইলেও রৌদ্রহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতের কোঠা, খট্ খট্ করিত, শুক্‌না। এ বাসার স্যাঁতসেঁতে মেজে ও অন্ধকারে সর্ব্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটেই ঘরে থাকে না, সূর্য্যালোকপুষ্ট নবীন তরুর ন্যায় শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো-হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, একদণ্ডও সে এখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

কাশী দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়াছে। বড় বড় বাড়ীঘর থাকিলে কি হইবে, এখানে বন নাই মোটেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথক ঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। একথা-ওকথার পর বলিল —কৈ আপনার ছেলেকে দেখ্‌চি নে?

হরিহর বলিল—কোথায় বেরিয়েচে খেলা করতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকেই বোধহয় বেরিয়েচে—

কথক ঠাকুর উড়ানির প্রান্তে কি দ্রব্য খুলিতে খুলিতে বলিল—আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েছে মশাই—সেদিন ঘাটের কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম—কড়ি খেলতে ভালবাসে তাই এই দুটো বড় বড় সমুদ্রের কড়ি সেদিন ব্রতের সিধেয় কারা দিইছিল, ভাবলাম ওকে দিয়ে আসি—রেখে দিন আপনি, ও এলে দেবেন—

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অপু বাবাকে ধরিল সে স্কুলে ভর্ত্তি হইবে। বলিল—সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও পড়বো—ওই তো গলির মোড় ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়েই ভাল ইস্কুল—

হরিহর ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তি স্কুল তবে ইংরাজী পড়াও হয়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে—সে প্রায় চার পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে— এই তাহার পুনরায় অন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি কথক ঠাকুর এক টুকরা বালির কাগজ হাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুকরা দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো মশাই পড়ে, এই রকম যদি লিখি তবে হয়?

হরিহর পড়িয়া দেখিল কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্ত্তী নামে কোনো লোক কথক ঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশ বিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুক তারিখ। কথক ঠাকুর বলিল—ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের দেশে কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চক্কোত্তি ভারী পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে আমাকে বল্লেন—রামধন, তোমার তো কিচ্ছু নেই, ভাব্‌চি তোমাকে বিঘে দশেক জমি দান করব—

তুমি নেবে কি? তা ভাবলাম সদ্ব্রাহ্মণ, দিতে চাচ্ছেন, দোষই বা কি? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন—এতকাল তত গা করিনি, কাশীতেই থাক্‌বো, দেশে ঘরে থাক্‌বো না, কি হবে জমি? তারপর চক্কোত্তি মশায় গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই রয়ে গেল। এতকাল পরে ভাবচি দেশে যাবো—ছেলেপিলে না হলে কি আর মানুষ মশাই? আপনাকে বলতে কি, শ তিনেক টাকা হাতে করেচি—করেচি জলাহার করে মশাই—আর শ দুই টাকা পেলে শ্রোত্রিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়—তা যদি তাই ঘটে, তবে জমিটা দরকার হবে তো? ভাবলাম মুখে মুখে দান, সে কি আর চক্কোত্তি মশাইএর ছেলেরা মান্‌বে? ভেবে চিন্তে এই কাগজখানা ব'সে ব'সে লিখিচি—নিজেই লিখিচি মশাই, সইটই সব—দুজন সাক্ষী, সব বানানো—দেখি লেখা কাগজ যদি মানে। গিয়ে বোলবো এই ত্যাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেচেন—

উঠিবার সময় কথক ঠাকুর বলিল—ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবারে মাঘীপূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ওই টেওটার রাজার ঠাকুরের বাড়ীতে, ঠিক মন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধ্যের পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন করায় কি না। একটু সগর্ব্বে বলিল—আমায় একখানা করে নেমন্তন্ন পত্তর দ্যায়, বেশ ভাল খাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিন্তু।

মাঘীপূর্ণিমার দিন শেষ রাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্ব্বজয়া অবাক্ হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে "জয় বিশ্বনাথজী কি জয়", "ব্যোলো ব্যোম", "বোলো ব্যোম্" বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘের শীতকে উপেক্ষা করিয়া স্নানের জন্য চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সর্ব্বজয়াও স্নান করিতে গেল—গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির, পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ষষ্ঠীর মন্দিরে লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথকঠাকুর অপুকে লইতে আসিল। সর্ব্বজয়া বলিল—পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপুর ওপর একটা দম হয়েচে, দশাশ্বমেধ ঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একদিন নাকি পেঁপে কিনে খাইয়েচে—পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো—

অপু প্রথমে কথক ঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলার ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দিয়া হিসাব লেখা। নমুনা :—

সিয়ারসোলের রাণীর বাড়ী ভাগবত পাঠ	...	৪৲
মুসম্মত কুন্তার ঠাকুর বাড়ী ...ঐ...	...	৩৲
ধারক লালজী দোবের একদিনের খোরাকী	...	।০

বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নাই। একখানা সরু চৌকী পাতা, একটা ছোট টিনের তোরঙ্গ, একটা দড়ি-টাঙানো আল্‌না, একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথক ঠাকুর বলিল—কমলালেবু খাবে?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে আপনার?

কি জানি কেন এই কথক ঠাকুরের কাছে তাহার কোনো প্রকার লজ্জা কি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং" জানেন আপনি?

—কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং? খুব জানি, রোজ বলি তো, একদিন শুনো না—

—এখন বলুন না একটিবার?

কথক সুর করিয়া বলিল বটে কিন্তু অপুর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভাল লাগে, কথকের গলা বড্ড মোটা।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথক ঠাকুর নানা খুচ্‌রা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল, খেল্‌না, শিবলিঙ্গ, মালা, কাঠের কাঁকই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অপুকে দেখাইয়া বলিল—কাশীর জিনিস, সবাই বল্‌বে কি এনেচে দেখি! তাই নিয়ে যাবো—

নানা সরু গলি পার হইয়া একটা অন্ধকার বাড়ীর দরজার সাম্‌নে আসিয়া কথক ঠাকুর দাঁড়াইল। নীচু দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপুর মনে হইল বাড়ীটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিঝুম। কথক ঠাকুর দু'একবার গলায় কাশির শব্দ করিতে কে একজন দালানের চারপাই হইতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দীতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না। কথক ঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও মনে হইল লোকটা তাহাকে চিনেও না বা তাহাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই। পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু ফিরিতে এত দেরী করিতে লাগিল যে, অপুর মনে হইল হয়তো ইহারা বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা। যাহাই হউক, অন্ধকারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে আধ-অন্ধকারে খানকতক শালপাতা পাতিয়া ইহাদের বসাইয়া দিল. একটা মোটা পিতলের লোটায় জল দিয়া গিয়াছে। কথক ঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল। রাজার বাড়ী কি না জানি খাওয়ায়? অধীর আগ্রহে অপু প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল—কাহারও দেখা নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপুর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেষ্টার আবির্ভাবরূপ অঘটন ঘটিল। মোটা মোটা আটার পুরী ও স্বাদ-গন্ধহীন বেগুনের ঘণ্ট—শেষে খুব বড় বড় লাড্ডু। অপু কামড়াইতে গিয়া লাড্ডুতে দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন। কথক ঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান দশ-বারো আগ্রহের সহিত খাইল। মাঝে মাঝে অপুর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়—বেশ লাড্ডু, না? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে থাকিয়া যায় যদি না কোনো বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবাট খুলিতে পারে। আজকার এই নিমন্ত্রণ

খাইতে আসার অনাদর, অবজ্ঞা, অপু বালক হইলেও বুঝিয়াছিল। তাহার পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপুর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল। তাহার মনে হইল এ কথক ঠাকুর অতি অভাজন। ভাবিল, কথক ঠাকুর কখনো কিছু খেতে পায় না, আহা এই লাড্ডু তাই অমন ক'রে খাচ্ছে—ওকে একদিন মাকে ব'লে বাসাতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো—

করুণা ভালবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনী বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদেশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙাল কথকঠাকুর তাহার দিদি ও গুলকীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল সুদ্ধ এক লাড্ডু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গীতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথক ঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে কথক ঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল। হরিহরের মনে হইল আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল—এই ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান বয়সের চেয়েও অন্ততঃ আট বৎসর বেশী বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন্ কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ী ছাড়িলে অপুর চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড় মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই উঠানের ধারে বসিয়া পড়িল। সর্ব্বজয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল,—কি হয়েচে, এমন করে ব'সে পড়্‌লে যে? স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্ব্বজয়া হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নভাবে বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

সর্ব্বজয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—অপু আস্‌চে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধহয় গোধূলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে—

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সামনে ছাদে বসিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপুর খুব আলাপ জমিয়াছে। নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দবাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি বই আবিষ্কার করিয়াছে—নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া পড়ে। কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কাড়িয়া লয়, কারণ একদিন সেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছাদের এক কোণে রৌদ্রে বসিয়া অপু বই পড়িতেছিল, নন্দবাবু ঘরের ভিতর কি খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল—আরে রেখে দাও, তোমার ব'সে ব'সে যত ঐ সব বই

পড়া, কোথাকার জিনিস কোথায় রাখো তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না—যাও, রাখো বই, যাও—

সে তো ঘরের অন্য কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবার কারণ কি? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে বই লইয়া থাকে।

নন্দবাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভাল জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায়। অপুর গায়ে একদিন একটু শিশি হইতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, বেশ ভুরভুরে গন্ধটা।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়তে যাইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল লইয়া লাল-মত একটা ঔষধ খায়। সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারী বকিয়াছিল। নন্দবাবুদের ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্যদিকে—আর একদিন রাত্রে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল—এখন যাও অপূর্ব্ব, ইনি আমার শালী—দেখতে এসেচেন, এখুনি চলে যাবেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে—ও আমাদের নীচের ভাড়াটের ছেলে—কিছু বোঝে-সোজে না।

নন্দবাবু তাহাকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে, তোমার মাকে ব'লে পান নিয়ে এস দিকি? আমার চাকরটা পান সাজতে জানে না—

অপু মায়ের কাছে আবদার করিয়া ওপরে প্রায়ই পান আনে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে—তোমার মা, আমার কথা কিছু বলেন টলেন নাকি—না?—অপু বাড়ী আসিয়া মাকে বলে—নন্দবাবু বেশ লোক—মা, তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে—

—আমার কথা? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করে—

—বল্‌ছিল তোমার মাকে বোলো, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস্ করি টরি—বেশ লোক—

—করুক গে—তুই পাজি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস্ টাস্ কেন? বিকেলে ওপরে ব'সে ব'সে কি করিস্?

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল। অপু স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল—খোকা এস, একটু বসো বাবা—

অপু বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প করিতে লাগিল। হাসিমুখে নীচু স্বরে বলিল—এই দু মাস তো স্কুলে গিইচি, এরই মধ্যে বাবা, স্কুলের সবাই খুব ভালবাসে, রোজ রোজ ফাস্ট´ বসি—স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা ছাপিয়ে কাগজ বার করবে এক মাস অন্তর। আমাকে সেই দলে নিয়েচে—তোমায় দেখাবো বাবা বেকলে—

হরিহরের বুকের ভিতরটা মমতায় বেদনায় কেমন করে। অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে—একটা লেখা লিখেচি—কাগজখানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে—কিন্তু যারা দু'টাকা কোরে চাঁদা দেবে শুধু তাদেরই লেখা ছাপ্‌বে বলেছে—দু'টাকা দেবে বাবা?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে সুরু করে। ছেলে

যে লেখে, সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প, সুন্দর বানানো, হরিহর খুশি হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে, বলে—তুই লিখিচিস্ খোকা?

—আমি তো আরো কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প, রাজকন্তের—বাড়ী থাকতে রাণুদির খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো—

সর্ব্বজয়া টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অসুখে পড়িয়া, এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচেই কুলাইবে না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে। হরিহর বুঝাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ায়, বলে—দাও গিয়ে, আহা খোকার লেখাটা ছাপিয়ে আসুক, সেরে উঠে পথ্যি করলেই ঠাকুর-বাড়ীর ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েচে—ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো—

দিন দুই পরে অপু নিরাশ মুখে রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে, হ'লো না বাবা। ছাপাখানাওয়ালার লোকেরা বেশী দাম চেয়েচে, তাই আজ স্কুলে ব'লে দিয়েচে, চার টাকা ক'রে চাঁদা চাই,—

ছেলের মুখের নিরাশার ভাব হরিহরের বুকে খচ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অন্য কথার পর সে বলে—ভাখ দিকি খোকা তোর মা কোথায় গেল···বালিসের তলা হইতে চাবির থোলো বাহির করিয়া দিয়া বলে—চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স, যেটাতে আমার কঞ্চির কলমের বাণ্ডিল আছে, ওইটে খোল্ তো?···কোণে ভাখ্ তো ক টাকা আছে? তাহার পর হরিহর সন্তর্পণে বাক্সখোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতার চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ!···ওর সুন্দর, শুভ্র চাঁদের মত ললাটটি ওঁর মায়ের ললাট, চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধূ সর্ব্বজয়ার অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপুর অনাবিল, নবীন মুখে।

অকারণে হরিহরের বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্র উদ্বেল উত্তাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে।

অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব-অরুণ আভা, তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখদুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের সে অসীম স্বপ্ন, সুনীল পাহাড়ের নবীন শালতরুশ্রেণীর উল্লাস-মর্ম্মর—কুলহারা সমুদ্রের দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে···চারটে টাকা আছে বাবা—হরিহর সময় অসময়ের জন্য টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী জানে না, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল—নিয়ে যা খোকা, চাঁদা দিয়ে দিস্, কিন্তু তোর মাকে যেন বলিসনে।

অপু খুশির সুরে বলে—ছাপা বেরুলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরুবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অসুখ আবার বাড়িল।

সর্ব্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল—নন্দবাবুকে বল্‌গে যা তো—একবার এসে দেখে যান্—

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল—একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব্ব, তোমার মাকে বলো।

বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঠাণ্ডা লেগে হয়েচে, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—ভাল নার্সিং চাই,—নীচের ঘরে কি এমনি ক'রে থাকে!···খোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এস আমার ডাক্তারখানায়, ওষুধ দেবো—

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী হইতে ঔষধ আনিল।

বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল—ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, অন্ততঃ এক সের করিয়া দুধ ও অন্যান্য ফল না খাইতে দিলে রোগী দুর্ব্বল হইযা পড়িবে। সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল। বিদেশ, বিভুঁই জায়গা। একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই, সর্ব্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

এই বিপদের মধ্যে সর্ব্বজয়া আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। উপরের ছাদে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তার রান্নাঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অসুখ হইবার পর হইতে নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল। নানা অছিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে—আগে আগে অপুকে আড়াল করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—আজকাল সরাসরিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্ত্তা বলে। প্রথমটা সর্ব্বজয়া কিছু মনে করে নাই—বরং বিপদের সময় এই অনাত্মীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা করিতেছে—ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই যে বাড়াবাড়ি—ইহা কোথায় যেন বেখাপ ঠেকিতেছে। নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে—চাকরদের হাতে পান সাজা—জীবনটা গেল বৌঠাকরুণ—সাজুন দিকি একবার—তাহাতেও সর্ব্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আত্মীয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনতার সীমা ডিঙাইতে চলিল। আজকাল পান আনিয়া বলে—রাখো দিকি বৌঠাকরুণ! হাত হইতে সর্ব্বজয়া লইবে—এইরূপই যেন চায়। অপু তো পাগল—অধিকাংশ সময়ই বাটীতে তাহাকে খুঁজিয়া মেলে না—ওঘরে হরিহর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে—আর ঠিক সেই সময়টিতেই নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে!···ছলছুতায় একথা-ওকথায় আধঘণ্টা না কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় • । বলে—কোনো ভয় নেই বৌঠকরুণ—আমি আছি ওপরে—অপূর্ব্ব থাকে না থাকে—ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না! বিপদের সময় অত বাছ্‌তে গেলে······একটু চুণ দাও তো! বোঁটা নেই?···আহা আঙুলের মাথাতে ক'রেই একটু দাও না অমনি—

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। এদিক-ওদিকে চাহিয়া

ক্ষীণস্বরে বলে—খোকা কৈ! খোকা কৈ!…সর্ব্বজয়া বলে—আসচে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বসবে…বেরিয়েচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ী এলে বলে—বসতে পারিস্‌নে একটু কাছে!…খোকা খোকা ক'রে পাগল—খোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বসগে যা; গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হয়ে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবেন কি না?

অপু অপ্রতিভ মুখে বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু খানিক বসিয়াই মনে ভাবে—ওঃ! কতক্ষণ ব'সে থাকবো—বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেড়াতে কি খেলা করতে নেই। কন্‌কনে ঠাণ্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। তাহার মন ছট্‌ফট করে—একদৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট, জলের ধাপ, নির্ম্মল মুক্ত হাওয়া, সুবেশ নরনারীর ভিড়। পন্টু …সুধীর…গুলু…পটল—পন্টুর দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়ূরপঙ্খীটায় আজ আবার নাচ, বেলা চারটার সময়! উস্‌খুস্‌ করিতে করিতে চক্ষুলজ্জায় সন্ধ্যা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্ব্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল—হ্যাঁরে, ওই সাদা বাড়ীটার পাশে কোন্‌ ছত্তর জানিস্‌?

—উঁহু—

—তুই ছত্তরে খাস্‌নি একদিনও এখানে এসে? কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিস্‌নে বুঝি! খেয়ে আসিস না আজ?…দেখেই আসিস্‌ না?

—কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কেন?

—খেলে পুণ্যি হয়—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে নেয়ে অমনি ছত্তর থেকে খেয়ে আসিস্‌—বুঝ্‌লি!

বেলা বারোটার সময় সত্র হইতে খাইয়া অপু বাড়ী ফিরিল। তাহার মা রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—লুকাইতে গেলে সন্দেহ জাগানো হয় ভাবিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিল—খেয়ে এলি? কেমন খাওয়ালে রে?

মা অড়হরের ডাল-ভিজা খাইতেছে।

—ভালো নাঃ—কুমড়োর একটা ছাই ঘণ্ট—ব'সে ব'সে হয়রান—বড্ড ময়লা কাপড়-পরা লোক সব খেতে যায়—আমি আর যাচ্ছি নে, পুণ্যিতে আমার দরকার নেই—ওকি খাচ্চ মা? তোমার বের্ত্তো নাকি? রান্না হয় নি?

—আজ তো আমার কলুইচণ্ডী—এই দুটো অড়লের ডাল ভিজে—বেশ খেতে লাগে—আমি বড্ড ভালবাসি…খাবি দুটো ওবেলা?

রাত্রিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল—অড়লের ডাল ভিজে খেয়ে ভাখ্‌ দিকি? বেশ লাগ্‌বে এখন—এবেলা রাঁধ্‌লাম না, ভারী তো খাস্‌, এত কটা ভাতে বলিস্‌ বই তো নয়—ওই খেয়ে কি আর খেতে পারবি?

পরদিন দুপুরে নন্দবাবু একতাড়া পান অপুর হাতে দিয়া বলিল—তোমার মার কাছ থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্ব্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে; নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল। এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বজয়া যে-ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্ব্বজয়ার ঝিমানি ধরিয়াছিল, জুতার শব্দে চমক ভাঙিলে একেবারে সম্মুখে নন্দবাবু, বলিল—পান সাজা হয়েছে বৌঠাকৃরুণ? সর্ব্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি রেকাবিতে করিয়া সামনের দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল—চুণ বড্ড কম হয় বৌঠাকৃরুণ তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্চি—

সর্ব্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাড়ীতে কেহ নাই, অপু কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ সর্ব্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চুণ লইবার অছিলায় অনাবশ্যকরূপে—তাহার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে চাহিতেছে—একটা অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া এক লহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল। একটা বিদ্যুতের মত কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিল—চলে যান এখখুনি ওপরে—কখখনো আর নীচে আসবেন না—নীচে এলে আমি মাথা খুঁড়ে খুন হবো—কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আসবেন না—

সর্ব্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে—নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে—তাও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, নিতান্ত নির্বোধ। এদিকে এই সব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেভদ্রে নীচে নামে—এক আধবার সর্ব্বজয়াকে উপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ ছয় মাস কাশীতে আসিয়াও সর্ব্বজয়া না পারে হিন্দী বলিতে, না পারে ভাল বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জমে নাই। সন্ধ তাহার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সুরধর্কুয়ারী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসর জেলার অধিবাসী, স্বামীটি রেলে ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও দেখিতে কমবয়সী, গৌরাঙ্গী, আয়তনয়না, আঁটসাঁট দীর্ঘগড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল—কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদমায়েসীর ভাব দেখেন আমায় বলিবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িব।...

ঠিক দুপুর। কয় রাত্রি জাগিবার পর সর্ব্বজয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উত্তরের ঘরের জানালা দিয়া একফালি রৌদ্র আসিয়া সরু উঠানটাতে বাঁকাভাবে পড়িয়াছে। অপু মাটির মালসাতে গাঁদাফুলের গাছ লাগাইয়াছিল, দু-তিনটা একপেটে গাঁদা নিতান্ত বিরক্তভাবে ফুটিয়া আছে,—তলায় একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়াছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভাল আছে—ডাক্তার

বলিয়াছে বোধহয় জীবনের আশা হইল। ভাল থাকিলেও রোগীর খুব চৈতন্ত আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁশ অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া যাইতে বলিতেছে। অপু সরিয়া যাইতে হরিহর রোগশীর্ণ ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক্ হইল, বাবার চোখের ও রকম দৃষ্টি কখনো সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কি শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে ক্ষীণ আলো জলিতেছে—মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানা সুরে যেন কি একটা শব্দ হইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। ঝুল-মাখানো কড়িকাঠ, স্যাঁতা মেজে, হাড়ভাঙা শীত, কাঠকয়লার আগুনের ধোঁয়া—সব মিলিয়া যেন একটা কঠিন দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যে বাঁচা যায়!

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।—অপু, ও অপু ওঠ, শীগ্‌গির গিয়ে ওপর থেকে হিন্দুস্থানী বৌকে ডেকে আন্‌তো—

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে স্বরধর্কুমারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ-বর্ষার ধারামুখর কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলা স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দ্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসাথী—দিগন্তের মায়ালীলার মত চৈত্র-বৈশাখের যে দিনগুলা অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্ব্বজয়াকে কি এক কুয়াসায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াসা বোধহয় বেলা হইলে, রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পেছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রংএর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ।

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ওভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য বাঙালীটোলায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিযা পৌঁছিল।

মনিকর্ণিকার ঘাটে সৎকার-অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপরউঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্তদিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দির-গুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্‌চিক্ করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী…

লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ………

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্ব্বাচন গান করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী···

লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ··················

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কোনোরূপে মাসখানেক কাটিল। এই একমাসের মধ্যে সর্ব্বজয়া নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনোটাই সমীচীন মনে হয় না। দু-একবার দেশে ফিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখনই সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায়। প্রথমত তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকী সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়াকিনিয়া আসা হইয়াছে, জমিজমা কিছুই আর নাই। দ্বিতীয়ত সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে সে পথে-ঘাটে, বৌ-ঝিদের সম্মুখে নিজেদের ভবিষ্যতের সুখের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়া মূর্খের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না, কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাহাকে সকলে লুফিয়া লইবে, অবস্থা ফিরিতে যে এক বৎসরও দেরী হইবে না—এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া সর্ব্বজয়া কতভাবে তাহাদের বুঝাইয়াছে! এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহার মধ্যে এরূপ নিঃসম্বল, দীন অবস্থায়, তাহার উপরে বিধবার বেশে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা ভাবিতেই সে লজ্জায় সঙ্কোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই হউক, ছেলের হাত ধরিয়া কাশীর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্য একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আবশ্যক, জাতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন, কাজকর্ম্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না? শেষ পর্য্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপুদের সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন। সর্ব্বজয়া অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া গেল। দিন-দুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্য যেন ইহারা প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটী কাশীতে নয়, তাঁহাদের বাড়ীর কাহারা কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হলদে রঙের বাড়ীটা। কাশীতে যে রকম বড় বড় বাড়ী আছে, সেই ধরনের খুব বড় বাড়ী। সকলের পিছনে পিছনে সর্ব্বজয়া ছেলেকে লইয়া সঙ্কুচিতভাবে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে পা দিতেই অভ্যর্থনার একটা রোল উঠিল—তাহার জন্য নহে—যে দলটি এইমাত্র কাশী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্য।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ীর গিন্নি সর্ব্বজয়ার সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটা-সোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—থাক্, থাক্, এসো, এসো—আহা এই অল্প বয়সেই এই—এটি ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে—কি নাম?

আর একজন কে বলিলেন—বাড়ী বুঝি কাশীতেই? না?—তবে বুঝি—

সকলের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বজয়া বড়া লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন ঝি তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিন হইতে সর্ব্বজয়া চুক্তিমত রান্নার কাজে ভর্ত্তি হইল। রাঁধুনী সে একা নয়, চার পাঁচজন আছে। তিন চারটা রান্নাঘর। আঁশ, নিরামিষ, দুধের ঘর, রুটীর ঘর, বাহিরের লোকদিগের রান্নার আলাদা ঘর। ঝি-চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়ীটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও একটু পৃথক। সেদিকটা যেন ঝি-চাকর-বামুনের রাজত্ব। বাড়ীর মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান মাত্র, বিশেষ কারণ না ঘটিলে রান্নাবাড়ীতে বড় একটা থাকেন না।

সর্ব্বজয়া কি রাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্ব্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভাল রাঁধিতে পারে। সে বলিল নিরামিষ তরকারী রান্নার ভার বরং তাহার উপর থাকুক। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—বাবুদের রান্না তুমি করবে? তা হ'লেই তো চিত্তির্। পরে পাঁচিঝিকে ডাক দিয়া কহিল, শুনচিস্, ও পাঁচি, কাশীর ইনি বল্‌চেন নাকি বাবুদের তরকারী রাঁধবেন। কি নাম গা তোমার? ভুলে যাই—মোক্ষদার ওষ্ঠের কোণের ব্যঙ্গের হাসিতে সর্ব্বজয়া সেদিন সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের কোনো তরকারী রান্না সেখানে খাটিবে না। ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাঁধাকপি ক্রিটার্স বলিয়া একটা যে তরকারী আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল।

গৃহিণী সর্ব্বজয়াকে মাস দুই বেশ লক্ষ করিয়াছিলেন। হাল্‌কা কাজ দেওয়া, খোঁজ খবর নেওয়া। ক্রমে ক্রমে অন্য পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এভাবে অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তি বড় একটা থাকে না। অন্য অন্য রাঁধুনীরা নিজেদের জন্য আলাদা করিয়া মাছ তরকারী লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাহিরে কোথায় লইয়া যায়। সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র।

রান্নার বিরাট ব্যাপার দেখিয়া সর্বজয়া অবাক্ হইয়া যায়, এত বড় কাণ্ডকারখানার ধারণা কোনো দিন স্বপ্নেও তাহার ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে,—দু'বেলায় তিন সের ক'রে তেলের খরচ? রোজ একটা যজ্ঞির তেল-ঘিএর খরচ!...পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন সরু চালের ভাত রান্নার বড় ডেক্‌চিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বাম্‌নীকে ডাক দিয়া বলিল—ও মাসীমা, ডেক্‌চিটা একটুখানি ধর্‌বে?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেক্‌চিটা কাত করিয়া ফেলিল, গরম ফেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনি ফোস্কা পড়িয়া গেল। গৃহিণী সেই দিনই তাহাকে রুটীর ঘরে বদলি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না সারা পর্য্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না।

সর্ব্বজয়া ছেলেকে লইয়া নীচের একটা ঘরে থাকে। ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই। কিন্তু সেটা এত নীচু, আর মেজে এত স্যাঁৎসেঁতে এবং ঘরটাতে সব সময় এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে, কাশীর ঘরও এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। দেয়ালের নীচের দিকটা নোনা-ধরা, রাঙা রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতে ঢুকিয়াই অপু বলে—উঃ, কিসের গন্ধ দেখচো মা, ঠিক যেন পুরোনো চা'লের কি কিসের গন্ধ বল দিকি? নীচের এ ঘরগুলা কর্ত্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করেন নাই, সেইজন্যই এগুলিতে চাকর-বাকর রাঁধুনীরা থাকে।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বাহির হইতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা দরজা। জানালায় সব কাচ বসানো। ঘরে ঘরে গদী-আঁটা বড় বড় চেয়ার, ঝক্‌ঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায়, এত ঝক্‌ঝক্ করে। অপুদের বাড়ীতে যেমন কার্পেটের পুরানো আসন ছিল, ঐ রকম কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভাল, পুরু ও প্রায় নতুন—কার্পেট মেজেতে পাতা। দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে, অপুর সমস্ত চেহারাখানা তাহাতে দেখা যায়। সে মনে মনে ভাবে—এত বড় বড় কাচ পায় কোথায়? জুড়ে জুড়ে করেচে বোধ হয়—

দোতলার বারান্দায় আর একটা বড় ঘর আছে—সেটা প্রায়ই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে চাকর বাকরে আলো হাওয়া খাওয়াইবার জন্য খোলে। সেটার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অপুর অদম্য কৌতূহল হয়। একদিন ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। কি বড় বড় ছবি! পাথরের পুতুল! বড় বড় গদী-আঁটা চেয়ার, আয়না,—সে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিতেছে, এমন সময় ছটু খানসামা তাহাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া রুখিয়া আসিয়া বলিল—কোন্ বা?...কাহে ইসমে ঘুসা?

হয়তো সেদিন সে মারই খাইত, কিন্তু বাড়ীর একজন ঝি দালান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিয়া বলিল—এই ছটু, ছেড়ে দাও, কিছু বোলো না—ওর মা এখানে থাকে—দেখচে দেখুক না—

সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সর্ব্বজয়া বেলা আড়াইটার সময় নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া মাঝে মাঝে অপু এসময় ঘরে আসে। তাহার মা তাহাকে এক-বার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি—ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহুরাত্রে কাজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয় না। এই দুপুরটার জন্য তার মন তৃষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। সর্ব্বজয়া বলিল—কে অপু! আয়—দোর ঠেলিয়া বামনী মাসী ঘরে ঢুকিল। সর্ব্বজয়া বলিল—আসুন, মাসীমা বসুন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বামনী মাসী বাবুদের সম্পর্কে আত্মীয়া। কাজেই তাহাকে খাতির করিয়া বসাইল। বামনী মাসীর মুখ ভারী ভারী! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দেখ্‌লে তো আজ কাণ্ডখানা বড়-বৌমার? বলি কি দোষটা…তুমি তো বরাবরই রুটির ঘরে ছিলে? মাছ, ঘি এনে চুপড়ীতে ক'রে রেখে গেল, আমি ভাবলাম বাঁধাকপিতে বুঝি—কি রকম অপমানটা দেখলে তো একবার? পোলোয়ার মাছ তো সে কথা ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠালে তো হোত। সদু ঝিও কি কম বজ্জাতের ধাড়ী নাকি?…গিন্নীর পেয়ারের ঝি কিনা? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে লাগখানা ক'রে লাগায়—ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি?

গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসী বলে, যাই, জলখাবারের ময়দা মাখিগে—চারটে বাজলো—

মাসী চলিয়া গেলে অপু মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস্ দুপুরে বল্ তো?…

অপু হাসিয়া বলিল—ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলের গান বাজচে মা—শুন্‌ছিলাম—ঐ বারান্দাটা থেকে—

সর্ব্বজয়া খুশি হইল।

—হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে বাবুদের ছেলেদের ভাব-সাব হয় নি?…তোকে ডেকে বসায়?…

—খু-উ-উব?…

অপু এটা মিথ্যা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোর শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার ভয় হয় এইবার হয়তো উহারা তাহাকে বলিবে নীচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নীচে নামিবার সময় ভাবে—কেউ তো কিছু বক্‌লে না? কেন বকবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে? এরা ভাল লোক খুব—

এ বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হইল না। তাহারা উহাকে আমলই দেয় নাই। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু—ইহারা একটা চৌকা পিঁড়ির মত তক্তা সামনে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটি চালিয়া এক রকম খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ক্যারাম

খেলা—সে খানিকটা ঘুরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলাটা দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেগুনবিচি খেলা ঢের ভালো।

বৈশাখের প্রথমে বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী নানাস্থান হইতে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদের আগমন সুরু হইল। সকলেই বড়লোকের ঘরের মেয়ে ও বড়ঘরের বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের ঝি-চাকর আসিয়াছে। নীচের তলার দালান-বারান্দা রাত্রে তাহারাই দখল করে। সারারাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্ব্বজয়াকে ডাকিয়া গিন্নী বলিলেন—ও অপূর্ব্বর মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন দুই রান্নাঘরের কাজ তোমার থাকুক, নানান্ জায়গা থেকে তত্ত্ব আসচে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো গুছিয়ে তোমাদের রুটীর ঘরের ভাঁড়ারে তোলাপাড়া করো—মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফলমুলুরী যা দেখবে পচ্‌বার মত, সদু ঝির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়ত রেখে দিও, জলখাবারের সময় নিয়ে আসবে বামনী মাসী—

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঝি বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্ব্বজয়া গুণিয়া সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টান্নের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রূপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল পনেরো ষোলটা। আম এখনও উঠে নাই, তবুও একটা বড় ধামা আমে বোঝাই হইয়া গেল।

সর্ব্বজয়া বামনী মাসীর হাতে খাবার তুলিয়া দিতে দিতে ভাবে—এই এত ভালমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলেটার জন্যে কিছু—আহা, বাছা আমার সরকারদের খাবার ঘরের কোণটায় কাঁচুমাচু হয়ে ব'সে দুটো ভাত খায়, না দিতে পারি পাতে দুখানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারী, না এক হাতা দুধ—তথ্‌খুনি ঐ সদু হারামজাদী লাগাবে নিজের ছেলের পাতে বাবুদের হেঁসেল থেকে সব—

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বরপক্ষ সকালের গাড়িতে আসিয়া পৌছিয়া শহরের অন্য এক বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল।

বাহিরের উঠান নিমন্ত্রিতদের দলে ভরিয়া গিয়াছে। সারা উঠানটাতে শতরঞ্চি পাতা, এক কোণে চওড়া জরিপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন, জরির ঝালর-দোলানো নীল সাটিনের চাঁদোয়া, দুপাশে কিংখাবের তাকিয়া, বড় বড় বেলফুলের মালা তিনগাছা করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো। চারিপাশে বরযাত্রীগণের চেয়ার ও কৌচ্। বিলাতী সেন্ট্ ও গোলাপ জলের পিচ্‌কারী ঘন ঘন ছুটিতেছে।

অপু এ সমস্ত বিশেষ কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, রাত্রি অনেক। মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত আছে! দামী বেনারসী শাড়ী-পরা মেয়েদের ভিড়ে উঠানের কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোট বাবুর মেয়ে অরুণা

কাহাকে ডাকিয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গ্যানটা বাড়ীর ভিতর আনিতে বলিতেছে।

বিবাহের দিন দুই পরে শখের থিয়েটার উপলক্ষ্যে আবার খুব হৈ চৈ। উঠানের এক কোণে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুলে ও অর্কিডে স্টেজটা খুব চমৎকার সাজানো। পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা স্টেজের মধ্যে খাটানো হইল। এ কয়দিনের ব্যাপারে তো একেই অপুর তাক্ লাগিয়াছে, আজকার থিয়েটার জিনিসটি কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই ভাল জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসরের সামনের দিকে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া রহিল।

ক্রমে ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীর দারোয়ানেরা জরির উর্দ্দী পরিয়া আসরের বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। সরকার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া কাজ দেখাইতে লাগিল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপ্‌সিন উঠিবার আর বেশী দেরী নাই, বাড়ীর গোমস্তা গিরিশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নীচু হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কে? অপু মুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু মুখচোরা বলিয়া খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল—ওঠো, ওঠো এখানে বাবুরা বস্‌বেন—ওঠো—গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নামতা পড়ার সুরে বলিল—আমি সন্দে থেকে এইখানটায় ব'সে আছি, পেছনে যে সব ভর্ত্তি, কোথায় যাবো?...তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনী দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল—তোর্ নাকি কিছু করেছে, জ্যাঠা ছোকরা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবার সামনে—বাবুরা বসবেন, উনি রাঁধুনীর ব্যাটা এসেচেন মুখের কাছে বসতে! কোথায় যাবো ওঁকে ব'লে দ্যাও—ফাজিল জ্যাঠা কোথাকার—যা এখান থেকে যা, ওই থামটামের কাছে বস্‌গে যা কোথাও—

পিছন হইতে দু'একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন—কি হয়েচে, কি হয়েচে গিরিশ কিসের গোল? কে ও?

—এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, এই জ্যাঠা ছোক্‌রা বাবুদের এখানে এসে ব'সে আছে, একেবারে সামনে—চন্দননগরের ওঁরা এসেচেন, বসবার জায়গা নেই—উঠ্‌তে বল্‌চি, আবার মুখোমুখি তর্ক?

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—দাও না, তুই থাপ্পড় বসিয়ে—

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মত আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলের চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনি এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোনো জায়গায় ছুটিয়া পলায়। তাহার পর সে গিয়া এক থামের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার গা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল ভয়ে, অপমানে,

লজ্জায়, তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দাগুলিতে হঠাৎ বেখাপ্পা গোছের কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল···কিন্তু চারিধারে চাকর-বাকর, ওপরের বারান্দায় টিনের আড়ালে মেয়েরা, ঝি রাঁধুনীরাও নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে! সে তো জানে না ওটা বাবুদের জায়গা? সে বার বার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল তাহাকে সম্ভবতঃ কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে, কত তো বাইরের লোক আসিয়াছে—কে তাহাকে চিনিয়াছে?

তাহার পর থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সম্মুখের এই লোকের ভিড়, বদ্ধ বায়ু, আলোর মেলা, দরোয়ান চাকরের হৈ চৈ—কোনোদিকে তাহার খেয়াল রহিল না। ছটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পানদান লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সারিতে পান বিলি করিতেছিল—সেইটার দিকে চাহিয়া অপুর গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ওপরের ঘেরা বারান্দার দিকে চাহিয়া ভাবিল, ওদিকে মা নাই তো? যদি মা একথা জানিতে পারে! কিন্তু অপুর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার মা তখন সে অঞ্চলেও ছিল না, এসব কথা তাহার কানেও যায় নাই।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরের বাড়ী নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মত থাকা সর্ব্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সুখে হৌক, দুঃখে হৌক, সে এতদিন একা ঘরের একা গৃহিণী ছিল। দরিদ্র সংসারের রাজরাণী—সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ীর গৃহিণী, বৌ-রাণীদের চেয়ে কম কার্য্যকরী ছিল না। এ যেন সর্ব্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্ব্বদা মন যোগাইয়া চলা, আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান থেকে চুণ না খসে! ছোটর ছোট তস্য ছোট!···এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে—কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই। প্রাণপণে খাটো—কেহ নাম করিবার নাই। উহারা যখন দিবে তখন গর্ব্বের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমার খাটার মূল্য দিতেছে বলিয়া সমানে সমানে দিবে না। তোমাকে হাঁটু গাড়িয়া লইতে হইবেই।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি?···বাহিরে যাইবার সুবিধা কৈ? আশ্রয় কে দিবে? কোথায় দাঁড়াইবে?···

চিরকাল এইরকম কাটিবে? যতদিন বাঁচিবে ততদিন? ওই বামনী মাসীর মত?···

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ। সন্ধ্যায় পর হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ী পিছনের গেটে আসিতে শুরু করিল। ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া সম্মুখেই মেয়ে-মহলের দোতলায় বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্ব্বেলের সিঁড়িটা নীল-

ফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া মোড়া। সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতলার বারান্দায় উঠিবার মুখে বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলিতেছে। দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়েরা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা মেয়েরা কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া, কেহ ধীর, কেহ ক্ষিপ্র, কেহ সুন্দর, অপূর্ব্ব গতি-ভঙ্গীতে, সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নীচের বারান্দার একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এ ধরণের দৃশ্য জীবনে সে প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুণ সে বিশেষ কিছু দেখে নাই। সকলের চেয়ে তাহার ভাল লাগিতেছিল এ বাড়ীর মেয়ে সুজাতাকে। সে কার্পেট-মোড়া মার্ব্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক একবার নামিয়া আসিতেছে, নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিতেছে—বা বেশ তো মণি-দি? একেবারে রাত আটটা কোরে? বকুলবাগানের বৌদি এলেন না? অভ্যর্থিতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—গাড়ী সাজিয়ে ব'সে আছি বেলা ছটা থেকে…বেরুনো তো সোজা নয় ভাই, সব তৈরী না হোলে তো…জানোই তো সব—

সুজাতা কাঞ্চনফুল রংএর দামী চায়না ক্রেপের হাতকাটা জামার ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেষ্টন করিয়া আদরের ধরণে তাঁহার ডান কাঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল—মা বল্‌ছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সাম্‌নের মাসে যাবেন কল্‌কাতা,—বুধবারে মা গেছ্‌লেন যে—ঠিক কিছু হোল?

সিঁড়ির ওপরের ধাপে মেজ বৌ-রাণী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশী, বোধ হয় ত্রিশের উপর, অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাঁর বেশের কোনো বাহুল্য নাই, ফিকে চাঁপারং-এর চওড়া লালপাড় রেশমী শাড়ীর প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ক্লিপ্‌ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গম্ভীর—এই বয়সেও দুধে-আল্‌তা রংএর আভা অপূর্ব্ব। মাসখানেক হইল উপযুক্ত ভাই মারা যাওয়াতে একটুখানি বিষাদের ছায়া পরিণত মুখের সৌন্দর্য্যকে একটি সংযত শ্রী দান করিয়াছে।

মণি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বৌ-রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির ওপরই দাঁড়াইয়া গেলেন—মেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে? এই দেখুন না, একবার আস্‌বো আস্‌বো করে… কাল ওঁরা এটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অব্‌ধি…

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপুর এ ধারণা ছিল না। অপু ইহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ইনি এতদিন এখানে ছিলেন না, ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে অপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরীর মেলা, দামী পুষ্পসারের মৃদু, মনমাতানো সৌরভ, বীণায় ঝঙ্কারের মত সুর ও হাসির লহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে?…

মেজ বৌ-রাণী অনেকক্ষণ হইতেই দেখিতেছিলেন সিঁড়ির কোণে কে একজন অপরিচিত

ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না—তাঁহার বাপও খুব বড় লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকেন। দু'ধাপ নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—খোকা, এস উঠে। দাঁড়িয়ে কেন? তুমি কোত্থেকে আসচ?···

অপু অন্যদিকে চাহিয়া অন্য একদল আগন্তুকদের লক্ষ্য করিতেছিল—হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বৌ-রাণী ডাকিতেছেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল—যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরেই রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিতেই সে উপরে যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে—এমন সময় মেজ বৌ-রাণী নিজেই নামিয়া আসিলেন—কাছে আসিয়া বলিলেন—কোত্থেকে আসচ খোকা?···

অতি কষ্টে অনেক চেষ্টায় অপুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি—আমি—ঐ—আমার মা—এই বাড়ী থাকেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ভয় হইল যে, এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে—কোথাকার রাঁধুনির ছেলে—একথা শুনিয়া এখনি হয়তো ইনি কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন—ইহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও এখান থেকে?···

মেজ বৌ-রাণী কিন্তু সে সব কিছুই করিলেন না—তিনি বিস্মিত মুখে বলিলেন—এ বাড়ী থাকেন তোমার মা?···কে বল তো···কি করেন? কতদিন তোমরা এসেচ?···

অপু ভাঙা ভাঙা কথায় আবোলতাবোল ভাবে পরিচয় দিল। মেজ বৌ-রাণী বোধ হয় ইহাদের কথা এবার আসিয়া শুনিয়াছেন—বলিলেন—ও তোমরা কাশী থেকে এসেছ বুঝি?···কি নাম তোমার?—তাহার সুন্দর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। বলিলেন—এস না ওপরে দাঁড়াবে—এখানে কেন?—ওপরে এস—

অপু চোরের মত বৌ-রাণীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপরে মেয়েদের বড় মজলিস—সারা বারান্দাটা কার্পেট মোড়া। ধারে ধারে বড় বড় কাঁচ-কড়ার টবে গোলাব গাছ, এরিকা পাম। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গ্যানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পরে অর্গ্যানের ধারে ছোট গদি আঁটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু'একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া—খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিমুখে একটি গান ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী নয়, রংটা মাঝামাঝি, কিন্তু গানের গলা ভারী সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটি দেখিতে তত ভাল নয়। মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারী সুন্দর মেয়ে, মায়ের মত সুশ্রী। আর কি মিষ্টি হাসি!

অপু ভাবিতেছিল এই সময় তাহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না কেন? কোথায় রহিল মা কোন্ রান্নাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এ সব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

মেয়েদের মজলিস্ চলিতেছে, এমন সময় নীচে এক হৈ চৈ উঠিল। গিরিশ সরকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল।

সদু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল—পোড়ানি !···কাণ্ড ভাখো···হি হি···বলে কিনা হুঁকোর মধ্যে—হি হি··· ।

দুই তিনজন নিমন্ত্রিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে রে ? কি ?

—ঐ ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কোত্থেকে···লুচি ভাজতে গিয়েচে···সরকারদের খাবার ঘরের উঠোনে ব'সে লুচি ভাজচে, বলে আসি বাইরে থেকে একবার · হুঁকোর মধ্যে···হি হি··· নিয়ে যাচ্ছে পুরে চুরি করে···আধসেরের ওপর···গোমস্তা মশায় ধরেচে···রামনিহোর সিং মার বা দিচ্চে···চুলের খুঁটি না ধরে—

সর্ব্বজয়ার আজ সকাল হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দুই মণ মাছ ভাজার ভার তার একার উপর—সকাল আটটা হইতে সে মাছের ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চেঁচামেচি শুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ ত্রিশ বছরের পাতলা ময়লা রংএর, ময়লা কাপড়-পরা বামুনের ছেলেকে দু-তিনজনে মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বর্ষণ করিতেছে—লোকটা ঠিকে রাঁধুনী, অন্তকার কার্য্যের জন্যই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হুঁকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে হুঁকাটি একদিকে ছিটকাইয়া ঘিটুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে—কাছা মারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে—লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হুঁকার ভিতরে ঘৃত পাওয়া একটা যে খুব স্বাভাবিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মধ্যে সন্দেহের বা আশ্চর্য্য হইবার কথা কিছুই নাই—এই কথা উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শম্ভুনাথ সিং দারোয়ান তাহাকে এমন এক ঠেলা মারিল যে, সে অস্ফুটস্বরে 'বাবা রে' বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠক্ করিয়া জোরে লাগিয়া বোধ হয় রক্তও বাহির হইল।

সর্ব্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে ক্ষেমিমাসি ?···আহা ওরকম ক'রে মারে ?···বামুনের ছেলে···

ক্ষেমি বলিল—মারবে না ! হাড় গুঁড়ো করে ছাড়বে···মারার হয়েছে কি এখনো···পুলিশে দেবে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

ক্ষেমি ঝির মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

সে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই ভটস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সর্ব্বজয়া চাহিয়া দেখিল একজন পঁয়ষট্টি সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ-রাণী ও এ বাড়ীর মেয়ে অরুণা ও সুজাতা। সকল ঝি-চাকরের দল তটস্থ অবস্থায় সিঁড়ির নীচের বারান্দায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া—এ উহার পিঠে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সর্ব্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপিচুপি বলিল, কে ক্ষেমিমাসি ? ক্ষেমি ঝি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল—কোথাকার রাণীমা—সর্ব্বজয়া ভাল শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল ঠিক এইরকম চেহারার মানুষ সে যেন কোথায় আগে দেখিয়াছে। গিন্নী কাহাকে

বলিলেন—খিড়কীর ফটকে ইহার পাল্কী আসিয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতে। বৃদ্ধার নিজের সঙ্গেও দুই তিনটি ঝি আসিয়াছে, তাহারা পিছনে পিছনে আছে। নানা বিদায় আপ্যায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হাস্য বিস্তার লাভ করিল, হঠাৎ এ বাড়ীর ঝি-চাকরের দল মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া খানিকক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সর্ব্বজয়া মনে মনে ভাবিল—এরা এত বড় লোক, এরা যখন এত খাতির করচে, তখন তো যে সে নয়···! বৃদ্ধার ষোল বেহারার প্রকাণ্ড পাল্কীটা খিড়কীর ফটকেই এতক্ষণ ছিল, বৃদ্ধাও পাল্কীতে উঠিলেন। তাঁহার দারোয়ানেরা পাল্কীর সামনে পিছনে দাঁড়াইল। তাঁহাকে বিদায় দিয়া গৃহিণী, অন্যান্য মেয়েরা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মাসীমা রুটীর ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—পয়সা রে বাপু, দেখলে তো পয়সার আদরটা? নিজেরই মস্ত জমিদারী, দুলাখ টাকা দান করেছেন বাঙাল দেশের কোথাকার কলেজের জন্যে—পয়সারই আদর—আর এই তো আমিও আছি···ওদের তো আপনার লোক ···গেরাজ্যি করে কেউ!

সর্ব্বজয়ার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এইরকম বয়েসের—সেই তাহার বুড়ী ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকরুণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায় সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু···

সর্ব্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কি না সর্ব্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে অপু দালান দিয়া যাইতেছে, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া মেজ-বৌরাণীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—দাঁড়াও না? তোমার নাম কি,—অপু না কি?

অপু বলিল—অপু ব'লে মা ডাকে—ভাল নাম শ্রীঅপূর্ব্বকুমার রায়···

সে একটু অবাক্ হইল। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর মুখ! রাণু-দি, অতসী-দি, অমলা-দি সকলেই দেখিতে ভাল বটে কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভাল কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ী আসিয়া পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বেকার ধারণা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেজ-বৌরাণীর মত সুন্দর কোনো মেয়ের কল্পনাও সে করে নাই! লীলাও মায়ের মত

সুন্দরী—সেদিন যখন লীলা মজলিসে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কবিতা সে ভাল শোনে নাই।

লীলা বলিল—তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ী? সেবার এলে তো দেখিনি?

—আমরা ফাল্গুন মাসে এইচি, এই ফাল্গুন মাসে—

—কোত্থেকে এসেচ তোমরা?

—কাশী থেকে। আমার বাবা সেইখেনে মারা গেলেন কি না—তাই—

অপুর যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লীলা, মেজ-বৌরাণীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে! খুশিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল।

লীলা বলিল—চল, আমার পড়ার ঘরে গিযে বসি, মাষ্টার মশায়েব আসবার সময় হয়েচে—এস—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আমি যাবো?

লীলা হাসিয়া বলিল—বারে, বল্‌চি তো চল, তুমি তো ভারী লাজুক?—এস—তুমি দেখোনি আমার পড়ার ঘর? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে?...

ঘর বেশী বড় নয় কিন্তু বেশ সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিলের দুপাশে দুখানা চামড়ার গদি আঁটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার খোলে একটা ছোট টাইমপিস্ ঘড়ি। একটা বই রাখিবার ছোট দেরাজ। চারপাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার এ্যাটাসি কেস্ খুলিয়া বলিল—এই ভাখো আমার জলছবি, মাষ্টার মশায কিনে দিয়েচেন, ভাগ শিখ্‌লে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো?

অপু বলিল—তুমি ভাগ জানো না?

—তুমি জানো? ভাগ কষেছ?

অপু তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কবে!...

এই ভঙ্গীতে অপুর সুন্দর মুখ আরো ভারী সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বেশ মজার কথা বল্‌তে পারো তো? পরে সে অপুর ঠোঁটের নীচে হাত দিয়া বলিল—এটা কি? তিল? বেশ দেখায় তো তোমায় মুখে, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত? তেরো? আমার এগারো—তোমার চেয়ে দু বছরের ছোট—

অপু বলিল—তুমি সেদিন মুখস্ত বলেছিলে, সেই একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার—

—তুমি জানো কবিতা?

—জানি—বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিচি—

—বলো দিকি?

লীলার গলায় সুর কি মিষ্টি, এমন সুর সে কোনো মেয়ের এ পর্য্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় দুলাইয়া বলিল—

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে,
তাকে খাট-পালঙ্ক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল—দাশু-রায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে—

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল—তুমি ভারী মজার কথা জানো তো? এমন হাসাতে পারো তুমি!...

লীলার মুখের প্রশংসায় অপুর মনে আহ্লাদ ধরে না। সে উৎসাহের সুরে বলিল—আর একটা বল্‌বো? আমি আরও জানি—পরে সে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ করে:—

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা
নিষ্কর্ম্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিয়েনবইএর ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্‌টা।
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার যোগাড় করিল। বলিল, দাঁড়াও লিখে নেবো—

লীলা এ্যাটাসি কেস্‌টা হইতে একটা কলম বাহির করিয়া বলিল—বলো দিকি?

অপু আবার বলিতে সুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক্ হইয়া বলিল—কালি নেওনি তো লিখ্‌চো কেমন করে?

লীলা বলিল—এ তো ফাউণ্টেন পেন—কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে—জানো না?

অপুর হাতে লীলা কলমটা তুলিয়া দিল। অপু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না!

—তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভরে নিতে হয়—এই ভাখো, দেখিয়ে দি—

—বাঃ, বেশ তো!—দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপুর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক্ হইয়া লীলার দিকে চাহিল। পরে লজ্জিতমুখে বলিল—না আমি নেবো না—

লীলা বলিল—কেন?

—উহুঁ—

—কেন?

—নাঃ।

লীলা একটু দুঃখিত হইল। বলিল—নাও না? আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নেবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত? বাস!···আর ফেরত দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা অপুর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে?

লীলা বলিল—ফাউন্টেন পেন দেবার জন্যে? কেউ বক্‌বে না, আমি মাকে বল্‌বো অপূর্ব্বকে দিয়ে দিলাম—বাবার কাছে থেকে আর একটা নেবো—বাবার ফটো দেখ্‌বে?···ওই ক্যালেণ্ডারের পাশে টাঙানো—দাঁড়াও পাড়ি—

তাহার পর লীলা আরও দু'তিনখানি ফটো দেখাইল। আলমারি হইতে খানকতক বই বাহির করিয়া বলিল—মাষ্টার মশায় কিনে দিয়েচেন—তুমি কোন্ স্কুলে পড়ো?

অপু কাশীতে সেই যা দিনকতক স্কুলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল—কাশীতে পড়্‌তাম, এখন আর পড়ি নে—কথাটা বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন সুরে বলিল, যেন না পড়িয়া খুব একটা বাহাদুরী করিতেছে। একখানা বইয়ে অনেক ছবি। অপু বলিল—বইখানা পড়তে দেবে একবারটি? লীলা বলিল—নাও না? আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাঁধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আল্‌মারিতে, এনে দেবো, পড়ো—

অপু বলিল—আমার কাছেও বই আছে, আনবো?

লীলা বলিল—চলো, তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপুর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেঁড়া বালিসের ওয়াড়, আল্‌নায় গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একখানা কি বই হাসিহাসি মুখে দেখাইয়া গর্ব্বের সুরে বলিল—আমার লেখা, এই ছাখো ছাপার অক্ষরে লেখা আছে আমার নাম—

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল—দেখি দেখি?

সেই কাশীর স্কুলের ম্যাগাজিনখানা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎফুল্ল মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপুর মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ তো হয়েচে, আমি এখানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো—

অপুর ভারী লজ্জা হইল। বলিল—না—

লীলা শুনিল না। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল—নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

—নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ—সেইখানেই তো আমাদের আসল বাড়ী—কাশীতে তো মোটে বছর খানেক হ'ল আমরা—

এমন সময় ছোট খোকা দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে ব'সে ? আমার পোড়ানি ! ওদিকে মাষ্টারবাবু ব'সে ব'সে হয়রান, আমি ওপর নীচে সব ঘরে খুঁজে খুঁজে—তা কে জানে তুমি এঁদো-পড়া কুঠুরিতে—এস এস—

লীলা বলিল—যা তুই, আমি যাচ্চি, যা—

ছোট খোকা বলিল—তা বসবার কি এই জায়গা নাকি ? বলে আমাদেরই তাই মাথা ধরে —তাই কি ওই আস্তাবলের খোট্টা মিস্তেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো ঝাঁট দেয়, না ধোয় ? উহু-হু, কি গন্ধ আসছে ছাখো—এস দিদিমণি, শিগ্‌গির—

লীলা বলিল—যাবো না যাঃ, আমি আজ পড়্‌বো না, যা বল্‌গে যা—কে তোকে বলেচে এখানে বক্‌বক্ কর্‌তে ? যা মাকে বল্‌গে যা—

ছোট খোকা থর্ থর্ করিয়া চলিয়া গেল। অপু বলিল—তোমার মা বক্‌বেন না ? কেন ওকে ওরকম বল্লে ?

পরদিন দুপুরে সে নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙিয়া চোখ চাহিয়াই দেখিল—লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে। সে মেজেতে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, লীলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনও সেই ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ডাগর চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হাসিমুখে বলিল—বেশ তো, দুপুর বেলায় বুঝি এমন ঘুমোয় ? আমি বা'র থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম—

অপু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল—সকালবেলা পড়তে আসেনি ? আমি তো পড়ার ঘর-টর সব খুঁজে দেখি কেউ কোথাও নেই—

লীলা অপুর স্কুলের সেই কাগজখানা অপুর হাতে দিয়া বলিল—মাকে প'ড়ে শোনালাম কাল রাত্রে, মা নিজেও প'ড়ে দেখ্‌লেন। অপুর সারা গা খুশিতে কেমন করিয়া উঠিল। অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইল। মেজ-বৌরাণী তাহার লেখা পড়িয়াছেন।

লীলা বলিল—এসো আমার পড়ার ঘরে, 'সখা-সাথী' বাঁধানো এনে রেখেচি তোমার জন্যে—

অপু আল্‌নার দিকে চাহিল। তাহার ভাল কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না। বলিল—এখন যাবো না—

লীলা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন ?

অপু ঠোঁট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব্ব সুন্দর দেখায় এই ভঙ্গীতে।

লীলা মিনতির সুরে বলিল—এস এস—

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

—বাবা, কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি ! না বল্লে আর হাঁ হবার যো নেই বুঝি ? আচ্ছা দাঁড়াও বইটা এখানে—

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

লীলা বলিল—অত হাসি কেন ? কি হয়েচে বলো—না বল্‌তেই হবে—বলো ঠিক—

অপু আল্‌নার দিকে হাসি-ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা বুঝিল। আল্‌নার কাছে গিয়া হাত দিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েচে, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি—ফাউণ্টেন পেনে লিখ্‌চো ? কেমন, বেশ ভাল লেখা হয় তো ?'

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দু'জনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুই জনে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বইএর উপর ঝুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার রেশমের মত চিকণ নরম চুলগুলি অপুর খোলা গায়ে লাগিয়া যেন গা সির্‌ সির্‌ করে। হঠাৎ লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গান জানো ?

অপু ঘাড় নাড়িল।

—তবে একটা গাও—

—তুমি জানো ?

—একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি ?

ছোট মোক্ষদা ঝি ঘরে উঁকি মারিয়া কহিল—এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও মনে ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক—এস দিকি, এই দুধটুকু খেয়ে যাও, জুড়িয়ে গেল—হাতে ক'রে খুঁজে খুঁজে হয়রান—

রূপার ছোট গ্লাসে এক গ্লাস দুধ। লীলা বলিল—রেখে যা—এসে এর পর গ্লাস নিয়ে যাস্‌—

ঝি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা বইয়ের ছবি দেখা চলিল। এক ফাঁকে লীলা দুধের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্ধেকটা—

অপু লজ্জিত স্বরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারী খোশামোদ কর্ত্তে হয় সব তাতে—কেন ওরকম ? আমাদের মুলতানী গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মত দুধ, লক্ষী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচ্‌কাইয়া বলিল—ইঃ লক্ষী ছেলে! ভারী ইয়ে কি না ? উনি আবার—

লীলা দুধের গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও—

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপরের দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা গ্লাসে চুমুক দিয়া বাকী দুধটুকু শেষ করিল, পরে সেও খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বেশ মিষ্টি দুধ, না ?

—আমার এঁটো খেলে কেন ? খেতে আছে পরের এঁটো ?

—আমার ইচ্ছে—একটুখানি থামিয়া কহিল—তুমি বেশ জলছবি তুল্‌তে জানো, ছাই জানো, দাও তো আজ আমার ক'খানা জলছবি তুলে ?

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সর্ব্বজয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া কোনো রকমে অপুর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ী, ঠাকুর-দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বামনী মাসী নাড়ু ভাজিতে সাহায্য করিল, দু'একজন রাঁধুনী-বামুনঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাহিরের সম্রান্ত লোকের মধ্যে বীরু গোমস্তা ও দীনু খাতাঞ্চি। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে, অপু নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া লীলার দেওয়া বাঁধানো 'মুকুল' পড়িতেছিল। খোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপু বলিল—বাঃ বেশ তো তুমি। ব'লে গেলে সোমবারে আস্‌বো কল্‌কাতা থেকে, কত সোমবার হয়ে গেল—ফিরবার নামও নেই—

লীলা হাসিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িল। বলিল—আসবো কি ক'রে? স্কুলে ভর্ত্তি হয়েচি, বাবা দিয়েচেন ভর্ত্তি ক'রে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কলকাতার বাড়ীতেই থাকবো কি না? এখন ক'দিন ছুটি আছে তাই মার সঙ্গে এলাম—আবার বুধবারে যাবো।

অপুর মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল—থাক্‌বে না আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল—বাবার শরীর ভালো হ'লে আবার আস্‌বো—

পরে সে হাসিমুখে বলিল—চোখ বুজে থাকো তো একটু? অপু বলিল—কেন?

—থাকো না?

অপু চক্ষু বুজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কার্ড-বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। বাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল ভাল দেশী ধুতি-চাদর ও রাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবি। লীলা হাসিমুখে বলিল—মা দিয়েচেন—কেমন হয়েচে? তোমার পৈতের জন্যে—

ধুতি-চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবিটা দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা, এ বাড়ীতে পা দিবার পূর্ব্বে অপু চক্ষেও কখনো দেখে নাই।

লীলা অপুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদলে গিয়েছে, আরও বড় দেখাচ্চে, দেখি নতুন বামুনের পৈতে?—তারপর কান বিঁধতে লাগ্‌লো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়েরও পৈতে হোল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল—

হঠাৎ অপু একখণ্ড 'মুকুল' দেখাইয়া বলিল—পড়েচো এ গল্পটা?

লীলা বলিল—কি দেখি?

অপু পড়িয়া শোনাইল। সমুদ্রের তলায় কোন্ স্থানে স্পেনদেশের এক ধনরত্ন-পূর্ণ জাহাজ দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ডুবিয়া যায়—আজ পর্য্যন্ত অনেক খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারী খুশি হইয়াছে।

বলিল—কেউ বার কর্ত্তে পারেনি—কত টাকা আছে জানো? একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ—পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা-রূপো·· এক পাউণ্ড তের টাকা—গুণ করো দিকি? তাহার পরে সে তাড়াতাড়ি একটু কাগজে আঁকটা কষিয়া দেখাইয়া বলিল—এই ছাখো এত টাকা!···আগেও আঁকটা সে একবার কষিয়াছে। উজ্জ্বল মুখে বলিল—আমি বড় হোলে যাবো—দেখ্‌বো গিয়ে—ঠিক বার কর্‌বো দেখো—কেউ সন্ধান পায়নি এখনও সেখেনে—

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যাবে? কোন্ জায়গায় আছে তুমি বার করবে কি করে?

—এই ছাখো লিখেচে "পোর্ত্তো প্রাতার সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভে"—খুঁজে বার করবো।···'

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালোই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সবাই সব বাহির করিয়া লইলে তাহার জন্ম কি থাকিবে?—সে বড় হইয়া তবে কি তুলিবে? এখন সে যাওয়া পর্য্যন্ত থাকিলে হয়! ··

লীলার বয়স কম হইলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—ওদের মত জাহাজ পাবে কোথায়? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই—ওদের মতন—

—সে হয়ে যাবে, কিন্‌বো, বড় হোলে আমার টাকা হবে না বুঝি?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোন তর্কও উঠাইল না।

খানিকটা পরে বলিল—তুমি কল্‌কাতা গিয়েচ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি দেখিনি কখ্‌খনো—খুব বড় শহর?—এর চেয়ে বড়?

লীলা হাসিয়া বলিল—ঢের ঢের—

—কাশীর চেয়েও বড়?

—কাশী আমি দেখিনি—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়া আসিল। একখানা খাতা দেখাইয়া বলিল—ছাখো তো কেমন ফুলগাছ এঁকেচি, কি রকম ড্রইংটা?

অপু খানিকটা পরে বলিল—আমি শুইগে, মাথাটা বড্ড ধরেচে—

লীলা বলিল—দাঁড়াও, আমি একটা মন্তর জানি মাথা-ধরা সারাবার—দেখি? পরে সে দুহাতের আঙুল দিয়া কপাল এমন ভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে, অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—উঃ বড় সুড়্‌সুড়ি লাগ্‌চে!—লীলা হাসিয়া বলিল—আমার বড় মামাতো ভাইকে কুস্তি শেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা—বেশ ভালো না। সেরেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনর্ব্বার কলিকাতায় চলিয়া গেল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইহাদের বাড়ী, সেখান হইতে কিছুদূরে গিয়া বাঁ-ধারে ছোট গলির মধ্যে একতলা বাড়ীতে স্কুল। জনপাঁচেক মাষ্টার, ভাঙা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙা চেয়ার, তেলকালি ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড, পুরানো ম্যাপ খানকতক—ইহাই স্কুলের আসবাব। স্কুলের সাম্‌নেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া

বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ীর চুনবালির কাজ-বিরহিত নগ্ন ইটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে যাইতে দেখে ধাঙড়ে ড্রেন সাফ্ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড়ো করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়া যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাহার ভাল লাগে না, মোটেই ভাল লাগে না, শহরের এই সব ইট-সিমেন্টের কাণ্ড-কারখানায় তাহার হাঁফ ধরে, কেমন যেন দম আট্‌কাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশী নাই, দু'একটা এখানে ওখানে। সুরকীর পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ীর মাঝখানের ফাঁকে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহপাঠীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। একতলা খোলার ঘর। অপরিসর উঠানের চারিধারের ঘরগুলিতে এক-একঘর গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরানো চটের পর্দ্দা। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বিঘতের বেশী উঁচু নয়, কাজেই আর্দ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো-হাওয়ার বালাই নাই। উঠান বিশ্রী নোংরা, সকল গৃহস্থই একসঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সবশুদ্ধ মিলিয়া অপুর অত্যন্ত খারাপ লাগে, মন যেন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহারা উহাকে বসিতে বলিলেও সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াও সেই বদ্ধতা। বরং যেন আরও বেশী। এখানে ইট-সিমেণ্ট আর মার্ব্বেল পাথরে চারিধার মায় উঠান পর্য্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্যরকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয়, এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ী চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কৈ? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোরের মত! কে কি বলিবে, উঁচু গলায় কথা কওয়া যায় না, ভয় করে।

এক-একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়া খাতাঞ্চি একটা লোহার সিক বসানো খাঁচার মত ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকে। অনেকগুলি খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে স্তূপীকৃত করা। ছোট্ট কাঠের হাতবাক্স সামনে করিয়া বুড়া সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অন্ধকার যে, দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলে। গিরীশ গোমস্তা জমা-সেরেস্তায় বসে। নিচু তক্তপোষের উপর ময়লা চাদর পাতা—চারিধারে দু'কোণে কাপড়ে বাঁধা রাশি রাশি দপ্তর। সে ঘরটা খাতাঞ্চিখানার মত অত অন্ধকার নয়, দু'তিনটা বড় বড় জানালাও আছে, কিন্তু তক্তপোষের নীচে রাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেঁড়া কাগজ এবং কড়িকাঠে মাকড়সার জাল ও কেরোসিন আলোর ঝুল। যখন বীরু মুহুরী হাঁকিয়া বলে—ওহে রামদয়াল দেখো তো, গত তৌজিতে বাস্তকর খাতে কত খরচ লেখা আছে?...তখনই কি জানি কেন অপুর মনে দারুণ বিতৃষ্ণা আবার জাগিয়া উঠে।

সকালবেলা। অপু দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ীর ছেলেরা চেয়ার-গাড়ীটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়ীটা নূতন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছে, ডাণ্ডা-লাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদী, বড় বড় চাকা—ঝকঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল—এই, এসে ঠেল্ তো একবার আমাদের—

এই গাড়ীটা আসা অবধি অপুর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুশী হইয়া বলিল—ঠেল্‌চি, আমায় একবার চড়্‌তে দেবেন তো ?

রমেন বলিল—আচ্ছা হবে, ঠেল্ তো—খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল—আচ্ছা খুব হয়েচে এবেলা—থাক্ আর নয়—পরে গাড়ী লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অপু বলিল—আমি এটু্ চড়্‌বো না ?

রমেন বলিল, আচ্ছা যা যা, এ বেলা আর চড়ে না, বেশী চড়্‌লে আবার ভেঙে যাবে—দেখা যাবে ও বেলা—

ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল—বা, আপনি যে বল্লেন আমাকে একবার চড়্‌তে দেবেন আমায় পালায় ? আমি সকলকে ঠেল্‌লাম—বেশ তো ? সেদিনও ওইরকমই চড়ালেন না শেষকালে—;

রমেন বলিল—ঠেল্‌লি কেন তুই, না ঠেল্‌লেই পার্‌তিস্—যা—কে বলে'চে তোকে চড়্‌তে দেবে ? গাড়ী কিন্‌তে পয়সা লাগে না ?

সে বলিল—কেন আপনিও বল্লেন; ওই সন্তুও তো বল্লে—ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়েছে—আর আমি বুঝি একবারটি—বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল—আমি বলিনি যা—

সন্তু বলিল—ধু-র্-র্-র্—বক দেখেচ ?

কোনও কিছু না, হঠাৎ বড়বাবুর ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা—আমরা চড়াবো না আমাদের খুশি—তোর নিজের ঘরের দিকে যা—এদিকে আসিস্ কেন খেলতে ?

টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুনই হউক বা সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্যই হউক—অপুর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল—সে ঝাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল—কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইতে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঝি-চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানায় বড়বাবু সকালবেলা কাছারি করিতেছিলেন, তিনি সদলবলে নীচে নামিয়া আসিলেন। দশদিক হইতে দশ ঘটি জল বাতাস⋯জলপটি, হৈ-চৈ কাণ্ড !

গোলমাল একটু কমিলে বড়বাবু বলিলেন—কৈ, কে মেরেচে দেখি? রামনিহোরা সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপুকে বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া দিল। বড়বাবু বলিলেন এ কে? ওই সেই কাশীর বামুনঠাকুরুণের ছেলে না?

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভারী বদ্ ছোক্‌রা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সেবার থিয়েটারের দিন, বসেছে একেবারে সকলের মুখের সামনে বাবুদের জায়গায়, স'রে বস্‌তে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি? সেদিন আবার দেখি ওই শেঠেদের বাড়ীর মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আসচে—এই বয়সেই তৈরী—

বড়বাবু রমেনকে বলিলেন—সকালে আজ তোমাদের মাষ্টার আসেনি? পড়াশুনো ছিল না? এই, আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ? ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্ত্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের?

রমেন কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—ওই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিগ্যেস করুন বরং সন্তুকে—আপনার সেই ছবিওয়ালা ইংরাজি ম্যাগাজিন্‌গুলোর ছবি দেখ্‌তে চা'স—আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে এটা সেটা নেড়ে-চেড়ে দেখে—

গিরিশ সরকার বলিল—দেখুন, শখটা দেখুন আবার—

এবার অপুর পালা। বড়বাবু বলিলেন—স'রে এসো এদিকে—টেবুকে মেরেছ কেন?

ভয়ে অপুর প্রাণ ইতিপূর্ব্বেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে কিন্তু এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল—টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে—

বড়বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—টেবুর বয়স কত আর তোমার বয়স কত জান?

গুছাইয়া বলিতে জানিলে অপুর পক্ষ হইতেও একথা বলা চলিত যে, টেবুর বয়স কিছু কম হইলেও কার্য্যে সে অপুর জেঠামশাই নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে, টেবু ও এ-বাড়ীর সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খেপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকর মারে—সে না হয় একটু খেলা করিতে যায় এই তো তাহার অপরাধ! কিন্তু উঠানভরা লোকারণ্যের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে, বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল—সে শুধু বলিল—টেবু ও—আমাকে—শুধু শুধু—আমাকে এসে—

বড়বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—স্টুপিড্, ডেঁপো ছোক্‌রা—কে তোমাকে ব'লে দিয়েচে এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশতে—এই দাও তো বেতটা—এগিয়ে এস—এস—

সপাং করিয়া এক ঘা সজোরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিস্ময়ের চোখে বড়বাবু ও তাঁহার পুনর্ব্বার উদ্যত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল—জীবনে সে কখনও ইহার পূর্ব্বে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়,—তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে

গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না—পরে সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেতটা ঠেকাইবার জন্ত হাত দুখানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে, সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল। রাঁধুনীর ছেলের যাহাতে স্পর্দ্ধা আর না হয় বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষাই দিলেন। অন্ত বেত হইলে ভাঙিয়া যাইত, এ বেতটা বোধ হয় খুব দামী।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন—বুড়ো ধাড়ী বয়াটে ছোক্‌রা কোথাকার, আজ তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্চি, ফের যদি শুনি এ বাড়ীর কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ, কান ধ'রে তক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দেবো—পরে কাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কাশী থেকে আন্‌লেম, ভাবলাম জাতের মেয়ে থাকুক্—দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাঁধে—উনি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান—

ধীরেনবাবু বলিলেন—ওসব ওই রকমই হয়ে থাকে—এর পর কোকেন খাবে—মার বাক্স ভাঙ্‌বে—ওর নিয়মই ওই—তার ওপর আবার কাশীর ছেলে—

বাড়ীর মধ্যে সব কথা গিয়া পৌছায় না, অপুর মার খাওয়ার কথা কিন্তু সর্ব্বজয়া শুনিল। একটু ভাল করিয়াই শুনিল। গৃহিণী বলিলেন—ওরকম যদি গুণ্ডো ছেলে হয় তা হ'লে বাছা—ইত্যাদি। কুটীর ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপু স্কুলে গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনো মাকে বলেও না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সর্ব্বজয়ার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিল, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিসর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অপুর গায়ে হাত! সে যে এখনও বলে, মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে যখন তুমি রান্না-বাড়ী থেকে আসবে, তখন রাত্রে তোমায় একদিন এমন ভয় দেখাবো!···তাহার কি কোনো বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?

সর্ব্বজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।···

অন্ধকার রাত···আকাশে দু'একটা তারা জল্ জল্ করে—আস্তাবলের মাথায় আমলকী গাছের ডালে বাতাস বাধে, দালানের কোণের লোহার ফুটা চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কান্নার বেগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—

—ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ধন, তুমি তো জানো ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সবুলে আমি স্থির থাকতে পারি নে, যা কিছু শাস্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও ঠাকুর, ওকে কিছু বোলো না, আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর, তা আমি সইতে পারবো না—

সকাল সকাল অপুদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিল তাহাদের ফুটবল খেলায় অপুকে রেফারী হইতে হইবে। অপু ভারী খুশি হইল, ফুটবল খেলা সে এ

শহরে আসিবার পূর্ব্বে কোনোদিন দেখে নাই, সে খুব ভাল খেলিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলায় রেফারী হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল—সেই বড় হুইসিলটা বাড়ী থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে প'ড়ে রয়েচে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন—

পথে আসিতে আসিতে অপুর সকালের কথাটা মনে উঠিল। আজ সারা দিনটাই সে সে-কথা ভাবিয়াছে। বার্ডসাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরিশ সরকারের সামনে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক, কিন্তু বার্ডসাই কি সে রোজ খায়? সেদিন মেজ বৌ-রাণীর দেওয়া রাঙা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার হঠাৎ শখ হইয়াছিল, এই রকম পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডসাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই খাবারের পয়সাটায় বার্ডসাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দিপুরে লুকাইয়া খাইতে গিয়াও ভাল লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না। তাহার মনে হইয়াছিল—দূর! এ না কিনে এক পয়সার ছোলা ভাজা কিন্‌লে বেশ হোত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়; কিন্তু গিরিশ সরকার না জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে যা তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নাই? থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত। মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই জন্তই তো সে ওবেলা তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল!

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই! সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহারা তাহার সহিত কথা কহিতে দিবে?

বাড়ী ফিরিতেই দেউড়ির কাছটায় আসিয়া শুনিল উপরের বৈঠকখানায় কলের গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুশি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উঁচু করিয়া দোতলার জানলার নীচে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তা হইতে গানের কথা সব ভাল বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটি ভারী চমৎকার, শুনিতে শুনিতে—স্কুল, খেলা, রেফারীগিরি, ওবেলার মার-খাওয়া মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের সুরে তাহার মনটা আপনা-আপনি কোথায় উড়িয়া যায়—সেই তখন তখন নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, ওপারের উলুখড়ের মাঠে ছোট রাঙা ফুলে-ভরা শিমুল চারা, তাদের পিছনে কতদূরে নীল আকাশের পট—খড়ের মাঠ যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুল চারা যেন আঁকা, শুক্‌না ডালে কি পাখী বসিয়া থাকিত, সব যেন আঁকা। তাহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা. ব হু-উ-দূরের দেশটা কোন্ দেশ তাহার জানা নাই, মাত্র মনের খুশিতে সেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দভরা পরিচিত সুরের ডাক আসে—অপু—উ-উ-উ—উ—

মন খুশিতে ভরিয়া উঠিয়া সাড়া দেয়—যা-আ-আ-ই-ই-ই—

তাহাদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—সকাল সকাল এলি যে? সে বলিল—ওপর ক্লাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাফ স্কুল—

তাহার মা বলিল—আয় বোস্ এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আজ তোকে ওরা কি জন্যে নাকি ডেকে নিয়ে গিয়ে নাকি—বকেচে?

—নাঃ, ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে, তাই বড়বাবু ডেকে বল্‌ছিলেন কি হয়েচে,—তাই—

—বকে-টকে নি তো?

—নাঃ—

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কথা ভাব্‌চি, এখেন থেকে চ'লে যাবি?

সে আশ্চর্য্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল—কোথায় মা, নিশ্চিন্দিপুর? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর-পূজো করবো—পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে—নিজেদের দেশ, বেশ হবে—এখানে আর থাক্‌বো না—

সর্ব্বজয়া বলিল—সে কথাও তো ভাবচি আজ দু'বছর। সেখানে যাবি বল্‌চিস্, কি আর আছে বল দিকি সেখানে? এক বাড়ীখানা, তাও আজ তিন বছর বর্ষায় জল পাচ্চে, তার কিছু কি আছে এ্যাদ্দিন? মান্ধাতার আমলের পুরোনো বাড়ী—ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো—গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও নেই—শত্তুর হাসাতে যাওয়া···

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কাজ কল্লে হয়, চল্ বরং—আচ্ছা কাশী যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। তাহার মায়ের তখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ী চলিয়া গেল। অপুর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে, দিদি বলিত, যাত্রাদলের বন্ধুও সেবার বলিয়াছিল। সে যদি কোনো যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মার বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে!

উঃ কি গরম! রান্নাবাড়ীর নলের মুখে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কার্নিসের গায়ে রোদ···ঘরের ভিতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার···আস্তাবলে মাতাবিয়া সহিস কি হিন্দি বুলি বলিতেছে···পাথর-বাঁধানো মেঝেতে ঘোড়ার খুর ঠুকিবার খট্ খট্ আওয়াজ··· ড্রেনের সেই গন্ধ···তাহার মাথাটা এমন ঘুরিয়াছে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল···এখন একটু শুয়ে নি, এরপর উঠে খেলার মাঠে যাবো···মোটে তিনটে বেজেছে—এখন বড় রোদটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। এ কথাটা এত-দিনে এভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন্ কোণে সব সময়েই স্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত যে, এ সবের শেষে যেন তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে—

তাহাদের জন্ত ! যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না —সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।

কিন্তু আজকার সমুদায় ব্যাপারে বিশেষ করিয়া মায়ের ও বড়বাবুর কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর কি কখনও সে তাহাদের গাঁয়ে ফিরিতে পাইবে না ?—কখনো না ?—কখনো না ?

এই বিদেশ, এই গিরিশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা—না হয় মায়ে-ছেলে হাত ধরিয়া ছন্নছাড়া পথে পথে চিরকাল—এরাই কি কায়েম হইতে আসিয়াছে ?

আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাধাইয়াছে, রান্নাবাড়ীর ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল, একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই···সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে·· খুব, খুব মাটির ভিতর···নীচের দিকে কে যেন টানিতেছে···বেশ আরাম···মাথা ধরা নাই, বেশ আরাম।··

উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে ! দিদির যা কাণ্ড—এত রদ্দুরে চড়ুইভাতি ! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রদ্দুরে চড়ুইভাতি ?

রাণুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। রাণুদির ছলছলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা। সে কি করিবে ? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের চলে না যে ? রাণুদি না লীলা ?

হারাণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্ত আনিয়া বাজাইতেছে···ভারী চমৎকার বাজায় ! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা একটা পয়সা দেবে ?···

তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েচে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখ্‌তে দিস্ খোকা।

সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা ? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথকঠাকুরের মত।

তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইষ্টিশান। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে, মা-ঝে-র পা-ড়া। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙা পাঞ্জাবিটা। কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধভরা বাতাসটা।

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না···সে চলিয়াছে···চলিয়াছে চলিয়াছে···সে আর মা···এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না···ও কাস্তে-হাতে কাকা শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু ব'লে দাও না আমাদের ? যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে ?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হ্যারে, ওঠ্‌ ও অপু বেলা যে আর নেই, বল্‌লি যে কোথায় খেল্‌তে যাবি ?—ওঠ্‌-ওঠ্‌।

সে মায়ের ডাকে ধড়্‌মড়্‌ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল—উঃ কি বেলাই গিয়াছে! রোদ একেবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে ? তাহার মা বলিল—বলজি যে কোথায় খেলতে যাবি, তা গেলি কৈ ? অবেলায় প'ড়ে প'ড়ে কি ঘুমটাই দিলি ? দেখো তোর সেই বাঁশিটা বের্‌ করে ?

তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া বাঁশিটা মা বিছানার কোণে রাখিয়া দিল বটে, সে কিন্তু রেকারীগিরি করিতে যাওয়ার কোনো উৎসাহ দেখাইল না। ঘরের মধ্যে এরই মধ্যে অন্ধকার। উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা একেবারে নাই। কি অসহ্য গুমোট! আস্তাবলের ড্রেনের গন্ধটা যেন আরও বাড়িয়াছে। ফটকের পেটাঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া বোধ হয় ছ'টা বাজিতেছে।

ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।

আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই—তি—ন বৎসর! কতকাল!

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারীপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েবের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়া ভিটার মিষ্ট লেবু ফুলের গন্ধে সন্‌নেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি ? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর ধারের শিরীষ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক ?

এতদিন তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুলতলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন-অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।

তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে রাঙুকাকা হয়তো এতক্ষণ তাহার অভ্যাসমত অবেলায় স্নান করিতে নামিয়াছে, চাল্‌তে পোতার বাঁকে নতুন কষাড় বনের ধারে ধারে অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ী পাতিয়াছে, আজ সেখানকার হাট-বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোলে রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, আর তাহারই তলাকার মেঠোপথ বাহিয়া গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিনু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।

এতক্ষণে তাহাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্‌ কিচ্‌ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট, নিঃশব্দ, শান্ত বৈকাল—সেই হল্‌দে পাখীটা আজও আসিয়া পাচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে…

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায়

সেখানে কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।···কেহ কোন দিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোনোদিন জানিবে না, ওড়্-কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ব্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন।

ওবেলা এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনাবিচারে মার খাইয়াও তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই, কিন্তু এখন নির্জ্জন ঘরের জানালাটাতে একা-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝরঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়—ভগবান—তুমি এই কোরো ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার—

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয় নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে ···দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্য্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে···

দিন-রাত্রি পার হয়ে, জন্ম-মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়··তোমাদের মর্ম্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না ··চলে···চলে···চলে···এগিয়েই চলে···

অনির্ব্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ···

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি! ··

চল এগিয়ে যাই।

মেঘ-মল্লার

মেঘ-মল্লার

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্ত অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশ-পারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকার নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গ'ড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্যে এনেছিল। একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী রেশমী শাড়ি এনেছিল বেচবার জন্ত। তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধ'রে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মন্দিরের উঠোনে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপ-খেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল, যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখবার পর তার চোখে পড়ল একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্যে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের ম ন হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উঁচু ক'রে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি অবন্তীর গাইয়ে সুরদাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না?

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য্য হ'ল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি ক'রে?

প্রদ্যুম্ন সসম্ভ্রমে জানালে, হ্যাঁ, সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে।

প্রৌঢ় বললেন—তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না ক'রে আসতাম না। তোমাকে ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।

—আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?

—নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে জান?

—হ্যাঁ জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্ব্বে থাকতেন না?

—তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোন একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তুমি এখানে কোথায় থাক ?

—এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন ?

— সে তোমাকে বলব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।

প্রদ্যুম্ন প্রণাম করে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি ; মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ি ফিরছিল। প্রদ্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যুম্নের মধ্যে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তাকে একটু বেশি শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত ক'রে বিহারে ফিরলে কি আর রক্ষা থাকবে ?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ের আড়ালটা সরে গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রদ্যুম্ন দেখলে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াচ্ছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। আরও দূরে একখানা সাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিকের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে আসছিল, চারিধারে তার শ্বেতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্‌কা করে টানা।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধ'রে কে ঈষৎ টানলে।

প্রদ্যুম্ন পিছন ফিরে চাইতেই যে কাপড় ধ'রে টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে কিশোরী, তার সোনার-চাঁপা রং-এর ছিপছিপে দেহটি বেড়ে' নীল শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ানো।

প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ের সুরে ব'লে উঠল—কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা ! আমি তোমাকে এত খুঁজলাম, কৈ দেখতে পেলাম না তো ?

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তারপরে সে একটু অভিমানের সুরে বললে —আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি ! যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি !

—সত্যি বলছি সুনন্দা, তোমাকে খুঁজেছি। নামবার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি, তুমি কাদের সঙ্গে এলে ?

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আসছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু ক'রে সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল থেকে তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক প্রদ্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথ-ঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি ক'রে? আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনারব্ধ দেখে তাকে ভর্ৎসনা করলেই বা কি করা যাবে? এ রকম রাত্রে যে যুগেযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে ওঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে মহাকোট্‌ঠি বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানসসুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য সে-ই কি দায়ী!

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নর-নারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রদ্যুম্নের গতি আরো দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে তার সর্ব্বাঙ্গে আলো-আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে ব'লে উঠল—আর একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চ'লে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না!

সুনন্দাকে দেখে প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুশী হ'ল, মুখে বললে—নাঃ, তা আর দেখব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে! আর না দেখতে পেলেই বা কি? আমি তোমার ওপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বলছি।

সুনন্দা বললে—দোষ করবেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে! সেদিন কি কথা বলছিলে মনে আছে? তা না, যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি ক'রে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বললে—তুমি বড়মানুষের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে—যাও! আর মিথ্যে ভানে দরকার নেই। কি কথা মনে ক'রে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে ব'লে উঠল—বুঝতে পেরেছি—সেই বাঁশী?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে—ভেবে দেখ বলেছিলে কিনা। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে ব'সে আছি! একে ত এলেন বেলা ক'রে, তার ওপর—যাও!

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে তো আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে—আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে,

কিন্তু তখন ও আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি ক'রে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে—আচ্ছা ধ'রে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বলছ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণ-বাজিয়ে আসবেন; তুমি তো জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে—বাবা তিন চার দিন হল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো তাই! নইলে আমি ভাবছি এত রাত পর্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে—চুপ চুপ, তোমার কি একটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে—এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে ব'লে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে—দিও ব'লে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তারপর বললে—আচ্ছা থাক্, ব'লে দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই, আমার সঙ্গেই আছে—সত্যি বলছি, তোমার শোনাবার জন্যেই এনেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজছিলাম, বীণটা ভালো ক'রে শিখব ব'লে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজালে বটে, কিন্তু সে যেন ভাসা-ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। তারা দুজনে নির্জনে আরও কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভালোবাসত ব'লে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্যে দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি!

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুঁথির ভূর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং!

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড় একটা কেউ আসত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত-আট মাস হ'ল

সেখানে বাস করছেন। তাঁরই দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত ব'লে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

অর্দ্ধ-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—চল, বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভালো ক'রে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন—হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জানতাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্ত্তি দূর থেকে দেখে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললে—আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে। হাঁ, তোমার পিতা তো একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে—একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন—পারা তো উচিত। তোমার বাবাকে জান্‌ত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণপত্র আস্‌ত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার!

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে—বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন—কই দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন কোন্ সময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন ক'রে রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুলফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্নারাতের মর্ম্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে রস যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল; সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশি কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুরদাস তাকে বললেন—শোন প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব ব'লে পূর্ব্বেও আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম, তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা

তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন?

সে বললে—কি কথা না শুনে কি ক'রে—

সুরদাস বললে—তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হলে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্তে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা করলে সুরদাসের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন—নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো? তার সামনেই বড় মাঠ। ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীনকালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল; শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ ক'রে সকলেই আগে ওই মন্দিরে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা; তার পর মন্দির ভেঙে-চুরে ওই দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে ব'সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাঁকে আনতে পারা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা ক'রে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি ক'রে হয়? আচার্য্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্ত্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—এ কি সম্ভব?

প্রদ্যুম্ন চুপ ক'রে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে কি তোমার অমত আছে?

প্রদ্যুম্ন বললে—সে জন্তে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, এটা কি ক'রে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সামনের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা ক'রে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে ব'লে দেব।

প্রদ্যুম্ন আর একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তারপর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরল।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং! শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য্য বসুব্রত বলেন বটে……

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সেবার ঘনঘোর বর্ষা নামল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকারে তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জ্জনতা, দূর বনের খোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর ঘাটে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এসে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করলে। সন্ধীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে অন্ধকার রাতে একজন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল।

সুরদাস বললেন—প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভালো লাগল না। কিন্তু তবু সে ব'সে একমনে বাঁশীতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনের মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শালবনের ডালপালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শালবনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার শয্যাশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সাদা

মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল। প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে···হাঁ, এই তো দেবী বাণী। এঁর বীণার মঙ্গল-ঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্ব্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্য্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী।

প্রদ্যুম্ন চেয়ে থাকতে থাকতে দেবীর মূর্ত্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রদ্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হ'ল না। সে যা দেখলে—এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। সুরদাস বললে আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন বোধ হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে, তাঁর চোখ দুটো যেন অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে জল্ জল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল, পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হলদে রং-এর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল। তারপর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয়, বরং···কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে শিমুল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কি! এঁকেই তো সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী তো!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, সেই অপরূপ দ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার দল থেকে যেমন আলো

বার হয়—তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্দ্ধনিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিয়াল গাছগুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নের মত।

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে এ কি কাণ্ড!

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌঁছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে স্বপ্ন দেখলে—অজ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন; তিনি যতই উপরে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুকরে রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে···ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার ক'রে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত!

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—একথা আগে জানাওনি কেন?

—তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—

—বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন?

—এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্দ্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—এই রকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি জানতাম। শঙ্খসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞান-হীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা না করতে পারে এমন কোন কাজই নেই—আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্দ্ধন বললেন—এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু যাক, তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি। আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি রকম বল দেখি?

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন—আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাস নয় বা তার বাড়ী অবন্তীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে—

প্রদ্যুম্ন অধীর ভাবে বলে উঠল, কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন, সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু'শত বৎসর পূর্ব্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘ-মল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়ক মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লার-সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা ক'রে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, অনেক জীবন ধ'রে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেই জানেন। আমি অনেকদিন তারপর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কিনা, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল।

তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল :—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবংবাদী মহাশ্রমনো···

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় আমগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণচর্ম্মের আসনে ব'সে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখলে—সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত নেই। দু'একটা যবাগূপানের ঘট, আগুন জ্বালবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুক্‌নো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়ানো প'ড়ে আছে।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল, সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশে যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাশী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতুহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশমত ভগবান্ তথাগতের মূর্ত্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্ত্তি কি মগধের দুর্দ্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্ত্তি, তা সেদেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দ্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ ক'রে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন!

মহাকোট্‌ঠি বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত ক'রে এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিকে একবার ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চ্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটা নির্জ্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিন্ব গ্রামের প্রান্তের একটা বড় বটগাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশে মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মত জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বন্যহংস তার জলে খেলা করছে।

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রত্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই তো! এই তো তিনি! অজ্রাবতীর তীরে শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নারাতে এঁকেই তো সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আব নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যার প্রত্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান—সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছু দিন কেটে গেল। একদিন প্রত্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রত্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তারপর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাকগে ফুল।

প্রত্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিতে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী কেমন একপ্রকার বিহ্বল চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বললেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চ'লে যান,—পাঁচ-ছদিন পরে আসেন। তুমি এখানে ব'সো।

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ ক'রে তাকে যবাগূ পান করতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মত, এমন সুস্বাদু যবাগূ সে পূর্ব্বে কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, যদি আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয়, তবে এই তো দেবী সরস্বতী তার সামনে। তার জানবার কৌতূহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন।

সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন? আপনার দেশ কোথা?

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সূপ ও অন্ন পরিবেশনে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কথা বলছ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন! সেই থেকে এখানেই আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা' আমার মনে পড়ে না।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তরে বনরেখার মাথায় সূর্য্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আন্‌বার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না! হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দু'টি বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল ঝরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সামনে অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন—খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী ক'রে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আসছিল।...ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা! সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধুলোরও

যোগ্য নয়, সে দেশের পথের ধুলো এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প'ড়ে থাকতে যাবে ?

খাওয়া শেষ হ'লে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন—থাকো না কেন রাত্রে ! আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না ?

—খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, সমস্ত রাত ব'সেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, তাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয় করে ব'লে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে,—আচ্ছা রাত্রে থাকব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় ব'সে কাটালে। দেবীও কাছে ব'সে রইলেন। বললেন—এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে পারিনে, ঘরের মধ্যে ব'সে রাত কাটাই।

দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, এতটা আত্ম-বিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী ব'লে দিলেন—সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।

সেই দিন থেকে প্রতি রাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে ব'সে কুটীরের দিকে চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ-পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাতে একা গান গাইছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণধারার আদিম ঝর্ণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন পথিক তারার গান।

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বললে—তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এই-মাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।

শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পুকুরের ধারে উপস্থিত হ'ল। দেখলে সত্যই গুণাঢ্য, পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি এখানে ?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমি কেন তা বুঝতে পারেন নি ?

গুণাঢ্য বললেন—তুমি এখন বলছ ব'লে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি এ-কাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যেই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে মনে করলে আমি যাকে ইচ্ছে বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধন-শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্যে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তারপর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে, এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতূহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে—এখন ?

গুণাঢ্য বললেন—এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—উপায় নেই কেন ?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। আমার পক্ষে দু'দিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর হয়তো পরজগৎ আছে, কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর ? তা আমি পারব না।

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দু'টির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নিশ্চল প্রাণে পৌছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন, আপনার সঙ্গে যাব, আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

গুণাঢ্য বিস্ময়ে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—বেশ ক'রে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বললে—চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্ত্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য বললেন—প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ, কোন মিথ্যা আশায় ভুলো না, এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হয়ে যাবে; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্ম্মম অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে—আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি ?—কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন—এস, এস! আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে না পেয়ে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।

তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—কই আমার মন্ত্রপূত জল দিন তবে ?

গুণাঢ্য বললেন—সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত ?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান ক'রে দু'জনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য্য আবার উরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তারপর তিনি ঘটকক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন—আমি এখান থেকে আগে চ'লে যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীরের মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চ'লে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রদ্যুম্ন চারিদিকে চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবলে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে ব'সে বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়তো প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাবছেন—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্যে দেখতে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। ঐ পূর্ব আকাশের নবমীর চাঁদ কেমন উজ্জ্বল হয়েছে! মগধ যাবার রাজপথে গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠল। বেতবনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময়ে সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল ; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ন্যাসী কোথায় ?

প্রদ্যুম্ন বললে—তিনি আবার কোথায় চ'লে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তারপর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে— শুনুন, আপনি বেশ ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি, আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?

দেবী বললেন—কেন, আমি ত বিদিশার পথের ধারে—

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতার মত দেবী যেন চমকে উঠলেন।

প্রদ্যুম্ন দৃঢ়হস্তে আর এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার-আকাশে-বদ্ধ-আঁখি বাতায়নপথবর্ত্তিনী তার মা !

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সুমন্তদাসের মেয়ে। পিতামাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্ব্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জ্জন পাষাণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে প্রায়ই কি ভাবত ; মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাত্তে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত, যেন কতদিন আগে তার যে প্রিয় আবার আসবে ব'লে চ'লে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুণে গুণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ-চাওয়া · প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এরকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না···তবু মেয়েটি ভাবত, আসবে · আসবে, কাল আসবে ···পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল !

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন

বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকানো এক অর্দ্ধভগ্ন পাষাণমূর্ত্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে সির্‌সির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতকাঁটার ছায়ায় পাষাণমূর্ত্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবল বাজছে মেঘ-মল্লার।...

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্ত্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!

নাস্তিক

অধ্যয়ন শেষ ক'রে লোকনাথ যখন তাঁর আচার্য্যের কাছে বিদায় চাইলেন, আচার্য্য তাঁকে বলেছিলেন—একটা কথা সব সময় মনে রেখো তুমি, অনেক লোকের ওপরে "লোকনাথ" নামটি সার্থক ক'রে জীবনের পথে অগ্রসর হবে।

অলোকসামান্য প্রতিভাবান এবং প্রিয়তম ছাত্রকে বিদায় দিয়ে, আচার্য্য দু'তিন দিন পর্য্যন্ত মৌনী ছিলেন।

মঠ থেকে বার হয়ে লোকনাথ কোন বড় রাজসভায় গেলেন না। অধ্যাপনা করবার কোন আগ্রহ দেখালেন না, বিবাহ ক'রে সংসারী হবার বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেলেন। কিছুদিন লক্ষ্যহীন অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরবার পর শেষে পুণ্যভদ্রার নির্জ্জন তীরভূমিতে কুটীর বেঁধে সেখানেই বাস ক'রতে সুরু করলেন। এতে বেশির ভাগ লোকই তাঁকে বললে পাগল।

বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ একটু অন্য প্রকৃতির। যে দিন প্রভাতের আলো খুব ফুটত, বালক লোকনাথ তার গ্রামের ধারের মাঠে একা বেড়িয়ে বেড়াত, সমবয়সী অন্য কোন ছেলের সঙ্গে সে মিশত না। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের তলে গ্রামের অদূরে ছোট পাহাড়টা যখন বড় আকাশের গা থেকে খসে-পড়া বড় একখণ্ড মেঘস্তূপের মত দেখাত, লোকনাথ দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে মাঠের ধারের বনের কাছে বসে এক মনে কি ভাবত, তার অপলক শিশু নয়ন দু'টি দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে ও পাহাড়ের দিকে আবদ্ধ থাকত। তার বিশ্বাস ছিল, ওই পাহাড়টাই পৃথিবীর প্রান্তসীমার পাহাড়। 'আচ্ছা, যদি ও ছাড়িয়ে চ'লে যাই, দূরে দূরে,—ক্রমেই দূরে,—আরও দূরে,—খুব খুব দূরে—খুব খুব খুব খুব দূরে—তা হলে কোথায় গিয়ে পৌঁছব? দৃশ্যমান সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে অজ্ঞাত রাজ্যে—এতদূর যাবার কল্পনায় বালকের মন বিস্মিত অভিভূত হয়ে পড়ত, নিজের ঘর, নিজের ভাই-বোনের কথা সে ভুলে যেত, শুধু অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকে পরিবর্ত্তনশীল মেঘ রাজ্যের পেছনে, অনেক অনেক পেছনে সে কোন্ দেশ, যেখানে এই এমনি ধূসর, মৌন চারিদিক, সে দেশের কথা মনে হ'তেই তার মন অবশ হয়ে আসত। তার দিদিমা যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প করেন, সে সব ঘটনা সেই দেশেই

ঘটে, রাম-রাবণের যুদ্ধ সেখানে এখনও চলেছে, সে দেশের সীমাহীন গহন বনের মধ্যে গলাকাটা কবন্ধ রাক্ষস এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যত অসম্ভব আর আজগুবি জিনিসের দেশ যেন সেটা।

কিন্তু সে সব অনেক দিনকার কথা। বড় হয়ে উঠে লোকনাথ অত্যন্ত রুক্ষদর্শন ও কঠোর প্রকৃতির লোক হয়ে উঠলেন। তাঁর নীরস শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যেই তাঁর আকৃতি দিন দিন লালিত্যহীন হয়ে উঠতে লাগল। যখন তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটার অসংযত দীর্ঘ চুলের গোছা আর দীর্ঘ রুক্ষ দাড়ি বাতাসে উড়ত তখন সত্যই তাঁকে অত্যন্ত ভয়ানক ব'লে মনে হ'ত। তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা তাঁর চোখে খেলতে দেখা যেত, কিন্তু এক এক সময় আবার সে দীপ্তি শান্ত হয়ে আসত, তাঁকে খুব সৌম্য, খুব সুদর্শন, খুব উদার ব'লে মনে হ'ত।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের বাল্যের সে সুদূর-পিয়াসী মন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই দৃশ্যমান জগৎটা একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হ'ল। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেউ আছে কিনা এই আজগুবি প্রশ্ন নিয়ে লোকনাথ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল আজগুবি ধরণের। সাংসারিক সুখ-সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে তিনি পূর্ব্ব হ'তেই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, যশোলাভ বিষয়েও তিনি হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার মঠের আচার্য্যের কাছে মগধ থেকে পত্র এল—মঠের অতীশদের মধ্যে আচার্য্য যাঁকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকে হস্তীর পৃষ্ঠে ক'রে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে। রাজসভার সুরিপদতিলক মহাচার্য্য জীবনসুরির সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেছে। আচার্য্য একমাত্র লোকনাথকেই এ পদের উপযুক্ত ব'লে ভেবেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ কিছুতেই মগধে যেতে রাজী না হওয়ায় তাঁর এক সতীর্থ মগধে প্রেরিত হলেন। এর কিছুকাল পরেই লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জ্জন তীরভূমি আশ্রয় করলেন।

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীরখানিতে একা বাস করছেন। জৈন ধর্ম্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল ও দুখানা বহির্ব্বাস তাঁকে দেওয়া হ'ত। মাঠের ধারের বুনো কাপাসের তুলা থেকে তিনি অঙ্গ পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে নিতেন। প্রথম প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও উদ্ধতচরিত্রের আকর্ষণে যখন শিক্ষার্থীর ভিড় বাড়বার উপক্রম হ'ল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জ্জন মাঠ তখন স্থানে স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এই সব বনে উপর-পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোন স্থানে নানা রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটা অপরিসর উপত্যকায়

দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্যতোয়ার একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা এর মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপারে বেরিয়ে গিয়েছে, তার গৈরিক জলধারার উপর সব সময়েই দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশুদেবদারু-শ্রেণীর কালো ছায়া।

এখানেই ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার বিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত ক'রে বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ এক রকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্য তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি ক'রে ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত—ষড়্দর্শন, উপনিষদ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, আশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা কোষকারদের পুঁথি, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের কিছু কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি মেঝেতে এমন যদৃচ্ছাক্রমে ছড়ানো প'ড়ে থাকত যে, কুটীরের মধ্যে পা রাখবার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান ক'রেই লোকনাথ কুটীরের সামনের প্রাচীন নিম গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন এবং একমনে পড়তেন।

এক-একদিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ন ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্য-ফোটা নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুক্লকেশ আর্য্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলপঙ্কে খড়ি এঁকে গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান উপদেশ করতেন, বুনো পাখীর অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, দুর্ব্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সামনে প'ড়ে সেখানে কুঞ্চিত-ললাট পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত একমনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তূপের দিকে আবদ্ধ ক'রে রাখতেন—চমক ভেঙে উঠে লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত না যে, কেন তিনি এতক্ষণে মনে মনে ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদীজলে সন্তরণকারী বন্য হংসের মুখের মত কল্পনা করছিলেন!

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে লোকনাথ ভাবতেন, এগুলো কি? প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে ভেবে স্থির করলেন, নক্ষত্রসমূহ এক প্রকার বৃহৎ স্ফটিক পিণ্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফটিক পিণ্ড ব'লে ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায় তিনি গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন। তাদের আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফটিক প্রস্তরের যে শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এই সমস্ত স্ফটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে এক প্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতিক রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু

লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না, সকলকে তাঁর মত প'ড়ে দেখে বিচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি মাঝামাঝি কিছু হওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন উচ্চজ্ঞান, নয় তো একেবারে মূর্খতা। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের উপর তাঁর একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। একবার তিনি কয়েক বৎসর ধ'রে বহু পরিশ্রম ক'রে সাংখ্যের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। লেখা শেষ ক'রে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন ভাষ্য তেমনটি হয়নি, অনেক খুঁত রয়ে গিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও লোকনাথ সে খুঁত কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। একদিন সকালবেলা হস্তলিখিত পুঁথিখানা নিয়ে তিনি পুণ্যভদ্রার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের স্রোতে তীরলগ্ন শরবনগুলো তখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। লোকনাথ অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পুঁথিখানিকে টান্ মেরে নদীর মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, একখণ্ড ইটের মতই সেখানা সেই মুহূর্তে ডুবে গেল, শুধু সাংখ্যের উগ্র পাণ্ডিত্যের সংঘাতে বন্য নদীর নিরক্ষর বুকটি অল্পক্ষণের জন্য ভাববিহ্বল হয়ে উঠল মাত্র।

দিন যেতে লাগল। লোকনাথ পূর্ব্বের মতন আর একস্থানে অনেকক্ষণ বসতে পারেন না। মনের শান্তি তিনি দিন দিন হারাতে লাগলেন। এক-একদিন সমস্ত দিন তিনি কিছুই খেতেন না, কি জানি কেন, শুধু কেবল নদীর ধারে ধারে সারা দিনমান ধ'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে আকাশের দিকে চাইতেন না, যদি হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে ফেলতেন, কালো আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যে সব নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করত, তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে তিনি অনভ্যস্তপাঠ অপরাধী বালক-ছাত্রের মতন সঙ্কুচিতভাবে দৃষ্টি নামিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলতেন। রাত্রে নির্জ্জন মাঠে চারিধার থেকে অন্ধকারে রাশি রাশি প্রশ্ন জেগে উঠত। ভগবান্ উপবর্ষের বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে এদের উত্তর মেলে না কেন?

লোকনাথ আবার অত্যন্ত একমনে দর্শনের পুঁথি পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যদি সে সময় কেউ দেখত সে বেশ বুঝত যে, তৃপ্তির চেয়ে অসন্তোষই হয়েছে তাঁর বেশি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করবার যে সহজ উপায় দার্শনিকরা নিরূপণ ক'রে গিয়েছেন, প'ড়ে শুনে দেখে লোকনাথের দুঃখ যেন তাতে বেড়েই চলেছে! রাত্রে বাঁশের আড়ায় পুস্তকাধার থেকে ভূর্জ্জপত্রের পতঞ্জলি বক্রচক্ষে গৌতমের দিকে চাইতেন, কপিল গর্ব্বমিশ্রিত ব্যঙ্গহাস্যে জৈমিনির দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইতেন, মূর্খগুলোর সঙ্গে এক আসনে বসতে হয়েছে ভেবে গভীর অপমানে ব্যাসদেব পুঁথির মধ্যে দিন দিন শুকিয়ে উঠতে থাকতেন। রাত দুপুরের সময় অধ্যয়ন-ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে শয্যাগ্রহণ ক'রে লোকনাথের মনে হ'ত অর্দ্ধ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে। দর্শনাচার্য্যগণ যেন কেউ কারুর কথা না শুনে পরস্পর মহা তর্ক তুলেছেন, তাঁদের ভাষ্যকার ও উপভাষ্যকারগণের বাগ্‌যুদ্ধ হাতা-হাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে, কথার উপর কথা চড়িয়ে দু'দিক থেকেই কথার

পাহাড় গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকনাথের আর ঘুম হ'ত না, পুরাতন জীর্ণপত্রের গন্ধে ভারাক্রান্ত বদ্ধ বাতাসে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, শয্যা ছেড়ে উঠে তিনি বাইরের নিমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়তো কোন দিন ভাঙা চাঁদের নীচে বিশাল মাঠ আলো-আঁধারে অস্পষ্ট দেখাত, কোন দিন কষ্টিপাথরের মতন কালো অন্ধকারে পথের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে কত কি কীটপতঙ্গ বিচিত্র সুরে ডাকতে থাকত, বনঝোপের মাথায় জোনাকি পোকার ঝাঁক জ্বলত···নদীর ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শান্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই সব নীরব নৈশ প্রশ্ন প্রেতের মতন তাঁকে পেয়ে বসত। এবার সেটা আসত অন্ধকারের রূপ ধ'রে। আলোর যদি সৃষ্টিকর্ত্তা থাকে, তবে অন্ধকারের আর একটা সৃষ্টিকর্ত্তার কি প্রয়োজন আছে? আলোর অভাবই যদি অন্ধকার হয়, অন্ধকার কি তবে স্বপ্রকাশ? স্বয়ম্ভূ? সৃষ্টির পূর্ব্বের জিনিস?

লোকনাথ আবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকতেন, আবার তত্ত্বসমাসের পুঁথিখানা উঠিয়ে নিয়ে প্রদীপের শিখা আঙুল দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন।

সেদিন তিনি পড়ছিলেন না, সারাদিন কেবল চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছিলেন। যে রহস্য ভেদ করবার জন্য তাঁর মন সর্ব্বদাই আকুল, সে রহস্য ভেদ করবার আশা ক্রমেই যেন দূরে চ'লে যাচ্ছে, সব দিকেই অন্ধকার, কোন দিক থেকে কোন আলোক আসবার চিহ্ন দেখা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মনে হ'ত কোন কোন আত্মস্থ ঋষি কোন্ প্রাচীন-যুগে তাঁদের জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে এ জীবনরহস্যের সন্ধান বোধ হয় পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাই তাঁরা আশ্বাসবাণী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিলেন 'পেয়েছি··· পেয়েছি···'। তাঁর মনে হ'ল প্রথম যেদিন তিনি উপনিষদের এক জীর্ণ পুঁথির পাতায় এ কথার সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স এখনকার চেয়ে কুড়ি বৎসর কম। সে এক বর্ষার রাত্রিকাল, স্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জ্জন মাঠ বেয়ে সেদিন অশান্ত বাধা-বন্ধনহীন বাতাস হু হু ক'রে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছিল, স্তিমিতপ্রদীপ কুটীরে একা বসে পুঁথির মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে ক্ষণিকের জন্য লোকনাথের সমস্ত শরীর সর্পপৃষ্ঠের মতন শিউরে উঠেছিল · পুঁথি বন্ধ ক'রে ঘরের বাইরে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল গাছপালা, দূর্ব্বা, নদীজল, সব যেন তাঁরই মতন শিউরে শিউরে উঠেছে। এখন তাঁর সে কথা মনে প'ড়ে হাসি পেল। অল্প বয়সের সেই কাঁচা, ভাবপ্রবণ মনের দিকে নীচু চোখে চেয়ে দেখে তাঁর বর্ত্তমান সময়ের প্রবীণ মন সকৌতুকস্নেহে রঞ্জিত হয়ে উঠল। মানুষের মন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না—যে বলে জেনেছি, হয় সে ভণ্ড, নয় সে আত্মপ্রতারক মূর্খ! কি বুঝতে হবে, সে সম্বন্ধে তার কিছু ধারণাই নেই।

হঠাৎ তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি দূরের নীল শৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্ত পলাশের বনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

অনেকদিন আগের কথা। তখন লোকনাথের বয়স একুশ বৎসর।

—কিছু না, মায়া লক্ষীটি, আমি, এই ধরো সাত বছরের মধ্যেই আস্‌ব···পড়া শেষ হ'তে কি আর এর বেশি নেবে? বড় জোর সাত বচ্ছরই হোক। তোমায় ফেলে এর বেশি কি আর থাকতে পারব? বুঝলে?

সতের বৎসরের মায়া সলজ্জ হেসে বলে—সাত বচ্ছর···এত কম সময়? এ আর এমন বেশি কি?

লোকনাথ গাঢ়স্বরে উত্তর দেয়, সেই কথাই তো বলছি মায়া, সাত বছর কি আর বেশি আমাদের পক্ষে? তারপর মায়ার মুখে নির্ভরতার দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—নয় কি, মায়া?

মায়া মুখে হাসি টিপে উত্তর দেয়—নাঃ, তা আর বেশি কি! মোটে সাত বছর—এবেলা ওবেলা—ব'লেই প্রগল্‌ভ উচ্চহাস্যে হেসে ওঠে।

লোকনাথ অপ্রতিভ মুখে বলেছিল—না, শোনো মায়া—আমি বলছি—না– আমার বল্‌বার কথা ··

যে মায়ার অভয়-ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেদিন তাঁকে প্রবাসের পথে সখীর মতন আগু বাড়িয়ে দিয়ে চোখের জলে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ লোকনাথের প্রবীণ হৃদয়ে কোথায় সে মায়ার স্থান তা আমরা জানিনে, তবে এটুকু বোধ হয় ঠিক যে সে সময়ের মনোভাব এখন আর লোকনাথের ছিল না। জীবনের তুচ্ছ জিনিসে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

মঠে থাকতেই লোকনাথের মন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল, তিনি মায়ার কথা ভুললেন, জীবনের সুখকে মনে মনে ঘৃণা করতে শিখলেন। তাঁর জীবনে শুধু অনুসন্ধিৎসু ঋষি-দার্শনিকদের যাতায়াত শুরু হল,—সে এক অন্য জগৎ, মনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে সেখানে শুধু এক বিরাট রহস্যময় দার্শনিক·· কে তুচ্ছ মায়া? মূর্খেই শুধু এত সামান্য জিনিসে এত বেশি আনন্দ পায়, হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ তাদের মনে কস্মিন্‌কালে জাগে না ব'লেই।

তবু কখনো কখনো, কোনো অসাবধান মুহূর্ত্ত যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন অতর্কিত ভাবে হঠাৎ এসে পড়ে। তাঁর বিশ বৎসরের যৌবন মায়ার মুখের লজ্জা-নম্র হাসিতে, তার প্রসন্ন ললাটের মহিমায় স্নিগ্ধ হয়েছিল, যৌবনলক্ষীর বরণ-ডালির সেই প্রথম মাঙ্গলিক।

অনেক বৎসর পরে মঠে থাকতে লোকনাথ শুনেছিলেন, মায়া বিবাহ করেনি, কোন্ মঠে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়েছে। সেও অনেক দিনের কথা, তার পর তার আর কোনো সংবাদ তিনি রাখেন না, যেখানে যায় যাক, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার ছায়া মাঠের চারিধারে ঘন হয়ে এল। কুটীরে যেতে যেতে লোকনাথ আকাশের দিকে চাইলেন, মনে মনে বললেন—হে অদৃশ্য শক্তি, আমি দার্শনিকাচার্য্য লোকনাথ—অজ্ঞান, মূর্খ সাধারণ মানুষের মতন আমার যুক্তিপ্রণালী বা মানসিক ধারা নয়। আমি জানতে চাই, এই কার্য্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন্ কারণ-প্রসূত। সাধারণ লোকে যাকে ঈশ্বর বলে, তার মূলে কিছু আছে কিনা। গ্রন্থের কথা আমি জানিনে, কারণ তার প্রমাণের ওপর আমার

কোন আস্থা নেই। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চাই, জানিনে তোমার শোনবার ক্ষমতা আছে কি না, থাকে তো জানিও।·· ভোলাবার চেষ্টা কোরো না,—তাতে আমি ভুলব না।

মহামণ্ডলীর মঠে প্রধান দার্শনিক বৈভাষিকপন্থী মাধবাচার্য্য বাস করতেন। লোকনাথ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মাধবাচার্য্য বোঝাতে গিয়ে প্রথমত মুক্তি কি, মুক্তি কয় প্রকার, মুক্তির ও নির্ব্বাণের মধ্যে প্রভেদ কিছু আছে কিনা, প্রভৃতি এত বিস্তৃতভাবে বলতে লাগলেন ও এত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মতের পরিপোষণের চেষ্টা পেতে লাগলেন যে লোকনাথ অত্যন্ত পাণ্ডিত্য-প্রিয় হলেও তাঁর মনে হ'তে লাগল, মুক্তির একটি স্বরূপ তিনি বুঝেছেন, সেটি সম্প্রতি মাধবাচার্য্যের বাক্যজালের হাত এড়ানো।

স্নান করতে করতে একদিন তাঁর মনে হ'ল তাঁর পিঠে যেন কিসের লেজ ঠেকছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে জলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন, লেজ নয়, একটা জলজ গাছের পাতা গায়ে ঠেকছে। গাছটাকে তিনি টান দিয়ে উপরে তুলে ফেললেন, দেখলেন একটা শেওলা-গাছ,—এ শেওলা নদীতে তিনি পূর্ব্বে দেখেছেন, তেমন লক্ষ্য করেননি ভাল ক'রে, চোখ পড়তে দেখলেন যে, শেওলার ডাঁটার যে অংশটা তাঁর গায়ে সুড়সুড় ক'রে ঠেকেছিল, সেটা জলের নীচেকার অংশ, সে অংশের পাতাগুলি ঝাউপাতার মতন—কিন্তু জলের উপরের অংশের পাতাগুলি পানের মতন। জলের উপরের অংশের পাতা জলের উপরে ভাসে, নীচের অংশের পাতা ও রকম হ'লে স্রোতের তোড়ে ভেঙে যেত, কিন্তু চুলের গোছার মতন হওয়ায় তারা জলকে বাধা দেয় না, জল তাদের মধ্য দিয়ে বেশ কেটে চ'লে যায়, যখন যেদিকে স্রোতের গতি পাতাগুলি তখন সেদিকে হেলে পড়ে। লোকনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে স্নান ক'রে ফিরলেন। একটা কি জিনিস যেন তিনি ধরেছেন।

তাঁর মনে হ'ল একই ডাঁটার উপরে নীচে দু'রকম পাতা হওয়ার মূলে প্রকৃতির মধ্যে একটা চৈতন্যসত্তা বেশ যেন ধরা পড়েছে—নইলে এই নগণ্য জলজ শেওলার পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা কোথা থেকে এল? পাছে ভেঙে যায়, এজন্যে কে এর জলের নীচের অংশের পাতা ঝাউপাতার মতন ক'রে গড়লে?

লোকনাথের আর একটা কথা মনে হ'ল। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে জাগতিক শক্তির কাছে তার চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে একটা প্রমাণ চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রার্থনা কি এইভাবে কেউ পূর্ণ করলে?

ন্যায়যুক্তির দিক্ থেকে এ সিদ্ধান্ত এত বিপজ্জনক তাঁর মনে হ'ল যে তিনি এ কথা জোর ক'রে মন থেকে দূর ক'রে দিলেন। সাধারণ মানুষের মতন এত শীঘ্র তিনি কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন না। তবু তিনি ভেতরে ভেতরে দিন দিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই জলজ শেওলার শুকনো ডাঁটা-পাতা কুটীরের সামনে প্রায়ই পড়ে থাকতে দেখা যেত। পুঁথিপত্র তিনি আজকাল কমই খোলেন। নদীর ধারে ধারে যেখানে বন্য-গাছের শ্যামপত্রলতার স্রোতের জলে ঝুপসি হয়ে প'ড়ে থাকত, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ফুল ফুলে

স্তূপে স্তূপে ফুটে জলের ধার আলো ক'রে থাকত, পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায় জলচর পক্ষীরা ডিমগুলি গোপনে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখত, লোকনাথ বেশির ভাগ সময় সেই সব স্থানে কি দেখে দেখে ফিরতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কুটীরের সামনের মাঠে এক রকম ছোট ঘাসের কুচো কুচো সাদা ফুল রাশি রাশি ফুটত, লোকনাথকে দেখা যেত সেই ফুল তুলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাদের গঠন লক্ষ্য করছেন—ঘাসের ফুল সম্বন্ধে লোকনাথের মনে হ'ত যে সব ফুলগুলি একই গঠনের—পাঁচটি করে পাপ্‌ড়ি মধ্যে একটা বিন্দু। প্রকাণ্ড মাঠে এ রকম ফুল দু'হাজার, দশহাজার, দু'লক্ষ, দশলক্ষ ফুটে থাকত, লোকনাথ যদৃচ্ছাক্রমে এখান থেকে ওখান থেকে ফুল তুলে দেখতেন, সবগুলির সেই একই গড়ন, সেই পাঁচটা ক'রে পাপ্‌ড়ি মধ্যে একটা বিন্দু।

লোকনাথের পিপাসা বিকারের রোগীর মত বেড়ে উঠল। কত কি প্রশ্ন তাঁর মনে আসে—অসাধারণ ভয়ানক বিভীষণ সব প্রশ্নদৈত্য! লোকনাথ বলতেন—জানাও হে চৈতন্যময় কারণ-শক্তি, আমায় আরও জানাও। দিনকতক পরে সত্যই তাঁর অসহ্য যাতনা হ'তে লাগল। একটা বিশাল ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্যজগৎ দ্বারপার্শ্বের সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটুখানি আলোকরেখা যেন তাঁর চোখে ফেলেছিল, তাঁর বুভুক্ষু মন সমস্তটা একসঙ্গে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগল,—রাত্রে তাঁর নিদ্রা হ'ত না—কালো আকাশে চোখ তুলে বলতেন—চোখ খুলে দাও, হে মহাশক্তি চোখ খুলে দাও।

ইতিমধ্যে আবার একদিন তিনি দেখলেন—একটা কি পতঙ্গ আর একটা ছোট পতঙ্গকে শরীর-নিঃসৃত রসে অল্পে অল্পে অচেতন ক'রে ফেলছে, বড় পতঙ্গটা হাতে তুলে নিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখে তাঁর মনে হ'ল সেটার শুঁড়ের মত ছুঁচলো একটা প্রত্যঙ্গের খানিকটা অংশ ফাঁপা,—একপ্রকার বিষাক্ত রস শরীরের মধ্যে থেকে বার হয়ে ঐ ফাঁপা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসবার বেশ সুন্দর, সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত আছে।···

লোকনাথের মন একমুহূর্ত্তে আবার অন্ধকার হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ধ্বংসের এ কি কৌশলময় আয়োজন! মূর্খ ভক্তিশাস্ত্রকার, এই বুঝি তোমার দয়ালু ঈশ্বর?

বসন্তের বাকী দিনগুলো এবং সারা গ্রীষ্মকালটা এই ভাবেই কেটে গেল। অবশেষে একদিন কৌতূহলপ্রদ এক ঘটনায় লোকনাথের দুঃখ, ব্যাকুলতা ও সন্দেহের এক অপ্রত্যাশিত রকমের উপসংহার ঘটল। সে সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, অসহ্য রৌদ্রতাপে মাঠের ঘাসগুলো জ্ব'লে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, বাতাস আগুনের ঝলকের মত তপ্ত। বৈকালের দিকে কিন্তু খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল, এবং একটু পরে ঈশান কোণে খুব মেঘ জমল। নদীর বড় বাঁকটায় বড় বড় ঘাসের মধ্যে শুয়ে লোকনাথ পূর্ব্ব দিকচক্রবালে নবীন বর্ষার মেঘস্তূপের সজ্জা একমনে লক্ষ্য করছিলেন, হঠাৎ তাঁর ডান হাতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মাঝখানে কিসে যেন কামড়ালে। সে দিকে চোখ ফিরিয়ে হাত টেনে নিতেই দেখতে পেলেন একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে হাতের সেখানে মুহূর্ত্তে আর একটা ছোবল মারবার উপক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা নীচু ক'রে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বিদ্যু-

বেগে অদৃশ্য হল। কি করছি, না ভেবেই লোকনাথ সাপটার অদৃশ্যমান পুচ্ছটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গিয়ে একগোছা ঘাস মুঠার মধ্যে চেপে ধরলেন, সাপটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি পরিধেয় বসন ছিঁড়ে হাতের কব্জিতে ও বাহুতে বাম হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে দু'টো বাঁধন দিলেন, বাঁধন তেমন শক্ত হল না, অনেকটা আল্‌গা রয়ে গেল। তাঁর মনে হল শ্বেত আকন্দের মূল সর্পাঘাতের মহৌষধ··· মাঠের ইতস্তত শ্বেত আকন্দের সন্ধানে গেলেন, সে গাছ চোখে পড়ল না···হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে বলে তাঁর মনে হ'ল। বিষ তবে নিশ্চয়ই উপরে উঠছে···লোকনাথ সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন, আরও দু'একটা সর্পাঘাতের ঔষধ মনে আনবার চেষ্টা করলেন,—কুসুম ফুলের বীজ, রক্ত-চন্দনের ছাল, ইত্যাদি কোনটাই হাতের কাছে নেই। এদিক্ ওদিক্ খানিকক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে লোকনাথের মনে হ'ল তিনি আর দাঁড়াতে পারছেন না, চোখে অন্ধকার দেখে একটা ঝোপের কোলে তিনি ব'সে পড়লেন—অসহ্য-দংশনবিষে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তখন ঝিম্ ঝিম্ করছে।···

ধীরে ধীরে তাঁর মনের নিভৃততম অংশ কিসের আলোকে যেন আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল···আসন্ন মরণের বজ্রকঠোর নির্ম্মল করাল রৌদ্র সুর, দূরশ্রুত মুক্তস্রোত গিরি-নির্ঝরের তালে যেন তাঁর কানে মুক্তির গান বাজাচ্ছে···তোমার পাষাণকারা এবার ভাঙ্‌ব—তোমার চোখের বাঁধন খুলব···

হে অনন্ত দেব, মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পারে কোন্ সুদূরতম, অপ্রকল্প্য রাজ্যের জ্যোতিঃসিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই ব্যাকুল দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য রেখেছ? তাই বুঝি সেদিন জলের মধ্যে আমায় পথ দেখিয়েছিলে?···সেদিন তোমায়ও চিনিনি, তোমার পথও চিনিনি—আজ বোধ হয় বুঝেছি—হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা, পৃথিবীর অপেক্ষা মহান্, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা মহান্, স্বর্গের অপেক্ষা মহান্, সর্ব্বভূতের অপেক্ষা মহান্ ·· মেঘ যেমন ওষধিগণের উপজীব্য, তুমি তেমনি আমার প্রাণধারার উপজীব্য · তুমি আমার প্রাণের কথা শুনতে পাও? বেশ, তা হ'লে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লো, দেব, এই অন্ধ রাজ্যের পারে, ওই দিগন্তসীমার পারে, জীবন-মহাসমুদ্রের পারে।···কোথায় তোমার চির-বিকশিত জ্যোতিঃ-প্রভাত, কোথায় দৈন্য-মুক্ত জ্ঞান-সম্পদের অপরাজিত আয়তন দেখব···

হঠাৎ লোকনাথের মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি মাথা তুলে ব'লে উঠল, তোমার বিচার-শক্তি চ'লে যাচ্ছে,—বিষের যাতনায় যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে, তখন তোমার যে বিচার, সে কি বিচার?' মনের এই তরল ভাব দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, মন থেকে দূর ক'রে দাও···

লোকনাথ কিছুই ঠিক করলেন না, তাঁর মন আর যুদ্ধ করতে পেরে উঠছিল না···আফিমের নেশার মত মরণের তন্দ্রা তাঁর ক্রমেই গাঢ় হয়ে এল···

কোথায় কোন্ দুটি বালক-বালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে

কোণে তলায়-পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে…সময়ের দীর্ঘ পাষাণ-অলিন্দের দূরতম সীমায় তাদের ছোট্ট ছোট্ট পাগুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে আসছে…ওধারে তারা ছুটিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে…

এক গ্রাম্য বনের মৌ-গাছের ডাল থেকে দু'জনে মৌ ফুল পেড়ে খাচ্ছে, বালিকাটি ভালো রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে দিচ্ছে—এই যে এটি, কি মিষ্টি দেখ, দেখ তুমি খেয়ে…

নীলব্যোমপথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু সমিধ্‌বাহী, জ্যোতির্ময় ঋষিরা চলেছেন—তাঁদের মধ্যে কে যেন পিছন ফিরে সঙ্গীদের নিকট প্রস্তাব করছেন—ওহে সঙ্গীগণ, আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেছি, এস তা ফেলে দিয়ে পুনর্ব্বার নূতন জল সংগ্রহ করি·· এতদিন ভ্রমণের পর মিষ্ট জলের উৎসের সন্ধান পেয়েছি…তাঁদের কমণ্ডলু থেকে কালি-গোলার মতো কি ঝ'রে পড়ছে।

পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে? কেন আমায় মারবে তুমি?…এ পাড়ায় আসি ব'লে?…আর কক্‌খনো আসব না…দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি ··

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ আবদ্ধ রইল, বহু বৎসর পূর্ব্বের শৈশবকালে গ্রামসীমার মাঠে তাঁর অজ্ঞান শিশু-নয়ন দু'টি যে ভাবে আবদ্ধ রইত… প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ ক'রে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল…প্রশ্নের কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না…

উমারাণী

বসন্ত প'ড়ে গিয়েছে না? দখিন্ হাওয়া এসে শীতকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল যে, মনে হচ্ছে উড়ন্ত চিলগুলোর ডানায় নীল রং লেগে যাবে। এই সময় তার কথা আমার বড় মনে পড়ে। তার কথাই বলব।

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিনকতক গবর্ণমেণ্টের চাকরি নেবার বৃথা চেষ্টা করবার পর যে মাসে আমি একটা চা-বাগানের ডাক্তারী নিয়ে গৌহাটিতে চ'লে গেলুম, সেই মাসেই আমার ছোট বোন শৈল শ্বশুর বাড়ীতে কলেরা হয়ে মারা গেল। এই শৈলকে আমি বড় ভালবাসতুম, আমার অন্যান্য বোনেদের সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক মারামারি করেছি, কিন্তু শৈলর গায়ে আমি কোনদিন হাত তুলিনি। শৈলর বিয়ে হয়েছিল যশোর জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। শৈল কখনো সে গ্রামে যায়নি, তার স্বামী তাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা ক'রে থাকত। তার স্বামী প্রথমে পাটের দালালী করত, তারপর একটা অফিসে ইদানীং কি চাকরি

করত। যেখানে শৈলর স্বামী বাসা করেছিল তার পাশেই আমার মামার বাড়ী,—একটা গলির এপার ওপার। এই বাসায় ওরা শৈলর বিয়ের অনেক আগে থেকেই ছিল এবং শৈলর বিয়েও মামার বাড়ী থেকেই হয়।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের বাংলো থেকে একটা ঘা ড্রেস ক'রে ফিরছি, পিওন খানকতক চিঠি আমার হাতে দিয়ে গেল। আমার বাসায় ফিরে এসে তারি একখানাতে শৈলর মৃত্যুসংবাদ পেলুম। বাংলোর চারি পাশের ঝাউ কৃষ্ণচূড়া ও সরল গাছ-গুলো সন্ধ্যার বাতাসে সন্ সন্ করছিল। আমার চোখের সামনে সমস্ত চা-বাগানটা, দূরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, মায়বেরিটা, ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সাদা রংটা, দেখতে দেখতে সবগুলো মিলে একটা জমাট অন্ধকার পাকিয়ে তুলল।

আলো জালিয়ে চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে রইলুম। বাইরের হাওয়া খোলা দুয়ার জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল। অনেক দিনের শৈল যে! কলকাতা থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমার তৃপ্তি দেবার পন্থা খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়ত। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কথ্ বেল পেকেছে, আমি বাড়ী আসবার আগেই শৈল এসব ঠিক ক'রে রাখত; নানারকম মশলা তৈরী ক'রে কাগজে কাগজে মুড়ে রেখে দিত, আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ জড়ানো ব্যস্ততা ও ছুটোছুটির আর অন্ত থাকত না। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি বাড়ী গেলে আমার বেলের শরবৎ খাওয়াবার জন্যে পরের গাছে বেল চুরি করতে গিয়ে ঘরের পরের কত অপমান সে সহ্য করেছে; আমারই জুতো বুনে দেবে ব'লে তার উল বুনতে শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে, কত তুচ্ছ সুখ-দুঃখের - স্মৃতির সঙ্গে কত খেলাধুলোয় শৈল জড়ানো রয়েছে। সে আজ ঐ আকাশের মাঝখানকার জল্‌জলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের মত দূরের হয়ে গেল, ঝাউ-গাছের ডালপালার মধ্যেকার ঐ বাতাসের শব্দের মতই ধরাছোঁয়ার বাইরে চ'লে গেল!

তার পরদিন ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গেলুম। বাড়ীর সকলকে সান্ত্বনা দিলুম। আহা, দেখলুম আমার ভগ্নীপতি বেচারা বড় আঘাত পেয়েছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারা শৈলকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম। শৈল প্রথম বুনতে শিখেই আমার ভগ্নীপতির জন্যে একটা গলাবন্ধ বুনছিল, সেটা আধ-তৈরী অবস্থায় প'ড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন একটু হিংসে হ'ল, আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উল্ বুনতে শিখে শেষে কিনা নিজের স্বামীর গলাবন্ধ আগে বুনতে যাওয়া! তবু তো সে আজ নেই!

পরে আবার গৌহাটি ফিরে গিয়ে যথারীতি চাকরি করতে লাগলুম। দেশ থেকে এসে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, তারপর তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর আর বিশেষ কোন সংবাদ রাখতুম না, তবে মাঝে মাঝে মামার বাড়ীর পত্রে

জানতে পারতুম, সে অনেকের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করতে রাজী নয়। বিবাহ সে আর নাকি করবে না।

এই রকম ক'রে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, দেশে যাবার বিশেষ কোন টান্ না থাকাতে দেশে বড় যেতুম না। আমার মা বাবা অনেকদিন মারা গিয়েছিলেন, বোনগুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমার পক্ষে দেশ-বিদেশ দুই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজের কোন বৈচিত্র্য ছিল না, সকালবেলা ডাক্তারখানায় ব'সে নীরস একঘেয়ে ভাবে কুলীদের হাত দেখা, কলের পুতুলের মত ঔষধ লিখে দেওয়া। রোগ তাদের যেন বড় একঘেয়ে রকমের, সাদা জ্বর, হিল্ ডায়েরিয়া, বড় জোর কালাজ্বর, কালে-ভদ্রে এক-আধটা টাইফয়েড বা শক্ত রকমের নিউমোনিয়া। যখন হাতে কাজকর্ম্ম বিশেষ থাকত না তখন পড়তুম, না হয় আমার একটা খেয়াল আছে অপটিক্সের বা আলোক-তত্ত্বের চর্চ্চা করা—তাই করতুম। বাংলোর একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আঁধার-ঘর বা ডার্করুমে পরিণত ক'রে নিয়েছিলুম। কলকাতা থেকে প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও ও অপটিক্সের বই সব আনাতুম।

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময় মামার বাড়ীর পত্রে জানলুম, আমার ভগ্নীপতি আবার বিবাহ করেছে। সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির হাত সে নাকি আর এড়াতে পারলে না। এতে মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পারলুম না, শৈলর প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্রিমই, তারই বলে সে এতদিন যুঝল তো?

সেবার বৈশাখ মাসের প্রথমে দেশে গিয়ে মামার বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কতকগুলো কথা অপটিক্স সম্বন্ধে মনে এসেছিল, যা একজন বিশেষজ্ঞের নিকট বলা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বস্তু-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে সে সব বিষয়ের কথাবার্ত্তা কইবার জন্যেই আমার এক রকম কলকাতায় আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরম্ভ করলুম, সেও খুব উৎসাহ দিল, আমি অপটিক্স নিয়ে একেবারে মেতে উঠলুম।

এই অবস্থায় একদিন সকালবেলা বারান্দায় ব'সে পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ প'ড়ে গেল সামনের বাড়ীর জানলাটায়। সেইটেই আমার ভগ্নীপতির বাসা। দেখলুম কে একটি অপরিচিতা মেয়ে ঘরের মধ্যে কি কাজ করছে। আমার দিক থেকে শুধু তার সুপুষ্ট হাত দুটি দেখা যাচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল তার পিঠের দিকটা খুব চওড়া।

একটু পরেই সেই ঘরের ভিতর ঢুকল আমার ভগ্নীপতির বোন টুনি। টুনির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় সম্প্রতি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে। আমি গৌহাটি থেকে এসে পর্য্যন্ত ওদের বাড়ী যাইনি। টুনিকে দেখে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—টুনি, ঐ মেয়েটি কি নতুন বৌ?

—হ্যাঁ, দাদা।

—দেখি একবার।

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বললে, তাকে জানলার কাছে নিয়ে এসে তার ঘোমটা খুলে দিলে। ভাল দেখা গেল না। গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগুলোকে প্রায় অপটিকচর্চ্চার ডার্করুম ক'রে তুলেছিল, দিনমানেও তার মধ্যে আলো যায় না। ভাল দেখতে না পেয়ে বললুম—হ্যাঁ রে, কিছুই তো দেখতে পেলুম না।

টুনি হেসে উঠল, বললে—আপনি ওখান থেকে যে দেখতে পাবেন না, তা আমি জানি। তার ওপর তো আবার চশমা নিয়েছেন—তার পর কি ভেবে টুনি একটু গম্ভীর হ'ল, বললে—আপনি এসে পর্য্যন্ত তো এ বাড়ী একবারও আসেননি, দাদা। আজ দুপুরবেলা একবার আসবেন?

দুপুরবেলায় ওদের বাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুকতেই মনে হ'ল, চার পাঁচ বছর আগে ভাই-ফোঁটা নিতে শৈলর নিমন্ত্রণে এ বাড়ী এসেছিলুম, তারপর আর এ বাড়ী আসিনি। দালান পার হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা সব আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে গেলে টুনি বললে—দাদা, বৌ দেখবেন আসুন। ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বৌয়ের ঘোমটা খুলে দিয়ে বললে—ওঁর সামনে ঘোমটা দিতে হবে না, বৌদি। উনি তোমার দাদা।

মেয়েটি আধ-ঘোমটা অবস্থায় গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। দিব্যি মেয়েটি তো! রং খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া ঢাল-বুনানি কালো চুল মাথা ভর্ত্তি। বেশ মোটাসোটা গড়ন। বয়স বোধ হয় চোদ্দ পনেরো হবে। টুনির মা বললেন—মেয়েটির বাপ পশ্চিমে চাকরি করেন, সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অন্য ছেলেপিলে কিছু নেই। তাঁদের সঙ্গে কি জানাশুনো ছিল, তাই এখানেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে বিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটি প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালে আমি তার হাত ধ'রে তাকে কাছে নিয়ে এলুম। বাঁ হাতে তার ঘোমটা আর একটু খুলে দিয়ে বললুম—আমার কাছে লজ্জা কোরো না খুকী, আমি যে তোমার দাদা। তোমার নামটি কি?

তার চোখের অসঙ্কোচ দৃষ্টি দেখে বুঝলুম, মেয়েটি সেই মুহূর্ত্তেই আমার বোন হয়ে পড়েছে। সে খুব মৃদুস্বরে উত্তর দিল—উমারাণী।

আমি বললুম—আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? এসো উমারাণী এই চৌকিটায় ব'সে তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।

আমি চৌকিতে তাকে কাছে নিয়ে বসালুম, খানিকক্ষণ তার সঙ্গে একথা সেকথা নানা কথা কইলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম—বাড়ী ছেড়ে এসে বড় মন কেমন করছে না?

উমারাণী একটু হেসে চুপ ক'রে রইল।

আমি বললুম—তোমার বাবা থাকেন কোথায়?

—মাউ।

আমি মাউয়ের নাম কখনো শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলুম—মাউ, সে কোনখানে বল দেখি?

—সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়।

—তোমার বাবা সেখানে কি কাজ করেন?

—কমিসারিয়েটে চাকরি করেন।

—তোমার আর কোন ভাই-বোন নেই, না?

—না। আমার পর আমার আর এক বোন হয়, সে আঁতুড়েই মারা যায়। তারপর আর হয়নি।

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূরে এসেছে, ভাবলুম হয়ত বাপ-মায়ের কথা বলতে মেয়েটির মনে কষ্ট হচ্ছে। কথার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি লেখাপড়া জান, উমারাণী?

—আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়তাম, বাংলা পড়া হ'ত না ব'লে বাবা ছাড়িয়ে নেন। তারপর বাড়ীতে বাবার কাছে পড়তাম।

—বাংলা বই বেশ পড়তে পার?

—পারি।

আমি উমারাণীর কথাবার্ত্তা কইবার ভাবে ভারি আনন্দিত হলুম। এমন সুন্দর শান্তভাবে সে কথাগুলি বলছিল মাটির দিকে চোখদুটি রেখে যে আমার বড় ভাল লাগল। আমি তার মাথায় একটা আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম—বেশ, বেশ। ও'রি লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, অন্য আর এক সময়ে আসব, এখন আসি।

দাঁড়িয়ে উঠেছি, উমারাণী আবার সেই গলায় আঁচলু দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। আমি তাকে বললুম—খুব শান্ত হয়ে থেকো কিন্তু উমারাণী। কোনো দুষ্টুমি যেন কোরো না, তাহলে দাদার কাছে,—বুঝলে তো?

উমারাণী হেসে ঘাড় নীচু ক'রে রইল।

এর পাঁচ ছয় মাস পরে পূজোর সময় আবার মামার বাড়ী এলুম। অষ্টমী পূজোর দিন দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর একটা বড় ক্লান্ত বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে একটা ঘরের খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার মামার বাড়ী পূজো হ'ত। সমস্ত দিন নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন করা প্রভৃতি নানা কাজে বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে গেলুম। আমার ছোট ভাই খাবার সময় বললে—অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন তো দাদা? দিদি এসেছিলেন আরতির সময়, আপনাকে দেখবার জন্যে আপনার ঘরে গেলেন। আপনি

ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পায়ে হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্তে। আপনি উঠলেন না। তারপর তাঁরা সব চ'লে গেলেন। তিনি নাকি পরশু বাপের বাড়ী চ'লে যাবেন! আপনি অবিশ্যি একবার ওবাড়ী যাবেন কাল। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দিদি বড় দুঃখ ক'রে গিয়েছেন।

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিয়ে না বুঝে বললুম—দিদি মানে?

—ও বাড়ীর।

—উমারাণী?

—হ্যাঁ। দিদি, টুনিদি, এঁরা সব আরতির সময় এসেছিলেন কিনা।

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তার সেই ভক্তিনম্র মধুর ব্যবহারটুকু আমার বড় ভাল লেগেছিল। তাই তাকে ভুলিনি, এবার চা-বাগানে গিয়ে মেয়েটির কথা অনেকবার ভেবেছি। তার পরদিন সকালে উঠে কাজকর্মের পাশ কাটিয়ে এক ফাঁকে ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখতে পেয়ে একেবারে ওদের রান্নাঘরের মধ্যে চ'লে গেলুম। টুনির মা বললেন—এস বাবা। তা এতদিন এসেছ, এবাড়ী কি একবারও আসতে নেই?

আমি সময়োচিত কি একটা কৈফিয়ৎ দিলুম। উমারাণী মাছ কুটছিল, আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চ'লে গেল। একটু পরেই হাত ধুয়ে এসে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। টুনির মা বললেন—বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও গে। এখানে এই ধোঁয়ার মধ্যে…

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে ব'লে উঠল—এ কি! দাদা যে? কি ভাগ্যি! বৌদি দাদা দাদা ব'লে মরে—ফি-দিন আমায় জিজ্ঞেস করে—দাদা পুজোর ছুটিতে বাড়ী আসবেন তো? দাদার দায় প'ড়ে গিয়েছে খোঁজ করতে! চার-পাঁচদিন এসেছেন, এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি?

আমাকে একটু অপ্রতিভই হতে হ'ল। উমারাণীর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—হ্যাঁ রে রাণী, দাদার কথা তা হ'লে ভুলিসনি?

টুনির কথায় মেয়েটির খুব লজ্জা হয়েছিল, সে মুখ নীচু ক'রে আমার কাপড়ের কোণ হাতে নিয়ে চুপ ক'রে নাড়তে লাগল—আমি দালানে একটা খাটের ওপর ব'সেছিলুম, উমারাণী নীচে আমার পায়ের কাছটিতে ব'সে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শচীশ বলছিল, দিদি চ'লে যাবে সোমবারের দিন। সে কথা কি ঠিক?

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল—বাবা চিঠি দিয়েছিলেন; একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও তো এলেন না।

ওর গলায় সুরটা যেন একটু কেঁপে গেল।

ওর বিরহী বালিকা-হৃদয়টি মা-বাপের জন্তে তৃষিত হয়ে উঠেছে বুঝে সান্ত্বনার সুরে বললুম—আসবেন; আজ তো মোটে নবমী। আচ্ছা, কলকাতা কেমন লাগল রাণী?

উমারাণী উত্তর দিল—বেশ ভাল।

আমি তার নত মুখখানির দিকে চেয়ে বললুম—তা নয় রে রাণী! ভাল কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে ভাল বললে চলবে না। কোথায় পশ্চিমের অমন জলহাওয়া, আর এই ধুলো ধোঁয়া—ভাল লাগতেই পারে না।

উমারাণী একটুখানি হেসে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম—পশ্চিমে পূজো হয় রে রাণী?

সে বললে—ঠিক এদেশের মত হয় না। হিন্দুস্থানীরা কি একটা করে, সেও অনেকটা এই রকমের। আর সেখানে এ সময় রামলীলার খুব ধুম হয়।

আমি উঠে আসবার সময় উমারাণী আবার একবার আমার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করল। আমি বললুম—রাণী, আমি যতবার আসব যাবো, ততবারই কি আমায় একটা ক'রে প্রণাম করতে হবে?

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথম বার আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললে—কাল বিকেলে আসবেন, দাদা?

এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব'লে ডাকেনি। আমি ওর মুখে দাদা ডাক শুনে বড় আনন্দ পেলুম। বললুম—কাল তো বিজয়া দশমী, আসব বৈকি।

তার পরদিন বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম করলুম। টুনি এসে বললে—আপনি দালানের পাশের ঘরে যান। ওখানে বৌদি আছেন।

আমি সে ঘরের দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে একটা বড় সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। তাতে ঘরের মধ্যে যাওয়া বন্ধ ক'রে আমায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের ওপরে বসে আমার ছোট ভাই শচীশ, তার বয়স বার-তের। তার পাশে উমারাণী দাঁড়িয়ে খাটের পাশে একটা টেবিলের ওপরকার একখানা রেকাবি থেকে খাবার নিয়ে শচীশের মুখে তুলে দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে। ওদের দু'জনকারই পেছন আমার দিকে।

এমন কোমল স্নেহের সঙ্গে উমারাণী শচীশের কাঁধের ওপর তার বাঁহাতটি দিয়ে স্নেহময়ী বড়দিদির মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে যে, আমার মনে হ'ল আজ শৈল বেঁচে থাকলে সে এর বেশী করতে পারত না। উমারাণীর প্রতি এতদিনে অনস্বুভূত একটা স্নেহরসে আমার মন সিক্ত হয়ে উঠল। আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে উমারাণীকে বললুম—লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু হবে না, দাদাকে কি খেতে দিবি রে রাণী?

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল লজ্জায়। সে এমন থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ যে, খামকা যে এত প্রণাম করে, আজ বিজয়ার প্রণাম করতে সে ভুলে গেল। একটা কি কথা অস্পষ্টভাবে বার দুই ব'লে সে মাথা নীচু ক'রে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধ'রে ফেলেছি, তার ভাই-বোন-বিহীন নির্জ্জন প্রাণটি কিসের

জন্তে তৃষিত হয়ে আছে, তা যে আজ বার ক'রে ফেলেছি। আজ অনুভব করছিলুম, জগতের মধ্যে ভাইবোনের একটু স্নেহ পাবার জন্তে ব্যাকুল এমন অনেক হৃদয়কে আজ আমি আমার বড় ভাইয়ের উদার স্নেহ-ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি। একটু বুকজুড়ানো তৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠল।

সেই সময় টুনি সে-ঘরে ঢুকে আমার সামনের টেবিলে থালা-ভরা মিষ্টান্ন রেখে বললে—দাদা, একটু মিষ্টিমুখ করুন।

আমি টুনিকে বললুম—আয় টুনি, সকলে মিলে ··

উমারাণীকে খাটের ওপর বসালুম। খাবার সকলকেই দিলুম। উমারাণী লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জ'মে গেল তার লজ্জার চোটে। বেচারী লজ্জায় আর ঘামে হাঁপিয়ে মারা যায় দেখে তার ঘোমটা বেশ ক'রে খুলে দিলুম। বললুম—আমি দাদা, আমার কাছে লজ্জা কি রে রাণী? আমার লক্ষ্মী ছোট বোনটি···

জলযোগ-পর্ব্ব সমাধা ক'রে বাইরের দালানে এসে টুনির মায়ের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলুম। একটু পরে তিনি উঠে রান্নাঘরে চ'লে গেলেন। আরও খানিক পরে আমি উঠতে যাচ্ছি, উমারাণী কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আজ ঠাকুর বিসর্জ্জন দেখলি নে?

—ওপরের ঘরের জানলা থেকে দেখছিলুম, বেশ ভাল।

—অনেক রকমের প্রতিমা, না?

—হ্যাঁ, কত সব বড় বড়।—তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে—দাদা, কাল আসবেন না?

আমি বললুম—সে কি বলতে পারি? সময় পাই তো আসব। আবার শীগ্‌গির চ'লে যাব কিনা, অনেক কাজ আছে।

—আপনি কি খুব শীগ্‌গির যাবেন দাদা?

—হ্যাঁ, বেশিদিন তো ছুটি নেই, পূর্ণিমার পরেই যেতে হবে।

উমারাণী নতমুখে চুপ ক'রে রইল।

বললুম—তা তোকেও তো আর বেশী দিন থাকতে হবে না রে।

উমারাণী বললে—বাবা বোধ হয় কাল আসবেন।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্তে বললুম—তবে আর কি? এই দুটো দিন কোন রকমে কাটালেই তো···

সে একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর যেন ভয়ে ভয়ে বললে—যাবার আগে একবারটি এ বাড়ী আসতে পারবেন না, দাদা?

বললুম—খুব খুব। আসব বৈকি। নিশ্চয়।

এর ছয় সাত দিন পরে গৌহাটি রওনা হলুম। এই কদিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে

ঘুরতে হয়েছিল। শচীশের মুখে শুনেছিলুম, উমারাণীর পশ্চিমে যাওয়া হয়নি। কি কারণে তার বাবা তাকে নিতে আসতে পারেননি। শচীশ মাঝে মাঝে বলত—দাদা, যাবার আগে একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন।

ইচ্ছা থাকলেও গৌহাটি যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে দেখা করা আর আমার ঘটে ওঠেনি।

গৌহাটি গিয়ে এবার অনেক দিন রইলুম। উমারাণীর কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হ'ত, তারপর দিনকতক পরে তেমন বিশেষ ক'রে আর মনে হ'ত না, ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম। কিছুদিন পরে গৌহাটির চাকরি ছেড়ে দিলুম। শিলচর, দার্জিলিং নানা চা-বাগান বেড়ালুম। দু'একটা হাসপাতালেও কাজ করলুম। সব সময় নির্জ্জনে কাটাতুম। একা বাংলোয় থেকে থেকে কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের একসঙ্গে কথাবার্ত্তা সহ্য করতে পারতুম না। এখানে সন্ধ্যায় পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে কুঙ্কুম ছড়ানো সূর্য্যাস্ত, চা ঝোপের চারিপাশ ঘেরা গোধূলির অন্ধকার, গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গম্ভীর ভাব, আর সরল গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের বিচিত্র সুর, ওই আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় স্বস্তিকর ব'লে মনে হ'ত। বসবার ঘরটিতে সাজিয়ে রেখেছিলুম জগতের যুগ যুগের জ্ঞানবীরদের বই Gauss, Zollner, Helmholtz, Geikie, Logan, Dawson, যাঁদের অলোক-সামান্য প্রতিভা আমাদের সুন্দরী বসুন্ধরার অতীত শৈশবের, তাঁর রহস্যময় বালিকা-জীবনের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের পাতা আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, যাঁদের মনীষার যোগদৃষ্টি অসীম শূন্যের দূরত্ব ভেদ ক'রে বিশাল নক্ষত্র জগতের তত্ত্ব অবগত হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটাতুম। জগতের রহস্যভরা অন্ধিসন্ধি তাঁদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ্চ-লাইট-পাতে উজ্জ্বল হয়ে তবে তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সীমার মধ্যে আসছে।

এই রকম প্রায় সাত আট বছর পরে আবার কলকাতায় গেলুম। ভাবলুম কলকাতাতেই প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করব। মামার বাড়ী গিয়ে উঠলুম। শুনলুম সামনের বাড়ীটায় আমার ভগ্নীপতিরা আর থাকে না, তারা বছর পাঁচ ছয় হ'ল দেশে চ'লে গিয়েছে। কয়েক মাস কলকাতায় কাটল। প্র্যাকটিস্ যে খুব জ'মে উঠেছিল, এমন নয়, বা অদূর ভবিষ্যতেও যে খুব জ'মে উঠবে, এরকম মনে করবার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন অবস্থায় একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে ব'সে পড়ছি, এমন সময় কে ঘরে ঢুকল। চেয়ে দেখে প্রথমটা যেন চিনতে পারলুম না। তারপর চিনলুম—টুনি। অনেকদিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদলে গিয়েছে। আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্য্যও হলুম, তেমনি খুব আনন্দিতও হলুম।

টুনি বললে, সে তার স্বামীর সঙ্গে আজ পাঁচ ছ'দিন হ'ল কলকাতায় এসেছে, সিমলেতে তাদের কোন্ আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আছে, আজ বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন এখন কোথায়?

টুনি বললে—ছোড়দা এখন আবাদে কোথায় চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণী কেমন আছে ?

টুনি একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, দাদা, সে অনেক কথা, আপনি এখানে আছেন, তা আমি জানতুম। সে সব কথা আপনাকে বলব ব'লেই আমার একরকম এখানে আসা।

আমি বললুম—কি ব্যাপার শুনি ? সে ভাল আছে তো ?

টুনি বললে—সে ভাল আছে কি, কি আছে সে আপনিই শুনুন না। সেই যে-বছর পুজোর সময় আপনি এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আসবার কথা ছিল, সে তো আপনি জানেন। তখন তিনি ছুটি পাননি ব'লে আসতে পারেননি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে নিয়ে যাবেন। তার বুঝি মাসখানেক পরে খবর এল তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের কনে বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল, এমনি অদৃষ্ট, আর সেমুখো হতে হ'ল না। তারপর···

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণীর মা ?

টুনি বললে—শুনুন না। মা আবার কোথায় ? তিনি তো বৌদির বিয়ে হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর এদিকে আবার দাদা তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তিনি সেই যেখানে চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন, বৌদি থাকেন চাঁপাপুকুরের বাড়ীতে প'ড়ে, দাদা চিঠিপত্রও দেন না। বৌদি বড় শান্ত, বড় চাপা মেয়ে, সে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। মেয়েমানুষের ও কষ্ট যে কি, সে আপনি বুঝবেন না দাদা। যতদিন মা ছিলেন, বৌদিকে কষ্ট জানতে দেন্‌নি, তা তিনিও আজ দু'বছর মারা গিয়েছেন। বাড়ীতে আছেন শুধু পিসীমা।

সেই শান্ত ছোট মেয়েটির উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গিয়েছে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি ?

টুনি বললে—তা তিনিই জানেন। তবে তিনি নাকি বলেন, জোর ক'রে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে করার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড়দাও দেশের বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীতে থাকেন শুধু পিসীমা। কাজেই বৌদির মুখের দিকে চেয়ে তাকে একটু যত্ন ক'রে দুটো কথা বলে, এমন একটা লোক পর্য্যন্ত নেই। পিসীমা আছেন, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে।

সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে—আপনাকে একটা কথা বলি দাদা। আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন। আপনাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বলতে পারিনে দাদা। সেবার চাঁপাপুকুরে গিয়েছিলুম, বৌদি বললে, আমার দাদার কথা কিছু জান ঠাকুরঝি ? আপনি এদেশ ওদেশ ক'রে বেড়াচ্ছেন শুনে সে কেঁদে বাঁচে না। মাঝে মাঝে যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনার কথা এমন দিন নেই যে সে বলেনি। বলে, ভগবান আমার ভাইয়ের অভাব পূর্ণ করেছেন, দাদা আর শচীশকে দিয়ে। এখনও পর্য্যন্ত কি চিঠিতেই আপনার খোঁজ নেয়। তা বড্ড পোড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহই কোন

দিন সে গেল না। আপনার পায়ে পড়ি দাদা, আপনি তাকে একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন, আপনি গেলে সে বোধ হয় অর্দ্ধেক দুঃখ ভোলে।

ছাদের আলিসার ওপর থেকে রোদ নেমে গেল, পাশের বাড়ীর চিলছাদের ওপর ব'সে একটা কাক একঘেয়ে চীৎকার করছিল।…

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন কি মোটেই বাড়ী যায় না?

টুনি বললে—সে একরকম না যাওয়াই দাদা। বছরে হয় তো দু'বার; তাও গিয়ে এক আধ দিন থাকেন। তাও যান সে কি জন্যে! কিস্তী না কি—সেই সময় যার কাছে যা খাজনা পাওয়া যাবে তাই আদায় করতে।

তারপর অন্যান্য এক-আধটা কথাবার্ত্তার পর টুনি চ'লে গেল। সেদিন বিকেলে সেনেট হলে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল, তিনি কেম্ব্রিজ থেকে এসেছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার বিষয়টি ছিল যেমনি চিত্তাকর্ষক,—বক্তৃতার অর্থাংশ ও বক্তার যুক্তিপ্রণালী ছিল তেমনই দুর্ব্বোধ্য। আরম্ভ হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাকলেও বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তারা প্রায় স'রে পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোড়বান্দা রকমের ছাত্র তখনও হলে বিভিন্ন অংশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ব'সে ছিল। বক্তা খ্যাতনামা অধ্যাপক, রয়েল সোসাইটির ফেলো। তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিকতার মোহে সকলেই তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পোশাক পরা সৌম্যমূর্ত্তি শ্মশ্রুদেহ অধ্যাপককে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত বোধ হচ্ছিল।… বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিন্তু আমার মন ভেসে যাচ্ছিল বক্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলকাতার ইটপাথরের রাস্তা থেকে অনেক দূর, আমার অভাগিনী বোনটি যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে সেই-খানে। মাঝে মাঝে হলের খোলা দুয়ার দিয়ে জ্যোৎস্না-ওঠা বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উমারাণীর বালিকা মুখখানি বড় বেশী ক'রে মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল তার সেই মিনতিভরা দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখতে পাবার জন্যে তার সে করুণ আগ্রহ। তার আগ্রহভরা দাদা ডাকটি অনেকদিন পরে আবার বড় মনে পড়ল। ভাবলুম সত্যিই কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহ কখনো সে পায়নি। আজ বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথার রস আমার স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থার সঙ্গে আমার অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোনটির নির্জ্জন জীবনের অবস্থা কল্পনা ক'রে আমার মন যেন কেঁদে উঠল। বাইরের জগতে যখন এত বিচিত্রস্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন সে কি ঘরের কোণে ব'সে দিনরাত চোখের জলে ভাসবে? জগতের আনন্দবার্ত্তা তার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যাবার কি কেউ নেই?

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘির জলের ওপর চাঁদ উঠেছে, কিন্তু ধোঁয়াভরা আকাশের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নার শুভ্রমহিমা আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। আমার মস্তিষ্ক তখন বক্তৃতার নেশায় ভরপুর, পুকুরের জলের ধারে সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে মরশুমী ফুলের ক্ষেত-গুলো আমার চোখের সামনে এক নতুন মূর্ত্তি ধরেছে। কিন্তু ত্রয়োদশীর অমন বৃষ্টি-ধোয়া

যুঁই ফুলের মত জ্যোৎস্নাও ধোঁয়ার জাল কাটিয়ে বাইরে আসতে না পেরে, ব্যর্থতার দুঃখে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে লক্ষ্য ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগল—এই জ্যোৎস্না, এই ফুলের ক্ষেত, এই ত্রয়োদশী, এবারকার মত সব মিথ্যে, সব ব্যর্থ।…ও জ্যোৎস্না প্রতীক্ষায় থাকুক সেই শুভ রাতটির, যে রাতে আকাশ-ভরা সার্থকতা ওকে বরণ ক'রে নেবে ফোটা ফুলের ঘন সুগন্ধের মধ্যে দিয়ে, তরুণ-তরুণীদের অনুরাগ-মগ্ন দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, গভীর রাতের নীরবতায় কাছে পাপিয়ার আকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে।…

বাড়ী এসে ভাবতে ভাবতে, এতদিন নানা কাজের ভিড়ে আমার যে বোনটিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

এর কয়েকদিন পরে কলকাতা ছেড়ে বার হলুম উষারাণীর কাছে যাব ব'লে। শীত সেদিন নরম প'ড়ে এসেছে, ফুটপাত বেয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দখিন্ হাওয়া অতর্কিত ভাবে গায়ের ওপর এসে প'ড়ে উৎপাত শুরু ক'রে দিয়েছে।…

পরদিন বেলা প্রায় দুটোর সময় ওদের ষ্টীমার স্টেশনে নেমে শুনলুম, ওদের গাঁ সেখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া নাকি কোন উপায় নেই, কোন রকম যান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব।

কখনো এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা করতে করতে পথ চলতে লাগলুম। কাঁচা রাস্তার দুধারে মাঠ, মাঝে মাঝে লতাপাতায় তৈরী বড় বড় ঝোপ। কোন কোন ঝোপের তাজা সবুজ ঘন বুনানি মাথা আলো ক'রে ফুটে আছে সাদা সাদা মেটে আলুর ফুল। মাঠে মাঠে মাটির ঢেলার আড়ালে কুপসি গাছে দ্রোণ-ফুলের খই ফুটে আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে মাটির পথের ওপর অভ্যর্থনা বিছিয়ে রেখেছে রাশি রাশি সজ্‌নে ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আর বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে মাতাল। বুনো কুলে আর বৈঁচি গাছের বনে কোন কোন মাঠ ভরা। পড়ন্ত রোদে গাছপালার তলায়, ঘন ঝোপের মধ্যে, ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করছে, মাঝে মাঝে কোন কোন জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে কোন অজ্ঞাত বনফুলের এমনি সুগন্ধ বেরুচ্ছে যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে। পায়ের শব্দ পেয়ে শুকনো পাতার রাশির ওপর খস্‌খস্ শব্দ করতে করতে দু'একটা খরগোস্ কান খাড়া ক'রে রাস্তার এপাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে পালাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমূল ফুলের গাছগুলো দখিন্ হাওয়ার প্রথম স্পর্শেই আবেশ-বিধুরা তরুণীর মত রাগ-রক্ত হয়ে উঠেছে।…

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবারে পড়বে চাঁপা-পুকুর। গ্রামের মধ্যে যখন ঢুকলুম তখন গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আশপাশের নানা বাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষ্মীদের সাঁজের শাঁখের রব নিস্তব্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল।…

কোন্ ঘরটি আলো ক'রে আছে আমার স্নেহের বোনটি? কোন্ গৃহস্থের আঙিনার আঁধার আজ দূর হয়ে উঠল তার সেবা-চঞ্চল চরণের শান্ত মধুর ছন্দে?…

রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় কতকগুলো ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তাদের মধ্যে একজন বললে—আসুন, আমি সে বাড়ী আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের একটা সরু পথ বেয়ে চলল। তারপর একটা বড় পুরানো বাড়ীর সামনে গিয়ে বললে, এই তাঁদের বাড়ী। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি। একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। বৃদ্ধাকে বললে—ইনি কলকাতা থেকে আসছেন জেঠাইমা, আপনাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে আমি ওপাড়া থেকে নিয়ে আসছি।

বৃদ্ধা আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমায় ত চিনতে পারছি নে বাবা, কোন্ জায়গা থেকে তুমি আসছ?

আমি আমার নাম বললুম—পরিচয় দিতেও উদ্যত হলুম।

বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন যে, আমায় আর পরিচয় দিতে হবে না, আমার আসা-যাওয়া নেই ব'লে তিনি কখনো আমায় দেখেননি, তাই চিনতে পারছিলেন না। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি এতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলুম না, আমি তো ঘরের ছেলের বাড়া, আমার আবার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কি ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। কেবল মনে হ'তে লাগল, আট বছর—আজ আট বছর পরে। কি জানি উমারাণী কেমন আছে, সে কেমন দেখতে হয়েছে। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে সে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝছি, আমার বুকের তারে তার প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজছে। আজ এখনি তার স্নেহমধুর ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আসব, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারব, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুনব, এ কথা ভেবে আনন্দে আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়ছিল।

দেখলুম এদের অবস্থা এক সময় ভাল ছিল, খুব বড় বাড়ী, এখন সব দিকেই ভাঙা ঘর-দোর, দেওয়াল ফেটে বড় বড় অশথ-চারা উঠেছে। বাইরের উঠান পার হয়ে ভেতর বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন—ও বৌমা, বার হয়ে দেখ কে এসেছে।

—কে পিসীমা?—ব'লে প্রদীপ হাতে সে ওদিকের একটা ঘর থেকে বার হয়ে এল, অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার পাশ দিয়ে চুলগুলো অসংযতভাবে কানের পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে, পরনে আধ-ময়লা শাড়ী, চেহারা রোগা রোগা একহারা। এই সেই-ই উমারাণী। তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হ'ল সে আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে আর মাথায়ও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড উমারাণী আমায় চিনতে পারলে না, তার পরই যেন হাঁপিয়ে ব'লে উঠল —দাদা!...

অন্য কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপটা কোনো রকমে নামিয়ে রেখে সে এসে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

আমি তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখলুম এক অপূর্ব্ব ভাব। মনে হ'ল আনন্দ, বিস্ময়, আশা, অভিমান সব ভাবের রংগুলো এক সঙ্গে গুলে তার প্রতিমার মত মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা বললেন—বাবা, তুমিই আস না, বৌমা দাদা বলতে অজ্ঞান। কত দুঃখ করে, বলে, কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝে দাদার দেখা পেতাম, এ তেপান্তরের পুর, তিনি আসবেন কেমন ক'রে!—বৌমা সতীশকে আগে হাতমুখ ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠাণ্ডা হোক, যে পথ।

হাতমুখ ধোবার পর উমারাণী একটা ঘরের মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ অবস্থায় হঠাৎ আসব, তা যেন সম্ভাবনার সীমার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। অন্ততঃ তার কাছে। তাই বেচারীর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে স্বাভাবিক গতি লাভের সুযোগ দেবার জন্যেও আমিও কোন কথা বলছিলুম না। একটুখানি দুজনে চুপ করে থাকার পর উমারাণী বললে—দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল?

আমি আগেকার মত তার মাথার দু'পাশের চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—রাণী, আসতে পারিনি হয়ত্ নানান্ কাজে। কিন্তু এ কথা মনে ভাবিসনি যে ভুলে গিয়েছিলুম। চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে রে, বড্ড কি অসুখ-বিসুখ হয়?

আট বছর আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত মুখ নীচু ক'রে একটুখানি হেসে সে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা রাণী, আমি আসব একথা ভেবেছিলি?

তার দুই চোখ জলে ভ'রে এল, বললে—কি ক'রে ভাবব দাদা। আমি আপনাদের আবার দেখতে পাব, আদর-যত্ন করতে পারব, এমন কপাল যে আমার হবে, তা কি ক'রে ভাবব?

এলোমেলো যে সব চুল তার ঘোমটার আশেপাশে পড়েছিল, সেগুলো সব ঠিকমত সাজিয়ে দিতে দিতে বললুম, সেই জন্যেই ত এলুম রে। আর তোদের দেখবার ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না? ভাবিস বুঝি, দাদাদের মন সব শান-বাঁধানো!

সে বললে—তাই আজ দু'তিন দিন থেকে আমার বাঁ চোখের পাতা অনবরত নাচছে দাদা। আজ ওবেলা যখন ঘাটে যাই, তখন বড্ড নেচেছে। পিসীমাকে বলতে পিসীমা বললেন—মেয়েমানুষের বাঁ চোখ নাচলে ভাল হয়।

আমি বললুম—আমার কথা তোর মোটেই মনে ছিল না, না রে রাণী? সে একথার কোন উত্তর দিল না, তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ রে, সুরেন বাড়ী থেকে গিয়েছে কতদিন?

সে নতমুখে উত্তর দিল—প্রায় আট মাস।

বললুম—চিঠিপত্র দেয়?

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

তার মুখের ভাবে বুঝলুম যে তার বড় ব্যথার স্থানে আমি ঘা দিয়েছি, দুঃখিনী বোনটির

এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে স্নেহে আমার মন গ'লে গেল। রুমাল বের ক'রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের জলে কেটেছে, তার খোঁজ তো কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী আছে কেবল আকাশের ঐ গহন অন্ধকার আর চারিপাশের গাছপালার মধ্যেকার ঐ ঝিঁঝিপোকার রব।···

উমারাণী জিজ্ঞাসা করলে—দাদা, আপনি কোথায় থাকেন?

আমি বললুম—আগে নানা জায়গায় ঘুরছিলুম, এখন ঠিক করেছি কলকাতাতেই থাকব।

সে বললে—আপনি বিয়ে করেছেন দাদা?

বললুম—না রে। বিয়ের তাড়াতাড়ি কি? সে একদিন করলেই হবে।

ছোট মেয়েটির মতন ঠোঁট দুটি অভিমানে ফুলে উঠল,—বললে—তাই বৈকি? আপনি বুঝি ভেবেছেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন? তা হবে না দাদা, এই বছরেই আপনার বিয়ে দেব।

আমার হাসি পেল, বললুম—দিবি তুই!

সে বললে—দেবই তো, এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই দেব।

আমি বললুম—তা যেন হ'ল। কিন্তু আমার তো বাড়ী-ঘর-দোর নেই, বিয়ে ক'রে রাখব কোথায়?

সে বললে—কেন দাদা, রাখবার জায়গার বুঝি ভাবনা? আমি বউকে এখানে রাখব। দু'জনে মিলে বেশ ঘর-সংসার ক'রব।

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বললুম—তা হ'লে পাঁজিখানা আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সামনের মাসে দিনটিন যদি থাকে···

উমারাণী বললে—পাঁজি ত ওপরের ঘরে রয়েছে দাদা। আপনি এখন খাওয়া-দাওয়া করুন, কাল সকালে দেখলেই হবে।

আশ্বস্ত হলুম। কি বলতে যাচ্ছিলুম, উমারাণী ব'লে উ'ল—আপনাকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করিগে, কাল থেকে পেটে ভাত যায়নি, আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে দাদা।

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই ভোরে নাইতে যাবার উদ্যোগ করছে। শীত সেদিন সকালে একটু বেশী পড়েছে। উমারাণীর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তার শরীরে আর কিছু নেই। রাত্রে ভাল টের পাইনি, আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না মেয়েটির সঙ্গে বর্ত্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা ক'রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এত সকালে নাইতে যাবার কি দরকার রে রাণী?

সে বললে—একটু সকাল সকাল না নেয়ে এলে কখন রান্না চড়াব দাদা? কাল রাত্রে তো আপনার খাওয়াই হয়নি এক রকম।

আমি বললুম—তা হোক। আমাকে যে আটটার মধ্যেই খেতে হবে তার কোন মানে নেই। এত সকালে নাইতে যেতে হবে না তোর।

উমারাণী ঘড়া নামিয়ে রাখল।

পিসীমা বললেন—তোমার কথা, তাই শুনলে বাবা। নইলে ও কি তেমন পাগলী মেয়ে নাকি, দ্বাদশীর দিনে মাঘ মাসের ভোরে নাইতে যাবে। শোনে না, বলি, বৌমা তোমার শরীর ভাল নয়, এত সকালে জলে নেবো না। শোনে না, বলে, পিসীমা কাল গিয়েছে আপনার একাদশী, একটু সকাল সকাল কাজ না সেরে নিলে, আপনাকে দুটো খেতে দেব কখন?

সেদিন দুপুরে ওদের ওপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি বই পড়ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক'রে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বললুম—কে, রাণী? আয় না ভেতরে!

আমি উঠে বসলুম। সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলুম তার শরীর আগেকার চেয়ে খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার মুখখানি প্রতিমার মতই টলটল করছে। বয়স যদিও বাইশ-তেইশ হ'ল, তার মুখ এখনও তেরো বছরের মেয়েটির মতই কচি। কথা আরম্ভ করবার ভূমিকাস্বরূপ বললুম—আজ বড় গরম পড়েছে, না?

উমারাণী বললে—হ্যাঁ দাদা। আমি ভাবলুম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি দিনমানে ঘুমোন না বুঝি?

বললুম—মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমোই। আজ আর ঘুমোব না। আয় এখানে বোস, গল্প করি।

তাকে কাছে বসালুম। তার চুলের অবস্থা দেখে বুঝলুম সে চুলের যত্ন করে না। মুখের আশেপাশে কোঁকড়া চুলের রাশ অযত্নবিন্যস্ত ভাবে পড়েছিল, চুলগুলোর রং একটু কটা হয়ে পড়েছিল। রাত্রের মত চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—তোর শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে! বিয়ের পর সেই সময় কেমনটি ছিলি। খুব কি জ্বর হয়?

একটু হাসি ছাড়া সে এ কথার কোন উত্তর দিলে না।

আমি বললুম—না, এ কথা ভালো না রাণী। আমি গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়মমত খেতে হবে। না হ'লে এ যে মহা কষ্ট।

একটু পরে সে বললে—তা হ'লে সত্যি দাদা, আমি কিন্তু বিয়ের চেষ্টা করব, বলুন।

আমি তার কথায় মনে বড় কৌতুক অনুভব করলুম। এই অবোধ মেয়েটা জানে না যে সে এমনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বসেছে, যাকে কার্য্যে পরিণত করা তার ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে।

বললুম—বকিস্ নে রাণী।

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কয় না দেখে পেছন ফিরে দেখি, ছেলেমানুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন ভরসা-হারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। মনে হ'ল, একটা ভুল করেছি, উমারাণী সেই ধরণের মেয়ে, যারা নিজেকে জোর ক'রে কখনও প্রচার করতে পারে না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে স্রোতের জলের শেওলার মত যারা জীবন কাটিয়ে দিতেই অভ্যস্ত। স্নেহ-সুখে সে আবোল-তাবোল বকছিল, এর সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক

হয়ে ব্যবহার করতে হবে, বাতাস লজ্জাবতী লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হয়ে চলে তার চেয়েও। কথাটা যতটা পারি সামলে নেবার জন্ত বললুম—তোর যদি সত্যি সত্যি বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকত, তাহ'লে তুই পাঁজিখানা আনতিস। দিন কোন্ মাসে আছে না আছে সেগুলো সব দেখতে হবে তো, না শুধু শুধু তোর কেবল বকুনি।

উমারাণীর মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, চোখের সে ভয়-ভয় দৃষ্টিটা কেটে গেল। আমার কথার মধ্যে সে আমার বকুনির একটা কারণ খুঁজে পেল। বোধ হয়, বিয়ে করবার জন্তে নিতান্ত উৎসুক দাদাটির ওপর তার একটু কৃপাও হ'ল। সে বললে—পাঁজি আপনাকে দিয়ে আজ দেখিয়ে নেব সে তো ভেবেই রেখেছি দাদা। আপনি বসুন, আমি ওপর থেকে পাঁজিখানা নিয়ে আসি।

দালানের ওপাশে একটা ঘর ছিল। উমারাণী সেই ঘরটার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময় পিসীমা নীচে থেকে ডাক দিলেন—বৌমা, নেমে এস, বেলা যে গেল, চালগুলো আবাব কুটতে হবে তো।

উমারাণী ঘরটার বার হয়ে এসে আমার হাতে পাঁজিখানা দিয়ে বললে—আপনি দেখে রাখুন দাদা, আমায় বলবেন এখন। আমি এখুনি আসছি।

সে নীচে নেমে গেল।

তখন বেলা একটু প'ড়ে এসেছে, নীচের বাগানের সন্ধ ফোটা বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভুরভুর করছে, বাগানের পথের পাশের সজনে গাছগুলো ফুলে ভর্তি। পড়ন্ত রোদ ঝিরঝিরে বাতাসে পেয়ারা গাছের সাদা ডালগুলো বুটিকাটা রাংতাব সাজে মুড়ে দিয়েছে।

উমারাণী কাজে গিয়েছে, এখন আর আসবে না ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হ'ল। উঠতে গিয়ে লক্ষ্য করলুম খাটের পা.শ একটা কা‍ে' হাতবাক্স রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-ওঠা, তাতে চাবির কলটাও নেই। সেই কাঠের বাক্সটার ডালা খুললুম। দেখি তার মধ্যে কতকগুলো টাটকা-তোলা লেবু ফুল, কতকগুলো গাঁদা ফুল, আর কতকগুলো আধ-শুকনো ঘেঁটু ফুল। ফুলগুলোর তলায় একটা আধ-ময়লা নেকড়ার যত্ন ক'রে জড়ানো কি জিনিস। নেকড়ার এমন কি জিনিস যার সঙ্গে এতগুলো ফুলের কার্য্যকারণ সম্পর্ক, এই নির্ণয় করতে কৌতূহলবশতঃ নেকড়ার ভাঁজ খুলে ফেলে দেখলুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোর ওপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতের লেখা ভগ্নীপতি সুরেনের। তার পোস্ট অফিসের মোহর দেখে বুঝলুম চিঠিগুলো পাঁচ-ছয় বছরের পুরানো, একখানা কেবল এক বছর আগে লেখা।

কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরোনো চিঠিগুলো এমন সযত্নে রক্ষা করছে, তার মধুর হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া-গহন যূথীবনে যার স্মৃতির নীরব আরতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল-সাঁঝে চলছে, কেমন সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা মন্দিরের ধূপ-গন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই ফিরতে লাগল!

মাঠ থেকে বেড়িয়ে যখন আসি, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ওদের রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে উমারাণী বললে—দাদা এলেন?⋯ আমি উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সে হাসিমুখে রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এল। বললে—দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? কোন্ দিক বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে বুঝি? তারপর সে বলল—দাদা, আপনি রান্নাঘরে বসবেন? আমি আপনার জন্তে পিঁড়ি পেতে রেখেছি।

পিসীমা বললেন—বৌমার যত অনাছিষ্টি, এখানে বাছাকে ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা।

আমি বললুম—আমার কোন কষ্ট হবে না, এখানেই বসি পিসীমা।

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে বসলুম। উমারাণী খাবার তৈরী ক'রে রেখেছিল, আমায় খেতে দিল, তারপর কাজ করতে ব'সে গেল। দেখলুম সে অনেকগুলো চালের গুঁড়ো, ময়দা ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে পিঠে তৈরী শুরু করেছে। পিসীমা খুবই বৃদ্ধা, তিনি কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে পারেন না। খাটতে সবটাই হচ্ছিল উমারাণীর। রোগা মেয়েটির অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল, ভাবলুম কেন অনর্থক পিঠে করতে ব'সে মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমারাণী যা করতে বসেছে, তার বিরুদ্ধে কোন কথা বললুম না অবশ্য।

জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আমায় পিঠে গড়তে শিখিয়ে দিবি?

উমারাণীর বড় লজ্জা হ'ল। মুখটি নীচু ক'রে সে বললে—দাদা, আমরা বেঁচে থাকতে পিঠে খাওয়ার ইচ্ছে হ'লে আপনাকে কি পিঠে গ'ড়ে নিতে হবে, যে আপনি পিঠে গড়তে শিখবেন?

পিসীমা বললেন—না, তোমার দাদার পিঠে খাবার ইচ্ছে হ'লে এই সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে খেয়ে যাবেন!

উমারাণী চুপ ক'রে রইল।

আমি বললুম—তা কেন পিসীমা? ও তার আর এক উপায় বার করেছে, শোনেননি বুঝি?

পিসীমা বললেন—কি বাবা?

আমি বললুম—ও এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই ওর দাদার বিয়ে দেবে।

পিসীমা বললেন—তা বৌমা তো ঠিক কথাই বলেছে বাবা। এত বড়টি হয়েছ, আর কি বিয়ে না করা ভাল দেখায়? সংসারী হ'তে হবে তো!

উমারাণী বলে উঠল—ভাল কথা দাদা, দিন তখন তো আর দেখা হ'ল না পাঁজিতে, আমি আর ওপরে যেতে পারলুম না। অবিশ্যি ক'রে বলবেন খাওয়ার পর রাত্রে।

আমি বললুম—বলব রে বলব। এতদিন তো মনে ছিল না তোর, এখন সামনে পেয়ে বুঝি দাদার ওপর ভারি মায়া।

পিসীমা বললেন—ও তোমার তেমন পাগলী বোন নয় বাবা। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়! আজ তিন-চার বছর হ'ল, ওরা যখন প্রথম কলকাতা থেকে এখানে আসে, তখন

বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছে তোমার জন্যে। বলে, দাদা দুঃখু করেছেন যে আমার বোন আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উলবোনা শিখে প্রথম কিনা জুতো বুনলো তার স্বামীর। তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো পরাব। তারপর ওদের আর কলকাতা যাওয়া হ'ল না, সুরেনের অন্ত জায়গায় চাকরি হ'ল। তুমিও আর কখনো এদিকে আসোনি। কাল তুমি আসতেই বৌমার যে আহ্লাদ! আমায় বললে—পিসীমা, আমার সাধ এইবার পুরলো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে পারব।

উমারাণীর চোখ দুটি লজ্জায় নীচু হয়ে রইল, প্রদীপের আলোয় উজ্জল তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মতন এমন লাবণ্যমাখা অথচ কচি মনে হচ্ছিল যে, বোধ হ'ল নোলক পরলে তাকে এখনও বেশ মানায়।

তারপর নানা কথায় আর খাওয়া শেষ হ'তে অনেক রাত হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে যখন ওপরের ঘরে শুতে গেলুম, তখন চাঁদ উঠেছে। গভীর রাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজল আমার মনে। আজ অনেকক্ষণ উমারাণীর নিকট ব'সে থেকে একটা জিনিস বেশ বুঝতে পেরেছি—উমারাণীর থাইসিস্ হয়েছে।

মৃত্যু ওর শ.ভ্র ললাটে তার তিলক পরিয়ে ওকে বরণ ক'রে রেখেছে, শীগ্‌গির একে বেরিয়ে পড়তে হবে অনন্তের পথের তীর্থযাত্রায়···

উমারাণী এক গ্লাস জল দিতে আমার ঘরে ঢুকল। জল নামিয়ে রেখে বললে—কৈ দাদা, সে পাজিখানা?

তার মুখখানির দিকে চেয়ে বড় মন কেমন ক'রে উঠল। বললুম—রাণী এদিকে আয়। ·· একথা আমার মনে উঠল না যে উমারাণী আমার আপন বোন নয় বা আমাদের দু'জনেরই বয়স কম। আমিও যেমন নিঃসংকোচে বললুম, সেও তেমনি নিঃসংকোচে এসে আমার পায়ের কাছে খাটের নীচে মাটিতে ব'সে পড়ল। আট বছর আগের মত আজও ওকে আদর ক'রে তার বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—রাণী, জুতোর কথা কে বলেছিল রে তোকে?

উমারাণী অসীম নির্ভরতার সঙ্গে ছোট মেয়েটির মত খাট থেকে ঝোলানো আমার পায়ের ওপর তার মুখটি লুকিয়ে রাখলে।···ওরে, স্নেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ হ'ত, তাহলে আমি বড় ভাইয়ের স্নেহ তোকে শিশি ভ'রে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে যেতুম।

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছ থেকে পেলুম না। কেন পেলুম না, তাও একটু পরেই বুঝলুম। একমাত্র লোক যে ঐ জুতোর কথা জানে বা যার কাছে আমি একসময় এ কথা বলেছিলুম, সে হচ্ছে সুরেন। সুরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোন সময় উমারাণীকে এ কথা ব'লে থাকবে। বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনটি তো আর সে কথা বলতে পারে না।

বললুম—রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। টুনি বলছিল—মানে, সুরেন কি ঠিক চিঠি-পত্র দেয়? বাড়ীটাড়ী আসে?

উমারাণী বড্ড জড়োসড়ো হয়ে গেল। আমার কথার কোন উত্তর দিল না, মুখও তুলে নিলে না, আগের মত আমার পায়ের ওপর মুখটি লুকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তারপর বুঝলুম সে কাঁদছে।...

তাকে সান্ত্বনা কি ব'লে দেব ঠিক বুঝতে পারলুম না, শুধু তার মাথার চুলগুলোর ওপর পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।... বেশীদিন না রে, সোনার বোনটি, বেশীদিন না। তোর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

ব্যর্থ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে যখন সে নীচে শুতে নেমে গেল, চাঁদের আলোর তলায় ঘুমন্ত বাতাস সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখছে।...

এর ছু'তিন দিন পরে তাদের ওখান থেকে চ'লে আসবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এর আগেই চ'লে আসতুম, কলকাতায় অনেক কাজ ছিল আমার, কিন্তু উমারাণীর করুণ মিনতি এড়াতে না পেরে কিছু দেরী হয়ে গেল।

কাপড় প'রে তৈরী হয়েছি, উমারাণী কাঁদো-কাঁদো মুখে নিকটে এসে দাঁড়াল। আমায় বললে—আবার কবে আসবেন দাদা?

বললুম—আসব রে, আবার পূজোর সময় আসব।

সে বললে—সে যে অনেকদিন! না দাদা, আপনি আষাঢ় মাসে রথের সময় আসবেন। আমাদের এখানে রথের বড় জাঁকজমক হয় দাদা। আর আমি কিন্তু আপনার বিয়ে দেবই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পায়ে পড়ি—আপনি অমত করবেন না।

তারপর সে সেই পশমের জুতো জোড়া বের ক'রে আমার সামনে মাটিতে রাখলে। বললে—আমি আন্দাজে বুনেছি, আপনি পায়ে দিয়ে দেখুন দেখি দাদা, হবে'খন বোধ হয়।

জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারাণী বড় খুশী হ'ল, তা'র সমস্ত মুখখানা সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তারপর সে আবার বললে—দাদা, আমি আপনার গরীব বোন, কখনো আসেন না এখানে, যদি বা এলেন, না পারলুম ভাল ক'রে খাওয়াতে দাওয়াতে, না পারলুম আদর-যত্ন করতে। এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি করব, আমার যেমন কপাল!

অনেকদিন আগেকার মত সেই রকম গলায় আঁচল দিয়ে সে আমায় প্রণাম করলে, তার চোখের জল আমার পায়ের ওপর টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে পড়তে লাগল।

আমি তাকে উঠিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—রাণী, তুই আমার মায়ের পেটের বোনই। একথা ভুলে যাস নে কখনো যে তোর বড় ভাই এখনও বেঁচে আছে।

যখন চ'লে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল, আসতে আসতে পেছন ফিরে দেখলুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

যখন পথের বাঁক ফিরেছি, তখনও তাকে দেখা যাচ্ছিল, বেলাশেষের হলদে রোদ সুপারি

গাছের সারির ফাঁক দিয়ে তার রুক্ষ কোঁকড়া চুলে ভেরা বিষণ্ণ মুখখানির ওপর গিয়ে পড়েছিল।··

বছরখানেক পরে আমি আবার চাকরি নিয়ে গেলুম ময়ূরভঞ্জ রাজস্টেটে। সেখানে থাকতে সুরেনের এক পত্রে জানলুম উমারাণী মারা গিয়েছে।

যাবেই তা জানতুম। সেবার যখন তার কাছ থেকে চ'লে আসি তখনই বুঝে এসেছিলুম, এই তার সঙ্গে শেষ দেখা। সুরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুম উমারাণীর অবস্থা সব খুলে, কোন একটা ভাল জায়গায় তাকে কিছুদিন নিয়ে যেতে। সুরেন লিখেছিল, জমিদারের কাজ-আদায়পত্র হাতে, পুজোর সময় বরং দেখবে, এখন যাবার কোন উপায় নেই ইত্যাদি। উমা-রাণী মারা গেল সেই ভাদ্র মাসে।

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার কিছুদিন ছুটি নিয়ে কলকাতা এসে দেখলুম ওদের সেই বাড়ীতে ওরা আবার বাস করছে। আমি এসেছি শুনে টুনি দেখা করতে এল। খানিক একথা-সেকথার পর টুনি কাগজে মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে দেখি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলো রুপোর কাঁটা।

টুনি বললে—বৌদি যে ভাদ্র মাসে মারা যায়, আমি সেই শ্রাবণ মাসে চাঁপাপুকুর গিয়েছিলুম। বৌদি আপনার কত গল্প করলে, বললে—মায়ের পেটের ভাই যে কি জিনিস ঠাকুরঝি, তা আমি দাদাকে দিয়ে বুঝেছি। আমার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী ক'রে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান, কেউ একটু যত্ন করবার নেই, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। ওই রূপোর কাঁটাগুলো সে গড়িয়েছিল আপনার বিয়ে হ'লে আপনার বৌকে দেবার জন্যে। সে আষাঢ় মাসে ওগুলো গড়িয়েছিল, আ 'ম গেলে আমায় দেখিয়ে বললে—ইচ্ছে ছিল সোনার চিরুনি দিয়ে দাদার বৌয়ের মুখ দেখব, কিন্তু এত পয়সা কোথায় পাব, এই বছরেই দাদার বিয়ে না দিলে নয়। বিয়ে হোক তারপর চেষ্টা ক'রে গড়িয়ে দেব। কাঁটা ওর বাক্সে তোলা ছিল, তারপর ভাদ্র মাসে বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে কাঁটাগুলো বের ক'রে এনেছিলাম আপনাকে দেব ব'লে। কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছর জমিয়ে যা করেছিল তাতেই ঐগুলো গড়িয়েছিল; দাদা তো এক পয়সাও তার হাতে দিতেন না, সংসার-খরচ ব'লে যা দিতেন তাতে সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবার গিয়ে দেখেই এসেছিলেন!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে তার হাতে পয়সা জমল কোথা থেকে?

টুনি বললে—বৌদি বাজারের খাবার বড় ভালবাসত। ওরা পশ্চিমে থাকত, সেখানে ওসব বোধ হয় তেমন মেলে না, সেই জন্য ঐ বাজারের কচুরি নিমকির ওপর তার কেমন ছেলেমানুষের মত একটা লোভ ছিল। বৌদি করত কি, নারকেল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাটি ক'রে রাখত, লোকে পয়সা দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেত। এই রকম ক'রে যে পয়সা পেত,

তাই দিয়ে গোপালনগরের হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাত, নিজে খেত, তাদের দিত। আপনি সেবার চ'লে যাবার পর থেকে সেই পয়সায় আর খাবার না খেয়ে তাই জমিয়ে জমিয়ে ঐ রূপোর কাঁটাগুলো গড়িয়েছিল।

আমি বললুম—সে মারা গেল কোন্ সময়ে ?

টুনি বললে—শেষ রাত্রে, প্রায় রাত চারটের সময়। রাত্রে বৌদির ভয়ানক জ্বর হ'ল, সেই জ্বরে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি ওর বিছানার পাশে ব'সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের এপাশ ওপাশ হাতড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজছে। আমি বললুম—বৌদি লক্ষ্মীটি, ও রকম করছ কেন ? তখন তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বললে, আমার চিঠিগুলো কোথায় গেল, আমার সেই চিঠিগুলো ? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগল। দাদা বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেসব চিঠি তাকে লিখেছিলেন, সে সেগুলো যত্ন ক'রে ওর বাক্সে তুলে রেখেছিল, আমি তা জানতুম। আমি সেগুলো বাক্স থেকে বের ক'রে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে দিলুম—তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা গেল। যখন তাকে বার ক'রে নিয়ে গেল, তখনও তার আঁচলে সেই চিঠিগুলো বাঁধা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন সে সময় ছিল না ?

টুনি বললে—ছোড়দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তিনি যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা হয়ে গিয়েছে।···

অনেক বছর হয়ে গিয়েছে।

এখনও শীতের অবসানে যখন·আবার বাতাবী-লেবুর ফুল ফোটে, সজনে-তলার ফুল কুড়োবার ধুম প'ড়ে যায়, পাড়াগাঁয়ের বন-ঝোপ ঘেঁটু ফুলে আলো ক'রে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন-ফুলের রাঙা ছায়া পড়ে, ফাগুন দুপুরের আবেশ-বিভোর রোদ আকাশে-বাতাসে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাবতে ভাবতে কার কথা যেন মনে পড়ে যায়·মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে·তখন মন বড় কেমন ক'রে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে··

বউ-চণ্ডীর মাঠ

গ্রামের বাঁওড়ের মধ্যে নৌকো ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আটকে গেল।

কানুনগো হেমেনবাবু বললেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নাও··

বাইরের নদীতে ভাঁটার টান ধরেছে, নাটা-কাঁটার ঝোপের নীচের জল স'রে গিয়ে একটু একটু ক'রে কাদা বার হচ্ছে।

হেমেনবাবু বললেন—একটুখানি নেমে দেখবেন না কোথায় পিন ফেলা হয়েছে ? যত শীগগির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়···

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিছনের নৌকো থেকে লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগ্‌গির সদর থেকে আসবার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলের সেই দিকে ঝোঁক। সাব ডেপুটি নৃপেনবাবু কাজ শেখবার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোকরা—কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা দুললেই তাঁর অত্যন্ত ভয় হচ্ছিল। বোধ হয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভান ক'রে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙায় নৌকো লাগাতে তিনি ছই-এর ভেতর থেকে বার হয়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক শুরু করলেন।

নৃপেনবাবুকে বললুম—Tenancy Act-কচ্‌কচিতে আর দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গাটা ঠিক করা যাক—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়...

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য নদীটির দু'পাড় ভ'রে সবুজ সবুজ লতানো গাছে নীল-পাপড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশ-ঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েছে, তলায় আকন্দ ঘেঁটু ফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝির্‌ঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারের রোদ-পোড়া কটা ঘাসওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লা গাছে গাঙ-শালিকের ঝাঁক কিচ্‌ কিচ্‌ কচ্ছে—নদীর বাঁ পাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতায় ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বন যুঁদোর ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হলদে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠছে।...

বেলা আর একটু পড়লে আমরা সেই বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হবে দেখতে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূর হ'লেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে। আমাদের যেখানে নৌকোখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটিতে ধাপ কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধ হয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আসছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—রসুলপুর কোন্ গাঁ-খানার নাম মশাই—সামনের এটা, না ওই পাশে?

তিনি বললেন—আজ্ঞে না, এটা হ'ল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙা—রসুলপুর হ'ল এ গাঁ-গুলোর পেছনে, কোশ দুই তফাৎ—আপনারা?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বললেন—এই মাঠটাতেই আপনারা তাঁবু ফেলবেন? আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হ'তেও তো পাঁচ ছয় মাস...

আমরা বললুম—তা তো হবেই, বরং তার বেশী...

বৃদ্ধ বললেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়েরা পুজো দিতে আসে, বরং আর একটু সরে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন, নইলে মেয়েদের একটু অসুবিধে...

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্ত্তী। জরিপ আরম্ভ হয়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্ত্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত শুরু ক'রে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ

মেশামেশি ও আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমা-জমি অনেক যাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করেছে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব ধরনের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। খানাপুরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমি সেদিনই জেলায় ফিরব—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়তে দেরী হ'তে লাগল। চক্রবর্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চকত্তি মশাই ? আপনাদের কি কোন ··

নৃপেনবাবুও বললেন—ভাল কথা, বলুন তো চকত্তি মশাই, বউ-চণ্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলুম। তিনি বলতে লাগলেন—শুনুন তবে, এটা সেকালের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোকে এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করতেন। এখন আর তাদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তাঁদের বড় শরিক পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর—পঞ্চাশ বছর বয়স হ'লেও চৌধুরী মহাশয়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাত। বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ব'লে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়স ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটি বেশ ডাগর, ভাসা ভাসা মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বললে, এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসেনি। সে মাটির দিকে চোখ রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্প বয়সের খুড়-শাশুড়ী দলের সামনেও ঘোমটা দেয়, সকলে বললে, যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস দুই-তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। সকলে দেখলে বৌটির আর সব ভাল বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁষ নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে, ছেলেমানুষ, বোধহয় সেই জন্তেই এ রকম করে। ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, স্বামী কেন, যে কোন পুরুষমানুষ দেখলেই সে কেমন যেন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যেদিন যজ্ঞি কি কোন বড় কাজ-কর্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সেদিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো যেতে রাজী হয় না, মাসে দু'দিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়, সে

জনেজনের পায় প'ড়ে, এর-ওর কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে, কিছুতেই বুঝ মানে না। পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

অনেক ক'রে বুঝিয়ে শুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ ক'রে দিল। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এর পর আর কিছুতেই কোন দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ী সুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগল, সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় করে, আমায় ওরকম ক'রে আর পাঠিও না···তোমাদের পায়ে পড়ি।···

বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোকে হয়রান হয়ে গেল।

দিনকতক গেল, একদিন তাকে সকলে মিলে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বার থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙবে—নইলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাল লাগে?·· ভোরে উঠে সকলে দেখলে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে গিয়েছে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায়নি। তখন সকলে বললে—পুকুরে ডুবে মরেছে; পুকুরে জাল ফেলা হয়, কোন সন্ধান মেলে না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হয়ে লোকের মনে অন্ত কোন সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেল না। কত দিকে কত সন্ধান ক'রে যখন কোন খোঁজই মিলল না. চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্তে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনলেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়া-চাড়া চলল। তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠাণ্ডা হ'ল। এই মাঠের পুবধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত প'ড়—ম'জে বাঁওড় হয়ে গিয়েছে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান বোঝাই নৌকা চলাচল হ'তে দেখেছি। ক্রমে চৌধুরীদের সব ম'রে হেজে গেল, শেষ পর্য্যন্ত বংশে একজন কে ছিল, উঠে গিয়ে অন্ত কোথাও বাস করলে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা, সত্তর-আশী বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম পড়ে, তখন রাখালেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারে বনের মধ্যে নিভৃত দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায়নি।···কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেছে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার স্বর উঠছে।···সমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফেরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে, দূর মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে সাদা কাপড় প'রে কে যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যাচ্ছে—তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না প'ড়ে চিক্‌মিক্ করতে থাকে।···মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন স্কুলেভরা

নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখলে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এইখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু ক'রে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে···তার ছোট ছোট পায়ের দাগ, ঝোপ যেখানে বড় ঘন সেদিকেই চ'লে গিয়েছে।···

মাঠের ধারে এই ছাতিম গাছের তলায় উলো-চণ্ডীতলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রাম-বধূরা পিঠে, কাঁচা দুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চণ্ডীর পুজো দিতে আসে। বউ-চণ্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হ'লে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতির স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পুজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দ্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাকবার সময় চিঠি আসতে দেরী হ'লে পুজো মানত করবার পরই শীগ্‌গির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে-আপদে তিনিই সকলকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ক'রে থাকেন।···

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হ'ল। তারপর আরও নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি ও আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ প'ড়ে এসেছে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে সুব্ সুব্ শব্দ হচ্ছে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্য্যন্ত উঁচু-নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁদিকে দূরে একটা পুরনো ইটের পাঁজার খানিকটা ঘন জিউলি গাছের সারির মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকোর গলুই-এ ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রাম্য-বধূর ইতিহাসটা ভাবতে লাগলুম। মাঠের মাঝে উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটু ফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যে—সারা দিনমান সে হয়ত ওর মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকে, কেবল গভীর রাত্রে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে, মাঠের মধ্যের বটগাছের তলায় চুপ ক'রে ব'সে আকাশের তারার দিকে চায়।···পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন-অপরাজিতা ফুলের রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী ব'য়ে যায়···ছাতিম বনের পাখীরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে—ওপার থেকে হু-হু ক'রে হাওয়া বয়···সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পুব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফোটবার দেরী কত!···

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকা ছাড়া হ'ল। জলের ধারের আঁধার-ভরা নিভৃত ঝোপের মধ্য থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল—সেটা হয়ত কোন রাত-জাগা বনের পাখীর, কি কোন পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হয়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েছি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জ্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসার ঘোমটা দেওয়া ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্না রাত্রি অন্ধে অন্ধে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ করছে, অনেককাল আগেকার সেই লজ্জা-কুণ্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত!···

নব-বৃন্দাবন

কর্ণপুর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন।

সংসারে তাঁহার কেহই ছিল না। স্ত্রী পাঁচ-ছয় বছর মারা গিয়াছে, একটি দশ বৎসরের পুত্র ছিল, সেও গত শরৎকালে শারদীয় পূজার অষ্টমীর দিনে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। সংসারের অন্য বন্ধন কিছুই নাই। বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, সেগুলি সব জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের দিয়া অত্যন্ত পুরাতন তালপত্রে কয়েকখানি ভক্তি-গ্রন্থ জীর্ণ তসরের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া কর্ণপুর পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কর্ণপুরের জন্মপল্লী অজয় নদের ধারে। তিনি পরম বৈষ্ণবের সন্তান। অজয়ের জলের গৈরিক দুই তীরের বন-তুলসী মঞ্জরীর ঘ্রাণে কোন্ শৈশবেই তাঁর বৈষ্ণব ধর্মে মানসিক দীক্ষা হয়। তিনি গ্রামের টোলে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। দুই-একটি ছাত্রকে কিছুকাল স্মৃতি ও বৈষ্ণবশাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা দেখিত তাহাদের অধ্যাপক মাঝে মাঝে ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কাঁদেন। পাগল বলিয়া অখ্যাতি রটাতে ছাত্রেরা ছাড়িয়া গেল, প্রতিবেশীরা তাচ্ছিল্য করিতে শুরু করিল, তাহার উপর প্রথমে স্ত্রী, তৎপরে পুত্রের মৃত্যু। সংসারের উপর কর্ণপুর নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যাইবার সময় জ্ঞাতি-ভ্রাতা রসরাজ আসিয়া মায়াকান্না কাঁদিল, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরিয়া কর্ণপুরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই সে তাঁহাকে বাঘি-জ্ঞানে শত হস্ত দূরে রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ যখন সে দেখিল কর্ণপুর সত্য সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছেন, ফিরিবার কোন আশঙ্কাই নাই, তখন সে আসিয়া মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল—আর কয়েকটা মাস থাকুন, যে করিয়া পারি ঋণটা শোধ করিয়া ফেলি, কারণ ঋণ পাপ ইত্যাদি! উদারচিত্ত কর্ণপুর এসব কপট প্রবন্ধ বুঝিলেন না। তিনি রসরাজকে তাঁহার প্রার্থনা মত তাল-দীঘির পাড়ের আওধান্যের একটুকরা ঐ কষ্ট ভূমি দানপত্র করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে বলিলেন—এক কড়া কড়ি আন ভায়া, গ্রহণ করিয়া তোমায় ঋণমুক্ত করি।

আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার জন্য সত্যকার ভাবনা কেহই ভাবিল না। শৈশব-স্মৃতির প্রথম দিনটি হইতে পরিচিত মাটির চণ্ডী-মণ্ডপ, স্বহস্ত-রোপিত কত ফল-ফুলের গাছ, কত খেলা-ধূলার জন্মভিটার আঙিনা পিছনে ফেলিয়া চলিলেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না, শুধু গ্রামসীমার অজয়ের ধারে গিয়া কর্ণপুর একটুখানি দাঁড়াইলেন।… অজয়ের ধারে প্রাচীন শিরীষ গাছের তলে গ্রামের শ্মশান, কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি মাতৃহীন বালক পুত্রটিকে এইখানে দাহ করিয়া গিয়াছেন। অজয় আর বাড়ে নাই, সুতরাং সে চিতার চিহ্ন এখনও একেবারে বিলীন হয় নাই। তার কচিমুখের অবোধ হাসিটুকু মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্বাসকষ্টে বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সে সময়কার তার আতঙ্কে আকুল অসহায় দৃষ্টি মনে পড়িল। কর্ণপুর অবাক হইয়া অজয়ের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।…ধূ ধূ গৈরিক বালুরাশির শয্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নদ অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া

ছিয়াছে, উপরে এখানে-ওখানে এক-আধটা দিকহারা মেঘশিশু আকাশের কোন কোণ হইতে বাহির হইয়া তখনই আবার সুদূর অনন্তের পথে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পৃষ্ঠের পুঁটুলিতে কয়েকখানি বস্ত্র, সামান্য কিছু তণ্ডুল ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, দক্ষিণ হস্তে মাধবীলতার আঁকাবাঁকা একগাছি দৃঢ় যষ্টি, বাম হস্তে একটি পিতলের ঘটি মাত্র লইয়া অজয় পার হইয়া কর্ণপুর পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন।···জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পরিচিত ছিল—সবই এপারে রহিয়া গেল।

দিনের পর দিন তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। এক-একদিন সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামের চটিতে, নয়তো কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইতেন। গ্রামপথে চলিবার সময় লোকে আদর করিয়া গৃহত্যাগী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের পুঁটুলি ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য দিত, পিতলের ঘটিটা পূর্ণ করিয়া নির্জ্জলা খাঁটি দুগ্ধ দিত; তিনি কোন দিন তাহার সামান্য অংশ খাইতেন, কোন দিন কোন দরিদ্র পথযাত্রী ভিক্ষুক বা কোন বুভুক্ষু কুকুরকে খাওয়াইতেন। কত গ্রাম, হাট, মাঠ, কত সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের গঞ্জ, কত নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি বসতি বিরল খুব বড় বড় নির্জ্জন মাঠ ও বনজঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলেন। চিরকাল নিতান্ত ঘরোয়া-ধরণের গৃহস্থ, বিদেশে কখনই বাহির হন নাই; সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পরই দিগন্ত বিস্তৃত জনহীন প্রান্তরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত; কর্ণপুর একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লোকালয়ের অন্বেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন—লোকালয় মিলিত না, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইত যদি কোন বন্যজন্তু বা কোন দস্যু আসিয়া আক্রমণ করে!···পরক্ষণেই ভাবিতেন, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, দস্যুতে আমার কি কাড়িয়া লইবে? অজয়ের ধারের বৃদ্ধ শিরীষ বৃক্ষতলে এক ধূসর হেমন্ত-সন্ধ্যার কথা মনে পড়িলেই অমনি কর্ণপুরের মন হইতে বন্যজন্তুর ভয় দূর হইত। বনের পথে চলিতে চলিতে অন্য খাদ্য মিলিত না, কোন দিন বুনো কুল, মহুয়া ফুল, কোন দিন বা ছোট তালচারায় নবোদগত পত্রকোরক খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন; অঞ্জলি পুরিয়া পার্ব্বত্য নদীর জলধারা পান করিতেন। মাঝে মাঝে আবার গ্রামও পাইতেন।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তিনি একটি তালবনে আশ্রয় লইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, পাথুরে মাটিতে অভ্রকণিকা চিক্ চিক্ করিতেছে, একটু পরে তালবনের পিছনে সূর্য্য ডুবিয়া গেল।···সন্ধ্যার আকাশে পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।···

সেদিন পথে এক ভিক্ষুকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল, তিন-চার মাস পূর্ব্বে জীবিকার চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়া সেদিন সে বাড়ী ফিরিতেছে। বাড়ীতে তার ছোট ছোট দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে, তাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রবাসের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রাঙা রাঙা পাথরের নুড়ি, নূতন ধরণের পাখীর রঙিন পালক, নানা তুচ্ছ জিনিস সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া

চলিয়াছে—বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের খেলনা করিতে।···কর্ণপুরের মনে হইয়াছিল সেদিন—দূর, মূর্খ সংসারাসক্ত জীব!···আজ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে জাগিল ঐ ভিক্ষুকটা তাঁহার চেয়ে সুখী। সে তো তবুও কতদিন পরে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গৃহ কোথায়?···পরক্ষণেই দুর্ব্বলতাটুকু বুঝিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান দয়া করিয়াই সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ভালই তো, ইহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে?

তাহার পর বসিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তালবনের মাথায় পঞ্চমীর চাঁদের দিকে চাহিয়া বার বার গাঢ়স্বরে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রির পাতলা জ্যোৎস্নায়, মাঠের নির্জ্জনতায়, শ্লোকের পদ-লালিত্যে তাঁহার মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। সেটাকে চাপা দিবার জন্য তিনি বসিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে গিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, ঐ অনন্ত আকাশের মত উদার-প্রাণ, ঐ জ্যোৎস্নার মত অনাবিল, চারিধারের প্রান্তর-বনের মত শান্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকের ললিত শব্দের মত তাঁর বাণী মধুর, শ্যামায়মান বনভূমির মতই তাঁর স্নিগ্ধ কান্তি···কিন্তু তাঁহার মুখটি কল্পনা করিতে গিয়া কেমন করিয়া কর্ণপুর বার বার তাঁহার মৃতপুত্রের মুখটিই ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দাহ করিবার সময় হইতে কর্ণপুর সে মুখটি কখনই ভোলেন নাই, মনে কেমন আঁটিয়া ছিল। সেই মুখ ছাড়া অন্য কোন মুখ তাঁহার ভাল লাগে না। নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিতে চাহিলেও কর্ণপুরের মনের গোপন কোণে একথা জাগিতেছিল, ইষ্টদেব যদি তাঁর পুত্রের রূপ ধরিয়া দেখা দেন, তবে না সুখ। যদি কখনও দেখা পান, তবে যেন পুত্রের সেই রূপেই পান।

শেষ রাতের স্বপ্নে কর্ণপুর দেখিলেন, জ্যোৎস্না দিয়া গড়া দেহ তাঁরই ছেলেটি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাঁর মৃতপুত্রের মুখটি খুব সুশ্রী ছিল, তবুও তাহার মুখের যেখানে যাহা কিছু ছোটখাট খুঁত ছিল, সেই সুন্দর অতি-প্রিয় খুঁতগুলি ঠিক সেই ভাবেই আছে। বাম ভুরুর উপরে শান্তশিষ্টতার জয়-তিলকটি এখনও তো বিলীন হয় নাই, সেই রকম পাগলের হাসি।···আস্তে আস্তে সে তাঁর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি ডাক দিল—বাবা!···অনেকদিন-হারা-পুত্রকে ক্ষুধার্ত্ত ব্যগ্র দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া কর্ণপুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন সকাল তো হইয়াছেই, তালবনের মাথায় রৌদ্রও উঠিয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে শুরু করিলেন। পথে কয়েকখানা গ্রাম পাইলেও তিনি কোথাও বিলম্ব করিলেন না। সারাদিন পথ চলিবার পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দূর হইতে একটি ছোটখাট গ্রাম দেখা গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় সম্মুখে লোকালয় দেখিয়া কর্ণপুরের মনে বড় স্বস্তিবোধ হইল। আশ্রয় স্থান সন্ধানে তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রাম-প্রান্তের প্রথম দুই-চারিখানা বাড়ী ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর অল্প-দূর অগ্রসর হইতে হইতেই গ্রামের দৃশ্য যেন কর্ণপুরের কাছে কেমন কেমন ঠেকিল। কোন গৃহস্থ-

বাড়ীতেই কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন বাড়ী হইতেই রন্ধনের ধূম উঠিতেছে না, পথে পথিকের যাতায়াত নাই, জনপ্রাণী কোনদিকে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গৃহস্থবাটীর বাহির দরজা খোলা—খোলা দরজা দিয়া চাহিলে বাটীর ভিতর একখানা কাপড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হইলেও সারাদিনের পথশ্রমে কর্ণপুর এত ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে—অতশত ভাবিবার, বুঝিবার বা ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি সম্মুখে এক গৃহস্থ বাটীর বাহিরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ও মোট পুঁটুলি নামাইয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।…দণ্ড দুই-কাটিয়া গেল, অথচ বাড়ীর ভিতর হইতে কোন মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া এই দুই দণ্ডের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা একটি গৃহপালিত পশুকে পর্য্যন্ত যাইতে দেখিলেন না। ততক্ষণে তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন; ভাবিলেন, এই বাড়ীটার মধ্যেই ঢুকিয়া দেখা যাউক, লোকজনেরা কি করিতেছে।

বাড়ীর মধ্যে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, ঘরের মধ্যে দুই তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে, মৃত্যু অনেকক্ষণ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া দেখিলেন, গৃহতলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে, মৃতদেহের পাশে একটি অনিন্দ্যসুন্দর গৌরবর্ণ শিশু থলবল্ করিয়া শয্যার পাশে বেড়াইতেছে ও ঘরের আড়া হইতে ঝুলিয়া পড়া একগাছি মাকড়সার জালের অগ্রভাগে দোদুল্যমান একটি মাকড়সার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইতেছে এবং আপন মনে হাসিতেছে।

ভাবগতিকে কর্ণপুর অনুমান করিলেন কোন ভীষণ মহামারীর আবির্ভাবে দুই একদিনের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে, সৎকারের মানুষ নাই, দেখিবার মানুষ নাই, হয়তো যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কর্ণপুরকে দেখিয়া শিশু একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। তাহার মা যে খুব বেশীক্ষণ মারা যায় নাই, ইহা দুইটি বিষয়ে তাঁহার অনুমান হইল। প্রথমতঃ, এই ক্ষুদ্র শিশুটি ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এতক্ষণ এরূপ হাসিত না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার মা জীবিতাবস্থায় তাহাকে স্তন্য পান করাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতি হয় নাই, শিশুর মা যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন মৃত্যু ও ঘনীভূত বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও অবোধ শিশুর এই নিশ্চিন্ত হাসি ও ক্রীড়া দেখিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, বাল্যকালে অজয়ের তীরের বনে তিনি এক প্রকার পতঙ্গকে লক্ষ্য করিতেন, সূর্য্যের আলোতে খেলা করিবার অধীর আনন্দে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে কোথা হইতে রাশি রাশি আসিয়া জুটিত এবং খানিকক্ষণ রৌদ্রে উড়িয়া নাচিয়া খেলা করিবার পর রৌদ্র বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য শেষ করিয়া মাটি ছাইয়া মরিয়া থাকিত।…কর্ণপুরের মন মমতায় গলিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ঘটিতে জল ছিল, বাহিরের ঘরে আসিয়া গণ্ডূষ করিয়া শিশুর মুখে ধরিতে পিপাসার তাড়নায় সে আগ্রহের সহিত উপরি উপরি বহু গণ্ডূষ জল খাইয়া ফেলিল।

তৎপরে তিনি শিশুর মাতার মুখে শুষ্ক তৃণ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, মস্তকের কাছে কর রাখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে সংক্ষিপ্ত সৎকার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি শিশুকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

কর্ণপুর আবার পৈতৃক ভিটাতে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিয়া আসা নহে, তিনি এখন পুরামাত্রায় সংসারী। জ্ঞাতি রসরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদ করিয়া বিষয়সম্পত্তি ও ধান্য-রোপণের ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে দু'বেলা তাগাদা করেন। দুপুর-রৌদ্রে উত্তরীয় মাথায় জড়াইয়া নিজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধান্য-বপনের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বৃক্ষ-বাটিকায় স্বহস্তে বহুদিন পরে ফল-ফুলের চারা রোপণ করেন।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাঁহার চক্ষের পুতলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। সমস্ত সকালটি সেই বহির্বাটিতে বসিয়া শিশুকে পথের লোকজন, গরু, শিবিকা-যাত্রী নববিবাহিত দম্পতি—এই সব দেখাইয়া তাহাকে আমোদ দেন। লোকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে, কর্ণপুরের কাণ্ড দেখ, তীর্থের পথ হইতে এক বন্ধন জুটাইয়া আনিয়াছে। হৃত সম্পত্তি রসরাজ পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়, মর্কট-বৈরাগ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কি আর মিথ্যা হইবার? হাতের কাছে দেখিয়া লও প্রমাণ! শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলোকে কর্ণপুরের পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কর্ণপুর এসব কথা শুনিয়াও শোনেন না। শিশু আজকাল ভাঙা ভাঙা কথা বলিতে শিখিয়াছে—তাহার মুখে আধ আধ বুলি শুনিয়া তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের অন্তর্হিত আনন্দ আবার ফিরিয়া পান। তারও আগের কথা মনে হয়, যখন তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী প্রথম ঘর করিতে আসিয়াছিল। পিতামাতা বর্ত্তমানে প্রথম যৌবনের সেই সুখের দিনগুলা কত প্রভাতের বিহঙ্গ-কাকলীর সঙ্গে, কত পরিশ্রম-ক্লান্ত মধ্যাহ্নে প্রিয়ার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণের সঙ্গে, অবসন্ন গ্রীষ্মদিনের শেষে উঠানের পুষ্পভারনত সাতাবী লেবু গাছটির সঙ্গে পুরাতন দিনের কত হাসি আনন্দের স্মৃতি জড়ানো আছে। তার পরে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্মোৎসব, স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া কোলের শিশুকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখ-স্বর্গ গড়িয়া তোলা! আবার মনে হয়, জীবনটাকে বিশ বছর পিছু হটাইয়া দিয়া কে যেন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাইতেছে।

শিশুকে সামলাইয়া রাখা দায়। অনবরত হামাগুড়ি দিয়া দাওয়ার ধারে আসিতেছে—হঠাৎ একবার অত্যন্ত ধারে আসিয়া হাত পিছলাইয়া মুখ থুবড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্ণপুর ধরিয়া ফেলিলেন। কি একটা বিপদ ঘটিবার অজানা ভয়ে পতনোন্মুখ শিশুর অবোধ চক্ষুদুটি ডাগর হইয়া উঠিয়াছে।...এ নিজের ভালও বুঝে না, এই ভাবনায় তাঁহার মন এই ক্ষুদ্র পাগলের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বন্ধন এইরূপ করিয়াই জড়ায়। ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসর হইয়া গেল, শিশু এক্ষণে সাত-আট বৎসরের বালক। তাহার দুষ্টামির জ্বালায় কর্ণপুর দিনেরাত্রে একদণ্ড শান্তি

পান না। এখানকার জন্য ওখানে লইয়া গিয়া ফেলে, কখন কি করিয়া বসে। নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেই তাহার আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশী।

বর্ষার দিনে কর্ণপুর তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া পড়ান। পড়িতে পড়িতে সে ছুটি লইয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যায়। অনেকক্ষণ আসে না দেখিয়া কর্ণপুর দাওয়ায় আসিয়া দেখেন—বালক অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে উঠানের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্তে মহা খুশির সহিত নাচিয়া বেড়াইতেছে। কর্ণপুর তিরস্কারের সুরে বলেন—ছি বাবা নীলু, দুষ্টুমি ক'রো না। উঠে এসো।···আদর করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছেন নীলমণি।

বালক বর্ষণ-ধৌত সুন্দর মুখখানি উঁচু করিয়া হাসিমুখে দাওয়ায় উঠিয়া আসে। শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সরে না, মনে ভাবেন—কোথায় ছিল এর পাত্তা ? সে সন্ধ্যাবেলা যদি উঠিয়ে না আনতাম, মুখে জলের গণ্ডুষ না দিতাম—তবে ?···মমতায় তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া পড়ে। মুখে তিরস্কার করিতে করিতে বালকের সিক্তকেশ মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া পুনরায় পড়াইতে বসেন।

আবার অন্যমনস্ক হইলে কোন্ ফাঁকে সে বাহির হয়। কর্ণপুর পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন সে দুই হাত জোড় করিয়া মুখ উঁচু করিয়া খড়ের চাল হইতে পতনোন্মুখ এক বিন্দু জল ধরিবার জন্য ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। হাত ধরিয়া আবার তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন।

বালক উত্তমরূপে বুঝে, বাবা তাহাকে কখনো মারিবেন না।

নিজ পুত্রের শোক কর্ণপুর ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন। কেবল এক্ এক দিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে তাহার মুখের হাসি দূরাগত করুণ সঙ্গীতের মত মনে আসে। মনের ইতিহাসে এই বালকের সে অগ্রজ, রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে সে-ই আসিয়া তাহার দাবী জানায়। কর্ণপুর উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত বালকের চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইয়া দেন। মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

শীঘ্রই কিন্তু বালককে লইয়া তাঁহার বড় বিপদ হইল। এত বেশী এবং এত বিনাকারণে সে মিথ্যা কথা বলে যে কর্ণপুর রীতিমত বিপন্নবোধ করিতে লাগিলেন। নানা রকমে মিথ্যা-কথনের দোষ ও সত্যভাষণের পুরস্কার সম্বন্ধে বহু গল্প উপদেশ বলিয়াও তাহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে সে অনেক কথা আজকাল লুকায়—আগে তাহা করিত না। কর্ণপুর ইহাতে মনে মনে কষ্ট পান। তাহা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। এ-গাছের লেবু, ও-গাছের আম ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, অমুকের ছেলেকে মারিয়াছে। কর্ণপুর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, কোন্ বংশের ছেলে, কি কুলগত স্বভাবচরিত্র লইয়া জন্মিয়াছে কে জানে! তাঁহার আপন ছেলের বেলায় এগারো বৎসরেও কোন অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই—কিন্তু এ বালক তাঁহাকে এ কি মুস্কিলে ফেলিল ?···ধর্ম্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এসব ব্যাপারে মনে মনে বড় ব্যথিত হন। তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া সময় সময় ভীত হইয়া পড়েন। বালস্বভাব-সুলভ চপলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন ; ভাবেন—উঠন্ত

মূল পত্তনেই চেনা যায়—কোন্ বংশের ছেলে ঘরে আসিল! কি জানি গতিক কি দাঁড়াইবে ?

অন্য সময় বসিয়া বসিয়া ভাবেন, তাঁহার অবর্তমানে বালকের ভরণ-পোষণের কি হইবে ? যদি মানুষ করিয়া দিয়াও মারা যান, তাহা হইলেও একটা এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহেন যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে সাংসারিক কষ্ট না ঘটে। কোন্ জমির কি ব্যবস্থা করিবেন, কুসীদ ব্যবসায় করিলে কিরূপ উপার্জন হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তায় কর্ণপুর ব্যস্ত থাকেন।

এক এক সময় হঠাৎ যেন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া যায়। বিষয় চিন্তা!

মনে মনে ভাবেন এ সব কি আসিয়া জুটিল ? সারাদিনে একদণ্ড ইষ্টচিন্তা করিতে পাই না, প্রৌঢ় বয়সে এ দুর্দৈব মন্দ নয়!

প্রতিবেশী রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করিলেন, কর্ণপুরের পালিতপুত্র তাঁহার বাড়ীর ময়না পাখীর খাঁচা খুলিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়াছে। বালক বাড়ী আসিলে কর্ণপুর জিজ্ঞাসা করিলেন—নীলু, শুনছি তুমি নাকি ওদের পাখী উড়িয়ে দিয়ে এসেছ ?

বালক বলিল—না বাবা—আমি না···

একে অপরাধ লঘু নহে, তাহার উপর তাঁহার মনে হইল এ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কর্ণপুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাহাকে খুব প্রহার করিলেন।

তাহার বাবা তাহাকে মারিবেন বালক ইহা ভাবে নাই—কারণ বাবার হাতে কখনো সে মার খায় নাই। তাহার চোখের সে বিস্ময় ও ভয়ের দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—যাও, বাড়ী থেকে বেরোও—দূর হও—মিথ্যা কথা যে বলে তার স্থান নেই আমার বাড়ী।

বালকের ভরসা-হারা দৃষ্টি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়-হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

অর্দ্ধ দণ্ড পরে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সেখানে বালক নাই। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বাড়ীর এদিক-ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদের বাড়ী খুঁজিলেন—কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কর্ণপুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সন্ধ্যাকাল—বেলীদূর কোথায় গেল ? তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিতেন—বালক ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছে, তাহার জন্য দুই-একটা, সে যাহা খাইতে ভালবাসে, এমন ব্যঞ্জন রন্ধন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—আজ রাত্রে মিষ্ট কথায় কি কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বালককে না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তন্ন তন্ন করিয়া পাড়ার সব বাড়ী খুঁজিলেন ; কেহ সন্ধান দিতে পারে না। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শিবানন্দ তাঁহার কাছে বৈদ্যক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। সে তাঁহাকে বলিল—তিনি রন্ধন করুন, সে আর একবার ভাল করিয়া সকল স্থান খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে যদি বাড়ী ফিরিয়া থাকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথায় ? সে বাড়ী আসে নাই।

কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন উঠানের পার্শ্বের গোশালার মধ্যে শিবানন্দ বার বার বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন, গোশালার রক্ষিত তৃণরাশির উপর বালক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শিবানন্দের ডাকাডাকিতে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া ব্যাপার কি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ না বুঝিতে পারিয়া, অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে।···কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন। পরে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অভিমানে বালক তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না—বহু আদরের কথা বলিয়া ও কাটোয়ার ফেণী বাতাসা কিনিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া কর্ণপুর তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

সেদিন রাত্রে কর্ণপুর মনে মনে ভাবিলেন—কাল হইতে ইহাকে একটু একটু ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাই, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এ স্বভাবটা শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন হইতে তিনি তাহাকে অবসর মত নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মুখস্থ করাইয়া দিলেন, প্রতি সকালে উঠিয়া বালককে তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে হয়। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা পড়িয়া শোনান। সন্ধ্যার সময় বসিয়া বালককে ডাকিয়া বলেন—ঠাণ্ডা হয়ে বসো, একটা গল্প করি।

পরে মাধবেন্দ্রপুরী উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডের বৃক্ষতলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, এক গোপাল বালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, তুমি কাহারও কাছে কিছু চাও না কেন? বোধ হয় সারাদিন উপবাসী আছ—এই ধরো দুগ্ধ। পুরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে আমি উপবাসে আছি? বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, এখানে কেহ উপবাসী থাকে না, তাহারাই এই দুগ্ধভাণ্ড দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ভাণ্ড রহিল, গরু দুহিয়া আসিয়া লইয়া যাইব।

বালক চলিয়া গেল, কিন্তু ভাণ্ড লইতে আর ফিরিল না।···রাত্রে পুরী স্বপ্ন দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া নিকটবর্ত্তী এক বনে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিতেছে, দেখ পুরী, আমি বহুদিন হইতে এই বনের মধ্যে আছি। যবনের আক্রমণের ভয়ে আমার সেবক এইখানে আমায় ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে, কেহ দেখে নাই; শীত-বৃষ্টি-দাবানলে বড় কষ্ট পাই, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা ক'রো। অনেকদিন হইতে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি—মাধব আসিয়া কবে আমার সেবা করিবে।

মাধবপুরী মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

পর বৎসর নীলাচল হইতে মলয়-চন্দন আনিয়া বিগ্রহের অঙ্গে লেপন করিয়া দিবেন ভাবিয়া ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী নীলাচল যাত্রা করিলেন। · যাইতে যাইতে রেমুনাতে আসিয়া রাত্রিবাসের জন্য তথাকার গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, ঠাকুরের ভোগের সময় উপস্থিত; কথায় কথায় পুরী মন্দিরের পূজারীকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপীনাথের ভোগের কি ব্যবস্থা আছে? পূজারী বলিল, গোপীনাথের ভোগের জন্য অমৃতকেলি নামক ক্ষীর দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরিয়া সন্ধ্যার পর দেওয়া হয়, অমৃতসমান তাহার আস্বাদ—গোপীনাথের ক্ষীর বলিয়া তাহা প্রসিদ্ধ—অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। কথা বলিতে বলিতে ভোগের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরী মনে মনে ভাবিলেন, অযাচিতভাবে কিছু ক্ষীর প্রসাদ পাওয়া যায় না? তাহা হইলে কিরূপ আস্বাদ জানিয়া ঐরূপ ভোগ বৃন্দাবনের মঠে শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করি। ভাবিতেই পুরীর মনে লজ্জা হইল—শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের হাটে আসিয়া বসিলেন।

অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত-উদাস
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।

রাত্রে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন পান—গোপীনাথ স্বয়ং তাহাকে বলিতেছেন, দেখ, এই গ্রামের হাটে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে, তার নাম মাধবপুরী; তাঁহার জন্য একখণ্ড ভোগের ক্ষীর ধড়ার আঁচলে ঢাকা রাখিয়া দিয়াছি, আমার মায়ায় তোমরা তাহা টের পাও নাই। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, শীঘ্র মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া এসো।··

পূজারী তখনই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, সত্যই বিগ্রহের ধড়ার অঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর চাপা আছে বটে। কে এমন মহা ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার জন্য স্বয়ং ঠাকুর ক্ষীর চুরি করিয়াছেন?···ক্ষীর-পাত্র লইয়া পূজারী গ্রামের হাটে আসিয়া তাঁহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিলেন। মাধবপুরী একা অন্ধকার হাটচালাতে বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। পূজারী তাঁহার হাতে ক্ষীর-পাত্র তুলিয়া দিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, ত্রিভুবনে তোমার সমান ভাগ্যবান পুরুষ নাই, পায়ের ধূলা দাও, উদ্ধার হইয়া যাই। তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

বালক এক মনে শান্তভাবে শোনে।

বার বার সে তাঁহাকে প্রশ্ন করে—বাবা, কৃষ্ণ কোথায় থাকেন? বৃন্দাবনে?

প্রতিদিন এক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কর্ণপুর বলেন—হাঁ হাঁ থাকেন।

ইহার পর হইতেই সে সুর ধরে—বৃন্দাবন কোথায় বাবা, আমি বৃন্দাবনে যাবো!

কর্ণপুর ভাবিলেন, ইহার কিছুই হইতেছে না দেখিতেছি—আমার পরিশ্রম সবই পণ্ড হইতেছে, এ কিছুই বোঝে না, শুধু বাজে দুষ্টামির দিকে ঝোঁক।

বার বার তাগাদায় বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে দূর গ্রামে তাঁহার এক ধান্য-ক্ষেত্রের কার্য্য ধরাইবার জন্য কর্ণপুরের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়াছিলেন, বালক যেরূপ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চোখে চোখে রাখাই ভাল, এক কাজে দুই কাজ হইবে। কর্ণপুর বলিলেন—চল নীলু, আমরা বৃন্দাবনে যাই।

উৎসাহে বালকের রাত্রে নিদ্রাবন্ধের উপক্রম হইল। প্রতি রাত্রে সে জিজ্ঞাসা করে,

যাইবার আর কয় দিন বাকি।…গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে শুইয়া সে কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল—আমি কৃষ্ণকে দেখতে যাব বাবা! কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান বাবা? কাল সকালে উঠে যাব।

পরদিন স্বীয় ধান্যক্ষেত্রে যাইবার সময় কর্ণপুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও ক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে পথের ধারে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এখানে চুপ ক'রে ব'সে থাক, কৃষ্ণ এই পথে যাবেন। উঠে এদিক-ওদিক গেলে কিন্তু আর দেখতে পাবে না। চুপ ক'রে ব'সে থাক।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ করিয়া কর্ণপুর বালককে লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মহা উৎসাহে বলিল—দেখেছি বাবা, এই মাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি দেখতে পেলে না!

কর্ণপুর বুঝিলেন, নির্ব্বোধ বালক গ্রামের রাখালদিগকে গরুর পাল লইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে। বলিলেন—চলো, বাড়ী চলো—আমি অনেক দেখেছি—তুমি দেখেছ তো, তাহলেই ভাল।

তার পরদিন হইতে বালক প্রায়ই বাবার সঙ্গে মাঠে যায় ও পথের ধারে নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া থাকে। রোজই বাপকে অনুযোগ করে, কেন বাবা এখানে সন্ধ্যার সময় থাকো না, কেন দেখো না! কোন কোন দিন বলে—কাল আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, আয় না গরু চরাবি! আমি তোমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে যেতে পারিনি। যাবো বাবা কাল?

প্রতিদিন এক কথা শুনিয়া কর্ণপুরের মনে খটকা লাগিল। বালক যেভাবে কথাগুলো বলে তাহাতে মিথ্যা কথা বলিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্যাপারটা কি? একদিন বালককে বলিলেন, এবার সে-সময় যেন তাঁহাকে সে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া লয়, তিনিও দেখিবেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বালক ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—শীগ্‌গির এসো বাবা, কৃষ্ণ আসছেন।

কর্ণপুর বালকের পাছু-পাছু পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কেহ নাই, মাঠের ধারে নির্জ্জন পথ…কিন্তু বালক দুই হাত তুলিয়া মহা উৎসাহে বলিল—ঐ দেখ বাবা—গরুর দল!·ঐ যে—ঐ দেখ…আসছেন··

কর্ণপুর বলিলেন—কৈ কৈ…কোন কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

বালক বলিল—এইবার দেখেছ তো বাবা? দেখেছ কত গরু?…ঐ দেখ, কৃষ্ণ কেমন পোশাক প'রে?··

কর্ণপুর বিস্মিত হইলেন। বালকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তেজিতভাবে জনশূন্য পথের দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিলেন, ইহা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ নয় তো?

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জ্জন পথে কর্ণপুরের কানে গেল, সত্য সত্যই যেন একদল গরুর

সম্মিলিত পদশব্দ হইতেছে, যেন অদৃশ্য একদল গরু কে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য বাঁশির তান তাঁহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিয়া চলিয়াছে···খুব মৃদু বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট! ·

অপূর্ব্ব মধুর তান! জীবনে সেরূপ কখনো তিনি শোনেন নাই।

কর্ণপুরের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বাঁশির সুর একটানা বাজিতে বাজিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দূরে আরও দূরে গিয়া আম্‌শি ফুলের বনের প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

বালক বলিল- দেখলে বাবা? আমি বুঝি মিথ্যে কথা বলি?

কর্ণপুর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভিশপ্ত

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওধারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

ও অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগল।

সময়টা পূজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হ'ল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হ'ল। ·

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ব্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধোঢাকা চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না চিক্‌মিক্ করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্নগাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে।··· বাইরে একটু ঠাণ্ডা থাকলেও আমি ছইএর বাইরে ব'সে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ-পনেরো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দীপ। আর একটু রাত হ'ল। খালের দু'পাড়ের নির্জ্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই; শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন—এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ছইএর মধ্যে। এসব জঙ্গলে—বুঝলেন না ?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, তাঁরই সঙ্গে ক'রে তিনি একবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন—সেই সব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হ'ল।

মাঝি আমাদের নৌকোর ছিল মোটে একটি। সে ব'লে উঠল—বাবু, একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেখানেই বাঁধা হ'ল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দুধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্য্যন্ত চুপ করেছে। সঙ্গীকে বললুম—মশায়, এই তো সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না তো নৌকোর ওপর ?

সঙ্গী বললেন—না পড়লেই আশ্চর্য্য হবো !

শুনে অত্যন্ত পুলকে ছইএর মধ্যে ঘেঁষে বসলুম। খানিকটা ব'সে থাকবার পর সঙ্গী বললে—আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে না, আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ ক'রে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে ব'লে মনে হ'ল না ; ভাবলুম, তবে আমিই বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি—মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপাশে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।...তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম—গ্রামোফোন ? এ বনে এত রাত্রে গ্রামোফোন বাজাবে কে ? কান পেতে শুনলুম—গ্রামোফোন না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্ত্তকরুণ সুরে কি বলছে।...খানিকটা শুনে মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতলার ছাদে গ্রামোফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌছয়—এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হ'ল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল—কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হ'ল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।...তাড়াতাড়ি ছইএর বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঁঝের বিচিত্র মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকোর তলায় ভাঁটার জল কল্‌কল্ ক'রে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়া-ঝোপে এক প্রকার

অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলুম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে, ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে ব'সে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম; তারপর আবার ছইএর মধ্যে ঢুকতে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন্ অংশ থেকে সুস্পষ্ট উচ্চ আর্ত্তকরুণ ঝিঁঝিঁ পোকার রবের মত তীক্ষ্ণস্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল – ওগো নৌকাযাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ···আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে ম'লাম···আমাদের ওঠাও ওঠাও···আমাদের বাঁচাও।

নৌকোর মাঝিটা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠল। আমি সঙ্গীকে ডাকলুম—মশায়, ও মশায়, উঠুন উঠুন।

মাঝি আমার কাছে ঘেঁষে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছিল। বললে—আল্লা! আল্লা! শুনতে পেয়েছেন বাবু?

সঙ্গী উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি, কি মশায়? ডাকলেন কেন? কোন জানোয়ার-টানোয়ার নাকি?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছইএর বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে কান খাড়া ক'রে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ · ভাঁটার জল নৌকোর তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।···

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি তবে···

মাঝি বললে—হ্যাঁ বাবু, বাঁয়েই কীর্ত্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন—তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখলি কেন? বেকুব কোথাকার!···

মাঝি বললে—তিন জন আছি ব'লেই রেখেছিলাম বাবু। ভাঁটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবার তো জো ছিল না।

কথাবার্ত্তার ধরণ শুনে সঙ্গীকে বললুম—কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনি কিছু জানেন নাকি?

ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বললেন—ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল্। আলো জ্বেলে ব'সে থাকা যাক—রাত এখনও ঢের।

মাঝিকে বললুম—তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?

সে বললে, হাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই তো আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আরও দুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও ডাক শুনেছি।

সঙ্গী বললেন—এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় ব'লে আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই ব'লে, শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই

এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমান্বিত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে ব'সে শশীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম।

তিন শ' বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এ অঞ্চলে তখন বারভুঁইয়ার দুই প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মশনদ-ই আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহানার বাহির সমুদ্র, যাকে এখন সন্দীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেতে ব'সে থাকত।

সে সময় এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা তখন কীর্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেকবার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দীপ তখন ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় ক'রে গড়তে হ'ত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর একটা খাল বড় নদীতে পড়ত, বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল, যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আশপাশের জমিদারী এমন কি নিজের জমিদারীর মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী-কন্যা লুঠপাট করা রূপ মহৎ কার্য্যে সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত।

কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্তি রায়ের এক বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশী ছিল। কীর্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারায়ণ তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান। নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী ও বন্ধু।

সেবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যে দিনকতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মতন স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। দু'একদিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হয়ে উঠতে হ'ল। নরনারায়ণ রায় তরুণবয়স্ক হলেও একটু গম্ভীর প্রকৃতি। বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ-পরিহাসে গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল। স্নান ক'রে উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নানা জায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে

দেখেন তার নীচেই তাস চাপা আছে—যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে খুঁজেছেন। …তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হ'তে লাগল, যা কোন কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়। …তরল-মস্তিষ্ক বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার-জর্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হ'লেও বাইরে স্ত্রীকে বললেন—দু'দিনের জন্ম এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে রকম বিব্রত ক'রে তুলেছ,' ও আর কখনো এখানে আসবে না।

দিন-কয়েক এ রকমে কাটবার পর কীর্ত্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল। নরনারায়ণ রায়ও বন্ধুপত্নী কখন কি ক'রে বসে, সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করবার পর নিজের বজ্‌রায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মী দেবী ব'লে দিলেন—এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত-দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে ব'সে চৌকি দেবে—বুঝলে তো?

নরনারায়ণ রায়ের বজ্‌রা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল। তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজ্‌রার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক্ ঝক্ করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোন নৌকো ছিল না—যারা সাহায্য করতে আসতে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র—সন্দীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। নরনারায়ণের বজ্‌রার রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নরনারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হ'লে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আ[illegible]ন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। …খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন, যাকে নক্ষত্র ব'লে মনে হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেজের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে।

আরো ক'দিন আরো ক'রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আনলে না। তিনি বুঝলেন, যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্ম্মম মৃত্যু!…

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন-দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল।…তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধা-কাতর দেহ প্রসারিত ক'রে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।… প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম্ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই

বরাভয়ী মৃত্যু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝতে পারলেন না—হঠাৎ আলো চোখে লেগে তাঁর তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তাঁর সামনে প্রদীপ-হস্তে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধুপত্নী লক্ষ্মী দেবী। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হ'ল—এসব স্বপ্ন নয় ত? কিন্তু ঐ যে দীপশিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায়।...

নরনারায়ণ শক্তিমান যুবক, ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচবার উৎসাহে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রবর্ত্তিনী ক্ষিপ্রগামিনী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখলেন যে তাঁরা কীর্ত্তি রায়ের প্রাসাদের সামনের খালধারে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতে-বোনা থলি বার ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এতে খাবার আছে, এখানে খেও না, তুমি সাঁতার জানো, খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর যত শীগ্‌গির পারো পালিয়ে যাও।

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝলেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারী কীর্ত্তি রায়ের জমিদারীর পাশেই এবং তাঁর অবর্ত্তমানে কীর্ত্তি রায়ই দনুজমর্দ্দনদেবের বংশধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্যসামন্ত কীর্ত্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন? কীর্ত্তি রায় যে মাথা নীচু ক'রে আছেন, তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর একপাশে বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্যপাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য?

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন, তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখে সে চটুল হাস্য-রেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে-ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহ-কোমল হয়ে এসেছে। তাঁদের চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপর আকাশের বুক চিরে দিগন্ত-বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাঁটার টানে তীরের হোগলা গাছ দুলিয়ে কল্‌কল্ শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটেছে। নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, চঞ্চলও কি এর মধ্যে আছে?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—না ভাই, তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুরঠাকুরের কীর্ত্তি। এই জন্যেই তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আমার মনে হচ্ছে। দৌড়-দৌড় সব মিথ্যে।

নরনারায়ণ দেখলেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মী দেবী আবার বললেন—আমি আজ জানতে পারি। খিড়কি গড়ের পাইক সর্দ্দার আমায় মা বলে, তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই...

নরনারায়ণ বললেন—বৌ-ঠাকরুণ, আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল—তুমি আমার সেই বোন, আজ আবার ফিরে এসে।

লক্ষ্মী দেবীর পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ভাই, বলতে সাহস পাইনে, তবুও একটা কথা বলছি—বোন ব'লে যদি রাখ···

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা বৌ-ঠাকরুণ?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—তুমি আমার কাছে ব'লে যাও ভাই যে শ্বশুরঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে না?

নরনারায়ণ রায় একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাকরুণ, তোমার কাছে ব'লে যাচ্ছি—তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা করব না।

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, তুমি ফিরে যেতে পারবে তো?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্তু যত দূর পার সাঁতরে গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে চ'লে যেও।

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে প'ড়ে মিলিয়ে গেলেন···

*

লক্ষ্মী দেবীর প্রদীপটা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের ছোট খালটায় দু'খানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জ'মে গেল—সর্ব্বনাশ! এরা কি তবে জানতে পেরেছে? দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখলেন সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কীর্ত্তি রায় বুঝতেন নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হয়ে ওঠে তো তাকে কেটে ফেলাই সমস্ত শরীরের পক্ষে মঙ্গল।···পরদিন আবার দিনের আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাঁকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল।···

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে ব'সে সব শুনলেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দু'ধারের মুখ বন্ধ ক'রে কীর্ত্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বাসরোধ ক'রে তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে তিনি চুপ ক'রে রইলেন।···এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল—বাশুণ্ডার লক্ষ্মণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চঞ্চলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোর সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠল। তাঁর মনে হ'ল তাঁর অভাগিনী বৌ-ঠাকুরাণীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে···মনে হ'ল, তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্না-ধৌত বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল-সুন্দর শ্রী···নীরব আকাশের তলে তাঁরই চোখের

দুই হাসিটি তারায় তারায় নব-মল্লিকার মতন ফুটে উঠেছে।...নরনারায়ণ রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ ভূম্যধিকারী দস্যু—হঠাৎ পূর্ব্বপুরুষের সেই বর্ব্বর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে উঠল, তিনি মনে মনে বললেন—আমার অপমান আমি এক রকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাকরুণ, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য করব না কখনও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন এক শীতের ভোর রাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্ত্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, স্লুপে, জাহাজে ভ'রে গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্ত্তি রায়ের প্রাসাদ দুর্গের ভিত্তি ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগল। কীর্ত্তি রায় শুনলেন, আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে দুরন্ত পর্ত্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিও গঞ্জালেস্। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও হয়েছে; পুরা বহরের বাকি অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে।

এ আক্রমণের জন্য কীর্ত্তি রায় পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেসের যোগদানের জন্য। রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষণ-মাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধ'রে শত্রুতা চ'লে আসছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্ যে তাঁদের পত্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্ত্তি রায়ের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হ'লেও কীর্ত্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চলল।

গঞ্জালেস্ সুদক্ষ নৌ-বীর। তার পরিচালনে দশখানা স্লুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্ত্তি রায়ের নওয়ারার এক অংশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস্ দু'খানা কামান-বাহী স্লুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকিগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু—মাইকেল রোজারিও ডি কেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ করবার জন্যে আদিষ্ট হ'ল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্ত্তি রায়ের নওয়ারা শত্রু-বহর কর্ত্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আটকে গেল—বার নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারলে না। কীর্ত্তি রায়ের নৌ-বহর দুর্ব্বল ছিল না, কীর্ত্তি রায়ের গড় থেকে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের আড্ডা সন্দীপ খুব দূরে নয়, কাজেই কীর্ত্তি রায়ের নৌ-বহর সুদৃঢ় ক'রে গড়তে হয়েছিল।

বৈকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।· নরনারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে প'ড়ে, কীর্ত্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু'পাড় ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঊর্দ্ধে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাঁক শকুনি কীর্ত্তি রায়ের গড়ের উপর চক্রাকারে ঘুরছে হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধু-পত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদভরা ম্লান মুখখানি, কা'তর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়ল—

তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন তখনি ভ'রে উঠল।...তিনি করেছেন কি! এই রকম ক'রে কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখতে এসেছেন?

নরনারায়ণ রায় হুকুমজারি করলেন—কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়।

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নেই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনি নিজে গড়ের মধ্যে ঢুকলেন। তিনি এবং গঞ্জালেস্ গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেন—দেখলেন সত্যিই কেউ নেই। পর্ত্তুগীজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুঠপাট করতে গিয়ে দেখলে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লুঠপাট চলল...কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্নে কেবলমাত্র দুখানা স্লুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে চ'লে গেলেন।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর দল লুঠপাট ক'রে চ'লে গেলে, কীর্ত্তি রায়ের এক কর্ম্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলে একজন আহত মুমূর্ষু লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিনলে—লোকটি কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্ম্মচারী। তার মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্ম্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝলে, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল। সে বুঝলে কীর্ত্তি রায় তাঁর পরিবারবর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচের এক গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তার সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না...কোথায় সে মাটির নীচে ঘর, তা স্পষ্ট ক'রে বলবার আগেই আহত লোকটি মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে সে গুপ্ত-গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলে না।

এই রকমে কীর্ত্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হ'ল না... সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্ব্বত-প্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো কোন্ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূ-কক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্য্যন্ত জানে না।

ওই ছোট খালটা প্রকৃত পক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিতর কীর্ত্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের সারের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শূলো-কাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্দ্ধ-প্রোথিত হাঙর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙা থামের অংশ—বার-

ভূঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে, বর্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দীঘির যে ইষ্টক সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বনভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে···সন্দীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকে· তখন খাল দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে—ওগো পথযাত্রীরা, ওগো নৌকাযাত্রীরা···আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম·· দয়া ক'রে আমাদের তোল···ওগো আমাদের তোল···

ভয়ে বেশী রাত্রে এ-পথে কেউ নৌকা বাইতে চায় না।

খুকীর কাণ্ড

হরি মুখুয্যের মেয়ে উমা কিছু খায় না। না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া পড়িয়াছে বড়।

উমার বয়স এই মোটে চার। কিন্তু অমন দুষ্ট মেয়ে পাড়া খুঁজিয়া আর একটি বাহির ক'রো তো দেখি!···তাহার মা সকালে দুধ খাওয়াইতে বসিয়া কত ভুলায়, কত গল্প করে, সব মিথ্যা হয়। দুধের বাটিকে সে বাঘের মত ভয় করে—মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখিলেই সোজা একদিকে টান্ দিয়া দৌড়।

মা বলে—রও দুষ্টু মেয়ে, তোমার দুষ্টুমি আমি···দুধ খাবেন না, সুজি খাবেন না, খাবেন যে কি দুনিয়ায় তাও তো জানি নে—চ'লে আয় ইদিকে···

খুকী নিরুপায় দেখিয়া কান্না শুরু করে। তাহার মা ধরিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দুধ খাওয়ায়। কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে অর্দ্ধেকের উপর ছড়াইয়া গড়াইয়া অপচয় হয়, বাকি অর্দ্ধেকটুকু কায়ক্লেশে খুকীর পেটে যায় কি না যায়।

সময়ে সময়ে সে আবার মায়ের সঙ্গে লড়াই করে। চার বছর বয়স বটে, না খাইয়া খাইয়া কাটি কাটি হাত পাও বটে, কিন্তু তাহাকে কায়দায় ফেলিতে তাহার মায়ের এক-একদিন গলদ্ঘর্ম্ম। রাগ করিয়া মা বলে—থাক্ আপদ বালাই কোথাকার, না খাস তো বয়ে গেল আমার—সারাদিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠবে, আবার ওই দস্যি মেয়ের সঙ্গে দিনে পাঁচবার কুস্তী ক'রে দুধ খাওয়াবার শক্তি আমার নেই—মর্ শুকিয়ে।

খুকী বাঁচিয়া যায়, ছুটিয়া এক দৌড়ে বাড়ির সামনের আমতলায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া সমবয়সী নন্দিনীকে ডাকে—ও নেন্থু উ-উ···

তাহার বাবা একদিন বাড়ীতে বলিল—দেখ, খুকীটাকে আজ দিন পনেরো ভাল ক'রে দেখিনি—আসবার সময় দেখি পথের ওপর খেলা ক'চ্ছে, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছে যেন চেনা যায় না, পিঠটা সরু, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে, অসুখ-বিসুখ নেই, দিন দিন ওরকম রোগা হয়ে পড়ছে কেন বলো তো ?

খুকীর মা বলে—পড়বে না আর রোগা হয়ে ? সারা দিন রাতে ক'ঝিনুক দুধ পেটে যায় ? মরে মরুক, আমি আর পারি নে লড়াই করতে · কে এখন ওই দস্যি মেয়েকে রোজ রোজ যায় দুধ খাওয়াতে ? যাই ওর কপালে থাকে তাই হোক গে···

তাই হয়। দস্যি মেয়ে শুকাইতে থাকে।

ভাদ্র মাস, হঠাৎ বর্ষা বন্ধ হইয়া রৌদ্র বড় চড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রামের ডোবা পুকুরে সারা গাঁয়ের পাটক্ষেতের পাটের আঁটি ভিজানো। নদীর ধারে কাশের ফুল ফুটিয়াছে।

গ্রামের হীরু চক্রবর্ত্তীর আড়তে এই সময় কাজকর্ম্মের বড় ভিড়। নানা দেশের ধানের ও পাটের নৌকা সব গঙ্গার ঘাটে জড়ো হইয়াছে। হরিশ যুগী আড়তের কয়াল—কাঁটার ফের্ত্তায় এক মণ ধানে, আরও সের দশেক ঢুকাইয়া লওয়া—তাহার কাছে ছেলেখেলা মাত্র। হাজরের মু:খোদাই বড় একখানা মহাজনী নৌকা হইতে ধানের বস্তা নামিতেছে, পটুপটি গাছের ছায়ায় উচুকরা ধানের স্তূপ হইতে হরিশ সুর-সংযোগে কাঁটায় করিয়া ধান মাপিতেছে —রাম—রাম— রাম হে রাম রাম হে দুই—দুই দুই—দুই হে তিন—তিন তিন···

গফুর মাঝি ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছে—তা নেন্ গো কয়াল মশাই, একটু হাত চালিয়ে নেন্ দিকি, মোবা একবার দেখি ? ইদিকি নোনা গাঙের গোন্ নামলি কি আর নৌকা বাইতি দেবানে ?

হরি মুখুয্যে মহাশয়কে একটু ব্যস্ত-সমস্তভাবে আসিতে দেখিয়া হীরু চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আরে এস হরি, কি মনে ক'রে ?···এসো তামাক খাও···

—না থাক—তামাক—ইয়ে আমার মেয়েটাকে ইদিকে দেখেছ হীরু ? না ?···বড় মুস্কিলে ফেলেছে বাঁদর মেয়ে···বারোটা বাজে, সেই বাড়ী থেকে নাকি বেরিয়েছে সকাল ন'টার সময়···একটু দেখি ভাই খুঁজে, এত জ্বালাতনও ক'রে তুলেছে মেয়েটা, সে আর তোমাকে কি বলব···

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে রায়বাড়ীর পথে উমাকে ধূলার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কি একটা হাতে লইয়া চুষিতে ও আপন মনে বকিতে দেখা গেল।

ওরে দুষ্টু মেয়ে···

হরি মুখুয্যে গিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বাবার কোলে উঠিতে পাইয়া উমা খুব খুশি হইল, হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বাবা, ও বাবা···ওই ওদের নাদু ভারি দুত্ত ·· এই, এই দুধ এই খায় না·· আমি দুধ খাই, না বাবা ?

—বেশ মেয়ে, দুধ খেতে হয়। ওটা কি খাচ্ছিস, হাতে কি ?

—নেবেন্ডুস, ওই পুঁটির মামা এসেছে, তাই দিয়েছে।

বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমার শাস্তি শুরু হয়। বাটিভরা দুধ, ঝিনুক, টানাটানি ইত্যাদি। তাহার কান্না, কাকুতি-মিনতি পাষাণী মা শোনে না জোর করিয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দিয়া ঢোঁকে ঢোঁকে দুধ খাওয়ায়···শেষের দিকটায় সে পা ছুঁড়িতে গিয়া খানিকটা দুধসুদ্ধ বাটিটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

দুম্ দুম্ দুই নির্ঘাত কিল পিঠে। পিঠ প্রায় বাঁকিয়া যায়।

—হতভাগা দস্যি আপদ কোথাকার—ছ'সের ক'রে দুধ টাকায়, ভাত জোটে না, দুধের খরচ যোগাতে যোগাতে প্রাণ গেল·· দস্যি মেয়ের ন্যাকরা দেখ আদ্ধেকটা দুধ কিনা ঠ্যাং ছুঁড়ে মাটিতে দিলে ফেলে!···

খুকী দম সাম্‌লাইয়া লইবার পরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল।

বেলা পড়িয়া আসে। ওদের উঠানে পূর্ব্বপুরুষের আমলের বীজু আমগাছের ছায়ায় অপরাহ্ণের রোদকে আটকাইয়া রাখে। খুকী বসিয়া বসিয়া ভাবে অপরের বাড়ীতে ভাল খাবার খাইতে পাওয়া যায় – মিষ্টি—তাহাদের বাড়ীতে শুধু দুধ আর দুধ!

তাহার মা বলিল—টিপ পরবি ও দস্যি?

খুকী ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিল।

—বলে নয়ন-তারা টিপ, দুটো ক'রে এক পয়সায়, বেশ টিপগুলো—স'রে এসে বোস দিকি।

টিপ পরিয়া খুকী আবার পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়। বাঁশবনের তলা দিয়া গুটি গুটি হাঁটে। পুনরায় সে লোভে লোভে রায়বাড়ী যায়, পরের বাড়ীতেই যত ভাল খাবার। বিস্কুট, নেবেঞ্চুস, কত কি।

নান্নুদের উঠানে পেঁপে গাছের মাথার দিকে তাহার চোখ পড়িতে সে প্রথমটা অবাক হইয়া গেল—সঙ্গিনীকে ডাকিয়া দেখাইয়া কহিল—ও নান্নু, ঐ পিঁপে।

পেঁপে তাহার মা কাটিয়া খাইতে দেয়, বেশ খাইতে লাগে, কিন্তু তাহা গাছের আগ্‌ডালে কি অমন ভাবে দোলে! চাহিয়া চাহিয়া সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

পূজার কিছু পূর্ব্বে খুকীর আপন মামা কলিকাতা হইতে আসিল। এত ধরণের খাবার কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। কিশমিশ দেওয়া মেঠাই, বড় বড় অমৃতি, জিলিপি, গজা, কমলালেবু আরও কত কি।

পাশের গ্রামে মামার এক বন্ধুর বাড়ী। মামা পরদিন সকালে উঠিয়া তাহাকে সাজাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

পথে কে একজন সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছে, খুকী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। মামাকে বলিল—ও কে গেল মামা?

—ও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একজন লোক···

উমা বলিল—ফরসা মুখ, ফরসা জামা গায়, না মামা?···চমৎকার!··

তাহার মামা হাসিয়া বলিল—'চমৎকার' কথাটা তুই শিখলি কি ক'রে?···আচ্ছা খুকু, তুই ওকে বিয়ে করবি?

উমা সপ্রতিভ মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাহার কোন আপত্তি নাই।

ভাদ্রের শেষ, ম্যালেরিয়ার সময়, তবে এখনও খুব বেশী আরম্ভ হয় নাই, বাড়ী-বাড়ী কাঁথামুড়ি দেওয়া শুরু হইতে এখনও দেরী আছে। উমার হাঁটুনির বেগ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে সে মাঝে মাঝে পথের ধারে বসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাই তুলিতে লাগিল। তাহার মামা বলিল—কি হয়েছে খুকু, রোদ্দুর বড্ড বেশী রে, আর বেশী নেই, চল···

বন্ধুর বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উমা বলিল—মামা, আমার শীত লাগছে

—শীত কি রে? ভাদ্র মাসে এই গরমে শীত? ও কিছু না, চল···

খুকী আর কিছু না বলিয়া বেশ চলিল বটে, কিন্তু খানিক দূর গিয়া তাহার মনে হইল শীত একটু বেশী বেশীই করিতেছে। শুধু শীত নয়, তৃষ্ণাও পাইয়াছে। সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—মামা, আমি জল খাব

—বড় বিপদ দেখছি তো, আচ্ছা, আগে চল গিয়ে পৌঁছুই—খেও এখন জল ·

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া উমার মামা তাহার কথা ভুলিয়াই গেল। অনেকদিন পরে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টায় মশগুল হইয়া উমার সুখদুঃখের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইল না। উমা দু'একবার কি বলিল, আলাপের গোলমালে সে কথা কেহ কানে তুলিল না।

খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা ফিরিয়া দেখিল, সে গুটিসুটি হইয়া রৌদ্রে বসিয়া আছে, মামার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জল খাবো মামা, জল-তেষ্টা পেয়েছে···

—দেখি? তাই তো রে, গা যে বড় গরম—উঃ, খুব জ্বর হয়েছে—যে ম্যালেরিয়ার জায়গা! আয়, চল্ ওদের ঘরে শুইয়ে রাখিগে, ওঠ্···

খুকীকে জল খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মামা পুনরায় পাড়ার দিকে বাহির হইল, স্নানাহার বন্ধুদের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইল, ক্রমে দুপুর গড়াইয়া গেল, মুখুয্যে পাড়ার হাফ-আখড়াই-এর ঘরে গ্রামের নিষ্কর্মা ছোকরার দল একে একে আসিয়া পৌঁছিল, প্রকাণ্ড কেটলিতে চায়ের জল চড়িল, গল্পে গল্পে বেলা একেবারেই গেল পড়িয়া।

এতক্ষণে হঠাৎ খুকীর কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার মামার। সে বলিল—ওই যাঃ, তোমরা বোসো ভাই, খুকীটার অসুখ হয়েছে ব'লে ভোম্বলদের বাইরের ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছি অনেকক্ষণ, দেখে আসি দাঁড়াও ·

ভোম্বলদের বাড়ীর বাইরের উঠানে গোয়ালের কাছে আসিতে ভোম্বলের বড় ছেলে টোনা বলিল—খুকু কোথায় কাকা?

খুকীর মামা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন, সে তোদের বাইরের ঘরে শুয়ে নেই?

—না কাকা, সে তো অনেকক্ষণ আপনার কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছে, তখন খুব

রোদ্দুর, উঠে কাঁদতে লাগল, বললে, মামার কাছে যাবো—শুনলে না, তখুনি রোদ্দুরে আপনাকে খুঁজতে বেরুলো…

—সে কি রে! আমি কোথায় আছি তা সে জানবে কেমন ক'রে? আর তোরা বা ছেলেমানুষকে ছেড়ে দিলি কি ব'লে? বেশ লোক তো! আর এ মেয়ে নিয়েও হয়েছে—

মামা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্নভাবে পুনরায় পাড়ার দিকে ফিরিল। পরিচিত স্থানগুলিতে খোঁজা শেষ হইল, কোথাও সে নাই, কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়া গিয়াছিল কাহারও চোখে পড়ে নাই, কেবল মতি মুখুয্যের ছেলে বলিল, অনেকক্ষণ আগে একটি অপরিচিত ছোট খুকীকে চড়চড়ে রৌদ্রে টলিতে টলিতে ভোম্বলদের বাড়ীর উঠানের আগল পার হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল বটে, খুকীকে সে চেনে না, ভাবিয়াছিল ভোম্বলদের বাড়ীতে কোন কুটুম্ব হয়ত আসিয়া থাকিবে, তাহাদের মেয়ে।

অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল গ্রামের বাহিরের পথে। মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিরুপায় অবস্থায় পথের উপর বসিয়া কাঁদিতেছিল, বৃদ্ধ হারাণ সরকার দেখিতে পাইয়া লইয়া আসেন।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সে সারাদিন কিছুই খায় নাই—খাইবার মধ্যে দুপুরবেলা ভোম্বলদের বাড়ীর কোন্ ছেলে এক টুকরা আমসত্ত হাতে দিয়াছিল, জ্বরের ঘোরে সেটুকু শুধু চুষিয়াছে শুইয়া শুইয়া। তাহার মামাকে সকলে বকিতে লাগিল। সরকার মশায় বলিলেন —তোমারও বাপু আক্কেলটা কি—ছোট মেয়েটাকে নিয়ে দুপুর রোদে এক কোশ হাঁটিয়ে আনলে, পথে এল তার জ্বর, দেখলেও না, শুনলেও না, ওদের চণ্ডীমণ্ডপে ঝ্যাং ক'রে ফেলে রেখে তুমি বেরুলে আড্ডা দিতে—না একটু দুধ, না কিছু—ছিঃ ·

তাহার মামা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা আমি কি আনতে গেছলাম, আমি বেরুবার সময় ছাড়ে না কোন রকমেই—তোমার সঙ্গে যাব মামা, তোমার সঙ্গে যাব মামা—আমি কি করব?

—বেশ, খুব আদর করেছ ভাগ্নীকে—এখন চল আমার বাড়ী, ওকে একটু দুধ খাইয়ে দি, কচি মেয়েটাকে সারাদিন—ছিঃ—

খুকীর মামা একটু দমিয়া গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিবার সময় খুকীকে বলিল—কিন্তু বাড়ী গিয়ে কিছু বোল না যেন খুকু! মার কাছে যেন বোল না যে জ্বর হয়েছিল, কি হারিয়ে গিয়েছিলে, কেমন তো? লক্ষ্মী মেয়ে, বললে আমি কলকাতা যাবো পরশু, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব না…

—আমি কলকাতা যাব মামা…

—যদি আজ কিছু না বলো, পরশু ঠিক নিয়ে যাব বলবি নে তো?

কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া খুকী বুদ্ধির দোষে সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। তাহার শুষ্ক মুখ ও চেহারায় তাহার মা ঠাওরাইয়া লইল একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—কি খেলি রে খুকী সেখানে?

খাওয়ার কথা মামা কিছু শিখাইয়া দেয় নাই, সুতরাং খুকী বলিল—আমসত্ত্ব খুব ভাল—এত বড় আমসত্ত্ব…

—আমসত্ত্ব? আর কিছু খাসনি সেখানে সারাদিনে? হ্যাঁ রে ও যতীশ, খুকী সেখানে কিছু খায়নি?

—খেয়েছে বৈকি, খেয়েছে বৈকি—তা, হ্যাঁ—জানোই তো ওকে, কিছু খাওয়ানোই দায়…

মা একটু আড়ালে গেলে খুকী মুখ নীচু করিয়া হাসিমুখে মামার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—মাকে কিছু বলিনি মামা—কাল আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবে তো?

—ছাই যাবো, না-খাওয়ার কথা বললি কেন? বাঁদর মেয়ে কোথাকার…

মামার রাগের কারণ খুকী কিছু বুঝিতে পারিল না।

খাওয়ার কথা সম্বন্ধে মামা তো কিছু বলিয়া দেয় নাই, তবে সে কথা যদি বলিয়া থাকে তাহার দোষ কি?

তাহার মামা একথা বুঝিল না। রাগিয়া বলিল—তোমার জন্যে যদি আর কখনো কিছু কিনে আনি খুকী, তবে দেখো ব'লে দিলাম—কখনো আনব না, কলকাতাতেও নিয়ে যাব না।

তাহার প্রতি এই অবিচারে খুকীর কান্না আসিল। বা রে, তাহাকে যে কথা বলিয়া দেয় নাই, তাহা বলাতেও দোষ? সে কি করিয়া অতশত বুঝিবে?

খুকী খুব অভিমানী, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া কাঁদিতে বসিল না, এক কোণে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকালে তাহার মামা কলিকাতায় রওনা হইল—যাইবার সময় তাহার সহিত কথাটিও কহিল না।

আবার দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষা শেষ হইয়া গেল, শরৎ পড়িল—ক্রমে শরৎও শেষ হয় হয়। পূজা এবার দেরীতে, কার্ত্তিক মাসের প্রথমে, কিন্তু বাড়ী-বাড়ী সবাই জ্বরে পড়িয়া, পূজায় এবার আনন্দ নাই। প্রবীণ লোকেও বলিতে লাগিলেন, এরকম দুর্ব্বৎসর তাঁহারা অনেকদিন দেখেন নাই।

উমা সারা আশ্বিন ধরিয়া ভুগিয়া সারা হইয়াছে। একে কিছু না খাওয়ার দরুণ রোগা, তাহার উপর জ্বরে ভুগিয়া রোগা—তাহার শরীরে বিশেষ কিছু নাই। তবুও জ্বরটা একটু ছাড়িলেই কাঁথা ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে,… কারুর কথা শোনে না—তারপর গয়লা-পাড়া, সদ্‌গোপ-পাড়া, কোথায় নবীন ধোপার তেঁতুলতলা—এই করিয়া বেড়ায়। বাড়ী ফিরিলেই দুম্ দুম্ কিল পড়ে পিঠে। মা বলে—দস্যি মেয়ে, মরেও না যে আপদ চুকে যায়, কবে যাবে ষষ্ঠীর মাঠে। কবে তোমায় রেখে খুকী-খুকী ব'লে কাঁদতে কাঁদতে আসব…

ওঘর হইতে বড়-জা বলিয়া ওঠে—আচ্ছা, ওসব কি কথা সকাল বেলা ছোট বৌ…বলি

মেয়েটার যষ্ঠীর মাঠে যাবার আর তো দেরী নেই, ওর শরীরে আর আছে কি ?···তার ওপর রোগা মেয়েটাকে ওই রকম ক'রে মার ?···ছি ছি, একটা পেটে ধ'রেই এত ব্যাভার, তবুও যদি আর দু'একটা হ'ত। এস উমা, আমার দাওয়ায় এসো তো মাণিক ! এসো এদিকে।

তাহার মা পাল্টা জবাব দিয়া বলে—বেশ করছি, আমি আমার মেয়েকে বলব তাতে পরের গা জ্বলে কেন ? যাসনে ওখানে, যেতে হবে না। শৌখীন কথা সকলে বলতে পারে —যখন জ্বর হয়ে প'ড়ে থাকে, তখন যত্ন করতে তো কাউকে এগুতে দেখিনে—তখন তো রাত জাগতেও আমি, ডাক্তার ডাকতেও আমি, ওষুধ খাওয়াতেও আমি—মুখের ভালবাসা অমন সবাই বাসে···

দুই জায়ে তুমুল ঝগড়া বাধিবার কথা বটে এ অবস্থায়, কিন্তু বড়-জা হরমোহিনী বড় ভাল মানুষ। সাতেপাঁচে থাকিতে ভালবাসে না, খুকীর ওপর একটা স্নেহও আছে, সে কিছু না বলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

পূজার সময় খুকীর মামা আবার আসিল। তাহারও বয়স এই কুড়ি-একুশের বেশী নয়, এই দিদিটি ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই। এতদিন কলিকাতায় চাকুরির চেষ্টায় ছিল, পূজার কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে কোন্ ছাপাখানায় মাসিক আঠারো টাকা বেতনে লিনোটাইপের শিক্ষানবিশী করিতে ঢুকিয়াছে।

অনেক খাবারদাবার, খুকীর জন্যে ভাল ভাল দু'তিনটা রঙিন জামা, ছোট ডুরে শাড়ী ও জাপানী রবারের জুতা আনিয়াছে। তাহার দিদি বকে—এসব বাপু কেন আনতে যাওয়া, সবে তো চাকরি হয়েছে, নিজের এখন কত খরচ রয়েছে, দু' পয়সা হাতে জমাও, ভাল খাও-দাও—শরীর তো এবার দেখছি বড্ডই খারাপ—অসুখ-বিসুখ হয় নাকি ?

ছেলেটি হাসিয়া বলে—না দিদি, অসুখ-বিসুখ তো নয়, বড্ড খাটুনি, সকাল ন'টা থেকে সারাদিন, বিকেল ছটা অবধি-এক একদিন আবার রাত আটটাও বাজে—এক-একদিন আবার রবিবারেও বেরুতে হয়, তবে তাতে ওভার-টাইম পাওয়া যায় বারো আনা ক'রে—এবার গুড় উঠলে এক কলসী গুড় নিয়ে যাবই এখান থেকে, ভিজে ছোলা আর গুড় সকালে উঠে বেশ জলখাবার হবে ·

তারপর সে চীনামাটির খেলনা বাহির করিয়া খুকীকে ডাকে—ও উমা, দেখে যা কেমন কাঁচের ঘোড়া সেপাই, এদিকে আয়···

খুকী নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, মামা আসাতে খুকীর খুব আহ্লাদ হইয়াছে, এসব ধরনের খাবার মামা না আসিলে তো পাওয়া যায় না !···পূজার কয়দিন খুকী মামার কাছেই সর্ব্বদা থাকিল। সকাল হইতে না হইতে খুকী চোখ মুছিয়া আসিয়া মামার কাছে বসে, মাঝে মাঝে বলে, এবার কলকাতায় নিয়ে যাবে না মামা ?

পূজা ফুরাইয়া গেলে খুকীর মামা দিদির কাছে প্রস্তাবটা উঠায়, দিদি সহোদর বোন নয়, বৈমাত্রেয়, তবুও তাহাকে বেশ ভালবাসে, যত্ন করে। সেও ছুটি-ছাটা পাইলে এখানে আসে।

স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া দিন-দশেকের জন্য আপাততঃ খুকীকে কলিকাতা ঘুরাইয়া আনিবার সম্মতি দিল।

খুকীর মামা খুশি হইয়া বলে—আমি ওকে লেখাপড়া শেখাব, সেখানে গিয়ে মহাকালী পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দেব—দেখতে পাই কেমন গাড়ী আসে, বাড়ী থেকে ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে যায়--গাড়ীর গায়ে নাম লেখা আছে 'মহাকালী পাঠশালা'।

ভগ্নীপতি হরি মুখুয্যে বলেন—পাগল আর কি! অতটুকু মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি আবার কি হবে?...হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্ছে—ছেলেমানুষ, ও কি আর গিয়ে টিকতে পারে? যাও নিয়ে দু'দিন—এখানে তো ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় হাড় সার ক'রে তুলেছে--যদি দু'দিন হাওয়া বদলাতে পারলে সেরে যায়...

ট্রেনে কলিকাতা আসিবার পথে উমা খুব খুশি। প্রথমটা তার ভয় হইয়াছিল, রেলগাড়ীর জানালার ধারে মামা বসাইয়া দিয়াছে, গাড়ীটা চলিতেই খুকীর মনে হইল তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া যাইতেছে, ভয়ে তাহার চোখ বড় বড় হইল—আতঙ্কে মামাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেই তাহার মামা হাসিয়া বলিল—ভয় কি, ভয় কি খুকু? এ যে রেলের গাড়ী—দেখ আরও কত জোরে যাবে এখন...

রেলগাড়ী চড়িবার আনন্দকে যে বয়সে বুদ্ধি দিয়া উপভোগ করা যায়, উমার সে বয়স হয় নাই। সে শুধু চুপ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহার মামা উৎসাহের সুরে বলে—কেমন রে খুকী, সব কেমন বল্ তো? কেমন লাগছে রেলগাড়ী?

খুকী বলে—খুব ভাল...

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা দুঃখের সহিত লক্ষ্য ক র যে খুকী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

গাড়ী কলিকাতায় পৌছিলে একখানা রিক্সা ভাড়া করিয়া তাহার মামা তাহাকে বাসায় আনিল। অখিল মিস্ত্রীর লেনে একটা ছোট মেসে বাসা, অফিসের বাবুদের মেস, সকলেই বয়সে প্রবীণ, সে-ই কেবল অল্পবয়স্ক। খুকীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই আনন্দ হইল। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে সকলেরই আছে, কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মাস-মাহিনার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িবার দরুণ মাসে একবার কি দুইবার ভিন্ন বাড়ী যাওয়া ঘটে না, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খুকীকে পাইয়া একটা অভাব দূর হইল। চার-পাচ বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে, চাঁদের মত মুখখানি, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল, কালো চোখের তারা—আপিসের ছুটির পর তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এ ডাকে উঁহার ঘরে, ও ডাকে তাহার ঘরে।

কিন্তু তাহার মামার বড় দুঃখ, খুকীর বেশভূষা একেবারে খাঁটি পাড়াগেঁয়ে। মাথায় বিনুনী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, অতটুকু মেয়ের পায়ে আবার আল্‌তা, ছোট চুড়ী শাড়ী

পরনে, ওসব সেকেলে কাণ্ড আজকাল শহর-বাজারে কি আর চলে? ছিছি পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকে, শহরের রীতিনীতি বেশভূষার কি ধার ধারিবে? এখানকার ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের কেমন সুন্দর চুলের বিন্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট সাজানো, দেখিতে যেন কাঁচের পুতুল। খুকীকে ঐ রকম সাজানো যায় না?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে খুকীকে সঙ্গে করিয়া ট্রামে ধর্মতলার এক চুল ছাঁটাই দোকানে লইয়া গেল। নাপিতকে বলিল—ঠিক—সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের মত যদি চুল কাটিতে পার তবে কাঁচি ধরো, নইলে অমন ঘন কালো চুল নষ্ট কোর না যেন।

মেস হইতে সে খুকীর মাথার বিনুনী খুলিয়া আনিয়াছিল।

চুল ছাঁটিতে উমার বেশ ভাল লাগিতেছিল। সামনে একখানা প্রকাণ্ড আয়না, চার-পাঁচটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, নাপিত মাঝে মাঝে আবার ময়দার মত কি একটা গুঁড়া তাহার ঘাড়ের চুলে মাখাইতেছিল···এমন সুড়সুড়ি লাগে!···

তাহাকে সাজাইতে খুকীর মামা পাঁচ-ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। মেসের নিয়োগী মশায় একে একে কয়েকটি পুত্র-কন্যাকে উপরি উপরি চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে হারাইয়াছেন, উমাকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিলেন না। সন্ধ্যার পর রঙিন ফ্রক পরা, বব্‌ড চুল, মুখে পাউডার, পায়ে জরির জুতা, আর এক উমা যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া তো নিয়োগী মশায় বিষম খাইবার উপক্রম করিলেন।

তাহার মামা হাসিয়া বলে—গেলই না হয় কিছু খরচ হয়ে, এমন সুন্দর মেয়ে কি ক'রে ভূত সাজিয়ে রেখেছিল বলুন দিকি?···ও কুণ্ডুমশায়, চেয়ে দেখুন পছন্দ হয়?—

কি করিয়া খুকীর শীর্ণতা দূর করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চলিল। গলির মোড়ের একজন ডাক্তার কড্‌লিভার অয়েল ও কেপ্‌লারের মল্ট্‌ এক্সট্রাক্টের ব্যবস্থা দিলেন, তাহা ছাড়া বলিলেন—খাওয়া চাই, না খেয়ে খেয়ে এমন হয়েছে—পুষ্টির অভাব, এ বয়সে এদের খুব পুষ্টিকর জিনিস খাওয়ানো চাই কিনা। সকালে কোয়েকার ওট্‌স্ খাওয়াবেন দিন পনেরো, দেখুন কেমন থাকে।

কিন্তু চতুর্থ দিনে খুকীর কম্প দিয়া জ্বর আসিল। খুকীর মামার লিনোটাইপের কাজে যাওয়া হইল না, সারাদিন খুকীর কাছে বসিয়া রহিল। অন্য দিন বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ছাপাখানায় যাওয়া চলিত, আজ আর তাহা হইল না।···সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল, খুকী উঠিয়া বসিয়া এক টুকরা মিছরি চুষিতে লাগিল। আপিসফেরতা কর্ত্তীবাবু একটা বেদানা ও গোটাকতক কমলালেবু খুকীর জন্য আনিয়াছেন, সতীশবাবু পোয়াটাক ছোট আঙুর ও পুনরায় গোটাতিনেক কমলালেবু, আরও দু'তিন জনের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কিনিয়া আনিয়াছেন।···সকলে চলিয়া গেলে খুকী মামার দিকে একবার চাহিল, পরে ঠোঁট ফুলাইয়া মাথা নীচু করিল। মামা বিস্মিত হইয়া বলিল—কি রে খুকী? কি হয়েছে?

খুকী দুঃখের চাপা কান্নার মধ্যে বলিল—বাড়ী যাব মামা · মার কাছে যাব···

—আচ্ছা কেঁদো না খুকু—জর সারুক, নিয়ে যাব এখন।

দু'তিন দিন গেল। জর সারিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে সে ঘুমের ঘোরে মায়ের জন্ত কাঁদিয়া ওঠে।...ভুলাইবার জন্ত তাহাকে একদিন হগ সাহেবের বাজারে খেলনার দোকানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটা খুব বড় মোমের খোকা-পুতুল তাহার খুব পছন্দ হইল, কিন্তু দামটা বড় বেশী, সাড়ে চার টাকা—খুকীর মামার এক মাসের মাহিনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মামা বলিল—অন্ত একটা পুতুল পছন্দ করো খুকু, ওটা ভাল না। কেমন ছোট ছোট এই সব কুকুর, হাতী, কেমন না?

খুকী দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু পুতুলটা ফিরাইয়া দিবার সময় (সে পূর্ব্ব হইতেই পুতুলটাকে দখল করিয়া বসিয়াছিল) তাহার ডাগর চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

দোকানদার বলিল—বাবু, খুকীর মনে কষ্ট হয়েছে, আপনি বড় পুতুলটাই নিন্, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে দিচ্ছি···

তাহার মামা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা খুকু তুমি বড়ো খোকা-পুতুলটাই নাও—কুকুরের দরকার নেই—ধরো বেশ ক'রে, যেন ভাঙে না দেখো···

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। সেদিন রবিবার, খুকীর মামা বিশেষ কারণে চেতলার হাটে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এখনি আসিবার কথা, কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহারই আদায়ের চেষ্টায় যাওয়া, ততক্ষণ অন্তান্ত দিনের মত নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই খুকীর থাকিবার কথা।·· খানিকক্ষণ খুকীর সহিত গল্পগুজব করিবার পরে বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাকর্ষণ হইল। কথা বলিতে বলিতে খুকী দেখিল তিনি আর কথা বলিতেছেন না, অল্প পরেই তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন শুরু হইল। মেসে কোন ঘরে কেহ নাই, উমার ভয় ভয় করিতে লাগিল। একবার সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল, গলির মোড়ে দুইজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের ঝোলাঝুলি, লম্বা চেহারায় ভয় পাইয়া সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল।

মামা কোথায় গেল? মামা আসে না কেন?

সে ভয় পাইয়া ডাকিল—ও জ্যাতাবাবু, জ্যাতাবাবু?

তাহার মামা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে—নিয়োগী মহাশয়কে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে।

সাড়া না পাইয়া সে আর একবার ডাকিল—আমার মামা কোথায় ও জ্যাতাবাবু?

নিয়োগী মহাশয় জড়িতস্বরে ঘুমের ঘোরে বলিলেন—হুঁ আচ্ছা, আচ্ছা।···

তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, দেশের বাটিতে রাত্রিতে শুইয়া আছেন, মালপাড়ার কেতু মাল চৌকিদার লাঠি ঘাড়ে বেঁধে বাহির হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিতেছে।

খুকী এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া পড়িল—সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল, সে নামিয়া নীচে আসিল। ঝি-চাকর রান্নাঘরে তালা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, একটা কালো বিড়াল চৌবাচ্চার উপর বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছে।

বাহির হইয়াই রাস্তা। খুকীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, এই রাস্তাটা পার হইলেই তাহার মামার কাছে পৌছানো যাইবে, এই পথের যেখানটাতে শেষ, সেখান হইতেই পরিচিত গণ্ডীর আরম্ভ।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে পথ হারাইয়া ফেলিল, গলি পার হইয়া আর একটা বড় গলি, তাহার পর একটা লোহার বেড়া-ঘেরা মাঠ মত, সেটার পাশ কাটাইয়া আর একটা গলি। ক্রমে খুকীর সব গোলমাল হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত সে একবারও পিছনের দিকে চাহে নাই, একবার পিছনের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে দিকটাও সে চেনে না।·· সামনের পিছনের দুই জগৎই তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও একটা এমন জিনিস নাই যাহা সে পূর্ব্বে কখনো দেখিয়াছে।···

সে ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক দুপুর বেলা, পথে লোকজনও কম, বিশেষতঃ এই সব গলির মধ্যে। আরও খানিকদূর গিয়া একটা লাল রঙের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বাড়ীর মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে একজন স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে খুকী, কাঁদছ কেন?·· তোমাদের কোন্ বাড়ীটা, এইটে?

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি মামার কাছে যাব ··

—তোমাদের ঘর কোথা গো?

খুকী আঙুল তুলিয়া একটা দিক দেখাইয়া বলিল—ওই দিকে।

—তোমার বাপের নাম কি?

বাপের নাম···কই তাহা তো সে জানে না! বাপের নাম 'বাবা'—তা ছাড়া আবার কি? সে চোখ তুলিয়া ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল।

স্ত্রীলোকটি একবার গলির দুই দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে বলিল—আচ্ছা এস, এস খুকী, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার মামার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এস···

এ-গলি, ও-গলি ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা ছোট্ট খোলার বাড়ী। ঝি কাহাকে ডাকিয়া কি একটা কথা নীচুস্বরে বলিল, তারপর দুইজনেই খানিকক্ষণ কি বলাবলি করিল, নবাগতা স্ত্রীলোকটি হাত দিয়া কি একটা দেখাইল, খুকী সে সব বুঝিতে পারিল না। পরে তাহারা খুকীকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ছোট ঘুলঘুলির কাছে একটা প্রকাণ্ড মাটির জালা ও তাহার চারিপাশে একরাশ অন্ধকার। খুকীর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল —যক্ষিবুড়ীর যে জালাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুকাইয়া পুরিয়া রাখিবার গল্প শুনিয়াছে, যেন সেই ধরণের জালা। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল—আমার মামা কোথায়?

নবাগতা স্ত্রীলোকটি বলিল—কেউ দেখেনি তো আনবার সময়ে? আমার বাপু ভয় করে। এই সেদিন সৈরভীর বাড়ীতে পুলিশ এসে কি ভম্বি, আমি থালা ফেরৎ দিতে গেনু তাই ··

খুকীদের বাড়ীর মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে যে স্ত্রীলোকটি সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—

নেহ্! যাও, সামনের দরজাটা খুলে চাক ক'রে রেখে এলে কেনে?···নেহ্, জানে না যেন কিছু!

সে খুকীকে চৌকির উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদরের কথা বলিল, তাহাকে একটা রসগোল্লা খাইতে দিল। পরে খুকীর হাতের সোনার বালা দু'গাছা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—এখন তুলে রেখে দি খুকী?···বেশ লক্ষ্মি মেয়ে—দেখি···

খুকী ভয়ে ভয়ে বলিল—বালা খুলো না···আমার মামাকে ডেকে দাও···

কিন্তু ততক্ষণে ঝি তাহার হাত হইতে বালা দু'গাছা অনেকটা খুলিয়াছে, দেখিয়া খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—আমার বালা নিও না, মামাকে ব'লে দেব—আমার বালা খুলো না ··

মতি-ঝিয়ের ইঙ্গিতে নবাগতা স্ত্রীলোকটি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু একটা বিষয়ে দুইজনেই বড় ভুল করিয়াছিল, উমার কাটি কাটি হাত-পা দেখিয়া তাহার লড়াই করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের হয়তো সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর অসত্য, তাহা গত মাসে দুগ্ধপানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উমার মা ভালরূপই জানিত। ইহারা সেস·, খবর জানিবে কোথা হইতে? বেচারীদের ভুল ভাঙিতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না, ধবস্তাধবস্তিতে বিছানা ওলটপালট হইয়া গেল, উমার আঁচড়-কামড়ে মতি-ঝি তো বিব্রত হইয়া উঠিল। গোলমালে একগাছা বালা হাত হইতে খুলিয়া কোথায় চৌকির নীচের দিকে গড়াইয়া গেল। পিছন হইতে তাহার হাত-মুখ চাপিয়া ধরিয়া অন্যগাছা নবাগতা স্ত্রীলোকটি ছিনাইয়া খুলিয়া লইল।

মতি-ঝি বলিল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—হাঁপিয়ে মরে যাবে—দেখি ও আপদ রাস্তার ওপর রেখে আসি—বাপ্‌রে, কি দস্যি!···

—এখন কোথায় রাখতে যাবি লো? খ্যান্তমণিকে একটা খ·. দিবি নে?

—না বাপু, তাতে আর দরকার নেই, ওকে রেখে আসি—কেউ টের পাবে না, দেখ্ না ব'সে ব'সে ··

তুমুল গোলমাল, খোঁজাখুঁজি, হৈচৈ-এর পরে সন্ধ্যার সময় উমাকে পাওয়া গেল নেবুতলার সেণ্টজেম্‌স্ পার্কের কোণে। কেবিন-ছাঁটাই বব্‌ড চুল ছেঁড়াখোঁড়া, কপালে ও গালে আঁচড়ের দাগ; হাত শুধু, ফ্রকের কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে · 'মামা', 'মামা' বলিয়া কাঁদিতেছিল, অনেক লোক চারিধারে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, একজন গিয়া একটা পাহারাওয়ালাও ডাকিয়া আনিয়াছে—ঠিক সেই ·,ময় নিয়োগীমশায়, কুণ্ডুমশায়, সতীশবাবু, অখিলবাবু, খুকীর মামা সবাই গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি থানায় ডায়েরী ইত্যাদি হইল। কে তাহার বালা খুলিয়া লইয়াছে এ সম্বন্ধে খুকী বিশেষ কোন খবর দিতে পারিল না। খুকীর মামাকে সকলে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল। খবরদারী করিবার যখন সময় নাই, তখন পরের মেয়ে আনা কেন ইত্যাদি। সবাই বলিল—

যাও ওকে কালই বাড়ী রেখে এল, ছিঃ, ওই রকম ক'রে কি কখনো···মেসের সকলে চাঁদা তুলিয়া খুকীকে দু'গাছা পালিস-করা বিলাতী সোনার বালা কিনিয়া দিল।

গাড়ীতে যাইবার সময় তাহার মামা বলিল—খুকু, বাড়ীতে গিয়ে যেন এসব কথা কিছু বলো না?···কেমন তো?···কক্ষনো বলো না যেন?···হ্যাঁ, লক্ষ্মী মেয়ে—তাহলে আর কলকাতায় নিয়ে আসব না···

খুকী ঘাড় নাড়িয়া রাজী হইল। বলিল—আমায় তখন একটা পুতুল কিনে দিও মামা··· আর একটা মেম-পুতুল ··

ঠেলাগাড়ী

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি, রোদ তখনও ভালোরকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখীতে কিচ্‌কিচ্ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া করছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরে ঝুলন্ত শিকায় বড় জাম বাটিতে টাঙানো আছে—তা কোন্ অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্ব্বে তা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিন্-রিনে গলায় ডাক শোনা গেল—

—টুনি-ই-ই-দা-আ-আ—ও টুনি···

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখী হয়ে কি একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে? এখনো কাক-পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি, অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার ক'রে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্দে নেই, দুপুর নেই, সব সময় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড়ঘড় ক'রে বেড়াতে দিচ্ছ, ওর পরকালটা যে ঝরঝরে হয়ে গেল—যা এখন যা, টুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড়ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা··· .

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূর থেকে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর হাত-মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কি দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে এল—ও টুনিদা?···আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি-স্থান ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিগ্-নির্ণয় ক'রে নিয়েই ঝাঁ করে খিড়কি দোরটা খুলে বার হয়ে এলুম। সকালের পদ্মের মত নির্মল, প্রফুল্ল, তরুণ নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবি নে টুনিদা? .

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না!

নরু চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বললে—কোথায়?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই…

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনেপ্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হ'ল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনিদা—আমি চালতে তলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়বি তো টুনিদা?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুলতলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোন ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসিমুখে বললে—আয় পটুদা, নিতাইদা—আমি গাড়ী এনেছি—দেখ্ ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড়্…গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল। চড়ল সকলেই। পটু বললে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী যাবি নরু?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বললে—যাস তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে?

নরু বললে—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ী পটুদা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে…বললে রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতুম ঠিক। যদি এর পর গাড়ী কেড়ে রাখে?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় ব'সে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হ'ত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি! সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়, বলে—সে নৌকোর মাঝির সর্দার হবে, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইষ্টীমার যারা চালায়, তাদের কি ব'…—তাও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ব, বলতাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হবো। মহকুমার হাকিম হবো।…

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ী ফিরত। বাবা যেদিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপি চুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বলত—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন্ সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল, এখন তুমি…

খোকা বলে—চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনিদা—কোথাও তো যাইনি মা! সত্যি…

কি জানি কেন ওকে বড় ভালোবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্তত ওর সঙ্গে না দেখা ক'রে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ী না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক-একদিন আমাদের বাড়ীর সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত ক'রে

বললুম, চড় গাড়ীতে, আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি···তা কিছুতে চড়লো না, বললে, মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়বি টুনিদা ?

—তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা ?

—আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব বা দুষ্টু। আসবি টুনিদা ?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হত না কোন মতেই। আমি চড়তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ক'রে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত···সূর্য্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচি মুখ রাঙিয়ে দিতেন, ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলী ধরণের ছিল ব'লে পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না···সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য করতে হ'ত। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্ব্বিবাদে জারি করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারি গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধুলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটছে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। অন্থ বললে– ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলাগাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—যাত্রা কবে বসবে রে টুনিদা ?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বললে—চড়বি পটুদা ? পটু ঘাড় নেড়ে বললে—চড়ব, টানবে কে ?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে—কেন আমি ?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পটু বললে, দূর, তুই বুঝি আমায় টানতে পারিস ? টান দিকি কেমন—হয় না আর আমাকে···

—বসো না ? টানতে কেমন পারিনে।

পটুর পালা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অন্থ, বীরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় একটু এইবার টান!

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল, তাকে কেউ টানতে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা ক'রে তার গাড়ীতে চ'ড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে, এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন্ দাবী আছে ? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

—বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম, আর আমার বেলায় বুঝি কেউ···

আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুণই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চ'লে গেল। এদের মধ্যে পূর্ব্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইঁট নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে মেরে বসল।

গাড়ীখানার তলা তখনি মচ্‌মচ্‌ করে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ভেঙে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইলে আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে-পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মত বিঁধল। ভাবটা এই রকম যে, তুইও টুনিদা এর মধ্যে?

কিন্তু সে কোন কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়ীটার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে স'রে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়েচেড়ে দেখলে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি ক'রে সারানো যায়। পাশে একটা ছোট বাকস্ ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলো থোলো বাকস্ ফুল দুলছিল- তারই পাশে গাব্‌ ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভাল ঘুম হ'ল না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব ক'রে ফেলতুম তো বেশ হ'ত, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু'তিন দিন ক'রে সপ্তাহখানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে মামার বাড়ী চ'লে গেলুম ছোট মাসীমার বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট-দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিংকাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায় দেখে বললে—টুনি, তোরা দেশে এলি?··· আমি কোন কথা বলবার আগেই তার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়ী বেড়াতে? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে রে! বোস্‌ বোস্‌, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, খাবি নুন দিয়ে? ওই পেকে পেকে থাকে, কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না ব'সে ব'সে।

শরতের অপরাহ্ণ। নির্ম্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে

কি পাখী উড়ে চলেছে। কার্নিস ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক···উঠানের ছায়া-স্নিগ্ধ বাতাস শুকনো কুলের গন্ধে ভরপুর।···

খোকার সেই ঠেলাগাড়ীখানা দেখলুম—কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্য্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয়নি।···

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সেই ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়ীটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্জ্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালেদের আমরুল বাগানের ছায়ায়··· আমাদের বড় মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে নিয়ে আসছে···নারিকেলতলা বেয়ে···পটুদের বড় দো-ফলা আম গাছটার তলা বেয়ে···যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্ত্তি মাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।···

পুঁই মাচা

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকাল বেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোন কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে? দাও না একটা ঘটি? আঃ, ক্ষেন্তি টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত স্বরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—কেন···কি আবার···কি—

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্তসুরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোর না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোর। তুমি কিছু জান না, নাকি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? কি গুজব?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগ্‌দী দুলে-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।—সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ সুরেই পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্ব্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হ'ল না—ও নাকি উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগ্‌দী-বাড়ী উঠে বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর।—ওঃ!...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি? —আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল। · হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হ'ল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?···পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটা কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কি-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কি-দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে ··

চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে হলদে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঞ্জাল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পুঁইপাতা জড়ানো কোন দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি,

কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইশাকে জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া খুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দুমকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকী আছে। আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁইশাকগুলো…ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে, নিয়ে যা…কেমন মোটা মোটা…

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতে অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছে পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত…নিয়ে যা…আর উনি তখন আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হ'ল না…যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে…ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমার বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে! খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?…কোথায় শাক, কোথায় বেগুন্, আর একমন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ—ফেল্ বলছি ওসব…ফেল্।…

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা, ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো…

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।…সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে… তুমি আবার …বরং ·

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না— মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয়…

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না।—নিঃশব্দে খিড়কি-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে

অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের!

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশে-পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—সে সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো ক্ষেষ্ট মুখুয্যে···স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধ'রে প'ডে, মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তার কি স্বভাব? রাম বলো, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়! পরে স্বর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের ··

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয় ··

—আহা-হা, তেরোয় আর যোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর যোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই যোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্গু করা মেয়ে। আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকী, এই তো, ···সমাজে ব'সে এসব কাজ-গুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব, এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।·· পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?·গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না?—দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর—শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল! দুই ভাইয়ের অভাব কি?···

ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা-ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবুর গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল ··

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন, যা শীগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি! কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটি লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল—ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন, মুখুয্যে-বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল, খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে, খুড়ীমাকে গিয়ে বল্ মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে-বাড়ী এ পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা!—পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল ··কে যেন কি খুঁড়িতেছে ··দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এক্ষুণি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো যোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে—কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং…

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি! না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি …সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বলো না।…আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি…দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ…তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ… তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকা . করতে, যা ইচ্ছে কর, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিতি থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।…

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা…

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার

বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশ ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল ; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড় ? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না ?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, উত্তর দিল, হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছো মেটে আলু চুরি করতে ? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে ! যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয় ? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত ? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা ব'লে পরের জিনিসে হাত ? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা ?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস…

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চাঁরা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্দ্ধমুখে এক খণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো ? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে !

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে ? আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে-বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কি হয় ? দেখ দিকি, এই শীত !

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো…

—হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুণি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে ?—সহায়হরি

বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনির নীচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া এক মালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্র সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উগনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল, মা, ঐ একটু···

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মা'র সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু···

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।···ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও পাড়ার ভিনুর বাবাকে। ওবেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁা মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপ্‌টা হয় না? খেঁদি বলছিল,

ক্ষীরের পুর মা হলে কি আর পাটিসাপ্টা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওই সব কথা! খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পুর দিয়ে দিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হ'ল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কি না, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপ্টা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর মা'র পিঠেতে কখনো কোন গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপ্টায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল-কোরা একটু নেবো?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ওবেলার, বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোট মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি আর নিবি? ··ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্ত ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসি-ভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন কেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু ··সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই; উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি ··

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোন মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কি না!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয়, এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হতখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও...দু'টো মাস তো...

ওপাড়ার ঠানদিদি বলিলেন—তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈকি?...দেখো তো, কেমন না যান্!

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত...তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বল্‌ব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ..

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধ'রে রাখো, ও-রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে

মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্ত ময়দা চট্‌কাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—নাঃ, সব তো আর···তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি ?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে ? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার···

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কি না! মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে·· ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খাই খাই ··আরও কত কি! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম—মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে ?

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোন কথা শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর ?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটাব যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!···পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি···প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্ত করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হ'ল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে ··

—দেখতে পাওনি ?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ··যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, বেলা গেল। চার কি ঠিক করলে ? ·· পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না। ··

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার

পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন ?

পুঁটি বলিল—আচ্ছা মা ওতে একটু নুন দিলে হয় না ?

—ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধ'রে উঠবে ··

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন— স'রে এসে ব'সো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না ? এই দিকে আয়!

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল···খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন···দেখিতে দেখিতে মিঠে-আঁচে পিঠা টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল—মা দাও, প্রথম পিঠাখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাসনে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।

পুঁটি ও রাধী খিড়কি-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কি-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন— দি'স ?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম ··

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে··· রাতও তখন খুব বেশী। ··জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠ্ঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে···দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত···

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল···যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত

মায়ের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইশাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে··· বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে··· সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!

উপেক্ষিতা

পথে যেতে যেতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

সে বোধ হয় বাংলা দুই কি তিন সালের কথা। নতুন কলেজ থেকে বার হয়েছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না, স্কুল-মাস্টারী নিয়ে গেলুম হুগলী জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। গ্রামটির অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল থাকলেও আমি যখন গেলুম তখন তার অবস্থা খুব শোচনীয়। খুব বড় গ্রাম, অনেকগুলি পাড়া, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বোধ হয় এক ক্রোশেরও ওপর। প্রাচীন আম-কাঁটালের বনে সমস্ত গ্রামটি অন্ধকার।

আমি ও গ্রামে থাকতুম না। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে সে গ্রামের রেলস্টেশন। স্টেশনমাস্টারের একটি ছেলে পড়ানোর ভার নিয়ে সেই রেলের P. W. D-এর একটা পরিত্যক্ত বাংলোয় থাকতুম। চারিদিকে নির্জ্জন মাঠ, মাঝে মাঝে তাল-বাগান। স্কুলটি ছিল গ্রামের ও-প্রান্তে। মাঠের মধ্যে নেমে হেঁটে যেতুম প্রায় এক ক্রোশ।

একদিন বর্ষাকাল, বেলা দশটা প্রায় বাজে, স্কুলে যাচ্ছি। সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটু শীঘ্র যাবার জন্ত পাড়ার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গিয়েছে সেইটে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত পথটা বড় বড় আম-কাঁটালের ছায়ায় ভরা। একটু আগে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। গাছের ডাল থেকে টুপ টুপ্ ক'রে বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়ছিল। একটা জীর্ণ ভাঙা ঘাটওয়ালা প্রাচীন পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কে একটি স্ত্রীলোক, খুব টক্‌টকে রংটা, হাতে বালা অনন্ত, পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঘড়া নিয়ে উঠলেন আমার সামনের রাস্তায়। বোধ হয় পুকুরে যাচ্ছিলেন জল আনবার জন্তে। আমায় দেখে ঘোমটা টেনে পথের পাশে দাঁড়ালেন। আমি পাশ কাটিয়ে জোরে চ'লে গেলুম। আমার এখন স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু তখন আমি ইউনিভার্সিটির সদ্যপ্রসূত গ্রাজুয়েট, বয়স সবে কুড়ি, অবিবাহিত। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পাতায় পাতায় যে সব তরলিকা, মঞ্জুলিকা, বাসন্তী—উজ্জয়িনীবাসিনী অগুরু-বাস-মোদিত-কেশা তরুণী অভিসারিকার দল, তারা—আর তাদের সঙ্গে ইংরেজী কাব্যের কত Althea, কত Genevieve, Theosebia, তাদের নীল নয়ন আর তুষার ধবল কোমল বাহুবল্লী নিয়ে আমার তরুণ মনের মধ্যে রাতদিন একটা সুমিষ্ট কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল। তাই সেদিন সেই সুশ্রী তরুণী, তাঁর বালা-অনন্ত-পরা অনাবৃত হাতদুটির হঠাৎ সৌন্দর্য্য আর সকলের ওপর তাঁর পরনের শাড়ী যারা নির্দ্দিষ্ট

তাঁর সমস্ত দেহের একটা মহিমান্বিত সীমারেখা আমাকে মুগ্ধ এবং অভিভূত ক'রে ফেললে। আমার মনের ভিতর এক প্রকারের নূতন অনুভূতি, আমার বুকের রক্তের তালে তালে সেদিন একটা নূতন স্পন্দন আমার কাছে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল।··

বিকালবেলা রেল-লাইনের ধারে মাঠে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তালবাগানের মাথার ওপর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। বেগুনী রংএর মেঘগুলো দেখতে দেখতে ক্রমে ধূসর, পরেই আবার কালো হয়ে উঠতে লাগল।···আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখতে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরিভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর।···বেশ কল্পনা ক'রে নেওয়া যাচ্ছিল, সেই সমুদ্রের চারিপাশে একটা গূঢ় রহস্যভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিন কেটে গিয়ে রাত হ'ল। বাসায় এসে Keats পড়তে শুরু করলুম। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মাটির প্রদীপের বুক পুড়ে উঠে প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে। অনেক রাত্রে উঠে দেখলুম বাইরে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে···আকাশ মেঘে অন্ধকার।···

তার পরাদিনও পাড়ার ভেতর দিয়ে নেমে গেলুম। সেদিন কিন্তু তাঁকে দেখলুম না। আসবার সময়ও সেখান দিয়েই এলুম, কাউকে দেখলুম না। পরদিন ছিল রবিবার। সোমবার দিন আবার সেই পথ দিয়েই গেলুম। পুকুরটার কাছাকাছি গিয়েই দেখি যে তিনি জল নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, আমায় দেখে ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।···আমার বুকের রক্তটা যেন দুলে উঠল, খুব জোরে হেঁটে বেরিয়ে গেলুম।···রাস্তার বাঁকের কাছে গিয়ে ইচ্ছা আর দমন করতে না পেরে একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখি, তিনি ঘাটের ওপর উঠে ঘোমটা খুলে কৌতূহলী নেত্রে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন, আমি চাইতেই ঘোমটা আবার টেনে দিলেন।

ওপরের পথটা ছেড়েই দিলুম একেবারে। পুকুরের পথ দিয়েই রোজ যাই। দু'একদিন পরে আবার একদিন তাঁকে দেখতে পেলুম। আমার মনে হ'ল সেদিনও তিনি আমায় একটু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। এইভাবে পনেরো-কুড়ি দিন কেটে গেল। কোনদিন তাঁকে দেখতে পাই, কোনদিন পাই না। আমার কিন্তু বেশ মনে হতে লাগল, তিনি আমার প্রতি দিন দিন আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠছেন। আজকাল ততটা ত্রস্তভাবে ঘোমটা দেন না। আমারও কি হ'ল—তাঁর গতি-ভঙ্গীর একটা মধুর শ্রী, তাঁর দেহের একটা শান্ত কমনীয়তা, আমায় দিন দিন যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল।···

একদিন তখন আশ্বিন মাসের প্রথম, শরৎ পড়ে গিয়েছে···নীল আকাশে সাদা সাদা লঘু মেঘখণ্ড উড়ে যাচ্ছে···চারিদিকে খুব রৌদ্র ফুটে উঠেছে···রাস্তার পাশের বনকচু, ভাঁট শেওড়া, কুঁচলতার ঝোপ থেকে একটা কটুতিক্ত গন্ধ উঠছে।···শনিবার সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরছি। রাস্তা নির্জ্জন, কেউ কোন দিকে নেই। পুকুরটার পথ ধরেছি, একাদশ

ছাতারে পাখী পুকুরের ওপারের ঝোপের মাথায় কিচ্‌কিচ্‌ করছিল, পুকুরের জলের নীল ফুলের দলগুলো রৌদ্রতাপে মুড়ে ছিল। আমি আশা করিনি এমন সময় তিনি পুকুরের ঘাটে আসবেন। কিন্তু দেখলুম তিনি জল ভ'রে উঠে আসছেন। এর আগে চার-পাঁচ দিন তাঁকে দেখিনি, হঠাৎ কি মনে হ'ল, একটা বড় দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসলুম। তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—দেখুন, কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি এখানকার স্কুলে কাজ করি, রোজ এই পথে যেতে যেতে আপনাকে দেখতে পাই, আমার বড় ইচ্ছা করে আপনি আমার বোন হন। আমি আপনাকে বৌদিদি বলব, আমি আপনার ছোট ভাই। কেমন তো? তিনি আমার কথার প্রথম অংশটায় হঠাৎ চমকে উঠে কেমন জড়সড় হয়ে উঠেছিলেন, দ্বিতীয় অংশটায় তাঁর সে চমকানো ভাবটা একটু দূর হল। ঘড়া-কাঁখে নীচু চোখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি যুক্তকরে প্রণাম ক'রে বললুম—বৌদিদি, আমার এ ইচ্ছা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। আমাকে ছোট ভাইয়ের অধিকার দিতেই হবে আপনাকে।

তিনি ঘোমটা অর্দ্ধেকটা খুলে একটা স্থির শান্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সুশ্রী মুখ যে আমি কখনো দেখিনি তা নয়, তবুও মনে হ'ল তাঁর ডাগর কালো চোখদুটির শান্ত ভাব, আর তাঁর ঠোঁটের নীচের একটা বিশেষ ভাঁজ, এই দুটিতে মিলে তাঁর সুন্দর মুখের গড়নে এমন এক বৈচিত্র্য এনেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলুম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

আনন্দে সারা গা কেমন শিউরে উঠল। বললুম—কলকাতার কাছে, চব্বিশ পরগণা জেলায়। এখানে স্টেশনে থাকি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

নাম বললুম।

তিনি বললেন—তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

বললুম—এখন বাড়ীতে শুধু মা আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাবা এই দু'বৎসর মারা গিয়েছেন।

তিনি একটু যেন আগ্রহের সুরে বললেন—তোমার কোন বোন নেই?

আমি বললুম—না। আমার দু'জন বড় বোন ছিলেন, তাঁরা অনেকদিন মারা গিয়েছেন। বড়দি যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট, মেজদি আজ পাঁচ ছ'বৎসর মারা গিয়েছেন। আমি এই মেজদিকেই জানতুম, তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি আমার চেয়েও ছয় বছরের বড় ছিলেন।

তাঁর দৃষ্টি একটু ব্যথা-কাতর হয়ে এল, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মেজদি থাকলে এখন তাঁর বয়স হ'ত কত?

বললুম—এই ছাব্বিশ বছর।

তিনি একটু মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন—তাই বুঝি ভাইটির আমার একজন বোন খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, না ?

কি মিষ্টি হাসি ! কি মধুর শান্ত ভাব ! মাথা নীচু ক'রে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম তা হ'লে ভাইয়ের অধিকার দিলেন তো আপনি ?

তিনি শান্ত হাসিমাখা মুখে চুপ ক'রে রইলেন।

আমি বললুম—বৌদি, আমি জানতুম আমি পাব। আগ্রহের সঙ্গে খুঁজলে ভগবানও নাকি ধরা দেন, আমি একজন বোন অনায়াসেই পাব। আচ্ছা এখন আসি। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না বৌদি, আপনার যেন দেখা পাই। রবিবার বাদে আমি দু'বেলাই এ রাস্তা দিয়ে যাব।

আমার মাঠের ধারের তাল-বাগানটার পাখীগুলো রোজই সকাল বিকাল ডাকে। একটা কি পাখী তার সুর খাদ থেকে ধাপে ধাপে তুলে একেবারে পঞ্চমে চড়িয়ে আনে। মন যেদিন ভারী থাকে সেদিন সে সুরের উদাস মাধুর্য্য প্রাণের মধ্যে কোন সাড়া দেয় না। · আজ দেখলুম পাখীটার গানের সুরের স্তরে স্তরে হৃদয়টা কেমন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে উঠছে।··· মনে হ'তে লাগল জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখীর গানে ভরা অপরাহ্নের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্তত বর্দ্ধিত অযত্ন-সম্ভূত তাল-নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরী—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্নের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করছে।

তার পরদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ল ছুটির পর বিকাল বেলা। বৌদিদি যেন চাপা-হাসির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে, বিমলের বুঝি আজ খুব সকাল সকাল স্কুলে যাওয়া হয়েছিল ?

আমি উত্তর দিলুম—বেশ বৌদি, আমি ওবেলা তো ঠিক সময়েই গেলুম—আপনিই ছিলেন না, এখন দোষটা বুঝি আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, না ? আর বৌদি, ঘাটে ওবেলা আরও সব মেয়েরা ছিলেন।

বৌদিদি হেসে ফেললেন, বললেন—তাই তো ! ভাইটির আমার ওবেলা তো বড় বিপদ গিয়েছে তা হ'লে !

আমার একটু লজ্জা হ'ল, ভাল ক'রে জবাব দিতে না পেরে বললুম—তা নয় বৌদি, আমি এখানে অপরিচিত, পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ—পাছে কেউ কিছু মনে করে।

বৌদিদির চোখের কৌতুক দৃষ্টি তখনও যায় নি, তিনি বললেন—আমি ওবেলা ঘাটের জলেই ছিলাম বিমল। তুমি ওই চট্‌কা গাছটার তলায় গিয়ে একবার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলে, আমায় তুমি দেখতে পাও নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আপনার বাপের বাড়ী কোথায় ?

বৌদিদি উত্তর দিলেন, খোলাপোতা চেন ? সেই খোলাপোতায়।

আমি ইতস্তত করছি দেখে আমায় আর একটু বিশদ সংবাদ দিয়ে বললেন, ওই যে

খোলাপোতার রাস! বৌদিদির হাসিভরা দৃষ্টি যেন একটু গর্বমিশ্রিত হয়ে উঠল। কিন্তু বলা আবশ্যক যে, খোলাপোতা ব'লে কোনো গ্রামের নাম এই আমি প্রথম শুনলুম। অথচ বৌদির বাপের বাড়ী, যেখানে এমন রাস হয়, সেই বিশ্ববিশ্রুত খোলাপোতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা পাছে তাঁর মনে ব্যথা দেয়, এই ভয়ে ব'লে ফেললুম—ও! সেই খোলাপোতায়? ওটা কোন্ জেলায় ভাল…

বৌদিদির কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করেছিলুম কিন্তু দেখলুম তিনি সে বিষয়ে নির্বিকার। তাঁর হাসিভরা সরল মুখখানির দিকে চেয়ে আমার করুণা হ'ল, এ-সমস্ত জটিল ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা নিয়ে তাঁকে পীড়িত করতে আর আমার মন সরল না।

বললুম—আচ্ছা বৌদি, আসি তা হ'লে।

বৌদিদি তাড়াতাড়ি ঘড়ার মুখ থেকে কলার পাতে মোড়া কি বার করলেন। সেইটে আমার হাত দিয়ে বললেন—কাল চাপ্‌ড়া ষষ্ঠীর জন্যে ক্ষীরের পুতুল তৈরী করেছিলাম, আর গোটাকতক কলার বড়া আছে, বাসায় গিয়ে খেও।

চার-পাঁচ দিন জ্বর ভোগের পর একদিন পথ্য পেয়ে স্কুলে যাচ্ছি, বৌদিদির সঙ্গে দেখা। আমায় আসতে দেখে বৌদিদি উৎসুক দৃষ্টিতে অনেকদূর থেকে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। নিকটে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি বিমল, এমন মুখ শুকনো কেন?

বললুম—জ্বর হয়েছিল বৌদিদি।

বৌদিদি উদ্বেগের সুরে বললেন—ও, তাই তুমি চার-পাঁচ দিন আসনি বটে। আমি ভাবলাম, বোধ হয় কিসের ছুটি আছে। আহা তাই তো, বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ যে বিমল।

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের ব্যথা-মিশ্রিত স্নেহের আত্মপ্রকাশ বেশ বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একটা নিবিড় আনন্দ পেলুম। হেসে বললুম—যে দেশ আপনাদের বৌদি, একবার অতিথি হলে আপ্যায়নের চোটে একেবারে অস্থির ক'রে তুলবে।

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বিমল, ওখানে তোমায় রেঁধে দেয় কে?

আমি বললুম—কে আর রাঁধবে, আমি নিজেই।

বৌদিদি একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা বিমল, এক কাজ করো না কেন!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি বৌদি?

তিনি বললেন—মাকে এই পুজোর ছুটির পর নিয়ে এস। এরকমভাবে কি ক'রে বিদেশে কাটাবে বিমল? লক্ষীটি, ছুটির পর মাকে অবিশ্যি ক'রে নিয়ে এস। এই গাঁয়ের ভেতর অনেক বাড়ী পাওয়া যাবে। আমাদের পাড়াতেই আছে। না হ'লে অসুখ হ'লে কে একটু জল দেয়? আচ্ছা হ্যাঁ বিমল, আজ যে পথ্য করলে, কে রেঁধে দিলে?

আমার হাসি পেল, বললুম—কে আবার দেবে বৌদি? নিজেই করলুম।

তিনি আমার দিকে যেন কেমন ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর সেদিনকার সেই সহানুভূতি-বিগলিত স্নেহ-মাখানো মাতৃমুখের জলভরা কালো চোখদুটি পরবর্ত্তী জীবনে আমার অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে ছিল।...

সেদিন স্কুল থেকে আসবার সময় দেখি, বৌদিদি যেন আমার জন্তেই অপেক্ষা করছেন। আমায় দেখে কলার পাতায় মোড়া কি একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—শরীরটা একটু না সারলে, রাত্রে গিয়ে রান্না, সে পেরে উঠবে না বিমল। এই খাবার দিলাম, রাত্রে খেও।.. বোধ হয় একটু আগেই তৈরী ক'রে এনেছিলেন, আমি হাতে বেশ গরম পেলুম। বাসায় এসে কলার পাতা খুলে দেখি, খানকতক রুটি, মোহনভোগ, আর মাছের একটা ডালনা মত।

তার পরদিন ছুটির পর আসবার সময়ও দেখি বৌদিদি খাবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার হাতে দিয়ে বললেন—বিমল, তুমি তোমার ওখানে দুধ নাও?

আমি বললুম—কেন, তা হ'লে দুধও খানিকটা ক'রে দেন বুঝি? সত্যি বলছি বৌদি, আপনি আমার জন্য অনর্থক এ কষ্ট করবেন না, তা হ'লে এ রাস্তায় আমি আর আসছি না।

বৌদিদির গলা ভারী হয়ে এল, আমার ডান হাতটা আস্তে আস্তে এসে ধ'রে ফেললেন, বললেন—লক্ষ্মী ভাই, ছিঃ ও-কথা ব'লো না। আচ্ছা, আমি যদি তোমার মেজদিই হতাম, তা হ'লে এ কথা কি আজ আমায় বলতে পারতে? আমার মাথার দিব্যি রইল, এ পথে রোজ যেতেই হবে।

সেই দিন থেকে বৌদিদি রোজ রাত্রের খাবার দেওয়া শুরু করলেন। সাত আট দিন পরে রুটির বদলে কোনদিন লুচি, কোনদিন পরোটা দেখা দিতে লাগল। তাঁর সে আগ্রহভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর সেসব স্নেহের দান ঠিক অস্বীকারও করতে পারতুম না, অথচ এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করতুম যে আমার এই নিত্য খাবার যোগাতে না জানি বৌদিদিকে কত অসুবিধাই পোহাতে হচ্ছে। তার পরই আশ্বিন মাসের শেষে পূজোর ছুটি এসে পড়াতে আমি নিস্কৃতি পেলুম।

সমস্ত পূজোর ছুটিটা কি নিবিড় আনন্দেই কাটল সেবার। আমার আকাশ বাতাস যেন রাতদিন আফিমের রঙিন ধূমে আচ্ছন্ন থাকত। ভোর বেলা উঠানের শিউলি গাছের সাদা ফুল বিছানো তলাটা দেখলে—হেমন্ত রাত্রির শিশিরে ভেজা ঘাসগুলোর গা যেমন শিউরে আছে, ওই রকম আমার গা শিউরে উঠত.. কার ওপর আমার জীবনের সমস্ত ভার অসীম নির্ভরতার সঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে আমার মন যেন শরতের জলভার নামানো হাল্কা মেঘের মত একটা সীমাহারা হাওয়ার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।..

ছুটি ফুরিয়ে গেল। প্রথম স্কুল খোলবার দিন পথে তাঁকে দেখলুম না। বিকালে যখন ফিরি, তখন শীতল হাওয়া একটু একটু দিচ্ছে।...পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু, কাল-কাসন্দা, ধুতুরা, কুঁচকাঁটা, ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট ছোট ঝোপ মত তৈরী করেছে... শীতল হেমন্ত অপরাহ্ণের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে...এমন একটা মিষ্ট নির্মল

গন্ধ গাছগুলো থেকে উঠছে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চল-প্রান্তের মত।

তার পরদিন তাঁকে দেখলুম।

তিনি আমায় লক্ষ্য করেন নি, আপন মনে ঘাটের চাতালে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলুম—বৌদি!·· বৌদিদি কেমন হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে ফিরলেন।

—এ কি বিমল! কবে এলে? আজ কি স্কুল খুলল? কি রকম আছ?···সেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বরটি! সেই স্নেহ-ঝরা শান্ত চোখ দুটি। বৌদিদি আমার মনে ছুটির আগে যে স্থান অধিকার করেছিলেন, ছুটির পরের স্থানটা তার চেয়ে আরও ওপরে।· আমি সমস্ত ছুটিটা তাঁকে ভেবেছি, নানা মূর্ত্তিতে নানা অবস্থায় তাঁকে কল্পনা করেছি, নানা গুণ তাঁতে আরোপ করেছি, তাঁকে নিয়ে আমার মুগ্ধ মনের মধ্যে অনেক ভাঙা-গড়া করেছি। আমার মনের মন্দিরে আমারই শ্রদ্ধা ভালবাসায় গড়া তাঁর কল্পনা-মূর্ত্তিকে অনেক অর্ঘ্যচন্দনে চর্চ্চিত করেছি। তাই সেদিন যে বৌদিদিকে দেখলুম, তিনি পূজার ছুটির আগেকার সে বৌদিদি নন, তিনি আমার সেই নির্ম্মলা, পূতহৃদয়া পুণ্যময়ী মানসী প্রতিমা, আমার পার্থিব বৌদিদিকে তিনি তাঁর মহিমাখচিত দিব্য বসনের আচ্ছাদনে আবৃত ক'রে রেখেছিলেন, তাঁর স্নেহ-করুণার জ্যোতির্বাষ্পে বৌদিদির রক্তমাংসের দেহটার একটা আড়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

আমার মাথা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ল, আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। বৌদিদি বললেন—এস, এস ভাই, আর প্রণাম করতে হবে না, আশীর্ব্বাদ করছি এমনিই—রাজা হও। আচ্ছা বিমল, বাড়ী গিয়ে আমার কথা মনে ছিল?

মনে এলেও বাইরে আর বলতে পারলুম না—কে তবে আমার মগ্ন চৈতন্যকে আশ্রয় ক'রে আমার নিত্য সুষুপ্তির মধ্যেও আমার সঙ্গিনী ছিল বৌদি?···শুধু একটু হেসে চুপ করে রইলুম। বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—মা ভাল আছেন?

আমি উত্তর দিলুম—হ্যাঁ বৌদি, তিনি ভাল আছেন। তাঁকে আপনার কথা বললুম।

বৌদিদি আগ্রহের সুরে বললেন—তিনি কি বললেন?

আমি বললুম—শুনে মার দুই চোখ জলে ভ'রে এল, বললেন—একবার দেখাবি তাকে বিমল? আমার নলিনীর শোক বোধ হয় তাকে দেখলে অনেকটা নিবারণ হয়।

বৌদিদিরও দেখলুম দুই চোখ ছলছল ক'রে এল, আমায় বললেন, হ্যাঁ, বিমল, তা মাকে এই মাসে নিয়ে এলে না কেন?

আমি বললুম—সে এখন হয় না বৌদি।

বৌদিদি একটু ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন—বিমল, জানো তো সেবার কি রকম কষ্টটা পেয়েছ! এই বিদেশ বিভুঁই, মাকে আনলে এই মিথ্যে কষ্টটা তো আর ভোগ করতে হয় না!

আমি উত্তর দিলুম—বৌদি, আমি তো আর ভাবি নি যে আমি বিদেশে আছি, যেখানে আমার বৌদি রয়েছেন, সে দেশ আমার বিদেশ নয়। মা না থাকলেও আমার এখানে ভাবনা কিসের বৌদি?

বৌদিদির চোখে লজ্জা ঘনিয়ে এলো, আমার দিকে ভাল ক'রে চাইতে পারলেন না, বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সবই করছি। আমার কি কিছু করবার জো আছে? কত পরাধীন আমরা তা জানো তো ভাই! ওসব নয়, তুমি এই মাসেই মাকে আনো।

আমি কথাটাকে কোন রকমে চাপা দিয়ে সেদিন চ'লে এলুম।

তার পরদিনও ছুটির পর বৌদিদির সঙ্গে দেখা। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আসবার সময় তিনি কলার পাতে মোড়া আবার কি একটা বার করলেন। তাঁর হাতে কলার পাত দেখলেই আমার ভয় হয়; আমি শঙ্কিতচিত্তে ব'লে উঠলুম—ও আবার কি বৌদি? আবার সেই···

বৌদিদি বাধা দিয়ে বললেন—আমার কি কোন সাধ নেই বিমল? ভাই-ফোঁটাটা অমনি অমনি গেল, কিছু কি করতে পারলুম? কলার পাতা-মোড়া রহস্যটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—এতে একটু মিষ্টিমুখ ক'রো, আর এইটে নাও—একখানা কাপড় কিনে নিও।

কথাটা ভাল ক'রে শেষ না ক'রেই বৌদি আমার হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিতে এলেন। আমি চমকে উঠলুম, বললুম—এ কি বৌদি, না না, এ কিছুতে হবে না; খাবার আমি নিচ্ছি, কিন্তু টাকা নিতে পারব না।

আমার কথাটার স্বর বোধ হয় একটু তীব্র হয়ে পড়েছিল, বৌদিদি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন, তাঁর প্রসারিত হাতখানা ভাল ক'রে যেন গুটিয়ে নিতেও সময় পেলেন না, যেন কেমন হয়ে গেলেন। তারপর একটুখানি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পরই তাঁর টানা কালো চোখদুটি ছাপিয়ে বাঁধ-ভাঙা বন্যার স্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়ল। আমার বুকে যেন কিসের খোঁচা বিঁধল।

এই নিতান্ত সরলা মেয়েটির আগ্রহ-ভরা স্নেহ-উপহার রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁর বুকে যে লজ্জা আর ব্যথার শূল বিদ্ধ করলুম, সে ব্যথার প্রতি· ত অদৃশ্যভাবে আমার নিজের বুকে গিয়েও বাজল!

আমি তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর হাত থেকে নোটখানা ও খাবার দুই নিয়ে বললুম—বৌদি, ভাই ব'লে এ অপরাধ এবারটা মাপ করুন আমার। আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না।

বৌদিদির চোখের জল তখনও থামে নি।

দুই চোখ জলে ভরা সে তরুণী দেবী মূর্ত্তির দিকে ভাল ক'রে চাইতে না পেরে আমি মাথা নীচু ক'রে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাড়ী এসে দেখলুম, কলার পাতের মধ্যে কতকগুলো দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি, সুন্দর ক'রে তৈরী। সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে বৌদিদির বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টি বারবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।··

মাসখানেক কেটে গেল।

প্রায়ই বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ত। এখন আমরা ভাই-বোনের মত হয়ে উঠেছিলুম, সেই রকমই পরস্পরকে ভাবতুম। একদিন আসছি, ফ্লানেল শার্টের একটা বোতাম আমার ছিল না। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি, বোতাম কোথায় গেল ?

আমি বললুম—সে কোথায় গিয়েছে বৌদি, বোতাম পরাতে জানিনে কাজেই ঐ অবস্থা।

তার পরদিন দেখলুম, তিনি ছুঁচ-সুতো বোতাম সমেতই এসেছেন। আমি বললুম—বৌদি, এটা ঘাটের পথ, আপনি বোতাম পরাতে পরাতে কেউ যদি দেখে তো কি মনে করবে! আপনি বরং ছুঁচটা আমায় দিন, আমি বাড়ী গিয়ে চেষ্টা করব এখন।

বৌদিদি হেসে বললেন—তুমি চেষ্টা ক'রে যা করবে তা আমি জানি, নাও স'রে এসো এদিকে।

বাধ্য হয়ে স'রেই গেলুম। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই বোতাম পরাতে লাগলেন। ভয়টা দেখলুম তাঁর চেয়ে আমারই হ'ল বেশী। ভাবলুম, বৌদির তো সে কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিন্তু যদি কেউ দেখে তো এর সমস্ত কষ্টটা ওঁকেই ভুগতে হবে।

একদিন বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—বিমল, গোকুল-পিঠে খেয়েছ ?

আমার মা খুব ভাল গোকুল-পিঠে তৈরী করতেন, কাজেই ও জিনিসটা আমি খুব খেয়েছি। কিন্তু বৌদিদিকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য বললুম—সে কি রকম বৌদি ?

আর রক্ষা নেই। তার পরদিনই বিকাল বেলা বৌদিদি কলার পাতে মোড়া পিঠে নিয়ে হাজির।

আমায় বললেন—তুমি এখানে আমার সামনেই খাও। ঘড়ার জলে হাত ধুয়ে ফেলো এখন।

আমি বললুম—সর্ব্বনাশ বৌদি, এই এতগুলো পিঠে খেতে খেতে এ পথে লোক এসে পড়বে, সে হয় না, আমি বাড়ী গিয়েই খাব।

বৌদি ছাড়বার পাত্রীই নন, বললেন—না, কেউ আসবে না বিমল। তুমি এখানেই খাও।

খেলুম, পিঠে খুব ভাল হয় নি। আমার মায়ের নিপুণ হাতের তৈরী পিঠের মত নয়। বোধ হয় নতুন করতে শিখেছেন, ধারগুলো পুড়ে গিয়েচে, আস্বাদও ভাল নয়। বললুম—বাঃ বৌদি, বড় সুন্দর তো! এ কোথায় তৈরী করতে শিখলেন? আপনার বাপের বাড়ীর দেশে বুঝি ?

বৌদির মুখে আর হাসি ধরে না। হাসিমুখে বললেন—এ আমি, আমাদের গুরুমা এসেছিলেন, তিনি শহরের মেয়ে, অনেক ভাল খাবার করতে জানেন, তাঁর কাছে শিখে নিয়েছিলাম।

তারপর সারা শীতকাল অন্যান্য পিঠের সঙ্গে সেই গোকুল-পিঠের পুনরাবৃত্তি চলল। ঐ যে বলেছি, আমার ভাল লেগেছে, আর রক্ষা নেই!

একটা কথা আছে।

কিছুদিন ধ'রে আমার মনের মধ্যে একটা আগ্রহ একটু একটু ক'রে জমছিল, জীবনটাকে

খুব বড় ক'রে অনুভব করবার জন্যে। আমার এ কুড়ি-একুশ বছর বয়সে এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে খাঁচায় পাখীর মত আবদ্ধ থাকা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। চ'লেও যেতাম এতদিন। এখানকার একমাত্র বন্ধন হয়েছিলেন বৌদিদি। তাঁরই আগ্রহে স্নেহ-যত্নে সে অশান্ত ইচ্ছাটা কিছুদিন চাপা ছিল। এমন সময় মাঘ মাসের শেষের দিকে আমার এক আত্মীয় আমায় লিখলেন যে, তাঁদের কারখানা থেকে কাচের কাজ শেখবার জন্যে ইউরোপ আমেরিকায় ছেলে পাঠানো হবে, অতএব. আমি যদি জীবনে কিছু করতে চাই, তবে শীঘ্র যেন মোরাদাবাদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি সেখানকার কাচের কারখানার ম্যানেজার।

পত্র পেয়ে সমস্ত রাত আমার ঘুম হ'ল না। ইউরোপ—আমেরিকা! সে কত ঊর্মি-সঙ্গীত-মুখরিত শ্যাম সমুদ্রতট···কত অকূল সাগরের নীল জলরাশি, দূরে সবুজ বিন্দুর মত ছোট ছোট দ্বীপ, ঐ কর্সিকা, ঐ সিসিলি! নতুন আকাশ, নতুন অনুভূতি ··ডোভারের সাদা খড়ির পাহাড়—প্রশস্ত রাজপথে জনতার দ্রুত পাদচারণ, লাড্‌গেট সার্কাস, টটেন্‌হাম্ কোর্ট রোড—বার্চ-উইলো পপ্‌লার-মেপ্‌ল্ গাছের সে কত শ্যামল পত্রসম্ভার, আমার কল্পলোকের সঙ্গিনী কনক-কেশিনী কত ক্লারা, কত মেরী, কত ইউজিনী। ··

পরদিন সকালে পত্র লিখলুম—আমি খুব শীঘ্রই রওনা হব। স্কুলে সেইদিনই নোটিশ দিলুম, পনেরো দিন পরে কাজ ছেড়ে দেব।

মন বড় ভাল ছিল না, উপরের পথটা দিয়ে কয়েকদিন গেলুম। দশ বারো দিন পরে নীচের পথটা দিয়ে যেতে যেতে একদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা। বৌদিদি একটু অভিমান প্রকাশ করলেন—বিমল, বড় গুণের ভাই তো! আজ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বোনটা বাঁচল কি ম'ল তা খোঁজ করলে না?

আমি বললাম—বৌদিদি, করলে সেটাই অস্বাভাবিক হ'ত! বোনেরাই ভাইয়েদের জন্যে কেঁদে মরে, ভাইয়েদের দায় পড়েছে বোনদের ভাবনা ভাবতে। দুনিয়াশুদ্ধ ভাই-বোনেরই এই অবস্থা।

বৌদিদি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলেন। এই তরুণীর হাসিটি বালিকার মত এমন মিষ্ট নির্মল যে এ শুধু লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতের জ্যোৎস্নার মত উপভোগ করবার জিনিস, বর্ণনা করবার নয়। বললেন—তা জানি জানি, নাও, আর গুমোর করতে হবে না, সে গুণ যে তোমাদের আছে তা কি আমরা ভেতরে ভেতরে বুঝি না? কিন্তু বুঝে কি করব, উপায় নেই। হ্যাঁ, তা সত্যি সত্যি মাকে কবে আনছ?

আমার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি বৌদিদিকে কিছু বলি নি। সে কথা বললে যে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন, এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। একবার ভাবলুম, সেই তো জানাতেই হবে, একদিন ব'লে ফেলি। কিন্তু অমন সরল হাসিভরা মুখ, অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব—বলতে বড় বাধল। মনে মনে বললুম, তোমরা কেবল বুঝি স্নেহ ঢেলে দিতেই জান? তোমাদের স্নেহ-পাত্রদের বিদায়ের বাজনা যে বেজে উঠেছে এ সম্বন্ধে এ রকম অজ্ঞান কেন?

জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, একটা কথা বলি, আপনি আমায় এই অল্পদিনে এত ভালবাসলেন কি ক'রে? আচ্ছা আপনারা কি ভালবাসার পাত্রাপাত্রও দেখেন না? আমি কে বৌদি যে আমার জন্যে এত করেন?

বৌদিদির মুখ গম্ভীর হয়ে এলো। তাঁর ওই এক বড় আশ্চর্য ছিল, মুখ গম্ভীর হ'লে প্রায়ই চোখে জল আসবে, জল কেটে গেল, তো আবার হাসি ফুটবে। শরতের আকাশে রোদ-বৃষ্টি খেলার মত। বললেন—এতদিন তোমায় বলি নি বিমল, আজ এই পাঁচ বছর হ'ল আমারও ছোট ভাই আমার মায়া কাটিয়ে চ'লে গিয়েছে, তারও নাম ছিল বিমল। থাকলে সে তোমারই মত হ'ত এতদিন। আর তোমারই মত দেখতে। তুমি যেদিন প্রথম এ রাস্তা দিয়ে যাও, তোমায় দেখেই আমার মনের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠল, সেদিন বাড়ী গিয়ে আপন মনে কত কেঁদেছিলাম। তুমি এখান দিয়ে যেতে, রোজ তোমাকে দেখতাম। যেদিন তুমি আপনা হতেই দিদি ব'লে ডাকলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে কি সুখে আছি তা বলতে পারি নে। তোমায় যত্ন ক'রে, তুমি যে বড় বোনের মত ভালবাসো, তাতে আমি বিমলের শোক অনেকটা ভুলেছি। ওই এক ভাই ছিল আমার। তুলসীতলায় রোজ সন্ধ্যাবেলা কত প্রণাম করি, বলি, ঠাকুর এক বিমলকে তো পায়ে টেনে নিয়েছ, আর এক বিমলকে যদি দিলে তো এর মঙ্গল করো, একে আমার কাছে রাখ।

চোখের জলে বৌদিদির গলা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি কিছু বললুম না। বলব কি!

একটু পরে বৌদিদি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জলভরা চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন। কি সুন্দর তাকে দেখাচ্ছিল। কালো চোখ দুটি ছল ছল করছে, টানা ভুরু যেন আরও নেমে এসেছে, চিবুকের ভাঁজটি আরও পরিস্ফুট, যেন কোন্ নিপুণ প্রতিমা-কারক দক্ষ বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে কেটে তৈরী করেছে।...পথের পাশেই প্রথম ফাল্গুনের মুক্ত আকাশের তলায় আঁকোড় ফুলের একটা ঝোপে কাঁটাওয়ালা ডালগুলিতে থোলো থোলো সাদা ফুল ফুটে ছিল - মনের ফাঁকে ফাঁকে নেশা জমিয়ে আনে, এমনি তার মিষ্টি গন্ধ।

দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলুম না। খানিক পরে বৌদিদি বললেন—সেই জন্যেই বলছি ভাই, মাকে আনো। আমাদের পাড়ায় চৌধুরীদের বাড়ীটা প'ড়ে আছে। ওরা এখানে থাকে না। খুব ভাল বাড়ী, কোন অসুবিধা হবে না, তুমি মাকে নিয়ে এস, ওখানেই থাক, সে তাঁদের পত্র লিখলেই তাঁরা রাজী হবেন, বাড়ী তো এমনি প'ড়ে আছে। তোমার বোন পরাধীন, কিছু করবার তো ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে এসব দেখাশোনা, এসব লুকিয়ে, বাড়ীর কেউ জানে না। তুমি দু'বেলা ঘাটের পথ দিয়ে যেও, দেখেই আমি শান্তি পাব ভাই। মাকে এ মাসেই আনো।

কেমন ক'রে তা হবে?

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আমি এখানে থাকলে কি আপনি খুব সুখী হন?

বৌদিদি বললেন—কি বলব বিমল? মাকে আনলে তোমার কষ্টটাও কম হয়, তা বুঝেও

আমার সুখ! আর বেশ দুটি ভাই-বোনে এক জায়গায় থাকব, বারো মাস দু'বেলা দেখা হবে, কি বল?

আমি বললুম—ভাই যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে আপনার কাছে, তাকে ক্ষমা করতে পারবেন?

বৌদিদি বললেন—শোন কথার ভঙ্গী ভাইটির আমার, আমার কাছে তোমার আবার অপরাধটা কিসের শুনি?

আমি জোর ক'রে বললুম—না বৌদি, ধরুন যদি করি তা হ'লে?

বৌদিদি আবার হেসে বললেন—না না, তা হ'লেও না। ছোট ভাইটির কোন কিছুতেই অপরাধ নেই আমার কাছে, আমি যে বড় বোন।

চোখে জল এসে পড়ল। আড়ষ্ট গলায় বললুম—ঠিক বৌদি, ঠিক!

বৌদিদি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন বিমল, কি হয়েছে ভাই! অমন করছ কেন?

মুখ ফিরিয়ে আনতে উদ্যত হলুম, বললুম—কিছু না বৌদি, অমনি বলছি।

বৌদিদি বললেন—তবুও ভাল। ভাইটির আমার এখনও ছেলেমানুষি যায় নি। হ্যাঁ, ভাল কথা বিমল, তুমি ভালবাস ব'লে বাগানের কলার কাঁদি আজ কাটিয়ে রেখেছি, পাকলে একদিন ভাল ক'রে দেবঁ এখন।

তার পরদিনই আমার নোটিশ অনুসারে স্কুলের কাজের শেষদিন। গিয়ে শুনলাম আমার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে। স্কুলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

শুধু একবার শেষ দেখা করবার জন্যেই তার পরদিন পুকুরের ঘাটে ঠিক সময়ে গেলুম। তাঁর দেখা পেলে যে কি বলব তা ঠিক ক'রে সেখানে যাই নি, সত্য কথা সব খুলে বলতে বোধ হয় পারতুম সেদিন—কিন্তু দেখা হ'ল না। সব দিন তো দেখা হ'ত না, প্রায়ই দু'তিন দিন অন্তর দেখা হ'ত, আবার কিছুদিন ধ'রে হয়ত রোজই দেখা হ'ত। সেদিন বিকালে গেলুম, তার পরদিন সকালেও গেলুম, কিন্তু দেখা পেলুম না।

সেদিন চ'লে আসবার সময় সেখানকার মাটি একটু কাগজে মুড়ে পকেটে নিলুম, যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার দিন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।···

সেইদিনই বিকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মত সে গ্রাম পরিত্যাগ করলুম।

মাঠের কোলে ছাতিম গাছের বনের মধ্যে কোথায় ঘুঘু ডাকছিল।—

সে সব আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর-আগেকারের কথা।

তারপর জীবনে কত ঘটনা ঘ'টে গেল। ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু! উপভোগ ক'রে দেখলুম, এ কি মধু! কত নতুন দেশ, নতুন মুখ, কত জ্যোৎস্না-রাত্রি, নতুন নব-ঝোপের নতুন ফুল, কত জুঁই ফুলের মত শুভ্র নির্মল হৃদয়, কান্না-জড়ানো কত সে মধুর স্মৃতি!···

কাকার কাছে ফোরাদাবাদে কাচের কারখানায় গেলুম। বছরখানেক পরে তারা আমায় পাঠিয়ে দিলে জার্মানীতে কাচের কাজ শিখতে। তারপর কোলোয়ে গেলুম, কাটা বেলোয়ারী কাচের কারখানায় কাজ শেখবার জন্যে। কোলোয়ে অনেক দিন রইলুম। সেখানে থাকতে একজন আমেরিকান যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হ'ল, তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। "শিকাগো ইন্টার-ওশন" কাগজের তিনি ফ্রান্স দেশস্থ সংবাদদাতা। কোলোয়ে সব সময় না থাকলেও তিনি প্রায়ই ওখানে আসতেন। তাঁরই পরামর্শে তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় গেলুম। তাঁর সাহায্যে দু'তিনটা বড় বড় কাচের কারখানায় কাজ দেখবার সুযোগ পেলাম···পিট্‌সবার্গে কর্ণেগীর ওখানে প্রায় ছ'মাস রইলুম, নতুন ধরণের ব্লাস্টফার্ণেসের কাজ ভাল ক'রে বোঝবার জন্যে।· মিড্‌ল ওয়েস্টের একটা কাচের কারখানায় প্রভাত দে কি বসু ব'লে একজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরও বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলায়। সে ভদ্রলোক নিঃসম্বলে জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে মহা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তাঁরই মুখে শুনলুম, সেয়াট্‌ল্‌-এ একটা নূতন কাচের কারখানা খোলা হচ্ছে। আমি জাপান দিয়ে আসব স্থির করেছিলুম, কাজেই আসবার সময় সেয়াট্‌ল্‌ গেলুম। তারপর জাপান ঘুরে দেশে এলুম। ···মা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। ভাই-দুটিকে নিয়ে গেলুম মোরাদাবাদে। বেশীদিন ওখানে থাকতে হ'ল না। বম্বেতে বিয়ে করেছি, আমার শ্বশুর এখানে ডাক্তারী করতেন। সেই থেকে বম্বে অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছি।

বহুদিন বাংলা দেশে যাইনি, প্রায় ষোল-সতের বছর হ'ল। বাংলা দেশের জল-মাটি গাছপালার জন্যে মনটা তৃষিত আছে। তাই আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে ব'সে আমার সবুজ শাড়ী-পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাবছিলুম।· রাজাবাই টাওয়ারের মাথার ওপর এখনও একটু একটু রোদ আছে। বন্দরের নীল জলে মেসাজেরী মারিতিম্‌দের একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এখনা এখুনি ছেড়ে যাবে। বাঁ-ধারে খুব দূরে এলিফ্যান্টার নীল সীমারেখা।· ভাবতে ভাবতে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃতপ্রায় ঝাপ্‌সা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এলো। পঁচিশ বছর পূর্ব্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠেছে আর্দ্র-বসনা তরুণী এক পল্লীবধূ!··· মাটির পথের বুকে বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা দুখানির রেখা আঁকা।··· আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের বেণু কুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অনিশ্চয়তায় ভরা। আম কাঁটালের বনের মাথায় ওপরকার নীলাকাশে দু'একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহ-দুর্ব্বলা বধূটির ওপর সস্নেহ কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তারপর এক শান্ত আঙিনায় তুলসী মঞ্চমূলে স্নেহাস্পদের মঙ্গলপ্রার্থিনী সে কোন্ প্রণাম নিরতা মাতৃমূর্ত্তি, করুণা মাখা অশ্রু ছলছল।··

ওগো লক্ষ্মী, ওগো স্নেহময়ী পল্লীবধূ, তুমি আজও কি আছো? এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও তুমি কি সেই পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটে সেই রকম জল আনতে যাও? ··আজ সে কত

কালের কথা হ'ল, তারপর জীবনে আবার কত কি দেখলুম, আবার কত কি পেলুম… আজ কতদিন পরে আবার তোমার কথা মনে পড়ল…তোমায় আবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে দিদিমণি, তুমি আজও কি আছো? মনে আসছে, অনেক দূরের যেন কোন খড়ের ঘর · মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলো·· মৌন সন্ধ্যা…নীরব ব্যথার অশ্রু…শান্ত সৌন্দর্য্য… স্নেহ-মাখা রাঙা শাড়ীর আঁচল……

আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্য্যাস্ত কখনও হয়নি!

স্মৃতির রেখা

কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের ক্ষাটা-চাঁদের ও শুকতারায় পেছনে তুমি ছিলে। এই শেষরাতের আকাশের পেছনে, এই ফুল ফোটা নিমগাছের ডালের সঙ্গে, এই সুন্দর শান্ত ঘন নীল আকাশে এক হয়ে কেমন করে তুমি জড়িয়ে আছ। কত প্রাণী, কত গাছ-পালার বংশ তৈরী হ'ল, আবার চলে গেল—ঐ যে পায়রাদল উড়ছে, ঐ যে নারকেল গাছটার মাথা ভোরের বাতাসে কাঁপছে, ঐ যে বন-ধুলোর ঝাড় ছাদের আলসেতে জন্মেছে, আমার ছাত্র বিভূতি—দু'হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল? দু'হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে? এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দ-হতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মত অনন্ত গহন গভীর কালসমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে, তার ঠিকানাও মিলবে না—আবার নতুন লোকজন ছেলেপিলে আসবে, আবার নতুন ফুলফলের দল আসবে, আবার নতুন সব সুখদৈন্য হর্ষহতাশা আসবে, কত মিষ্টি জ্যোৎস্না-রাত্রির মাধবী বাতাস আবার বইবে, পুরোনো উজ্জয়িনীর কেশধূপ বাস যেমন মদির ছিল, ভবিষ্যৎ কোন বিলাস-উজ্জয়িনীতে নতুন কেশরাশি পুরোনো দিনের চেয়ে কিছু কম মদির হয়ে উঠবে না, কত গ্রাম্য-নদী ভবিষ্যতের অনাগত গ্রাম-বধূদের সুখদুঃখ সম্ভার নিয়ে বয়ে চলবে···আবার তারা যাবে, আবার নতুন দল আসবে।

কিন্তু তুমি ঠিক আছ। হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্ত্তিত, অনাহত তুমি যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী যখন আকাশে জলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল, তারও কত অনন্তকাল পূর্ব্ব থেকে তুমি আছ, এই পৃথিবী যখন আবার কোন দূর অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে, যখন আবার জড় পদার্থের টুকরোতে রূপান্তরিত হয়ে দিকহারা উল্কার গতিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অনন্ত ব্যোমে ছোটাছুটি করবে, তখনও তুমি থাকবে। কালের অতীত, সীমার অতীত, জ্ঞানের অতীত কে তুমি—তোমাকে চেনা যায় না। অথচ মনে হয়, এই যেন বুঝলাম, এই যেন চিনলাম! শেষরাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টি জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় ফুলে তাল দেয়, তখন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুরভুরে কচিগন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন নরম হাতদুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, যেন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ওরায়ন যখন পৃথিবীর গতিতে সমস্ত রাত্রির পরে দূরে পশ্চিম আকাশে ঝুলে পড়ে, সেই রুদ্র প্রচণ্ড অথচ না-ধরা-দেওয়া-গতির বেগে তুমি আছ, জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে তখন মনে হয় তাদের সেই সরল প্রাণের প্রাচুর্য্য—তার মধ্যে তুমি আছ।

তাই বলছিলাম যে, কাল শেষরাত্রে তোমাকে হঠাৎ দেখলাম। অন্ধকার প্রহরের শেষ-রাত্রের চাঁদ—তার পার্শ্ববর্ত্তী শুকতারার পেছনে। তোমায় প্রণাম করি—

আজ কলেজের কালভার্ট বেয়ে উঠছিলাম। বেলা পাঁচটা, ঠিক সন্ধ্যেটা হয়ে এসেছে, ছোট ছোট সেই অজানা রাঙা ফুলগাছগুলোর দিকে চেয়ে কেমন হঠাৎ আনন্দ এসে পৌঁছলো—সাধনগরের আমগাছগুলোর ওপর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে সেদিকের আকাশটা—এই সামান্য জিনিসের আনন্দ, কচিমুখের অকারণ হাসি, রাঙা ফুলগাছটা, নীল আকাশের প্রথম তারা, ঐ যে পাখীটা বাঁকা ডালে বসে আছে, সবশুদ্ধ মিলে এক এক সময় জীবনের কেমন গভীর আনন্দ এক এক মুহূর্ত্তে আসে।

মানুষ এই আনন্দ জানতে না পেরেই অসুখে, হিংসায় স্বার্থদ্বন্দ্বে সুখ খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আরও অসুখী করে তোলে…আজ যে মার্টিন লুথারের জীবনী পড়ছিলাম, তাতে মনে হোল এক এক সময় এক-একজন ব্রাত্যমন নিয়ে পৃথিবীতে এসে শুধু যে নিজেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করে চলে যায় তা নয়, জড়মনকেও বন্ধন-মুক্ত করে দেবার সাহায্য করে। যেমন সহস্র বৎসরের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার এক মুহূর্ত্তের একটা দেশলাইয়ের কাঠির আলোতেই চলে যায়—তেমনি।

কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। এ জগতে যারা হিংসুক, স্বার্থান্ধ নীচমনা তাদের আমরা যেন ঘৃণা না করি…শুধু উচ্চ জীবনানন্দ তাদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা ঐ রকম হয়ে আছে। কোন্ মুক্ত পুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা তাদের উপেক্ষিত বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে?

।২৭শে অক্টোবর, ১৯২৩, কলিকাতা।

হঠাৎ পুরোনো দিনগুলো মনে এল। মনে এল কতকগুলি ছায়াভরা বৈকাল, কতকগুলি সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির সন্ধ্যা, সবগুলিই কেমন গভীর, অনন্ত, রহস্যময়। সময় তাদের দু' পাশ বেয়ে ছুটে চলে তাদের কোন দূরে নিয়ে ফেলেছে…যেমন ভবিষ্যৎও মানুষের মনে বড় গভীর ও অনন্ত বলে মনে হয়, অতীতও অল্পদিনের হলেও তার চেয়েও গভীর বলে মনে হয়, রহস্যময় বলে মনে লাগে, হারিয়ে যাওয়ার গভীরতা মাখানো রহস্য তাদের অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো—অনেকদিন হ'ল প্রাচীন অতীতে মিশে গেলেও তাদের গন্ধ, শব্দ, রূপ এখনও আমার মনের মধ্যেই আছে। মনের যেখানে তাদের আশ্রয়, একদিন কিসে বলা যায় না হঠাৎ সেই তারে ঘা পড়ে যায়, তখন অতীত মুহূর্ত্তগুলি তাদের অতীত গন্ধে রূপে বর্ণে শব্দে, সুখে দুঃখে, হাসি অশ্রুতে, আশায় নিরাশায়, মঙ্গলে অমঙ্গলে, সৌন্দর্য্যে রসে একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে মুহূর্ত্তের জন্য উদয় হয়। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে, তারপরই আবার চোখের ভ্রমজালের মত পর-মুহূর্ত্তেই মিলিয়ে যায়—

।২০শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল হাজার বছর আগে যে সব পাখী বনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরা সন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যে সব ছেলে-

মেয়েরা হাজার বছর আগে মা-বাপের কোলে মিষ্টি হাসি হেসে কতদিন হ'ল ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সব অস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলে-পিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি—নদীর ধারে বনে বনে মাঠে মাঠে—ঝোপে ঝোপে—ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।

তার ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এল। রায়েদের কাঁঠালতলায়, পুকুরধারে, টুনুদের উঠানে, নেড়াদের বাড়ীর সামনের বড় গাছটার তলায় অন্ধকার হয়ে এল, খেলাঘরের ক্ষুদ্র জগতের চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রি, অস্ত সূর্য্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য···এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অবক্তব্য আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছয় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়—শতবর্ষজীবী হলেও পায় না···অনুরূপ শিক্ষা, সাহচর্য্য, আদর্শ, যে রূপ আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তা সকলের জোটে না।

সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্ত্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দবার্ত্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে, এই কাজ তাদের করতে হবেই—তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা···

। ৩০শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর।

আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে। তাদের কচি কচি মুখ, তাদের হাসি, তাদের পাগলামি, তাদের সরল শিশু চোখের দুষ্টুমির চাউনি, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মনে পড়ছে—ফুলের মত মুখে কচি ফুলের মত হাসি···আমার সেই সব অনাগত শিশু প্রপৌত্র, বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্রদের জন্য কি রেখে যাব তাই ভাবছি। আগামী হাজার বছরের মধ্যে লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে, কত শিশুফুল ফুটে উঠছে নির্ম্মল শুভ্র হাসিভরা সুন্দর সৌম্য মেশামেশি গলাগলি করে—তারা সব একসঙ্গে যেন পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে তাদের শিশুমুখগুলি তুলে, অজস্র খইয়ের মত ফোটা ঘেঁটুফুলের দলের মত—নীল আকাশে অনাদি অনন্ত কালের রঙের খেলার নীচে—চিরযুগব্যাপী অপরাহ্ণের শান্ত ছায়াভরা মাঠে বসন্তের হাসি দেখছে···ওদের দেখতে পাচ্ছি বেশ—আসবে, ওরা আসবে।

অনন্ত মেঘভরা আকাশে এখানে দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে। এই সামান্য দুদিনের অতি একঘেয়ে সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর জীবন ফুরিয়ে গেলে মনে হয় ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ ঘরদোর হবে। হয়ত ওদের অদৃশ্য সাথী তারাগুলো, বড় বড় বিশ্ব, কত সভ্যতা, কত নূতন প্রাণী,

নতুন বিবর্ত্তন ওগুলোর মধ্যে। কত স্নেহ ভালবাসা প্রেম জ্ঞান স্মৃতি প্রীতি, কত নতুনতর জীবনযাত্রা, কত অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্রতা ওদের জগতে আছে, কে জানে। এই পার্থিব অস্তিত্বের ওপারে সেই সব নতুনতর জীবন হয়ত আমাদের জন্যে অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছে— এই পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের থেকেও কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ দূরতম প্রান্তের মোহনায় হয়ত আরও কত লক্ষ বিশ্ব আছে। তাদের প্রত্যেকটিতে হয়ত কত নতুন সূর্য্য, নতুন গ্রহ, নতুন নক্ষত্রমণ্ডল আছে। কত নতুন প্রাণী, কত বিচিত্র জীবনযাত্রার ইতিহাস, কত কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত ভাবের লীলা, সে সব দূর বিশ্বের চিরদিনের সম্পত্তি কে জানে?

। ২২শে জুন, ১৯২৮, ভাগলপুর।

এখন থেকে বিশ কি ত্রিশ হাজার বছর পরের কথা। এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরের ওপরে কয়েক শত ফিট পলি জমে গিয়েছে, মনুমেণ্টের চুড়োটায়ও অনেক উপর পর্য্যন্ত মাটি জমে গিয়েছে, তার উপর দিয়ে এক বিরাট বিশাল মহাসমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে, কত মাছ কত প্রবাল কত ভীষণদর্শন সব সামুদ্রিকপ্রাণী তার কুক্ষির মধ্যে

অনাগত সেই সুদূর ভবিষ্যতের দুটি মানুষ একটা জাহাজে চড়ে সমুদ্র-যাত্রা করছে, একটি বালক, বয়স দশ এগার-বৎসর। অপরটি তার এক আত্মীয়, প্রৌঢ়। নিজের দেশ ছেড়ে তারা বিদেশে চলেছে জীবিকার্জ্জনের আশায়। প্রৌঢ় তার আবাল্য সহচরদের ছেড়ে চলেছে, মনে কত কষ্ট হচ্ছে। বহু পুরাতন পিতৃপিতামহের পুণ্যপাদপূত জন্মভিটা ছেড়ে যাচ্ছে। কাজেই চিরপরিচিত স্থান আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে যাবার দুঃখে সে চুপচাপ উদাসভাবে জাহাজের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দূরে ক্রমবিলীয়মান শ্যাম তটভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট ছেলেটি সবে বছর দশেক হল পৃথিবীতে এসেছে। তার মধ্যে বছর পাঁচেক তো তার জ্ঞানই হয়নি। অতএব সবে বছর পাঁচেক হল তার দেখবার শুনবার চোখকান ফুটেছে মাত্র—সে চঞ্চলভাবে এদিকে ওদিকে চাইছে—আঙুল দিয়ে উৎসাহপূর্ণ স্বরে এটা ওটা দেখিয়ে বলছে—"ঐ দ্যাখো কাকাবাবু, কেমন পাহাড়টা ঐ দ্যাখো, ওটা কি?—পাহাড়ের ওপর বন? বাঃ বেশ তো? ঐ দ্যাখো কাকাবাবু কেমন একটা পাখী"—প্রৌঢ় বসে বসে ভাবছে অমুকের কাছে যে দেনাটা ছিল সেটা আদায় করে আসবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। বড় ভুল হয়ে গেছে তো! অমুকের জমিটার দর আর একটু বেশী দিলে হয়ত দিয়ে দিত—জমিজমা এই সময় না কিনলে-কাটলে ভবিষ্যতে কি করে ছেলেপিলেদের চলবে? তার প্রপিতামহ কোন্ প্রাচীনকালে যে জমিজমা করে রেখে গেছেন তাতেই এখনও চলছে—সে সব কি আজকের কথা! তখন সত্যযুগ ছিল, অমুকের দর শুনেছি অমুক ছিল। আর এখন! বাপরে, আগুন, ছোঁয়াও যায় না (দীর্ঘনিঃশ্বাস)··ছেলেটা এই সময় জিজ্ঞাসা করলে—কাকাবাবু, আমরা যে অমুক শহরে যাচ্ছি সেটা কি খুব বড় জায়গা?

—ওঃ কত বড় জায়গা তা দেখিস—পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ও-রকম জায়গা কোথায়?

—কাকাবাবু, শহরটা কি খুব পুরোনো ?

কাকাবাবু (মুরুব্বিয়ানার হাস্তে)—হিঃ হিঃ, বলে কিনা খুব পুরোনো ? ওরে পাগল, আমার প্রপিতামহ অমুক যখন অমুক জায়গায় দেওয়ান ছিলেন, তখনও ঐ শহর এত বড়ই ছিল · তবে তার চেয়ে এখন অবিশ্যি আরও ঢের উন্নতি হয়েছে। ও-শহর আরও পুরোনো—কত পুরোনো তা বলা যায় না, মোটের ওপর অনেক অনেক কালের প্রাচীন জায়গা···

তাদের সমস্ত কথাবার্ত্তার সময় অনাগত ভবিষ্যতের এই দুটি নতুন মানুষ জানতো না তাদের জাহাজ যে সমুদ্র বেয়ে যাচ্ছে তার নীচে, অনেক অনেক নীচে, বালি কাদা খোলা পাথর উদ্ভিজ্জ পচা এঁটেল মাটির স্তরের নীচে, ভিন্ন যুগের এক বিশাল নগর, তার মেমোরিয়াল মহুমেণ্ট প্রাসাদ অট্টালিকা চত্বর বিদ্যালয় গৃহস্থবাটী বাগান আশা ভরসা সুখ দুঃখ নিয়ে সবশুদ্ধ একেবার পুঁতে গিয়ে চাপা পড়ে রয়েছে। হয়ত সেই দশবছরের ছেলেটি তার কোনো দূর জন্মান্তরে সেই শহরের অধিবাসী ছিল, কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, কত সাথী, কত বন্ধু, কত তরুণী—কত প্রেম, কত স্নেহ···সেকি জানে সে পৃথিবীতে নতুন আসেনি ? তিনশত ফিট নীচে মহাসমুদ্রের তলের কয়েক ফিট নীচে, বালি কাদা উদ্ভিজ্জ পচা মাটি-স্তূপের নীচে সুদূর, বহুপ্রাচীন, বিস্মৃত অন্ধকার অতীতের এক বিলুপ্ত জগতে তার একবারের জীবন কেটেছে · এমনি সুখ আশা, সুখ দুঃখেই কেটেছে, যা তার কাছে আজ নতুন লাগছে। তার সেই প্রাচীন, সুদূর অস্তিত্বের মধ্যে আর বর্ত্তমান নতুন জীবনকোরকের কচি দলগুলির মধ্যে এক বিরাট মহাসমুদ্র, কয়েকশত ফিট পচা কাদার স্তর, আর সহস্র সহস্র বৎসরের এক বিরাট যবনিকা পড়ে রয়েছে।

সামনের সাদা ঐ মেঘ-ভরা আকাশ, প্রভাতের নবোদিত সোনার সূর্য্যকিরণ, নীল পাহাড়ের উপরকারের প্রভাতকিরণ সমুজ্জ্বল বনশোভা শরতের শান্ত রৌদ্রলীলা যে এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য জগতের আভাস দিচ্ছে, এই সব পরিচিত, প্রাচীন, সনাতন এবং অতি একঘেয়ে বলে মনে হওয়া জগতের পিছনে যে কি বিরাট পরিবর্ত্তনের গতির উদ্দাম নৃত্যের ভাঙাগড়ার খামখেয়ালী লীলা চলেছে, কি অবাধ মুক্ত লীলা-চঞ্চল দৃঢ় জীবনস্রোত বয়ে চলেছে, দুদিনের জীবনে যাকে একঘেয়ে চিরপুরাতন বলে মনে হচ্ছে, সে যে কি বিরাট চঞ্চল, কি গতিশীল, কি প্রচণ্ড, কি রোমান্স যে তার পিছনে, সে কথা ওই নব-আগন্তুক অপরিপক্কবুদ্ধি শিশু কি বোঝে ?

সে শুধু চেয়ে আছে। তার মুগ্ধ, আনন্দদীপ্ত শিশুনয়ন দুটি তুলে সমুদ্রের মধ্যের ছোট পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে, যার চূড়ায় কোন্ এক ধনীর মস্ত একটা সাদারঙের প্রাসাদ, আর নীচে জেলেরা চড়ায় ছোট নৌকা নিয়ে মাছ ধরছে।

"পুরা যত্র স্রোতঃপুলিনমধুনা তত্র সরিতম্"

প্রাচীন যুগের অধুনাতন লুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হ'ত, সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকত। তাদের মাথার উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্ত্তনশীল মেঘস্তূপের মত চঞ্চল এই

বিশ্ব তার প্রাচীন আদিমযুগের লতাপাতা, জীবজন্তুসহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত। এমনি প্রভাতের সূর্য্যের আলো প্রাচীন যুগের সাগরবেলায় পড়তো। আর প্রভাতসূর্য্যের আলো এমনই শীকরসিক্ত প্রাচীন ধরনের ঝিনুক শাঁখ কড়ি পলায় ওপরে রামধনুর রং ফলাতো। সবশুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকাল অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনাপাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালের গহন-গভীর রহস্যে নৃত্য-ক্লান্ত চরণচিহ্নের মত।

। ২৯শে জুলাই, ১৯২৫, কলকাতা।

অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলার ধারে বনে বড় বড় তাল গাছগুলো অল্প অল্প বার হওয়া তুঁতে রঙের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপ-ঝাপ, গাছপালায় বর্ষণক্লান্ত ভাদ্র-সন্ধ্যার মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে—এখানে ওখানে জোনাকির দল জলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাঙ ডাকছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, চারিদিক নীরব, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

দেখে বসে বসে মনে হ'ল যেন সৃষ্টির আদিম যুগের এক জলার ধারে বসে আছি। যে জলার ধারের বনগাছ এখন প্রস্তরীভূত হয়ে পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে—সে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ বা কোটি বৎসর আগেকার এক প্রাচীন আদিম পৃথিবীর জলার ধারে চারধারে গাছপালাগুলো আদিম ধরনের সাদাসিধা গাছপালা· Stigmaria, Sigiloria, Lepidodenpren, Longifolium ইত্যাদি। পৃথিবী জনহীন, মনুষ্য সৃষ্টির বহু বহু পূর্ব্বের পৃথিবী এ। আদিম গহন গভীর অন্ধকার অরণ্যে শুধু আদিম যুগের অতিকায় অধুনালুপ্ত Sauriানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, সৃষ্টির কোনো সৌন্দর্য্য নেই আকাশে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার সূর্য্যাস্ত হচ্ছে। প্রতি রাত্রে রূপোলী চাঁদের আলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে বেয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই। কতদিন পরে মানুষ আসবে, পৃথিবী যেন সেজন্যে উন্মুখী হয়ে আছে—সে আসবে তবে তার শিল্পকলা সঙ্গীত কবিতা চিত্রে ধ্যানে উপাসনায় চিন্তায় প্রেমে আশায় স্নেহে মায়ায় পৃথিবীর জন্ম সার্থক হবে। অনাগত সে আদুরে ছেলেটির জন্যে পৃথিবীমায়ের বুকটি তৃষিত হয়ে আছে।

কিন্তু ছেলেটি যখন এলো, তখনই কি দেখলে, না সকলে দেখে? ঐ যে অন্ধকার বনের উপরের মেঘান্ধকার শুক্ল আকাশে, ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদটুকু দেখা যাচ্ছে, কে ওর মর্ম বোঝে? তাই মনে হয় ভগবান যেন মাঝে মাঝে দুঃখ করেন। তাঁর এই বিপুল রহস্যেভরা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ভাল করে বুঝলে বা বুঝতে চেষ্টা করলে এমন লোক খুব কম। তিনি যে যুগ যুগ ধরে তপস্যার পর শান্ত মৃত্যুঞ্জয়, অমৃতরস মন্থন করে তুললেন - এই বিরাট, বিদ্রোহী, জড়-সমুদ্র মন্থন করে · তাঁর অনন্ত যুগের তপস্যার ফল এই অমৃত কেউ পান করলে না, কেউ আগ্রহ দেখালে না পান করবার। কোন্ যে তার বরপুত্রেরা মাঝে

মাঝে পৃথিবীতে পথ ভুলে এসে পড়ে, তারা এ জগতের তুচ্ছ জিনিসে ভোলে না, তাদের মন পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগলালসার অনেক ঊর্দ্ধে, ঐ অমৃতলোকে, ঐ cosmic সৌন্দর্য্যে ডুবে আছে, অনেক বড় vision তারা ছাখে, সকলের জন্যে বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে, গানে কবিতায়, ছবিতে কথায় লিখেও রেখে যায়, কিন্তু তাদের কথা শোনে বোঝে খুব কম লোকেই—তার চেয়ে সুদের হিসেব কষলে ঢের বেশী আনন্দ এরা পায়।

। ২১শে আগষ্ট, ১৯২৭, ভাগলপুর ।

সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলি পৃথিবীতে নেমে আসছে, নীল অকূল থেকে পৃথিবীর মাটির তীরে। মুখে তাদের প্রাণ-কাড়া দুষ্টুমির হাসি, চোখে দেবদূতের সরলতা। কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুক্‌টুকে মুখগুলি—সকলেরই হাতে তাদের ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল।

চন্দন কাঠের তৈরী চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে মশলা বাঁধা মশালগুলি, জ্বললে, গন্ধে দিক আমোদ করে।

ওদের দিকে কেউ চাইছে না। বাঁশবনের অন্ধকার ছায়ায় সারাদিন ওদের কাটল, রাত আসছে, কিন্তু ওদের মশালগুলো কে জ্বালবে?

অনেক লোকে জ্বালতে এল, কেউ জেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, নিবে যে গেল তা পিছন ফিরে চেয়েও দেখলে না। কেউ বহুবার চেষ্টা করেও জ্বালাতে পারলে না, কেউ চেষ্টা করলে না জ্বালবার। কেউ চোখ নীচু করে চেয়েও দেখল না যে শিশুদের হাতে মশাল আছে।

অথচ সব সময় শিশুরা অনন্ত নির্ভরপূর্ণ মিনতির চোখে চেয়ে রয়েছে সকলেরই দিকে, কে তাদের মশাল জেলে দেবে? কে সে নিপুণ অথচ প্রেমিক মশালচী?

কত শিশু বুঝতে না পেরে আশাভঙ্গ হয়ে নিজেদের হাতের মশাল ফেলে দিলে, হয়ত যা জ্বলতে পারত অতি সুন্দর, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত যে সৌরভে আকুল হয়ে উঠত, তা অনাদৃত হয়ে পড়ল কাদায়। অবোধ শিশুদের বলে দেবার, দেখিয়ে দেবার মশাল তুলে জেলে দেবার তো কেউ নেই।

গহন অরণ্যের অন্ধকার বীথি বেয়ে কে একজন আসছে। বাঁশবনের ছায়া স্নিগ্ধ হয়েছে কার সুন্দর মুখের হাসিতে? তার হাতে মস্ত বড় মশাল, শুভ্র আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

গহনান্ধকার বেণুবীথির অজানা ওপার থেকে সে এসেছে, চিররাত্রির অন্ধকার দূর করতে। ভগবানের বিশ্বের সে এক মশালচী—

আয়রে, আয় আয়, আয়।

হাসি মুখে কোঁকড়ান চুল দুলিয়ে, আলোর জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিশু-পতঙ্গের দল সব ছুটে এল ওদের ছোট্ট ছোট্ট চন্দন-মশলায় বাঁধা মশাল হাতে নিয়ে। চারধার ঘিরে কাড়াকাড়ি, সবাই আগে চায়।

কত ধৈর্য্যের সঙ্গে নতুন মশালচী আলো জালতে লাগল, যাদের নিবে যাচ্ছিল তাদের বার বার ফুঁ দিয়ে—কত অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে। সকলেরই জলল।

ছোট্ট ছোট্ট জলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিকে ওদিকে বেরিয়ে কোথায় সব চলে গেল। আর কোথাও কেউ নেই। অপর কোন অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করতে, অপর কোন অনাগত বংশধরদের হাতের মশাল অমনি করে জেলে দিতে। নিত্যকালের ওরা হ'ল যে মশালচী।

। ২৮শে আগষ্ট, ১৯২৫, ভাগলপুর।

পনের বৎসর আগের এক সন্ধ্যা হঠাৎ বড় স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো। বাড়ীর পিছনের বড় কাঁঠালগাছটায় রাঙা শেষ সূর্য্যাস্তের রোদটুকু লেগে আছে, গাছে পাতায়, বাঁশবনে, কাঁঠালগাছের তলায়। পথের ধারের শেওড়াবনে অন্ধকার নেমে আসছে, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, পাঁচিলের পুরোনো কোন্ কোণে, মাটির ঘরের দাওয়ায়, খড়ের চালের নীচে। সন্ধ্যায় শাঁখ বেজে উঠলো, চারধারে কাক, ছাতারে, ঘুঘু, নীলকণ্ঠ, শালিখ পাখীরা ছায়াভরা আকাশ বেয়ে বাসায় ফিরছে—তখনকার সেই দিনটির আশা আনন্দ আকাঙ্ক্ষা আকুল আগ্রহ—

আজকের এই সন্ধ্যায় আকাশটির রং যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে, কোথাও ওই তুঁতের রং এখনই কালো হয়ে উঠছে, কোথাও রোদের সোনার রং ধূসর হয়ে গেল। মেঘের পাহাড় সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্র দেখতে দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। রক্তের পুকুর-চোখের সামনে নীল মাঠ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটাও ঐ রকম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল—সূর্য্যাস্তের এই আকাশে যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহুরূপীর মত রং বদলাচ্ছে ঠিক ঐ রকমই আকাশ যেন একটা মস্ত দর্পণ—পৃথিবীর এই অহরহ পরিবর্ত্তনশীল রূপ ওতে যেন সব সময় ধরা পড়ছে। তাই সেটাও একটা বিরাট ছায়াবাজীর মত দেখা যায়।

তরল আনন্দ আধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী নয়। Sadness জীবনের একটা বড় অমূল্য উপকরণ—Sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না—যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশী হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও জ্যোতিষ্মান হয়ে প্রকাশ পায়—তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তারা চিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত।

সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।

॥ ২৮শে আগষ্ট, ১৯২৫ ॥

এই প্রশ্ন একদিন নিউটনের, কেপ্লারের, গ্যালিলিওর মনে উদয় হয়েছিল। সকলেরই মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত। জগতে দুদিনের জন্য আসা—এই জগতের ফলে, জলে, স্নেহে, দয়ায় মানুষ হয়ে এটা কি উচিত নয় যে জগতের জন্য কিছু ক'রে যাবো? আমার

ছাত্রটি যেমন কচি, সুন্দর, ঐ রকম অবোধ শত শত অনাগত শিশুমনের জন্যে উত্তরকালে আমার কি দেবার থাকবে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, শত শত কি সহস্র বৎসর পরেও এমন কেউ কেউ ওদের মধ্যে থাকবে যে হয়তো শান্ত পর্ব্বতের ছায়ায়, নির্জ্জন সন্ধ্যায় শান্তিপূর্ণ কোনো গ্রাম্য নদীতীরে, অথবা অন্ধকার গহন-রাত্রে শিশিরভেজা ঘাসের উপর, তারার আলোয় শুয়ে শুয়ে এইগুলি পড়বে আর মনে আনন্দ, বল, উৎসাহ আলো পাবে—এই তো জনসেবা, পৃথিবীতে এসে এই করেই তো সার্থকতা—একশত বৎসর পরে আমার নাম দশ বৎসর আগেকার পাতা মাকড়সার জালের মত কোথায় কালসাগরে মিলিয়ে যাবে—তবে কি রেখে যাবো আমার দুঃখের মত দুঃখী ঐ সব অনাগত কচি কচি শিশু-মনগুলির খোরাকের জন্যে? কি রেখে যাবো? কি সম্পত্তি কি heritage তাদের জন্যে দেবো?

শান্ত, আঁধার অপরাহ্নে বাড়ীর পিছনের বন যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে আসে, পুরোনো নোনাধরা দেওয়ালের কোণে যখন বাদুড়ের দল ছটপাট করতে শুরু করে নদীর ওপারে শিমুলগাছের মাথা থেকে শেষ বৈকালের ম্লান রোদের ছায়াও যখন মিলিয়ে যায়, তখন বহু দূর, ভবিষ্যতের রাশি রাশি ফুলের মত মুখ, শিরীষের পাপড়ির মত নরম এই সব অনাগত বংশধরগণের কথা মনে পড়ে। এই সন্ধ্যার মত অন্ধকারও ওদের মধ্যে কত ছেলের জীবনে আসবে। সন্ধ্যায় এখন আকাশে যেমন জলজ্বলে শুকতারা সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসে আবার সূর্য্যের প্রথম আলোর আগেই মিলিয়ে যায়, ওদের জীবনেও অমনি দুঃখরাত্রের সত্যের উজ্জ্বল শুকতারা যদি না ফোটে তো কে তাদের আশা দেবে? তাই কিছু করে যেতে হবে—জীবনটা ছেলেখেলার জিনিস নয়। এটা একটা serious জিনিস। যারা হেসে খেলে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে স্ফূর্ত্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরি না, কিন্তু যারা জীবনটাকে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিত এই উত্তরকালের শিশু, বৃদ্ধপৌত্র, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের জন্য কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া।

এতে আপন পর কিছু নেই, কি তুমি দেবে এদের? এদের জন্যে কি রাখছো তুমি? জীবনের mission কি তুমি অবহেলা করবে? উপেক্ষা করে ভগবানের পবিত্র মহৎ দানকে পায়ে দলে যাবে?

কোনো কার্য্য কর বললেই করা হয় না, এ জিনিস সহজ নয়। অনেকদিন ধরে ভাবতে হয়, বাইরের কোনো জিনিস থেকে বাধা বিঘ্ন না আসে। চিন্তা; শুধু গভীর চিন্তা অনবরত বাধাহীন চিন্তাতে শান্তমনে গভীর সত্যের উদয় হতে পারে, interrupted হলে সারাজীবনেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না, যা কিনা হয়ত এক বৎসরের নির্জ্জনবাসেই আসতে পারত…"By keeping it constantly before one's mind…By always thinking and thinking upon it, much is done under these conditions…… much might be sacrificed to obtain these conditions.

জনসেবার জন্যে sacrifice করবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে এও এক জনসেবা, এর জন্যেও

বিরাট স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন আছে। এ সাময়িক হুজুগের জনসেবা নয়। ধীর, শান্ত সমাহিত ভাবে উত্তরকালীন অনাগত জনগণের সেবা।

। ৯ই অক্টোবর, ১৯২৫ ।

মানুষের সামান্য সুখদুঃখ, আমবন কাঁঠালবাগানের পাড়ায় আড়াল বেয়ে দিব্যি চলছে। Anuytaর মত কত মেয়ে কত দুঃখী · সন্ধ্যার আকাশে কত শত গ্রহ-নক্ষত্র—কত জগতের ছড়াছড়ি—বিরাট নাক্ষত্রিক শূন্য—ঠাণ্ডা জনহীন—পৃথিবীর ফুলফল লতাপাতা সামান্য সুখদুঃখ—গ্রহ-নক্ষত্র লাটিমের মত ক্রীড়া-কন্দুকের মত আকাশে ঘুরছে। এই আনন্দলীলায় সব প্রাণীই যোগ দিচ্ছে। সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সবই খেলা, দুদিনের। কিছুতেই ব্যথিত হবার কিছুই কারণ নেই। নদী বেয়ে যে শব ভেসে যাচ্ছে কে জানে হয়ত দূর কোন অজানা নক্ষত্রে ওর মৃত্যু নবজীবন লাভ করেছে। ওর মৃত্যুযন্ত্রণা সার্থক হয়েছে! এই বিচিত্র বিশ্বলীলার সকলেই যে যাত্রী। ফুল, ফল, গাছ, পাখী, মানুষ সকলেই।

কিন্তু ক'জনে জগতের বাইরের এই বিরাট শূন্যের দিকে চেয়ে পৃথিবীর জীবনের সুখদুঃখের উর্দ্ধের কথা ভাবে? Crowd mind-এর বাইরে সকলেই নয়—সকলেই গড্ডলিকা। খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। জগতের বড় বড় মনীষাসম্পন্ন চিন্তাবীর কয়জন? উপনিষদের ঋষি পথে-ঘাটে সুলভদর্শন নন। সকলেই শঙ্কর নন, প্লেটো নন, নিউটন ফ্যারাডে গ্যালিলিও কোপারনিকাস গাউস ইনষ্টিন নন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলিরাশির আবরণ ভেদ করে ক'জনের চোখ বাইরের অনন্ত উর্দ্ধ আকাশের ঘূর্ণমান-সদাচঞ্চল বিরাট বিশ্বজগতের দিকে যাবে?

দুই এক জনের—তারা জনপ্রবাহের কেউ নয়, তার অনেক উর্দ্ধে।

। ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৫ ।

সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে। লেখার পাতাগুলো ছড়ানো আছে। ফুলদানিটাতে chrysanthemum, কলাফুল। এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত—হয়ত একাশ্ন বৎসর পরে আমার কোনও চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা * হয়ত থেকে যাবে। হয়ত কত লোকের মনে আশা সান্ত্বনা দেবে। হয়ত পাঁচশত বছর পরে - যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে—আমি · এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাবো। আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না। তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব চলবে। অনাগত ভবিষ্যতের সে-সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জ্বেলে তেল খরচ করে, আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবুও দেবো, দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি। তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি

* 'পথের পাঁচালী' লেখা হচ্ছিল।

আর দেখতে আসবো না। আমার ফুলদানীর এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর chrysanthemum ফুলটা আর বছর এ সময় কোথায় থাকবে? আশি বছর পরে আমি কোথায় থাকবো?

এই তো যুগ-যুগের শিক্ষকতা। যুগ-যুগের জনসেবা সে। এক জন্মের suffering সেখানে সার্থক। উত্তরকালের শত শত অনাগত তরুণ মনে যখনই দুঃখ আসবে, তাদের কচি প্রাণে আশা, বল, আনন্দ দেওয়া, জীবনের পথ দেখিয়ে দেওয়া—এক জন্মের জন্য জীবন নয়, দু'দশ বৎসরের সাময়িক উত্তেজনা নয়, যুগ-যুগের জনসেবা। সে দিকে মনে রেখে কাজ করতে হবে। সাময়িক হাততালির দিকে নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃতে কি করেছেন? বুদ্ধদেব কি করেছেন? স্বয়ং চৈতন্য কি করেছেন? তাঁদের এক জন্মের suffering, ব্যাকুলতা, ধ্যান সব ধন্য হয়েছে— কারণ যুগে যুগে তাঁদের কাহিনী পড়ে লক্ষ লক্ষ কুয়াশাচ্ছন্ন মন আলোর সন্ধান পাচ্ছে। suffering এদিক থেকে মস্ত জিনিস, কেউ যেন সে কথা না ভোলে। জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্য। sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, কিন্তু তা চিরদিন লোকের মনে বল দেবে। পূর্ণ-অন্ধকার অমাবস্যার পরই শুক্লপক্ষের চাঁদ ওঠে—দুঃখের রাত্রিতেই তারা খুব উজ্জ্বল হয়।

। ২০শে নভেম্বর, ১৯২৫।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এই মাত্র ফিরে থেকে আসছি। আজ ইসমাইলপুর থেকে ভাগলপুর আসবার সময়ে শূয়রমারীর খেয়া-ঘাটে এপারে যে নৌকা লেগেছিল, যাতে ছেঁড়াখোঁড়া হলদে রংএর বই খুলে মাঝিরা পড়ছিল—জনসেবকদের কথা মনে এলে যেন এর কথা মনে আসে—নৌকাতে যে মেয়েটি ময়লা কাপড় পরে বসেছিল ও নদীতে নেমে কাপড় হাঁটু পর্যান্ত তুলে চলে গেল, ওর কথাও যেন মনে থাকে। মুরাঠা বেঁধে ওরা নাকি কোন্ কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেল। আর ওই যে ছেলেটা বললে তার বাড়ী রজীদপুর, ওর কথাও—সাবোর স্টেশনের বাইরে লতাকাটা পাতা কুড়িয়ে আগুন পোয়ালো, গাড়ীতে ওই লোকটাকে বিড়ি খেতে বারণ করা, এই সময়ে আলো জ্বালিয়ে বড় বাসার টেবিলটার এই সব লেখা অনেককাল মনে থাকবে। শূয়রমারীতে আজ ঘি খুঁজলেই পাওয়া যেত – মুকুন্দি বলেছিল—কাত্তিক খুঁজলে না ভাল করে। এখানে মোটেই শীত নেই। ইস্মাইলপুর কাছারীতে কদিন কি শীতই পেয়েছি। আগুন রোজ সন্ধ্যায় না পোয়ালে রাত কাটতো না। রামচরিত রোজ খড়ের বোঝা নিয়ে এসে আগুন করত। সেদিনকার শিকারটা খ্‌ ‸ার হয়েছিল। বন্দুক নিয়ে কাদায় কাদায় বেড়ানো— প্রথম কুণ্ডীটাতে এত হাঁস ছিল একটাও মারতে পারা গেল না। শুধু এদিক ওদিক দৌড়ে দৌড়ে হয়রাণ—

। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৫, ভাগলপুর।

লেখাপড়া একটা খুব বড় মানসিক দুঃসাহসিকতা। যারা সারাদিন ঘরে বসে বসে পড়ে, তাদের শরীর ঘরটার চারধারের দেওয়ালে বদ্ধ থাকলেও মন উড়ে যায় অনেক অনেক দূরে

—অসীম শূন্য পার হয়ে কোটি কোটি অজ্ঞাত নক্ষত্রলোকের দেশে দেশে। সময়ের কুয়াশা ভেদ করে তাদের মন ফিরে যায় একেবারে পৃথিবীর সে-যুগে যখন মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হয় নি, জলাজঙ্গলে অজ্ঞাত ভীষণ-দর্শন অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত গাছপালায় ভরা আদিম যুগের জঙ্গলে। এই জগতে সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে অজানার আনন্দ—জানা জিনিসে কোনো সুখ নেই।

এই নতুন জিনিসের আনন্দ, অজানার আনন্দে বিশ্বজগৎ ভরা। মানুষের সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়-শক্তির চারপাশ ঘিরে, তার চোখের সামনে, তার কানের সামনে, তার অনুভব ও স্পর্শশক্তির সামনে, তার মনের সামনে অনন্ত অসীম রহস্যময় অজানার মহাসাগর। তার দূর দিক্‌চক্রবালের ওপারে ঘন ঘন আবছায়া কুয়াশার অস্পষ্ট কল্লোলও শোনা যায় না—এত দূর সেদিক। এই অসীম অজানা সাগর মানুষকে অজানার আনন্দ দেবার জন্য যেন তার চারধার ঘিরে আছে। কে আছে যার সাহস, বুদ্ধি, মন এত দৃঢ় যে অজানার দরিয়ায় পাড়ি জমাতে চলে? কূল আঁকড়ে তো সকলেই পড়ে রইল। দিক্‌দিশাহারা অকূল-রহস্য মহাজলধিতে কে 'বাচ' খেলতে চলবে—কোথায় সে বীর ব্রাত্য, মুক্ত আত্মা?

সংসারের ধুলায় পড়ে সবাই লুটোপুটি খাচ্ছে—সুদের হিসাবে দিন যাচ্ছে, গাঁজা খেয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করছে, সংসারের সবাই আনন্দকে খুঁজছে। কিন্তু আনন্দের জলধি যে সামনে অক্ষুণ্ণ রইল তার দিকে তো চাইবে না।

সে উচ্চ আনন্দের ভাণ্ডারকে ব্যবহার করবার মত শিক্ষা-দীক্ষা সকলের থাকে না, অধিকার সকলের থাকে না।

এই জন্যই মনে হয় সংসারে কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। মানুষ এই উচ্চ ব্রাত্য, আনন্দের খবর না জানতে পেরেই অ-সুখে হিংসায় ধুলায় কাদায় পড়ে লুটোপুটি খায়। স্বার্থদ্বন্দ্বে নিজের সুখ খুঁজতে নিজেকে আরও হীন, অসুখী করে তোলে। তাদের দোষ নেই। হতভাগ্য তারা—সকলে আনন্দকেই খুঁজছে। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে আনন্দের পথ না জেনে ভুল পথ ধরেছে। শুধু অবগুণ্ঠনময় বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্য-লোকের অজানা জীবনানন্দের পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা এমন হয়েছে। নইলে একবার চোখ ফুটলে তারা সকলেই ঠিক পথই ধরত, কারণ নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। কেউ নেই—কেউ নেই—তাদের মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। কোন্ মুক্তপুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্তা নব-আনন্দের তড়িৎলেখায় তাদের উপেক্ষিত অন্ধ বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে?

। ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ ।

হঠাৎ জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম—বাইরে শীত কমে গেছে—জ্যোৎস্নাসিক্ত লম্বা ছায়া পড়েছে—আলো আঁধারে গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া—মনে হোল এই যে সুন্দর পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না ছায়া, ঐ রহস্যময় চিন্তা পাঁচশো বছর পরে কোথায় থাকবে?

ঐ দূরে যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে, এই বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো—আজ যারা সব জীবন্ত

স্পষ্ট মূর্তিমান—আজ আমার জীবনের যে দুঃখ সুখ আমার কাছে স্পষ্ট জীবন্ত, তারা সব কোথায় থাকবে? কোথায় মিশে যাবে—কোন্ দূর অতীতে? আবার তাদের জায়গায় নূতন অনুভূতি—এতদিনের অচঞ্চল, গতিহীন জড় সংসার যেন হঠাৎ তার চোখে সচল গতির বেগে জলন্ত হয়ে উঠল, যা এতদিন ছিল বদ্ধ, হয়ে উঠলো রহস্যময় জীবন্ত গতিশীল—পথিক বিশ্ব এই অনন্তের মধ্য দিয়েও ঠিক আছে, তার বুকে যুগে যুগে কত বিনষ্ট অবোধ জীবের ব্যথা, কত অতীতের কত বেদনা-ভরা বুক তার, যুগযুগের বিরহ জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ, সৃষ্টির কত ভুল কত রহস্য নিয়ে যে চলে আসছে। হয়ত অনেক দিন পরে সৃষ্টি যখন সুন্দর হবে আগের চেয়েও তখন দূর স্বর্গের কোন্ কোণে মস্ত বড় জ্যোতির্বাতায়ন খুলে রেখে অতীতদিনের জীবের কাহিনী তার মনে পড়ে যায়—অনন্তের পাষাণ আনন্দ বেয়ে যারা কত কতদিন মিশিয়ে গেছে—বুক হয়ত তার অনন্তের ব্যথায় ভরে ওঠে।

। ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৫, ভাগলপুর।

অসীম অনন্ত রহস্যভরা আকাশ -শুব্ধ রাত্রি। পৃথিবী সুপ্তির অন্ধকারভরা। এখানে ওখানে দুই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে মাত্র; মাঝে মাঝে বাতাস জেগে নিমগাছের ডালপালার মধ্যে সির্ সির্ শব্দ হচ্ছে। আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার। আকাশে বাতাসে একটা নীরবতা। অন্ধকার আকাশে নিমপাতার ফাঁক দিয়ে একটা তারা যেন অসীম রহস্যের বুকের স্পন্দনের মত টিপ টিপ করছে। তারাটা ক্রমে নেমে যাচ্ছে—আগে যেখানে ছিল ক্রমে তা থেকে নীচে নামছে। এই অনন্ত, সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক, রুদ্র লীলা প্রচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে তা ঐ সঞ্চরমাণ তারাটিকে দেখলে বোঝা যায়। অন্ধকারের পিছনে একটা অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্যলোক যেন আবছায়া আবছায়া চোখে পড়ে। ঐ তারায় হয়ত একটা স্বাতী নক্ষত্র আছে। তা ·খিব চোখের বাইরে, হয়ত তাতেও একটা আমাদের মত উন্নত ধরনের জীব থাকত। কি হয়ত আমাদের চেয়েও উন্নততর বিবর্ত্তনের প্রাণীর বাস। কি তাদের সভ্যতা, কি তাদের ইতিহাস, কি তাদের প্রেম স্নেহ, জ্যোৎস্না সৌন্দর্য্য · জানতে ইচ্ছা যায়। এই রহস্যভরা বিশ্বের বুকের স্পন্দনটা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে হয়—আরও কত নক্ষত্র, কত জগৎ, কত প্রেম, কত মহিমা, কত সৌন্দর্য্য, অব্যক্ত, বিশাল, বিপুল, অসীম চারধারে ছড়ানো। তা লোক-কোলাহলে শোনা যায় না। এই রকম গভীর রাত্রিতে এই রকম নির্জ্জন জানালার ধারে বসে এক মনে আঁধারভরা আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়ে থাকলে গভীর রাতের দক্ষিণ বাতাস যখন কালো গাছপালার মধ্যে সির্ সির্ বয়ে যায় তখন যেন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট তার বুকের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়।

আনন্দের রহস্যের গভীরতায়, বিপুলতায় মন ভরে ওঠে। জীবনের অর্থ হয়। পৃথিবীর জীবনের পারে যে জীবন, অসীম রহস্যময় অনন্তের পথে মহিমায় যাত্রাপথের পথিক যে জীবন, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। দৈনিক জীবনের সাংসারিক কর্মকোলাহলে যে মহিমাময় শাশ্বত জীবনের সন্ধান আমরা পাই না, জগতের সুখ দুঃখের ওপারে যে অমত্ত জীবন সকলেরই

জন্যে চঞ্চল প্রতীক্ষায় রয়েছে, অসীম নীল শূন্য বেয়ে যার উদ্দাম রহস্যভরা পথযাত্রা, সে জীবন একটু একটু চোখে পড়ে।

"ভয় নেই, ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না, অসময়ে দেখবার জন্যে ব্যাকুলও হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোনো ভয় নেই, পৃথিবীর কোন শান্ত, গ্রাম্য নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁশিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে এ অসীম শূন্য অনন্ত রহস্য তোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনা আপনিই হবে, কোন ব্যাঙ্কে জমাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্যোৎস্না ভালবাস? ফুল, ফল, পাখী ভালবাস? গান ভালবাস? পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলেমেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে চোখে জল আসে? মন আকুল হয়ে ওঠে? আর্ত্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও? তবে তুমি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী। তোমার সুখের সীমা হবে না। সে খুশি আনন্দের মধ্যে দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্যে দিয়ে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেখে বেড়িও, কত দীন দরিদ্র, আতুর জীব কঠিন সংগ্রামে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নির্জ্জন নদীর তীরে কেউ হয়ত বসে বসে কাঁদছে—ওদের চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টা কো'র, তাদের সঙ্গে কেঁদো, সেই তোমার স্বর্গ হবে। চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য্য থাকতো না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য্য, সব সন্তোষ, শান্তি, কেমন মরুভূমির মত ভয়ানক খাঁ খাঁ করতো - মাঝে মাঝে আর্ত্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুণ মধুর হয়েছে।

"জ্যোৎস্না যখন ওঠে, তখন অনেকদিন আগে মরে-যাওয়া ছেলের কথা ভেবো—দেখবে, জ্যোৎস্না মধুর করুণ হয়ে আসছে। পাখীর গানে করুণ গৌরীর উদাস মীড় ধ্বনিত হচ্ছে। যে বুড়ীটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবো—মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে—জগতের পবিত্র কারুণ্যের, আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অনন্তের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি জগতে সে অতি দুর্ভাগা। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।"

কুকুরের ঘেউ ঘেউ যেন একটু থেমেছে। অন্ধকার যেন আরও একটু গভীর হয়েছে। তারাটা আরও নেমে গিয়ে গাছের ডালের আড়ালে পড়েছে—কি রুদ্র প্রচণ্ড তাণ্ডব গতি কি শান্ত নিরীহতার আড়ালেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ঝির ঝির বাতাসে নিমফুলের গন্ধ আসছে – বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ আসছে।

তখনও আবার ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাড়াগাঁয়ের বনে বনে ঘেঁটু ফুল ফোটে, বৈঁচিগাছের নতুন কচি পাতা গজায়, দক্ষিণ বাতাস বয়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে দোয়েল কোকিল ডাকে। কিন্তু তারা আর নেই, সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে তারা কোথায় কতদূর চলে গিয়ে কোন দূর অতীতে মিশে গিয়েছে।

॥ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

ভাবতে ভাবতে মনে হোল সাত বৎসর আগে এই দিনটিতে আমি প্রথম চাকরী নিয়েছিলাম। সেই মাইনর স্কুলের খাট, সেই লেপে শোওয়া—অন্ধকার আকাশে চেয়ে দেখলাম। যদিও আমি ভাগলপুর আছি, এখনি এত বড় একটা মিটিং করে এলুম, কাল সকালে হেমেন আসছে, ইসলামপুরে নায়েবের চার্জ বুঝে নিতে যাবে, কিন্তু এই সবের মধ্যে পুরোনো দিনের ছবিগুলো বড় মনে পড়লো, অনেক দূরে এক গ্রাম্য নদীতীরে কেমন মাটা কাঁটার বন, খল চিতের খাল, মোনা কাদা, গোল বেগোল, তারপর সেই পুকুরের ধার, সেই জানালা, সেই বর্ষার দিনে দরমাহাটার মোড়ে পাখুরে চুণ ফেলা, সেই পানচালার শোয়া, সেই কালী ডাকছে, ওঃ বড্ড কম।

জীবন কি করে অগ্রসর হচ্ছে? সাত বছরের এই পরিবর্ত্তন, পাঁচ হাজার বছর পরে কি হবে? এই বিভূতি, এই নায়েব, এই অম্বিকাবাবু, এই হেমেন, এই আমি কোথায় থাকবো? পাঁচ হাজার বছর আগে যারা ইজিপ্টে থাকতো তারাও হয়ত ঠিক এই রকম ব্যক্তিগত আশা নিয়ে যতীনবাবুর মত অহঙ্কার করতো, বিভূতির মত ফোর্থ ক্লাসে পড়বার স্বপ্ন দেখতো—কিন্তু তাদের আশা অহঙ্কার প্রেম স্নেহ স্বার্থ নিয়ে কোথায় তাঁরা আজ? দু-একটা ভাঙা ছেঁড়া মমি ছাড়া সেই বিশাল সভ্যতার অতীত জনসঙ্ঘের কি চিহ্ন পাওয়া যায়?

ঐ রকম আমাদেরও হবে। আমরাও আমাদের দ্বন্দ্ব, মারামারি, অহঙ্কার, আশা, দাম্ভিকতা, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া নিয়ে বুদ্‌বুদের মত মহাকাল-সাগরে কোথায় মিলিয়ে যাবো। আমাদের জায়গায় আবার নতুন একদল আসবে। তাদের ঠিক এই রকমই সব হবে। তারাও বলবে—আমরা বড়, আমরা জমি কিনবো, বিষয় কিনবো, সুদে টাকা ধার দিয়ে বড় মানুষ হবো, বই লিখে নাম করবো—তারা বুঝতে পারছে না, তাদেরই পায়ের মাটির তলায় এক নয় কত লক্ষ লক্ষ generation তাদেরই মত ভেবে কেঁদে হেসে আশা করে অহঙ্কার করে সুখী অসুখী হয়ে বগল বাজিয়ে নেচে কুঁদে হামবড়াই করে বর্ত্তমানে ধুলোমাটি হয়ে পৃথিবীমায়ের বুকেই কেঁচোর মাটির মত মিলিয়ে রয়েছে।

এখানে ওখানে, অন্ধকার আকাশে, বহির্শূন্যে—বিশ্বসৃষ্টির উপকরণ, পাথর, ধাতুর পিণ্ডগুলো মাঝে মাঝে পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠে রয়েছে—ঐ একটা—আবার—একটা—আবার ঐ—শূন্যটা একবারে ধাতুর পাথরের উপকরণে ভরা—

ঐ বিশ্বজগৎ, সংসারের কোলাহল, উর্দ্ধের বড় জগৎটা ঐ অন্ধকার শূন্যে আত্মপ্রকাশ করছে।

ঐ যে গতি, ও বিশ্বের গতির প্রতীক। শুধু প্রতীক নয় ও তারই গতি। স্বয়ং সঞ্চরমাণ, ভ্রাম্যমান, ঘূর্ণ্যমান বিশ্ববস্তুর অংশ। আপনা আপনি নিয়মে চলেছে। ওর দিকে চাইলে নিউটনের, কেপলারের, হেল্‌ম্‌হোল্‌টজের, শঙ্করের, বরাহমিহিরের জগৎ মনে পড়ে—সে জগৎ ডাক্তার শরৎ সরকারের জগৎ নয়, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার অমুকের জগৎ নয়, অমুক বড় মানুষ পেটো মহাজনের জগৎ নয়, অমুক স্টেটের অমুক ম্যানেজারের জগৎ নয়। কত পৃথিবীর, বিশ্বের ভাঙা টুকরো ও। কত ইতিহাস ছিল তাতে? কত জীব কত সভ্যতা কত উত্থানপতন কি বিরাট রহস্য ওর আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে! কি

অনন্ত ধ্যানের চিন্তার সৌন্দর্য্যস্বপ্নের ধারণার জ্ঞানের বিষয় ওই পাথরের থাতুর টুকরোগুলো তা কে ভেবে ভাখে ?

আবার আকাশে চাও, Seriusএর পাশের, কত গ্রহনক্ষত্রের পাশের অদৃশ্য জগৎগুলোর কথা ভাবো ! অন্ধকারে গা লুকিয়ে কোথায় ওরা অনন্ত পথে ঘুরছে ? কি জীববাস তাতে ? তাতে এরকম কত জীবের উত্থান পতন ? কত দিনের ইতিহাস ?

তবে এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে, এই তারের ঘরের মধ্যে, এই মেঘের প্রাসাদচূর্ণের মধ্যে আসল জিনিসটি কি ? জনসেবা—এ জীবনের নয়। যুগযুগের জনসেবা। বিশ্বকে উপলব্ধি ক'রে সত্যকে উপলব্ধি ক'রে শাশ্বত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি ক'রে, ধ্যানে কল্পনায় ছবিতে তাকে এঁকে যাওয়া। নয়ত এমন কাঁদিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল কাঁদবে, এমন হাসিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল হাসবে, এমন ভাবিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল ভাববে, এমন দেখিয়ে যাওয়া যে তারা চিরদিন দেখবে।

শিক্ষকতা নয়, জনসেবা—দীন নিরহঙ্কার অথচ দৃঢ় পবিত্র হয়ে অবহিত মনে এই অতি মহৎ সার্থক সেবা।

বৎসরে বৎসরে এরকম বসন্ত কত আসে—কত নতুন মুখের আশা, কত নতুন স্নেহ প্রেম—মাথার উপরে নিঃসীম নীল শূন্য অনন্তের প্রতীক—এই নীল আকাশের তলে বৎসরে বৎসরে এরকম কচি পাতা ওঠা গাছপালা, বেলফুলের ঝোপের নীচে বৈঁচি-ষাঁড়া-বাঁশবনের আড়ালে যে শান্ত জীবনগতি বহুদিন ধরে ছাতিমবনের আমবনের ছায়ায় ছায়ায় বেয়ে চলেছে, তারই কথা লিখতে হবে। ওদের হাসিখুশি ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশা ভরসায় যে কাহিনী ওই দিয়ে দিতে হবে—তাদের জীবনের যে দিক আশাহত ব্যর্থতায় দীনতায় চোখের জলে অপমানে উদাসকরুণ, চাঁদের আলো যাদের চোখের জলে চিক্ চিক্ করে, ফাল্গুন-দুপুরের অলস গরম দমকা হাওয়ায় যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়, নিস্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যা যাদের মনের মত ঝুলিঝুলি অন্ধকার ভরা নির্জ্জন—তাকেই আঁকতে হবে—মানুষের এই suffering এতো বড়।

বেড়াতে বেড়াতে চায়বাবের কাশজঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসছে। চন্দ্রইপাখী কিচ্‌কিচ্‌ করছে। সন্ধ্যার শান্তি ও অন্ধকার—অনেক দূরে এই ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়া বইছে। বনে বনে বাতাবী লেবুর গন্ধ ভেসে আসছে। এখন শান্ত সন্ধ্যায় মিষ্টি বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ পুকুরের ঘাটের পথে বইছে। রাঙা কাঞ্চনফুলের ছায়া পুকুরের জলের ওপর পড়েছে। ভিজে কাপড়ে বধূরা ঘাট থেকে বাড়ী যাচ্ছে। আর এখানে ? এখানে চারিদিক কাশের গন্ধে ভরপুর। মহিষের খুকইয়া চিৎকার করছে। হু হু পশ্চিম বাতাসে বালি উড়ে চারধার অন্ধকার করে দিয়েছে। কাটরা থুবড়ী, রামজোড়, লোধাই, এই বসন্ত, এই লেবুফুল, সৃষ্টির আনন্দ—এই সব তুচ্ছ জিনিসে জীবনের মাদকতাময় আনন্দ—magic :of life যুগে যুগে, বিবর্ত্তনে এরকম আসবে—এই আনন্দ, এই উৎসব, যুগযুগের মাঝখান দিয়ে অনন্ত কাল ধরে চলেছে—তারই মধ্যে জন্মেছি আমি—এরকম কত যাবো, কত আসবো—কত চড়কে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াবো, কত সরস্বতী পূজার গান শোনা, "ফাল্গুন লেগেছে বনে

বলে", কত Abyssinian horseman, কত চাপা পুকুর, কত অন্ধকারময়ী রাত্রি, কত বর্ষাসন্ধ্যার কত অজানা বঁধুর মিলন গন্ধ, কত জনের সঙ্গে বাহুতে বাহুতে বাঁধা কত উৎসবের দিন—কত মুকুমার, কত হুগলী ব্রিজ, কত কেওটার সিকেতার গন্ধ, কত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ছায়াভরা বৈকালে বোর্ডিং থেকে বাড়ী যাওয়া, কত ফাল্গুন দিনে প্রতিভা সুন্দরীর পড়া, কত জানালার ধূপগন্ধ—কত জন্মের মধ্য দিয়ে বারে বারে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নূতন নূতন অজানা মায়েদের কোলে শিশু হয়ে হয়ে আসা যাওয়া, নব নব জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস-আনন্দ।

হে আনন্দময়, যুগে যুগে তোমার মহারহস্যময় জীবনধারা বিজয়ীবৎ বিমৃত্যু, বিশোক, পথহীন মহাপথ বেয়ে কত কল্প, মন্বন্তর মহাযুগের মধ্য দিয়ে, শত সহস্র জন্ম মৃত্যুর মাঝ দিয়ে কোথায় সে ভেসে চলেছে।

নিয়ে চল, নিয়ে চল নিয়ে চল

মহাকালের মহাকলেবরের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল—

অনন্ত নীল ব্যোম-সমুদ্রে এখানে ওখানে পাটকিলে রংয়ের মেঘদ্বীপের দিকে—

। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, ভাগলপুর।

Life! Life!

কাল রাত্রে অন্তরের মধ্যে জীবনের বিশাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস অনুভব করলাম—ওরকম অনেকদিন হয়নি। শক্তির, উৎসাহের, কল্পনার, আনন্দের, উদ্দীপনার, সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের কি বিরাট প্রাণ মন মাতানো, পাগল করা, উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন গতি-বেগ! নদীর কূল-ছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া, জোয়ারের কি দুর্মদ, ফেনিল, প্রলয়লীলা! মনের মধ্যে জীবন যেন বলছে—এই যে গণ্ডী তুমি তোমার চারিদিকে রচনা করে বসে আছো এরা তোমারই ভৃত্য তোমারই দাস। তুমি কেন ভুল করে এদের হাতে ইচ্ছে করে খাঁচার পাখীর মত বন্দী হয়ে আছো? তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়। জীবনটা ভালো করে দেখতে হবে। উপভোগ করতে হবে। জীবন উৎসবের মূল শুকিয়ে দেয় অলস নিকর্মা জীবনযাত্রায়। শত্রুকে তাড়াতে হবে।

কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে চলো! উদ্দাম উন্মত্ত বিজয় বিমৃত্যু গতির বেগে বার হয়ে পড়ো। কি ঘরের কোণে বসে মোকদ্দমার ফাইল আর স্টেটমেন্ট ঘাঁটছো।—তোমার মাথার ওপর অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ উদাস রহস্যময় অজ্ঞাত, নব নব ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজিকে বুকে নিয়ে চলেছে। ধূমকেতু নীহারকণা নীহারিকা সুদূর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আলোকবর্ষ পারের দেশ, নতুন অজানা বিশ্বরাজি, নতুন অজানা প্রাণীজগৎ, বিশাল প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন,হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, এলুমিনিয়াম,—প্রচণ্ড জাগতিক তেজ X-ray, বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঢেউ, অনন্ত শূন্যপথে ভ্রমণশীল জলন্তপুঞ্জ, জানা অজানা ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমান ধাতুপিণ্ড,প্রস্তরপিণ্ডের অতি অদ্ভুত রহস্যভরা ইতিহাস—এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটী প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলাউৎসব। মৎস্যযুগ, অঙ্গারযুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা, কত দ্রুমহীন,

দিকহীন গর্জ্জমান মহাসমুদ্র—অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজেয় জীবন মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে। চুপ করে চোখ বুজে বসে এই গতিশীল তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল মহাকালের মহাযাত্রার উৎসবের কথা ভাবো—কোথায় যাবে তোমার তুদিনের বদ্ধজীবনের দৈন্য, কোথায় যাবে তোমার রুদ্ধ ঘরের অনিশ্চল তুষ্ট হওয়ার ভাণ্ডার—প্রাণের বেগে গতির বেগে ছুটে বেরিয়ে পড়ে ভাখো জীবন কি মহিমাময়, কি বিরাট, কি শক্তিশীল! কি অক্ষয় অনাদি অনির্ব্বাণ জীবন, সঙ্গীতের কি মধুর লয়-সঙ্গতি।

ঘুঙুর বাঁধা পায়রা হয়ে ছাদের আলসে আঁকড়ে পড়ে থেকো না, বাজ পাখীর মত ওড়ো, মাথার ওপরে যে অনন্ত অকূল শাশ্বত নীলাকাশ তার ঘননীলের মধ্যে পাখা ছেড়ে দাও, উড়ে যাও—উড়ে যাও—সুন্দর বৈকাল, আমের বউলের গন্ধ ভেসে আসছে, পাখী ডাকছে, বন-ঝোপের পাতা সর্ সর্ করছে—জীবনে এ বৈকাল কতবার আসে কতবার যায়, কিন্তু প্রত্যেক অপরাহ্ণই যেন নিত্য-নূতন মনে হয়, কারণ সামনে যে অজানা রাত্রি আসছে। অজানায় আনন্দই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ। অন্ধকারে সূর্য্য ডুবে গেল, কিন্তু আবার সকালে উঠবে। আবার নতুন জীবন নতুন ফুল ফল দূর্ব্বা শিশির পাখীর গানে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। আবার কত হাসি, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, কত জানালায় ধূপগন্ধ—

অশান্ত প্রাণপাখী আর মানে না—সব দিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত অকূল নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বার লোভে ছটফট করছে—জীর্ণ পিঞ্জরদলে শুধু অধীর অকূল পক্ষবিধূনন! উড়তে চায়—উড়তে চায়—পরিচিত, বহুবার দৃষ্ট, একঘেয়ে, গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যে আর নয়, একেবারে অপরিচয়ের অকূল জলধিতে পাড়ি দিতে চায়, হয়ত দূরে দূরে কত শ্যামসুন্দর অজানা দেশসীমা তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মেরুপর্ব্বত। আলোর পক্ষে ভর দিয়ে শুধু সেখানে যাওয়া যায়, অন্যভাবে নয়—সেখানেও ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী বয়ে যায়—দেববধূগণ পীত হরিৎ তারকার আলোকে মৃদুপদবিক্ষেপে জলখেলা করতে নামে।

জীবনটাকে বড় করে উপভোগ করো, খাঁচার পাখীর মতো থেকো না। জগতের চল-চঞ্চল গতি দেখে বেড়াও দেশে দেশে। দিল্লী আগ্রা গিয়ে ভাখো মোগল বাদশাহের সিংহাসন। ঐশ্বর্য্য ছায়াবাজীর মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে ওঠো, কেদারবদরীর পথে বেড়াও, অবসাদ দূর হবে, মন দৃঢ় হবে।

। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, ভাগলপুর ।

সকালে হাওড়ায় চেপে কেমন বর্ষাস্নাত মেঘমেদুর ভূমিশ্রীর মধ্যে দিয়ে সারাদিন ট্রেনে করে এলাম! নিউ কর্ড লাইনের দুধারে কেমন সবুজ বর্ষালতেজ গাছপালা, ঝোপ-ঝোপ, ধানের মাঠ। বাড়ীতে বাড়ীতে রান্না চাপিয়েছে—ঘরে ঘরে যে সুখদুঃখের লীলাস্রোত চলছে, কেমন ঘরের পেছনে খড়ের ঘরের কানাচে ছোট ডোবায় পদ্মবনগুলি! বড় বড় পদ্মপাতা-গুলো উল্টে রয়েছে, সাদা সাদা পদ্ম ফুটে—কেমন যেন সব ভাই বোন নীল আকাশের দিকে চেয়ে সারাদিন পদ্মের চাকা তুলে তুলে যায়—এই ছবি মনে আসে। মাঠের ধারের বনে.

দীর্ঘ ছাতিম গাছটা, নীচে আগাছার বনজঙ্গল। বীরভূমের মাঠে মাঠে ছোট ছোট চাষার চালা ঘর, লাউ কুমড়োর লতা উঠেছে রাঙামাটির দেওয়াল বেয়ে, মেয়েছেলেরা গাড়ী দেখছে —সেই যে ছোট ঘরখানা থেকে গাড়ীর শব্দ শুনে মা ও মেয়ে ছুটে (বয়স দেখে মনে হলো) বার হয়ে এলো, আমার এসব কথা আজীবন মনে থাকবে।

। ২রা আগস্ট ১৯২৭ সাল।

বড় বাসার ছাদ ভাসিয়ে কি চমৎকার—যেন ঠিক শরতের রৌদ্র উঠেছে আজ। নীল আকাশের এমন চমৎকার স্বচ্ছ নীল রং অনেকদিন দেখিনি। কি সুন্দর সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘের রাশি হালকা গাড়ীতে উড়ে চলেছে। চেয়ে চেয়ে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই পুরোনো দিনের কথা মনে আসে—সেই আমাদের খড়ের ঘরখানা, অতীতের কত মধুমাখা দিনগুলোর কথা, সকালে বিল, বিলের ধারে সেই বর্ষার মনসা ভাসান শুনতে যাওয়ার উৎসাহ, সেই পেয়ারা খেতে খেতে পূব-মুখো যাওয়া। মা বসে বসে সেলাই করতেন। নীরব দুপুরে বাইরের দাওয়ায় বসে পড়তাম—সেই সব দিনগুলো! সেই বন্ধুদের বাড়ী বিলাতী কার্ডের ছবি দেখে দেশকে প্রথম চিনেছিলাম, কিন্তু কি চমৎকার লাগে। (আবার চব্বিশ বৎসর আগের একটা এমনি দিন থেকে জীবন আরম্ভ হয় না? আমি অমনি লুফে নেবো।)

বহুদূরের নক্ষত্রে, গ্রহে গ্রহে কেমন সব জীবনধারা? সময়ের মাপকাঠিটা তাদেরও কি আমাদের মত ওই রকম ছোট, না বড়? সেখান থেকে এসে আবার শাকড়াটোলার পথটার আসন্ন সন্ধ্যায় আবার ঘোড়া ছুটালাম। কখনো মাঠ, কখনো ঝোপ-ঝাপ, কখনো উলুবন, কখনো শুধু আকাশ, কখনো ভুট্টাক্ষেত—এই রকম থরে থরে নূতন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই উন্মুক্ত গতি বড় ভাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটলে অন্ধকারে ধূসর পাহাড়টাও যেন সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগল—দূর আকাশে শুকতারা উঠেছে, কি জানি কোন্ দূরের জগৎ, সেখানে কি ধরনের জীবনযাত্রা!

। ৩ই আগস্ট ১৯২৭ সাল।

দূরের দিগন্তপ্রসারী মাঠের শ্যামলতা, চারিধারের স্নিগ্ধ শান্তি, পাখীর ডাক, প্রথম শরতের নীল আকাশ এ সবের দিকে চেয়ে মনে হোল কত যুগ যুগের এমন ধারা স্পন্দন যেন এসে মনে পৌছবে—একটা কথা মনে ওঠে—মানুষের অমরত্ব ব্যষ্টি হিসাবে সত্য না সমষ্টি হিসাবে সত্য? হাজার বছর পরে মনুষ্য জাতি কিরকম উন্নততর ধরনের সভ্য হবে, সে প্রশ্ন আমার কাছে যতই কৌতূহলজনক হোক, আমি—এই আমার অত্যন্ত পরিচিত আমিত্বটুকু নিয়ে হাজার বছর পরে কি রকম দাঁড়াবো—এই প্রশ্নটা আরও বেশী কৌতূহলপ্রদ। কে এর উত্তর দেবে?

আজকার এই পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে হঠাৎ মনে যেন ভাসা ভাসা রকমের এই কথা এল যে, মানুষের এই যে সৌন্দর্য্যানুভূতি, এই গভীর ভাবজীবন—ভগবান কি জানেন না এসব পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে কত সময় নেয়? যিনি সুদীর্ঘ যুগ ধরে এই পৃথিবী করেছেন তিনি সময়ের

এ উপযোগিতাটুকু নিশ্চয়ই জানেন। তা হোলেই কি এই দাঁড়ায় না যে মৃত্যুর পরেও ব্যষ্টি-জীবন চলতে থাকবে—থেমে যাবে না।

তাই তো মনে হয়, সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে এই আলো পাখী ফুল আকাশ-বাতাসের মধ্যে দিয়ে কত শত শৈশবের হাসি খেলার মধ্যে দিয়ে কতবার কত আসা যাওয়া।

আজ দুপুরের নরম রোদে বড় বাসায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছেলেবেলাকার কত এরকম দুপুরের কথা মনে হোল—সেই সইমা, দিদিদের ফুলতলা, সইমার বাড়ী রামায়ণ পড়া, সেই হাটবার—সব দিনগুলো একেবারে সেদিনের লুপ্ত স্মৃতি নিয়েই যেন আবার এল—

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বড় বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে—আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐরকম দীন হীনের পর্ণ কুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রাম্যনদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ অপূর্ব্ব সন্ধ্যা মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়—

যে জীবনের এ্যাডভেঞ্চার নেই, উত্থান পতন নেই—সে কি আবার জীবন? সেই পুতু পুতু ধরনের মেয়েলি একঘেয়ে জীবন থেকে ভগবান তুমি আমায় রক্ষা করো।

। ৯ই আগষ্ট ১৯২৭ সাল।

পূর্ব্বদিকের জানালাটা দিয়ে আজ বেশ ঝির ঝির করে হাওয়া বইছে—একটু মুখ তুলে জানালার ওপর গরাদের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেই বটেশ্বর নাথ পাহাড়টা দেখা যায়। খাটের পাশে টাটকা তাজা বেল ফুলের ঝাড়টা টবে বসানো, একরাশ ফোটা-ফুল বিছানায়। শুয়ে এমার্সন পড়তে পড়তে মনে হোল ১৯১৮ সালের এমনি রাত—সেও ১৪ই ভাদ্র। অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এর একটা এঁদো ঘরের গুমট গরমে প্রথম সিট নিয়ে এই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম। কত আনন্দে, কত উৎসাহে—কি অপূর্ব্ব মোহ, সেদিনের রাত্রির ঘুমঘোরে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল—তার পরদিন সকালটিতে আমার সেই নতুন জামাটি গায়ে দিয়ে কত যত্নে কামিয়ে গাড়ী ধরতে ছুটেছিলাম। সে সব দিনের ইতিহাস আর কোথাও লেখা থাকবে না—নেইও। শুধু এক তরুণ মনে তা আঁকা আছে—আর পঞ্চাশ বছর পরে, কি আর পাঁচশো বছর পরে—সেসব দিনের অপূর্ব্ব পুলকের কাহিনী শতাব্দীর পূর্ব্বের প্রথম বসন্তের পুষ্পস্তবকের ন্যায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তবু যেন মনে থাকে একদিন সে অমৃতধারা বাস্তব জগতের ছিল।

তাই যখন মিউজিয়মে মমি দেখি তখন সেসব চূর্ণায়মান সাদা হাড়টির বুকে, এই পৃথিবীর নীল আকাশ, রাগরক্ত সন্ধ্যা, বাতাস, আলো, কোনো সুশ্রী শিশুর মূর্ত্তি, তরুণীর চোখের দীপ্তি, কোন্ নিভৃত অপরাহ্নের অজানা ফুলের সুবাস— এই সব একদিন যে আনন্দের বাণ ছুটিয়েছিল—তিন হাজার বছর অতীতের যে লুপ্ত হাসিগান, মনের শান্তি,—রহদিন লুপ্ত সেসব জ্যোৎস্নারাত্রি, প্রাসাদশিখরে পদচারণশীল সম্রাট থট মোসিসের চক্ষুকে মুগ্ধ করেছিল—মরুভূমির দূরপ্রান্তলীন সে সব সান্ধ্যসূর্য্যের রক্তচ্ছটা, সে ঊর্দ্ধমুখ উষ্ট্রশ্রেণী, খর্জুর কুঞ্জের শ্যামলতা আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখনও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, ঐ জানালার ছোট্ট হারাকরা

ঝোপে খঞ্জন পাখী এমনি নাচত—সে মাধবী রাত্রি, সে নাচ আজকালকার কালে কারুর জানা না থাকলেও একদিন তারা সত্য সত্যই বজায় ছিল।

এমনি আমরাও চলে যাবো। কত হাজার বছর পরে আমাদের হাড় মাটির তলা থেকে হয়তো প্রস্তরীভূত অবস্থায় বেরুবে। তখনকার সে হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ যেন না ভাবে এগুলো বুঝি চিরকাল এইরকম দাঁত বারকরা সাদা হাড়ই ছিল—তাঁরা যেন ভুলে না যায়, এককালে সেগুলোও তাদের মতই এই বিশ্বের আলো জ্যোৎস্নার সকাল সন্ধ্যার অংশীদার ছিল। তাদের বীণার যে সুরগুচ্ছ বেজে বেজে নীরব হয়ে গিয়েছে তাদের বুকে অদৃশ্য কাল-মুহূর্ত্তগুলিতে তাদের লিখন আছে। হে আমাদের স্নেহ-ভাজন উত্তর-পুরুষগণ, সে কথা মনে রেখো।

কাল এমনি কেটে যায়, বৎসরে বৎসরে ঝোপেঝাপে ফুলদল এমনি ফোটে আবার ঝরে পড়ে, একদল পাখী গান শেষ ক'রে মরে-হেজে যায়। তাদের ছানারা মানুষ হয়ে আবার গান ধরে—গান বন্ধ হয় না তা বলে, ফুলফোটা বন্ধ থাকে না তা বলে।

শুধু আমাদের পৃথিবীতে নয়, অনন্ত আকাশের অসীম গ্রহতারার মধ্যে হয়ত কত লুকানো অদৃশ্য জগৎ আছে। তাদের মধ্যের জীবেদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। উচ্চতর বিবর্ত্তনের প্রাণী হলেও জন্মমৃত্যু আছেই আছে। এতবড় নাক্ষত্রিক বিশ্বের যখন আরম্ভ ও শেষ আছে তখন প্রাণীর কথা তুচ্ছ।

অনন্তকালে মুহূর্ত্তগুলি এই রকম শত শত দৃশ্য অদৃশ্য বিশ্বের শত শত প্রাণীর বুকের কথায় ভরা, কত হাসি ব্যথার গানে সুরময়।

অনন্ত দেবের বাঁশির তান অনন্ত যুগমুহূর্ত্ত ছেয়ে ভেসে আসছে—কান পেতে শুনলেই শোনা যাবে। শুধু আনন্দ দেওয়াই তার লক্ষ্য। এক পলকে জীবনকে চিনে নাও—দুঃখের পথ বেয়ে যেতে হবে বটে কিন্তু সামনে আনন্দধাম—দুঃখনদীর ওপারে।

উঃ! কি সত্যি কথাই বেরিয়েছে উপনিষদের ঋষির মুখ দিয়ে—

আনন্দেন খলু ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জীবন্তি···

কিন্তু এই সকল আবোল তাবোল ভাবনার মধ্যে এটুকু ভুলে গেলে চলবে না যে ১৯১৮ সালে এতক্ষণ অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিংএ আলুভাতে ভাত খেয়ে মির্জ্জাপুরের বেনের দোকানটা থেকে একপয়সার চা-খড়ি কিনে কাগজে মুড়ে পকেটে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে শেয়ালদায় গাড়ী চেপেছি—হয়তো গাড়ী ছেড়েছেও।

তারপর সারাদিন আর একথা মনে ছিল না—বিকেলের দিকে খুব ঘোড়া ছুটিয়ে বর্ষাস্নাত আকাশের তলে মাঠে মাঠে বেড়ালাম তখনও মনে হয় নি। এই এখন আবার রাত আটটার পর জানালার ধারে বসে লিখতে লিখতে টবের গাছটার ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধে সে কথা মনে পড়ল।

এখন সেই বাঁশবনে ঘেরা বাড়ীতে অন্ধকার রাত্রি, হয়ত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মাঝে আনন্দের কাহিনী দেখব। কতকাল হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে ভাবলাম আজ

যদি যাই ? সেই জামাটা প'রে ? অন্ধকার রাত্রে ভাঙা দরজার ইটগুলো পেরিয়ে পোড়ো ভিটাতে বর্ষাসতেজ সেওড়া ভাঁটবন। বনচালতা গাছ—বড় চারাটা। বাঁশঝাড় ঝুঁইয়ে পড়েছে—বনবনে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পিছনের গভীর বাঁশবনে শিয়াল ডাকছে। নয় বছর আগেকার সে রাতটার আনন্দের ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে ? ঐ পোড়ো ভিটার অন্ধকারে, ঘুপসি বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দে, গভীর রাত্রিতে গভীর বনের দিকে হুতুম পেঁচার ডাকে।

এ সব রাতে একমনে ভাবতে ভাবতে শুধু এর অসীম রহস্যভরা জীবন বড় চোখে পড়ে—এ কোথায় এসেছি ? কোথায় চলেছি ? সংসারের কল-কোলাহলে যা কখনো মনেও ওঠে না, এ সব নীরব অন্ধকার রাত্রিতে জানালার ধারে বসে গুনগুন করে কোন গানের একটা লাইন গাইতে গাইতে একদণ্ডে সেটা বড় ধরা দেয়। তাই সকল জ্ঞানের পুঁথিতেই নির্জনতার পরিপূর্ণ অবসরভরা। নির্জনতার বড় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দূরের ঐ তারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় এ রকম হাসি আশাভরা জীবনস্রোত হয়তো ওখানেও চলেছে—কে জানে ? বিশাল Globular Cluster-এর দেশ, বড় বড় Star Clouds, ছায়াপথ, কি অজানা বিরাটত্ব, অসীমতা ভরা এ বিশ্বে জন্মেছি। Sagittarius অঞ্চলের নক্ষত্রঠাসা আকাশটার কথা মনে হলেই মন শিউরে ওঠে—পুলকে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

তাই এই নির্জন রাত্রিতে মনে হয় সুখ আছে এক জিনিসে। কি সে ? মনকে প্রসারিত ক'রে এই অনন্তের অসীমতার সঙ্গে এক ক'রে দেবার চেষ্টা করো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই ছোট্ট একরত্তি পৃথিবীটার মত শত শত লক্ষ লক্ষ অজানা জগৎ—তার মধ্যের অজানা প্রাণীদের সে সব কত অজানা অদৃষ্ট ধরনের জীবনযাত্রা, কত সুখদুঃখ, কত আনন্দ। সে সব কি অজানা উচ্ছ্বাস—তোমার মন অসীমতার রহস্যে ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্ব ভেসে যাবে অনন্তের অমৃতের জোয়ারে।

মনকে সে ভাবে যে তৈরী করেছে, জগৎ তার প্রিয় সাথী—চিরদিনের বন্ধু।

"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন"

কিন্তু ক'জনে চিনতে চায় জীবনকে এ ভাবে ? সকলেই যে চোখ বুজেই থাকে—খোলে না।

অনন্ত যে তোমার চারধারে প্রসারিত, তোমার পায়ের তলার তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে, তোমার আঙিনার পাখীর ডাকে, সন্ধ্যার ঝিঁঝির সুরে, নৈশপাখীর পাখার আওয়াজে—কিন্তু আমি শুনবো না, আমি দেখবো না, আমি বুজে আছি—কার এত স্পর্দ্ধা আমার চোখ খোলে ?

। ২৮শে আগষ্ট ১৯২৭, আজমাবাদ কাছারী।

আজ আমি ও রাসবিহারী ঘোড়া করে একটুখানি বেতেই ভারী বৃষ্টি এল। রাসবিহারী সিং বললে নিকটে এক রাজপুতের বাংলো আছে চলুন।—ঘোড়া ছুটিয়ে দুজনে সেই বাড়ী গিয়ে উঠলাম। তার নাম সহদেব সিং। বাড়ী মজঃফরপুর জেলা। রাশি রাশি ফসল ঘরটার মধ্যে গাদা করা, অড়র তুট্টা ঝুলছে। বললে, বীজ রেখে দিয়েছে। বৃষ্টি থামলে দুজনে ফিরে চলে এলাম।

। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সাল।

আজ সকালে মধু মণ্ডলের ভিহির প্রাচীন বলাইল গাছটার ছায়ায় ঘোড়া দাঁড়িয়ে জমি মলালাম। বৈকালে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ভীমদাসটোলার নীচেকার আলটায় অত্যন্ত জল বেড়েছে—ঘোড়ার এক বুক জল হ'ল পার হবার সময়। ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব্ব নীল রং দেখাচ্ছে! ডান দিকে লাল রংয়ের অস্ত-আকাশ—উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলেভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্ত মেঘ, নীল পাহাড়, ঢালু দূর্ব্বাঘাসের মাঠ, ধুতুরা ফুলের ঝোপ, উলুখড়ের ঝোপ, বড় পাকুড় গাছটার তলায় হলুদ-রাঙা, জরদা রংএর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে—বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, স্নিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্য বায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেল।

দূর প্রান্তে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম বহুদূরের আমাদের বনজঙ্গলে ভরা অন্ধকার ভিটা, বাঁশবনের কথা। এই সুন্দর অপরূপ শরৎ সন্ধ্যায় গ্রামের লতাপাতা থেকে ওঠা ভরপুর কটুতিক্ত গন্ধটার কথা, সেই বাঁশঝাড়ে শালিখ-ডাকা বাংলাদেশের মায়া সন্ধ্যার কথা, তরুণীরা মাটির প্রদীপ হাতে গৃহ-আঙিনায় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দেখাচ্ছে, ঘরে ঘরে রাত্রির আবাহন—মঙ্গলশঙ্খের রব।

এসময়ে চাঁপাপুকুরের পুকুর ঘাটে, তাদের তেতলার ঘরটায় চট্টগ্রামের দূর প্রান্তের সেই ঘরটাতে, বারিদপুরের বাড়ীটায়, বালকাটির মণির বাড়ীতে না জানি কি হচ্ছে!

মণি বড় হয়েছে—বোধ হয় বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দেবতার—যিনি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, যুগান্তের পর্ব্বতশিখরে নীরব চিন্তামগ্ন। কত শত জন্মের স্মৃতি, হাজার বৎসরের হাসিকান্নার কাহিনী, নির্জ্জন গ্রহের নির্জ্জন পর্ব্বতে, যুগ যুগ অমর তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে—ধীর, নির্জ্জন, নীরব ধ্যান শুধু অতীতের। সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি, সকলের সীমা পায়নি গ্রহে, শত প্রেম কাহিনীর জালে জালে জড়ানো তরুণ সুন্দর মুক্ত তীর। নিস্তব্ধ অন্ধরাতে বসে বসে শুধু সে একমনে অপরূপ জীবন রহস্য ভাবে—ভাবে—

চারধারে বিশ্বের আঁধার ঘিরে আসে, মাথার ওপরে তারা ওঠে, কোন্ সুদূর লোকের পার থেকে অনন্ত অজানার সুর যেন কানে বাজে—একটা ছবি মনে আসে সেটা নীচে আঁকলাম,

ছবিটা আমার মনে আছে, কিন্তু আঁকাটা এখানে হবে না,, কারণ আঁকতে আমি জানিনে, তবুও এইটা দেখে মনের ছবিটা মনে ফিরে আসবে।

। ৬ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ।

সকালে আজ কিরকম করে বৃষ্টিটা এল! কাটারিয়ার দিক থেকে ভয়ানক মেঘ করে এল। ঘন কালো মেঘের রাশ ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের মুখে হু হু উড়ে আসতে লাগলো। মাটিতে জল কি মিশ কালো ছায়াটা ফেললে! বড় অশথ গাছের ধারের বন্যার জলটা যে কালো সোনার রং হয়ে উঠল। বকের দল ভয়ে ভয়ে ওপর থেকে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মুখে উড়ে উড়ে এপারে আসতে লাগল। কাকের দল কা কা করে ডাকতে ডাকতে দিশাহারা ভাবে উড়ে আসতে লাগল। তারপর এল ভীষণ ঝড়। শোঁ শোঁ শব্দে ভীষণ বেগে গাছপালা লুটিয়ে নুইয়ে ফেলে মেঘলোকে ঘুরতে ঘুরতে বটেশ্বরের পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলল। কোথায় কোন সমুদ্রের জলের রাশি কি কৌশলে মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন! তারপর এল বৃষ্টি।

বৈকালে ঘোড়া করে বার হয়ে সহদেবটোলার পথটা ধরলাম। দুধারে কেমন বাংলাদেশের মত কাঁটার ঝোপ, তেলাকুচা লতায় পাকা টুকটুকে সিঁদুরের মত রং তেলাকুচা ফল দুলছে। পড়কলমীর নোলক ফুটে আছে, বনসিজির জঙ্গল, আলোকলতার জলে মটর লতা মিশ্র বনদৃশ্যকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্ত আস্তে আস্তে ঘোড়া চলতে লাগল। তারপরে সুখটিয়ার জঙ্গ কুলের জঙ্গল দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে দেখি সামনে কালোয়ার চকহাট। সেখান থেকে জঙ্গল বেয়ে একহাঁটু জলকাদা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে একেবারে গেলাম কলবলিয়ার ধারে। কাশবনটার কাছে থেকেই দেখলাম ফিকে হলুদরংয়ের গোল সূর্য্যটা মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কলবলিয়ার ওপরে তিরাশী সেকেণ্ড যেন অপেক্ষা করলো, তার পরেই সে তার তপ্ত মুখখানা লুকিয়ে ফেলতে আর দেরী করলো না।

আবার অন্ধকারে ঘোড়া ছাড়লাম। কুলের জঙ্গল দিয়ে কাশবনের ভেতর দিয়ে,,জলকাদা ভেঙে ঘোড়া এসে উঠল গ্রান্ট সাহেবের জমির অশথ-গাছটার কাছে। সেখানে পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। একে মেঘান্ধকার, তাতে কৃষ্ণাপক্ষী—ঘোড়াও পথ দেখে না, আমিও না। পথে একজায়গায় অনেকটা জল পার হতে হোল ঘোড়াটাকে। অন্ধকারে অন্ধকারে গোমজা ধানের ক্ষেতের মধ্যেকার সুঁড়ি পথ দিয়ে চলে আসতে লাগল। চারধারে লোক নেই, জন নেই, আকাশে একটা তারা নেই। সামনে পড়লো আবার জল, সেই জলটায় আবার কুমীরের উপদ্রব আছে। যাই হোক, ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে জল পার করিয়ে মকাই ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে একপ্রহর রাত্রে কাছারীতে পৌছলাম!

। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সাল।

বিকালের দিকে অনেক দিন পরে বেড়াতে গিয়ে যতীনবাবুর দোকানে কথা বলছি—

হেমন্তবাবু টেনে নিয়ে গেলো ম্যাচ্ দেখতে, সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হোল। হেমন্তবাবু উকীল, যতীশবাবু ইত্যাদি। ওখান থেকে ফিরে দুজনে গেলাম হেমেনের কাছে। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর ক্লাবে গেলাম। বাসায় ফিরে অনেক রাত পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাভরা ছাদে বসে রইলাম একা। শুতে যেতে আর ইচ্ছা করে না। ইচ্ছে করে শুধুই বসে বসে এই দীর্ঘ নির্জ্জন রাত্রি ভাবতে আর নানা রকম কল্পনা করে কাটাতে।

আনমনে রচি বসি তন্দ্রাদীর্ঘ দিবসের অলস স্বপন—ভাটপাড়ার সেই বধূ দুটি, যাঁরা বিজয়ার দিনে আমাকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আগ্রহ করে ডেকে জলখাবার খাইয়েছিলেন—আজ হঠাৎ তাঁদের কথা মনে পড়ল। সত্যকারের স্নেহ কি ভালবাসার ঘটনা বিফলে যায় না—তাঁদের সে অনাবিল স্নেহের ফল এই হয়েছে যে তাঁরা আমার মনে একদিনের জীবনপুলকের সঙ্গিনীরূপে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। আজ এই প্রায় তিন বৎসর পরে এই দূর দেশে যখনই ভাবলাম তাঁদের কথা, তখনই আনন্দ পেলাম।

মোঁপাসার সেই পলাতকা লক্ষীছাড়া খুড়োর গল্পটা মনে এল—সেই জাহাজের ডেকে সেই ছোট ছেলেটি যখন তার হতভাগ্য নির্ব্বাসিত খুড়োকে দেখলে তখন তার বালকহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত অথচ গোপন সহানুভূতিটুকু!

তাই মনে হোল সাহিত্যে এই ভাবজীবন ফুটানোর প্রচেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাবজীবন খুব গভীর নয়—অনেকের মন এমন ভাবে তৈরী যা কিনা কোন বিষয়েই গভীরত্বের দিকে যাবার উপযোগী নয়। অথচ এই গভীরত্বের অভাবে জীবন বড় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনের এ দৈন্য অর্থে পূরণ হয় না, ঐশ্বর্য্যে নয়, সাংসারিক বা বৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ সব অপূর্ব্ব অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ধারার সঙ্গে, উপযুক্ত গড়ে ওঠা মনের সঙ্গে।

এই মোঁপাসার মত লোকেরা আসেন আমাদের এই বড় অভাবটা পূর্ণ করতে। তাঁদের ভাগ্যের লিখন এই, জীবনের উদ্দেশ্য এই। নিজের গভীর ভাবজীবনের গোপন অনুভূতির কাহিনী তাঁরা লিখে রেখে যান উত্তরকালের বংশধরদের জন্যে। হতভাগ্য দীনহীন খুড়োর দৈন্যের করুণ দিকটা একদিন কোন বিস্তৃত তুষারবর্ষী রাত্রে আগুনের ধুঁওের আরাম-কেদারায় বসে মোঁপাসার মনে হয় তাঁর চোখে জল এনেছিল, আজ সর্ব্বদেশের নরনারীর চোখে জল আনছে—আজ কতকাল পরে সেই কল্পনাদৃষ্ট বৃদ্ধ ও তার দীন বাক্সিকর ছিন্ন বেশ, কয়লা কালিঝুলি-মাখা হাত-পা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যুগে তারা জন্মেছে, তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। এই বর্ত্তমান যুগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা এই সময়ের একটা কাহিনী লিখবেন। অন্তরের এক মুহূর্ত্তের কথা, তবুও জগতের ভাণ্ডারে থেকে যাবে। এই যুগের সেক্সপীয়র হোমার বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথ তাজমহল Great War এই কলকারখানা, সামাজিক বিপ্লব, এই বিভূতি, জহু, ভারতে স্বরাজ নিয়ে মহাহবে, বাঙ্গলার এই ম্যালেরিয়া, বার্ণার্ড শ' বা ওয়েল্স্ ইবানেজ, মেটারলিঙ্কের

প্রতিভা, আমেরিকার ধনী ভ্রমণকারীদের এই পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাওয়া, জাপানের ভূকম্পন—এই সবশুদ্ধ জড়িয়ে এই যুগটার মানাদ্বিকের কাহিনী, ইতিহাসে লেখা হবে। প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ, ছেলেমেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়। যত অজ্ঞাতনামা লেখকই কেন হোক না, তার সত্যিকার অনুভূতি কখনো কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না—পড়বেই সেটাকে সকলে। সকলেই খেলার তাঁবুর বাহির দুয়ারে অপেক্ষা করছে—রহস্যভরা খেলাটা সকলের ভাল লাগে, কিন্তু ভাল বুঝতে পারে না—তাঁবুর বাইরে এলেই পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান ও তুলনা হয়—'মশাই কিরকম দেখলেন?' প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে—প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতূহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে সৃষ্ট ভর করে—যেমন সনেটের পিছনে তেমনি হ্যামলেটের পিছনে সেক্সপীয়ার গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েছেন।

তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাবো। আমি জগৎকে কি রকম দেখলাম? আমার শৈশব কি রকম কাটল? কোন্ কোন্ সাথীকে আমি আনন্দ মুহূর্তে দেখলাম? কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃতরসে স্নিগ্ধ করলে? গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার করে লেখার জালে তাদের বেঁধে যাবো—সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা তাদের কাহিনী জানবে। আর হয়তো এ পথে আসবে না, হয়তো আবার যুগযুগান্ত পরে ফিরে আসবো—কে জানে? বহুকাল পৃথিবীর সন্তানগণের মনে এ লেখা ঐ ইতিহাস কৌতূহল জাগাবে—তাজমহলের ধ্বংসস্তূপ যেন মাহেঞ্জোদরোর মত, গভীর মাটির রাশির মধ্যে যাকে খুঁড়ে বার করতে হবে—Great War-এর কথা মহাভারতের কি হোমারিক যুদ্ধের কাহিনীর মত প্রাচীন অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে—কলকাতা শহরটা বঙ্গোপসাগরের তলায় ঢুকে যাবে—সেই সুদূর অতীতের নতুন যুগের নতুন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ এ সব কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। বলবে—আরে দেখ, সেই সে কালেও লোকে এমনি ভাবে বিয়ে করতে যেতো! এই রকম জমি নিয়ে মারামারি করত, মেয়ের বিদায়ের সময় কাঁদতো! ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে তারা।

যুগযুগান্তের শাসনে জীবনদেবতা বসে বসে শুধু হাসবেন।

। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ।

আজ অনেকদিন পরে পরিচিত সেই বনটার ধারে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই। পশ্চিম আকাশে অপূর্ব্ব রাঙা মেঘের পাহাড়, সমুদ্র, কত বিচিত্র মহাদেশের

আবছায়া। সামনের তালবনগুলো অন্ধকারে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! চারধারে একটা গভীরতা, অপরূপ শান্তি, একটা দূরবিলম্বিত ইঙ্গিত।

এই স্থানটা কি জানি আমার কেন এত ভাল লাগে! যখনই আমি এখানে সারাদিন পরে আসি তখনই আমার মনে হয় আমি সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে গিয়েছি। এই গাছপালা, মটরলতা, পাখীর গান, সন্ধ্যাকাশে বর্ণের ইন্দ্রজাল—এ অন্য জগৎ—আমি সেই জগতে ডুবে থাকতে চাই—সেটা আমারই কল্পনায় গড়া আমারই নিজস্ব জগৎ, আমার চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা, স্মৃতি সব উপকরণে গড়া।

নীচের জলাটা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলা—সেখানে অধুনালুপ্ত হিংস্র অতিকায় সরীসৃপ বেড়াতো—সামনের অন্ধকার বনগুলা কয়লার যুগের আদিম অরণ্যানী—আমি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দেখি কত রহস্য, কত অপরূপ পরিবর্ত্তনের কাহিনী, কত কার ইতিহাস ওতে আঁকা, কত যুগযুগের প্রাণধারার সঙ্গীত।

বড় বাসার ছাদে বসে বসে ছেলেবেলার দুই একটা বড় ঘটনার কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এই রকম করে বলা যেতে পারে—শৈশব তো সকলেরই সয়—ওতে ভাববার কি আছে! এ আর নতুন কথা কি? তা নয়। এই ভেবে দেখাটাই আসল। "না ভাবলে ভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে পড়ে। জগতে যে এত সৌন্দর্য্য তার সার্থকতা তখনি যখন মানুষ তাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে। নইলে আকাশের ইথারে তো চব্বিশঘণ্টা নানা ভাবের স্পন্দন চলছে, কিন্তু যে বিশিষ্ট ধরনের স্পন্দনের ঢেউএর নাম সঙ্গীত তা এত আনন্দদায়ক হ'ল কেন? দিনের পর দিন সূর্য্য অস্ত যায়, পাখী গান করে, খোকাখুকিরা হাসে—যদি কেউ না দেখতো, না শুনতো—তবে মানুষের দৈনন্দিন বা মানসিক জীবনে তাদের সার্থকতা কিসের থাকতো? কিন্তু মানুষের মনের সঙ্গে যখন এদের যোগ হয় তখনই এদেরও সার্থকতা, মনেরও সার্থকতা। মনের সার্থকতা যে এই বিপুল সৃষ্টির আনন্দকে সে ভোগ করে নিজেও বড় হয়ে উঠল—আত্মাকে আর এক ধাপ উঠিয়ে দিলে—এদের সার্থকতা এই যে এরা সে উন্নতির আনন্দের কারণ হোল।

তাই আমাদের শাস্ত্রেও যোগকে অত বড় করে গিয়েছে। এই বিশ্বের অনন্ত আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগই মানবজীবনের লক্ষ্য। সে কি রকম? মানুষ সাধারণত ছোট হয়ে থাকে—হিংসাদ্বেষ, অর্থচিন্তা তার কারণ। অনন্ত অধিকারের বাণী সে শোনেনি বলেই সে নিজেকে মনে করে ছোট—বাইরের আলো পায় না বলেই এই দুর্দ্দশা। এই ভূপতিত, ধূলি-লুণ্ঠিত আত্মাকে উঁচুতে ওঠাতে পা.. তার মন। মন মুদিখানার দোকান থেকে বার হয়ে পোদ্দারী আড্ডা খোলে এসে। বাইরের অনন্ত নক্ষত্র-জগতের দিকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চোখ চেয়ে থাকুক—কান পেতে নদীর মর্ম্মর, পাখীর সুর, রন্ধ্র থেকে উপচীয়মান সঙ্গীত শুনুক—এই হোল যোগ। সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে দিক অনন্তের দিকে—এই হোল যোগ! আর সে ছোট থাকবে না—বড় হয়ে যাবে। ঐ অনন্ত শূন্যের উত্তরাধিকারী

সে যে নিজে একথা বুঝবে—কি অনন্ত আনন্দ তার জন্যে অপেক্ষা করছে তা বুঝবে—অনন্তের দিকে বিসর্পিত তার আত্মাই তখন তাকে বড় করে তুলবে।

এই অবস্থা ঘটেছিল এক সুদূর অতীতে সেই চিন্তাশীল কবির—যিনি জোর গলায় জ্ঞানের চিন্তার স্পর্দ্ধায় বলেছিলেন—

পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—তিনি বুঝেছিলেন, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। মৃত্যুকে জয় করে বড় হতে গেলে এই অন্ধকারের পরপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ যাঁকে মহর্ষি নিজে বুঝেছেন এবং বুঝে এটুকুও বুঝেছেন যে তাঁকে না বুঝলে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে ওঠবার আর পথ নাই—তাঁকেই জানতে হবে।

যে অমৃত প্রভাতে আদিম ভারতেব কোন্ তপোবনে এ মহাবাণীর জন্ম হয়েছিল, সে তপোবনের, সে প্রভাতের বন্দনা করি।

সত্যই তো। অনন্ত বিশ্বকে মানলেই তো মানুষ দেবতা হয়েওঠে, তার ওপর এই বিশ্বজ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার ওপারে তার কর্ত্তব্যজ্ঞান যে লাভ করেছে সে অতিমানব—এ বিষয়ে ভুল নেই।

অতিমানব সেই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে।

মনোরাজ্যে মানুষের অতি অমূল্য অধিকার। একে খুব কম লোকেই জানে, খুব কমই এর সঙ্গে পরিচিত। ভাববার সময় মানুষে পায় না। অথচ এই মনই মানুষের অন্ধকারে পরপাবেব জ্যোতির্ময় অনন্ত জীবনের বেলাভূমিতে যাবার একমাত্র অদৃশ্য পুষ্পক বথ।

তোমাকে যে দেশের জঙ্গল কাটতে হবে সেটা ঠিকই, বুভুক্ষিতকে অন্ন দিতে হবে ঠিকই, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে চিন্তার দ্বারা তুমি মানবজাতিকে যে আনন্দের স্তরে ওঠাতে পারো সাময়িক একমুঠো অন্নদানে সে সাহায্য হবে না। নিজে বড় হও তারপর সেই আনন্দের বার্ত্তা পরকে শোনাও—আশার বাণীতে তাদের জরামরণ ঘুচে যাবে।

ভগবান তাঁর অনন্ত জীবনের আনন্দ সকলকে বিলিয়ে দিতে চান এই জন্যেই যে তাঁর মত উচ্চ জীবের কল্পনা, ধ্যান, বুদ্ধি সকলের হয় এই তিনি চান। তার উপায়ও তিনি করেছেন, তবুও যদি ছোট হয়ে থাকা যায় তবে কে কি করবে?

সংসারের কলকোলাহলের ঊর্দ্ধে নিত্যকালের মশালচীদের যাবার পথ, তোমার ব্যাকুলতা দেখে তোমার মশাল তাঁরা জেলে দেবেন, নয়তো অনেকের মত তোমার মশাল এমনিই থেকে যাবে।

"Let us not fag in paltry works which serve one not and lag alone. Let us not lie and steal. No God will help. We shall find all their terms going the other way—Charle's Wain, Great Bear, Orion, Leo, Hercules, every God will leave us. Work rather for these interests which the divinities honour and promote—justice, love, freedom, knowledge, utility."

। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ।

জ্বরজ্বরের রক্ত পেয়ে বসেছিল, তাই আজ বেরিয়ে পড়লাম আমি ও অম্বিকা। সকালে হেমন্তবাবু এসে প্রথম মাইল পোস্ট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। চারধারে সবুজ ধানক্ষেত, জলাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে, দূরে তালগাছের সারি ও নীল পাহাড় শ্রেণীর সীমারেখা। বার মাইল চলে এসে রামবাবুর বাড়ী রয়ে গেলাম। সেখানকার অভ্যর্থনা, পান, করকার সিরাপ দিয়ে চাটনি কখনো ভুলবো না। রামবাবুর বাগানটিতে ছায়াভরা পেঁপে গাছ ফুলগাছ বড় ভাল লাগল। সেখান থেকে বার হয়ে বৈকালের দিকে কি সুন্দর দৃশ্য! খড়কপুর পাহাড়ের ওপর সূর্য্য অস্ত গেল। পাহাড়ের কি নীল রং, ধানের রং কি সবুজ! সন্ধ্যার সময় এসে রজৌন থানায় পৌঁছে মুসলমান দারোগাটির আতিথ্য গ্রহণ করলাম। বেশ ভাল লোক—আজকাল এই হিন্দু-মুসলমানে বিবাদের দিনে এরূপ আতিথ্য দেখলে বড় আনন্দ হয়—মানুষের আত্মা সব সময়ে যেন বাইরের কুয়াশাতে দিশাহারা হয়ে থাকে না—বরং যখন আপনা-আপনি থাকে তখনই সে মুক্ত, অনন্ত সুখী থাকে—এর আমি অনেক প্রমাণ আগে পেয়েছি, এখানেও পেলাম।

এই থানা, সামনের মৃণাল-ফোটা বৃহৎ পুকুরটা, এই কি সুন্দর হাওয়া—সন্ধ্যার পর এই থানার আয়না বসানো টেবিলটার ধারে বসে লিখছি—এ সব যেন কোথায় এসে পড়েছি!—সেই—সেই সময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মত যুদ্ধ-যাত্রা মনে পড়ে—সেই মার তালের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া—বাবার দেশভ্রমণের বাতিক—সেই বড় দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো—কত পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনে নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে এমন সময়ে মা মারা যাওয়ার দিনটি থেকে খুব নিয়ে চলছে—সেই কিশোরীবাবুর বাড়ী, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।

। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রজৌন থানা।

কাল রজৌন থানা থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত খারাপ রাস্তায় মাঠের বাঁকা আলপথে এসে পৌঁছুনো গেল। চানন নদীর কূল থেকে কি সুন্দর দৃশ্যটা! গুপিবাবুর বাড়ী সেদিনটা থেকে আজ ভোর পাঁচটাতে জামদহের পথে রওনা হলাম। চাননের বাঁধ থেকে দূরে পূবদিকে তালের সারির আড়াল দিয়ে সিঁদুর রংএর অরুণ আজ দেখা দিচ্ছে—আরও দূরে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়—এধারে কাকোয়ারা ওধারে বংশীর পাহাড়। পথে কেবলই দূরে দূরে পাহাড়, উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো লাল কাঁকরের পথ—চাননের জল স্থানে স্থানে জমে আছে—দূরে দূরে তালের সারি, শাল গাছের বন—রাঙা বালির ও,.র দিয়ে শীর্ণকায় নির্ম্মল নদী বয়ে যাচ্ছে—সাঁওতাল পরগণার ছায়াময়ী অতি পরিচিত অথচ প্রতিবারেই নতুন-মনে-হওয়া ভূমিশ্রী।

সন্ধ্যা সাতটা। ডাকবাংলোর টেবিলে নির্জ্জনে বসে লিখছি। নীচের চানন নদী ওপরের পাহাড় অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না—সামনের আম বনের মাথার ওপর তারা উঠেছে—লছমীপুরের ম্যানেজার মণীন্দ্র বাবু ও-অংশে কাছারী করছেন—প্রজারা কথাবার্ত্তা বলছে—

এই সুন্দর অপরিচয়ের মধ্যে বসে মনে হোল কতদিন আগেকার গানটা—'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন গগন অন্ধকার'—ঠিক এই সময়—কলকাতার বোর্ডিংটা। আজ দ্বিতীয়া—সামনেই পূজা আসছে ষোলই আশ্বিন। সেবার পূজা ছিল চব্বিশে। সেই সময়কার বুয়-কালের সে জীবনটার সঙ্গে আজকার এই নির্জ্জন জীবনের মধ্যকার এই শালবন বেষ্টিত পাহাড়, নদীতীরের ডাকবাংলা, এই নিভৃত সন্ধ্যা, এই সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবনটা মনে পড়ে। আমি এই রকম অতীতের ও বর্ত্তমানের এই রকম বিভিন্ন জীবনযাত্রার কথা ভাবতে বড় ভালবাসি। বড় ভাল লাগে, কোথায় যেন একেবারে ডুবে যাই। আজ সকালে মহিয়ারডি, লড়কী কয়লা প্রভৃতি অদ্ভুত রকমের গ্রামগুলো ও অপূর্ব্ব পথের দৃশ্য, অম্বিকাবাবুর ললিত ডেপুটিকে প্রশংসার কথা অনেক দিন মনে থাকবে। কাল সকালে লছমীপুর যাবার প্রস্তাব হয়েছে—দেখা যাক। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, দেওঘরে অবশ্যই পৌছে যাবো। ডাকবাংলায় জলের বড় অভাব —পূরণ ছুটাছুটি করছে। নাগেশর প্রসাদ, লছমী মুন্সী দেওয়ান শ্রীধরবাবুর নামে পত্র নিয়ে আজ সন্ধ্যায় আসে, ঘোড়ায় করে লছমীপুর চলে গেল। পায়ে এমন বড় ফোস্কা হয়েছে যে ওপথে বড় চড়াই-উৎরাই শুনে একটু ভাবছি। জয়পুর পর্য্যন্ত মিশিরজী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হোল।

আমি এই সব তুচ্ছ—খুঁটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবশুদ্ধ দিনটাকে ও তার আব-হাওয়াটাকে অনেক দিন পরে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।

। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, জামদহ ডাকবাংলা।

জামদহ ডাকবাংলা থেকে বেরিয়ে লছমীপুরের পথে কি সুন্দর দৃশ্যটা দেখলাম—চাননের ওপারে পাহাড়ের মাথার ওপর প্রভাতের অরুণ-আভা, উঁচুনীচু পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে মধ্যে ক্ষীণস্রোতা নদী—শালবন, বড় বড় পাথরের টিলা। গভীর উপত্যকার মধ্যে শালবন-বেষ্টিত লছমীপুর গড়ে এসে পৌছানো গেল বেলা আটটাতে। দেওয়ান শ্রীধরবাবুকে কালিখাড়িতে খবর দেওয়া গেল। লছমীপুর প্রাসাদে পৌছে দেওয়ানখানায় বসে রইলাম। তার আগেই কালীপদ চক্রবর্ত্তী গুরুঠাকুরের ওখানে চা খাওয়া গেল। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে দুর্গম জঙ্গলের পথে হরপুর রওনা হলাম। উচ্চ মালভূমির উপর গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ। দুধারে খদির, হরিতকী, বয়েড়া, বাঁশ, আবলুশ, আমলকী, কৎবেল, বেলের জঙ্গল। প্রথম জঙ্গল পার হয়ে দ্বিতীয় জঙ্গলটা শুধু ঘন আবলুশ ও কেঁদ জঙ্গল। এত বড় বড় পাথর যে জুতা ছিঁড়ে বুঝি পাথর পায়ে ফোটে। অম্বিকাবাবু ভারী বিরক্ত হোল—এত গভীর বন দিয়ে কেন আসা? বনে ভালুক, বাঘ ও হরিণ প্রচুর। জঙ্গল শেষ করে রাঙা মাটির উঁচু-নীচু পথ। শালের ও মহুয়ার বন পার হয়ে হয়ে অবশেষে জয়পুরের ডাকবাংলায় পৌছানো গেল। ওস্তাজি লছমীপুরের কাছারী থেকে নিয়ে এসে আহার ও রন্ধনের আয়োজন করলে।

বেশ কাটল আজ সারাদিনটা। বনোয়ারী বাবুর কথা যেন মনে থাকে বহুদিন। রাণী-সাহেবার এক ভাই এলেন। বাবরীচুলের গোছা, স্প্রিংএর মত কপালে ও মুখের দুপাশে

পড়েছে। পকেটে একটা বড় টর্চ যেন একটা পিতলের বাঁশী, হাতে সোনার হাতঘড়ি। রং কালো, আবলুশ কাঠ হার মেনেছে। পথে সাহেবের বাংলা থেকে অম্বিকাবাবু কি সুন্দর ফুল তুলে নিলে। আমি আমলকী, হরীতকী, বয়েড়া তুলে পকেট বোঝাই করলাম।

এতবড় বন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। সারাদিন লছমীপুরের আমলাদের উপর অম্বিকাবাবু ও আমি খুব হুকুমটা চালালাম যাহোক্।

॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, জয়পুর ডাকবাংলা ॥

কাল সকালে উঠে গেলাম পূজা দেখতে আমলাকুণ্ড কাছারী। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে চা খেয়ে সন্ধ্যার একটু আগে ঘোড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। আসবার সময় নৌকায় উন্মুক্ত গঙ্গার উপর জ্যোৎস্না কি অমল, উদার…

এই সব জ্যোৎস্নায় যেন কার মুখ মনে পড়ে। এই মৃদু হাওয়ায় তার স্পর্শ আছে… ছেলেবেলাকার সেই নবীন শিশিরসিক্ত প্রভাতগুলি দিদির মুখের হাসি মাখানো, মায়ের হাসি মাখানো। সেই পাকাটির গন্ধ, নূতন গ্রামে এসেছি, একটু একটু ভারী ম্যালেরিয়া ভরা যেন হাওয়াটা, উঠানে শিউলিফুল ফুটেছে, সম্মুখে বিস্তৃত অজানা জীবন মহাসাগর। সেই রঘুনাথজী হাবিলদারের কালো তরুণ চোখদুটি ও শিবাজীর হাতের কম্পায়মান উন্নত বর্শা মনে পড়ে।

নবীন তাজা প্রভাতে পূজার ঢাক বাজছিল গ্রামান্তরে ছাব্বিশ বছর আগে—ছাব্বিশ বছর আগের পাখীর দল, ফুলের গুচ্ছ আমার গ্রামের পথে পথে বনে বনে অমর হয়ে আছে।

এই যে আজ পূজোতে কহলগাঁতে ঢাক বাজে, পঁচিশ বছর আগে কি বেজেছিল ঠিক এই রকম! এই রকম হাসিভরা ছেলেমেয়ের দল·· তারা কোথায় সব চলে গিয়েছে। আড়াই শত বছর পরে যারা আসবে তারা অনাগত ভবিষ্যতের সম্পদ, তাদের ভেবে মন কেমন মুগ্ধ হয়।

কয়দিন সুরেনবাবুর ওখানে রামচন্দ্রপুর কাটিয়ে আজ কেটে ফিরে এলাম। কয়দিন বেলিঘনে বসে বসে কি আড্ডা! কাল বৈকালে চক্রতোর নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে কত কথা গল্প হোল। আমি, সুরেনবাবু ও মুরলীধর নদীর ধারে ঘাসে বসে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না উঠলে রওনা হলাম। সকালে আটটার মধ্যে ভাগলপুর এসে দেখি মেজ মামা এসেছেন।

॥ ৩রা অক্টোবর ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

সুরেনবাবুর ওখান থেকে গেলাম C. M. S. School-এ। সেখান থেকে এসে নির্জ্জনে বহুক্ষণ অন্ধকারে বসে রইলাম।

মানুষ কি ধূলার গড়াগড়ি দিতে জন্মেছে? তার অদৃষ্ট কি তাকে শস্যক্ষেত্রে ফসলের আঁটি বাঁধতে চিরকাল চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে? তামাকের দোকানে পোদ্দারের নিক্তির সাহায্যে, মণিকারের কষ্টিপাথরের সঙ্গে সুপরিচয়ের বন্ধনে?

যে মানুষের চারধারে গহন অসীম বিস্তৃত, মাথার ওপরে শূন্যে এখানে ওখানে ক্ষণে ক্ষণে ঝিকিটে চার পাঁচটা করে কত না-জানা প্রাচীন জগতের ভাঙা টুকরোর তারাবাজি ধূমভস্মে পরিণত হচ্ছে, যে শান্ত সন্ধ্যায় পাখীর গানে নদীর মর্মরে রক্ত সূর্য্যের অস্ত-আভায় অনন্ত জীবনের স্বপ্ন দেখে—পাথরে কাগজে ক্যান্‌ভাসে সব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্তা বড় ধর্ম প্রচার করেছে, কত লোককে কাঁদিয়েছে, নক্ষত্রজগৎকে চিনিয়েছে, ভগবানের সত্তাকে আন্দাজ করেছে—তার অদৃষ্ট কি পৃথিবীর ধুলার সঙ্গে সত্য সত্যই জড়িত থাকবে?

বিশ্বাস হয় না। মনে হয় কত দূর দিনে ঐ সমস্ত বিশাল নাক্ষত্রিক শূন্যের সে হবে উত্তরাধিকারী। অসীম ব্যোমপথে নব নব গ্রহ তারার অজানা সৌন্দর্য্যের দেশে তার যে অভিযান এখন সে মনে ভাবতেও সঙ্কুচিত হয়, তখন তা হবে নিত্য নূতন আনন্দের পুষ্পবীথি। মানুষের ভবিষ্যৎ অদ্ভুত, উজ্জ্বল, রহস্যময়, রাত্রির অন্ধকারে—এই নির্জ্জনে বসে স্পষ্ট তখন দেখতে পেলাম।

সত্যিই আর ভয় করি না, নিরানন্দ বোধ করি না। মানস-সরোবরের শতদল পদ্মের মত এই অনন্তের বোধ আমার প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে যেন। যখন তখন নীল আকাশের দিকে চাইলেই মনে হয় আমার এ দুদ্দিনের প্রবাস অনন্তের খেয়ার এপারের ঘাট পারানীর ছোট কুঁড়েখানা। ঐ তো কানে আসছে উন্মত্ত গহন গভীর সাগরের ক্ষুব্ধ উদাত্ত সঙ্গীত। কুঁড়ের চাল ভুলে যাই। পুঁই মাচার কথা মনে থাকে না। লাউশাকগুলো গরুতে খেয়ে ফেললে কিনা দেখবার কার মাথা ব্যথা পড়েছে?

শতজন্মের পারে তাকে যেন আবার পাবো। কোন্ দেবতা আছেন্ যেন জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা। তিনি সব দেখেন শুনেন।

কতদিন আগে এই সময়ের সেই গানটা মনে পড়ল:

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই'

॥ ২১শে অক্টোবর ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

আজ সকালে মাহেন্দ্র ঘাট থেকে ষ্টীমারে হরিহরছত্র মেলা দেখতে গিয়ে কত কি দেখলাম। ভেটারীনারী হাসপাতালে জিনিস-পত্র রেখে টমটমে বেরুলাম। কি ভিড়, ধুলো। সেই যে মেয়েটি ধুলায় ধূসরিত কেশ নিয়ে বসে আছে, ভারী সুন্দর দেখতে। হাতী বাজার, উট বাজার, চিড়িয়া বাজার—কত সাহেব মেম ধূলি ধূসরিত হয়ে মেলা দেখে বেড়াচ্ছে। হাজিপুর থেকে, মজঃফরপুর থেকে ট্রেন সব আসছে, লোক ঝুলতে ঝুলতে আসছে বাইরে। একটা ঘোড়া কেমন নাচতে নাচতে এল। টম্‌টম্‌-ওয়ালারা চীৎকার করছে—'ধাক্কা বাঁচাও।' একটি মেয়ে কাঁদছে, তার স্বামী কোথায় গিয়েছে—পাত্তা পাচ্ছে না। সারন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবু পড়েছে।

॥ সন্ধ্যা ৬টা, ৭ই নভেম্বর ১৯২৭, রেলওয়ে কম্পার্টমেন্ট, সোনপুর ॥

জ্যোৎস্নাভরা রাতে পুঁটুলি হাতে এইমাত্র এসে পাটনায় পৌছান গেল। বৈকুণ্ঠবাবুর সাজানো অফিস ঘরে টেবিলটাতে বসে লিখছি। গঙ্গায় খুব বড় একটা স্টীমার, নাম মজঃফরপুর—তাতেই পার হওয়া গেল। এপারে ওপারে কি ভয়ানক ভিড়! গঙ্গার ধারে দীঘা ঘাটে ও প্যালেজা ঘাটেই এক এক মেলা বসে গিয়েছে। জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে হু হু হাওয়ার মধ্যে যখন জাহাজ ছাড়ল তখন কল্পনা করলাম ইজিপ্ট থেকে যেন জাহাজ যাচ্ছে—ওপারে সুন্দরী ইটালীতে। যাবের ভূমধ্যসাগরের চলোর্মি-চঞ্চল নীল বারিরাশিতে কতকাল আগেকার কত নীলনয়না কনক-কেশিনী সুন্দরীর ছবি যেন দেখলাম, কত ক্লিওপেট্রা, কত হাস্যমুখী তরুণী, ইটালীর মেয়ে, গ্রীসের মেয়ে, রোমের মেয়ে। লোকের ভিড়ে স্টীমারে ঘাটে নামা যায় না, মালগাড়ীর মধ্যে ওয়েটিং-রুম, টিকিট দেওয়ার ঘর—যেন যুদ্ধের সময়ের বন্দোবস্ত। আসবার সময় কেবলই মনে হতে লাগল—এই বিদেহ—মিথিলা। এই ছাপরা জেলা হলেও কালকাসুন্দে গাছের একটা ছায়াভরা ঝোপ দেখে বাংলাদেশের কথা একবার একটু মনে হোল—অবশ্য ঐ পর্য্যন্তই মিল। এদেশের শ্যামলতাশূন্য ভূমিশ্রীর মধ্যে কি আর মরকতশ্যামশ্রীর তুলনা হয়? সেই মাকাললতা-দোলা বৈকালের-ছায়া-পড়া ঝোপঝাপ, নদী-তীর, পাখীর ডাক, ঘন বন, লতাপাতার কটুতিক্ত সুগন্ধ, বনফুলের সৌরভ। দীঘাঘাট থেকে গাড়ী ছেড়ে আসবার-সময় মনে পড়ল—গিরীনদাদার মুখে শুনতাম দীঘাঘাটের ওপারে প্যালেজা ঘাট। কখন দেখিনি। এতকাল পরে সে সাধ মিটলো। আরও মনে পড়ল, গিরীনদাদা তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বহুকাল আগে—আজ একুশ বছর আগে—এই পথে প্রথম বারাকপুর গিয়ে বাড়ী তৈরী করেন। তারপর আমাদের যে মুগ্ধ শৈশব কেটেছে, কৈশোর কেটেছে—প্রথম যৌবন, বনগ্রামের বোর্ডিং, গর্দ্দভ উপাধি, বেচু চাটুয্যের স্ট্রীট, মনোমোহন সেনের লেন, পানিতর, কত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। এখন তিনি কি করছেন? গঙ্গায় আসতে আসতে স্টীমারে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম বহুদূরে চাঁপাপুরের ঘাটটার কথা। সেই পুকুরঘাটের বাঁধা পৈঠায় এই জ্যোৎস্নালোকে এখন কি হচ্ছে? সময়ের গতি আগে থেকে কত সামনে চলে এসেছে যে! আজ যদি এক্ষুণি আবার সেখানে যাই? সেই বাড়ী আছে, সেই পুকুরঘাট আছে, সেই ঘরদোর আছে কিন্তু সে মানুষ কৈ? পাটনা যেন হয়ে গিয়েছে বাড়ী। পাটনায় এসে বড় স্টেশনে গিয়ে বক্তিয়ারপুরের গাড়ীর সময় জিজ্ঞাসা করে নিলাম। বৈকুণ্ঠবাবু ও তাঁর চাপরাসী প্লাটফর্ম্মে পাঞ্জাব মেল ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপর পুঁটুলি হাতে জ্যোৎস্নাভরা রাজপথ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে মনে হোল কি ভবঘুরেই হয়ে পড়েছি! কোথায় বাড়ীঘর আর কোথায় সারণ জেলা, পাটনা জেলা, গয়া জেলা ক'রে কত দিনটা কাটলো. সেই আদিনাথ পাহাড়, আগরতলা, কুমিল্লা, উজীরপুর, সেই রাত্রে খালে বেড়ান, ইসলামকাটি, সেই জয়পুর ডাকবাংলা—চানন নদী, শালবন। পাটনা ল প্রেসের কাছে এসে কল্পনায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরে গেলাম।

—ও মা—মা?

—দোর খুলে গেল।—'কে বিভূতি?'

মণি এল, জাফরী এল, হুটু এল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কালী বাড়ী আছে ?'

ওধারে নেড়ার বাবা কাশছে। বাড়ী—বাড়ী, কতদিন পরে নিজের পুরানো ভিটাতে মার কাছে গিয়েছি ?

কিছুই না অবিশ্যি। ছাতিমফুলের ঘন গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা মোটর আসবে—সরে দাঁড়ান গেল। একটা লোক আমাকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, আপ কাঁহা যাইয়েগা ? ভাবলে বুঝি পথ হারিয়ে গেছি। বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ী এসে সারাদিনের মেলার ধুলো বেশ করে ধুয়ে আরাম করে অফিস ঘরের টেবিলে বসে লিখছি, কিন্তু কি বিকট মশার উৎপাত।

॥ রাত ৯টা, ৭ই নভেম্বর ১৯২৭, পাটনা ॥

একজন পুরোনো আমলের বিদ্যার্থীর পাথর-বাঁধানো শোবার জায়গায় বসে লিখছি। কোন্ বিদ্যার্থীর সুখে-দুঃখে মণ্ডিত ছিল হাজার বছর আগেকার এই প্রাচীন দিনের কোঠাটি —এই বিদ্যার্থীর আমলটি কে জানে ? কোন্ দেশ থেকে শেষ বিদ্যার্থী এসেছিল ? কি ছিল তার ইতিহাস ? কে তার বাপ-মা ? তার আর কোন আনন্দভরা শৈশব-কাহিনী ? কোন্ দেশে কোন্ নদীর ধারের শ্যামল বন তার কৈশোরকে স্বপ্নমণ্ডিত করেছিল ? কত শুভ অবসরে তাঁর বাপমায়ের কথা ভাবতো—হয়তো তাদের তরুণী নববিবাহিতা বধূরা শতদ্রু, গঙ্গা—অজানা কোন গ্রাম্য নদীর তীরে তাদের প্রতীক্ষায় বিরহাকুল হৃদয়ে দিন গুণে গুণে দেওয়ালে আঁচড় কেটে রাখতো—হাজার বছরের দুয়ার দিয়ে কতকাল আগে—সে সব ছাত্র, সে সব অধ্যাপক, তাদের বাপ-মা কোথায় স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে! অদূরের রাজগৃহের প্রাচীন কোন্ রাজার কোষাগার আজ অন্ধকার রুদ্ধবায়ু ভূগর্ভের কুক্ষিতে গুপ্ত,— ইট, মাটি কাঠের স্তূপের আড়ালে সে সব দিনের কথা বসন্তের ফলের মত ঝরে গিয়েছে। এদেরও সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহের বাঁশিও আজ হাজার বছর ধরে এই নির্জন প্রান্তরের হাওয়ার নিঃসীম শূন্যে কানে কানে তাদের রহস্য কাহিনী গান করে এসেছে!

॥ ১১ই নভেম্বর ১৯২৭, নালন্দা ॥

একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গর্বদৃপ্ত রাজধানীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দুটো বাজগিরি মাটির তলে অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। কেবলই মনে হয়, এত প্রাচীন দিনের রথ, সৈন্য, কোলাহলভরা জয়দৃপ্ত পথ, চৈত্য, স্তূপ, কত রাজনৈতিক, কবি, সেনানায়ক, মন্ত্রী, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, শ্রেষ্ঠী, পুরোহিত যেন মাটির তলে কোথায় চাপা রয়েছে। তাদের সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। মহাভারতের যুগের কথা, তার ছবি—কতকাল আগে ভীম বলে যদি - কোনকালে থেকে থাকেন, তবে তিনি এসেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার দিনের জানালায় বসে দুপুর রোদে এই জরাসন্ধের কারাগারের কত ছবিই যে দেখেছি!

আমি বেশ মনে ভাবছি—পুরোনো সে যুগের এক তরুণ সেনানায়ক মগধের দূর প্রান্ত থেকে যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেছিল, তার বাড়ী ফিরে আসা, তার বিরহী মনটার তৃষ্ণা—আবার মা, বাপ, ভাই, বোন ও নববধূর সঙ্গে মিশবার যে আকাঙ্ক্ষা—হাজার হাজার বছর পরে যেন আমার মনে এসে বাজছে। ছায়ার মত, স্বপ্নের মত, তারা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে কতকাল আগে!

পাহাড়ে পাহাড়ে জংলীবাঁশের বনে শেষ মধ্যাহ্নের ম্লান রোদের মধ্যে, বুনো পাখীর কাকলীর তানে, কতকাল আগেকার মিলিয়ে যাওয়া আশা, দুঃখ, সুখ, হর্ষ, প্রেম ও স্নেহের তান করুণ হয়ে ওঠে!

এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঘন জঙ্গলে বসে আছি ময়না-কাঁটা, বুনো বাঁশ, গৌয়াফুল, কত কি বুনো গাছপালা। কি নির্জ্জন স্থান—এই পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থানে বোধ হয় প্রাচীন রাজগৃহ ছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাব ও চিন্তাদৈন্য দেখলে মনে বড় কষ্ট হয়। এত নিকটে এমন স্থান আছে—প্রাচীন বেবিলনের মত গৌরবশালী ধ্বংসস্তূপ যার—তার কেউ একটা ভালরকম সন্ধানও দিতে পারলে না বক্তিয়ারপুর থেকে!

অনেক কাল পরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোল। College days-এ তার মধ্যে gifts ছিল। কিন্তু interests বড limited হয়ে গিয়েছে। তার পরে সংসারে পড়ে অর্থার্জ্জন ও তুচ্ছ যশাকাঙ্ক্ষায় তার সব মন, বুদ্ধি, শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। পঁচিশ বছর পূর্ব্বে সে দীপ্তমুখ বালককে এই অকাল-বৃদ্ধ অপ্রসন্ন মুখ নিস্তেজ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

মনে বড় কষ্ট হোল। এই রকম করেই জগতে অনেক লোকের জীবন ছাই চাপা পড়ে যায়। প্রথম কারণ—কল্পনার অভাব, দ্বিতীয়—তারা দিক্‌চক্রবালের দূরসীমার প্রান্তের সবুজ বনরেখার সন্ধান পায় না, মাথার ওপরকার ছাদের কড়িবরগায় তাদের অনন্ত আকাশের ছায়াপথকে আড়াল করে রেখেছে। জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান ভিন্ন তার সন্ধানই মেলে না। হৈ-হাই বাজারের মেছোহাটার কলরবে ধ্যানকে কখনো আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে সুযোগ দেয়নি এরা। সে বেচারী সুযোগ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে তারপর কম্বল গুটিয়ে অসাফল্যের পথ চেয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। তারপরেই আসছে সাহেবকে প্রসন্ন করে মাইনে বাড়াবার চেষ্টা। কোন ফন্দিতে বেশী ব্রিফ্ যোগাড় করতে পারা যাবে সেই ভাবনা। এর ওপর মেয়ের বিয়ে তো অবিশ্যি আছেই।

কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কে খবর রাখে মগধ! আর কে খবর রাখে এই ভূমি পবিত্র হয়েছিল সে প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেবের পূত চরণরেণু স্পর্শে? তারা শুধু তাড়াতাড়ি ব্রহ্মকুণ্ডে একটা ডুব দিয়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির পায়ে একটি ফুল ফেলে দিয়ে আহার যোগাড় করবার জন্য ছোটে। এই বিশাল পাহাড়শ্রেণী, এই নির্জ্জন স্নিগ্ধ বনভূমি, এই ভূগর্ভস্থ প্রাচীন দিনের সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্যের রাজধানী তাদের মনে খোরাক যোগাতে পারে—তারা তার উপযুক্ত নয়।

। ১৩ই নভেম্বর১৯২৭, রাজগির।

কালীর সঙ্গে ৫।৬টা দিন বেশ কাটল। সময়ে সময়ে পুরোনো দিনের ছেলেবেলাকার গল্প-গল্প করা যেত! রাজগৃহ বেড়াতে গেলাম, নালন্দা গেলাম—যেমন বাল্যকালে আমরা দুজনে কুঠির মাঠে, মরাগাঙের ধারে বেড়াতে যেতুম, তেমনি। বাবার মুখে গান পুরোনো সুরে বহুদিন পরে তার মুখে শুনতাম। আবার সেই সব শৈশবের আনন্দ ফিরে এসেছিল।

কাল সকালে পাটনা গিয়েই বৈকুণ্ঠবাবুর মুখে শুনলাম যে এখনই ভাগলপুর যেতে হবে। তখনই লুপ্ Express-এ রওনা হলাম। বক্তিয়ারপুর স্টেশনে ওদের মশারী ও গায়ের বোতাম ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। আজ সকালে ইন্সিওরেন্সএর এজেন্ট ভদ্রলোক বলছিলেন কাল নাকি অমরবাবুর বাসা থেকে সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গিয়েছিল। অসম্ভব নয়, কালকার দিনটা ছিল খুব ভাল। আমি কাষরা স্টেশনের বাঁকটায় এসে ট্রেন থেকে ঠিক বেলা চারটার সময় পূর্ব-উত্তর কোণে দিক্‌চক্রবালে মিছরীর পাহাড়ের মত শুভ্র, ঈষৎ সোনালী রংএর একটা পর্ব্বতশ্রেণীর মত লক্ষ্য করছিলাম বটে। হয়ত সেটা মেঘ, কিন্তু হতেও পারে হয়ত বৈকালের নির্ম্মুক্ত আকাশে দূর থেকে হিমালয়ের তুষারশিখরই চোখে পড়ছিল।

Hugh Walpoleএর কথাটা বড় মনে লেগেছিল সেদিনকার Englishman-এ:

"The establishment of a contemplative order. Anyone above 50, should retire to a quiet valley, free from motors and radios and spend some time in silence and contemplation—amidst green woods and quietness of chirping of wild birds beneath a blue sky—if possible by the side of a running brook."

চমৎকার কথা! জগতে এখানে ওখানে সত্যিকার মানুষেরা সব আছে, যাদের মুখে মাঝে মাঝে ভারী খাঁটি কথা সব শুনতে পাওয়া যায়।

। ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৭।

অমরবাবুর ওখান থেকে গল্প করে ফিরে কেদারবাবুর বাড়ীতে রামায়ণ গান শুনে বাসায় ফিরছিলাম।

পথে আসতে আসতে অনেক কালের একটা গল্প মনে পড়ল। আমার পলিসির অধ্যবসায়ের ঘটনাস্থল ছিল নবীন চক্কোত্তির বাড়ীর এদিকের এড়ো ঘরটা, এই গল্পটার ঘটনাস্থলও ছিল তাই। কোন এক ভগ্নপোতে মহাসমুদ্রের কোন অংশে জানি না অন্য সব যাত্রী, মাঝি-মাল্লাকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ অবশিষ্ট একটামাত্র লাইফবেল্ট পরতে যাচ্ছেন—এমন সময় তাঁর চোখে পড়লো জাহাজের এক কোণে এক ক্ষুদ্র অপরিচিত বালক শীতে ভয়ে ঠক্ ঠক্ কাঁপছে। সে একজন stowaway—লুকিয়ে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল—এতদিন খায়নি, ভয়ে ও অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। মহানুভব পোতাধ্যক্ষ তাকে তাঁর জীবনরক্ষার শেষ উপায়টা দিয়ে মৃত্যুর জন্য নিজে প্রস্তুত হলেন এবং অল্পক্ষণেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের গর্ভে পোতসহ নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

সেই কাপ্তেনের ছবিটা বেশ দেখতে পেলাম। পর্তুগালের কি স্পেনের কোন দ্রাক্ষা-লতার বনের ধারে বসে নীলনয়ন-বালক আপন মনে নির্জ্জনে দূর দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো—আটলান্টিক্ পার হয়ে অজানা দেশের ধনভাণ্ডার লুট করে তার দেশের নাবিকেরা প্রাচীন কালে দেশকে ধনশালী করে ক্ষমতাশালী করে রেখে গিয়েছে—তারও মনে মনে ইচ্ছা যে সেও একদিন সেইরকম হবে। কর্টেজ কি পিজারোর মত রাজ্যস্থাপয়িতা দিগ্বিজয়ী বীর নাবিক। তারপর তার দরিদ্র পিতামাতার কুটীরে পোড়ারুটী খেয়ে শুয়ে রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে দূরের স্বপ্নে আকুল হয়ে উঠতো। পিতামাতার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, কেউ ভাল খেতে পায় না। শিক্ষার সুযোগই বা কে দেয়? একদিন স্বপ্নের সৌন্দর্য্যে আকুল হয়ে বালক বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে গেল। তার কেউ খোঁজখবর করলে না। ক্রমে সকলে ভুলে গেল তাকে।

কেবল তার মা তাকে মনে রাখলে। ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার সময় সঙ্গীহীন, সেই নীলনয়ন পলাতক ছেলেটি তার ছিল নিত্যসঙ্গী। কত নির্জ্জন রাত্রের চোখের জলে, রোগশয্যায় বিকারের ঘোরে তার কিশোর মূর্ত্তি চোখে পড়েছে। মা যখন মারা গেল, ছেলে তখন স্বপ্নকে সার্থকতার মধ্যে পেয়েছে।

কত কাল চলে গিয়েছে—কত দেশের কত অদ্ভুত জীবন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সে বালক এখন প্রৌঢ় পোতাধ্যক্ষ। বিবাহ সে করেনি—বিশাল মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্গীত তার জীবনের বীণাকে চিরকাল রুদ্রতালে বাজিয়ে এসেছে। সংসারের কোন বাঁধন নেই তার। অচিনের অনন্ত পথ ছেলেবেলাকার মতই তার সামনে তবুও বিস্তৃত।

ভীত, জড়সড়, ক্ষুদ্র বালককে দেখে সে মরণের রাত্রে তার নিজের দূর শৈশবের কথা মনে পড়ল। এই রকম অবোধ, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালক ছিল সে, যখন প্রথম অজানার টানে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই বালকও আজ সেরকম বেরিয়েছে, কিন্তু হতভাগ্য প্রথম বারেই জীবনকে বিপন্ন করে বসেছে। বালকের জীবনের বিস্তৃত ও সুখ আনন্দকে প্রসারলাভ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে সে নিজের লাইফ-বেল্ট তখনি খুলে তাকে পরিয়ে দিয়ে বললে—'বন্ধু, তোমারই মত বয়সে আমিও বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম, আমার জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে—তুমি বাঁচো, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।'

আজ এই রাত্রে পড়াশুনার একটা অদম্য পিপাসা মনের মধ্যে অনুভব করছি। এক লাইব্রেরী বই পাই, সব বিষয়ে খুব বসে বসে পড়ি। বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস—দেশবিদেশের কবিদের ও ঔপন্যাসিকদের বই পড়তে বড় ইচ্ছে করছে। জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। অন্য ব্যাপারে নষ্ট করে কি করবো? শুধু পিপাসা -আমার এ পড়াশুনার পিপাসা দেখছি বিকারের তৃষ্ণার মত। যত জল খাই, আরও জল, আরও জল। ততই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

॥ ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

এইমাত্র থিয়েটার দেখতে যাবো। টিকিট কিনেছি। বড় বাসার নির্জ্জন ছাদটার নির্জ্জন

শীতসন্ধ্যায় গঙ্গার বুকের শেষ রোদ মিলিয়ে যাওয়া ঝিকিমিকি ছায়াভরা রোদের রেশটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে দূর ইছামতীর বুকের একটা অন্ধকার ঘন তীরের কথা মনে পড়ল। ঠিক এই সময়ে—"যতবার আলো জ্বালাতে যাই—নিভে যায় বারে বারে"—সেই গীতের বিষণ্ণ প্রভাতে গানটির কথা মনে আসে! সেই সন্ধ্যা—সেই দোকান।

যাক সে কথা। আকাশের দিকে এখানে ওখানে দু'একটা নক্ষত্র জ্বলছে। দেখে মনে হোল এই পৃথিবীটুকুই কেবল জানা—তার ওপারে অনন্ত অজানা মহাসমুদ্র। কোথায় Sirias, Vega, Spiral Nebula, বর্হিষদ্ পিতৃলোক! মরণলোকের যাত্রীদের যাতায়াতের বীথিপথ। অনন্ত, অজানা সেই ছেলেবেলার রাজু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়তে যাবার সময় চারিধারের বাঁশবনে যেমন অজানা দেশ লুকিয়ে থাকতো—গুপ্তধনের দেশ তেমনি ঠিক।

ক্লাব থেকে আভাসবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেলাম। অমরবাবুকে দেখলাম—কথাবার্ত্তা হোল। "ষোড়শী" বইখানা শুনেছিলাম খুব ভালো। কিন্তু একটু সন্দেহ নিয়েই গিয়েছিলাম মনে মনে। শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম সে সন্দেহ করে আমি শরৎবাবুর প্রতিভার প্রতি অবিচার করেছি। বই বেশ ভাল লাগল। ওরকম নূতন ধরনের কথাবার্ত্তা বাংলা স্টেজে বোধ হয় বেশী নেই।

পরদিন বড়-বাসার ছাদে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা ভাবছিলাম অনেক কথা। জীবনে কত ভাল জিনিস পেয়েছি সে কথা—আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। কি গ্রামেই জন্মেছিলাম। এই তো আরা জেলা, ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম। কোথায় সেই পরিপূর্ণ, সুন্দর, স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন ঝোপঝাপ। বড় ভালবাসি তাদের, বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। কেউ জানে না কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওলা ঝোপ, কোঁয়ালীফুল ছাতিমফুল, বাবলা বনকে। সে ছায়া, সে স্নিগ্ধস্নেহ, আমার গ্রামের সে সব অপরাহ্ণ—আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে।...তারাই যে আমার ঐশ্বর্য্য। অন্য ঐশ্বর্য্যকে তাদের কাছে যে তৃণের মত গণ্য করি।

এই শীতের অপরাহ্ণ, রাঙা রোদ যখন বাবলা বনে লেগে থাকে তখন শৈশবে কতদিন শ্যামছায়া ঘনিয়ে আসা ইছামতীর তীরে নির্জ্জনে বসে বর্ষার তাপনের শিমুলতলার দিকে চেয়ে জীবনের মরণের পারের এক রহস্যময় অজানা অনন্তলোকের স্বপ্ন আবছায়া ভাবে মনে আসতো—কতদিন চেয়ে থাকতাম শিমুলতলার নীচে, লক্ষণ জেলের শাশুড়ি, ক্ষুদে গোয়ালা যখন মারা গেল, তাদের পোড়ানোর জায়গার দিকে—কেমন যেন উদাস উদাস ভাব, দিগন্তবিস্তৃত মাধবপুরের উলুখড়ের মাঠটার বহুদূর পার থেকে কে যেন হাতছানি দিত।

তারপর সত্যি সত্যি কত ভাল জিনিসই পেলাম। গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায়-কপালে ঠেকানোর কথা মনে হয়ে পুলক হয়।

তারপর চাটগাঁয়ের সুন্দর দিনগুলো—জানি। ফরিদপুরের সত্যবাবুদের বাড়ী। তারপর সুন্দর জীবনের period চললো। সেই নয় বৎসরের ক্ষুদ্র বালককে কি ভালই বাসি! তার

সেই মামা জুতো মেরেছে বলে কান্না, সেই মকামদিনার যাওয়া বালিশ, সেই "শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি"!

এ সব চলে যাবে জানি। আবার নূতন আসবে জীবনে। আরও কত-কত আসবে। এও ঠিক, একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে, বাবলা বনের ছায়ায়, ইছামতীর তীরের বনঝোপের বিহঙ্গ তানের মধ্যে, নীরব শান্তির কোলে এ জীবনের দেওয়া-নেওয়া সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ঐ দূর ক্ষীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন অনন্ত লোকে, অনন্ত কালের পথিক যাত্রী সে—তার যাওয়া-আসা কি ফুরাবে হঠাৎ?

আমি এই যাওয়া-আসা স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তারপর, তাও আমি জানি! হয়ত একবার এসেছিলাম দূর কোন ঐতিহাসিক যুগে—হয়ত রোমের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জের আড়ালে ভূমধ্যসাগরের নীলজলের তীরের কোন সম্রান্ত ধনীর প্রাসাদে। হয়ত প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের দিনে গ্রীকবীর হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে ঢাল তলোয়ার ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছি—নয়তো কোন পাহাড়ের ছায়ায় বসে এইরকম স্বপ্ন দেখতাম—নয়তো ইংলণ্ডে কি ফ্রান্সে কোন অবজ্ঞাত গ্রামে কৃষকবালক হয়ে জন্মেছিলাম—এলম্ কি ওক গাছের নীচে বসে বসে ভেড়া চরাতাম—কে জানে?

আবার বহুদূরে জন্মান্তরে হয়ত ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্য্যের আলোকে একদিন অসহায় অবোধ শিশু নয়নদুটি মেলবো। পাঁচশো বছর পরের পাখীর গান, ফুলবন, জ্যোৎস্না আবার আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবে। কোন অজানা দেশের অজানা পর্ণকুটীরে কোন অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ছায়াঝোপের তলে মাঠে বনে মুগ্ধ শৈশব কাটবে—অনাগত মা বাপের স্নেহসুধায় মানুষ হব। পাঁচশো বছর পরের অনাগত ক'ত বালকবালিকা তরুণ তরুণী, কত সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশা, লোকের সঙ্গে সে কত পুলক ভরা পরিচয়!

কেবলই মনে হয় সৃষ্টির যিনি দেবতা এত দয়া তাঁর কেন? এই অনন্তের সুধা-উৎস মানুষের জন্যে তিনি কতকাল থেকে খুলেছেন? এই অন্ধকারে তবু হাত জোড় করে তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

। ১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭ ।

মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। পথের ধারে আমগাছে তাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল, কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখী দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশুচোখে চেয়েছিল, সন্ধ্যায় ঘোড়ায় হাট থেকে ঘোড়া কিনে এনে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় ঢেউ বইয়েছিল। দুহাজার বছরের ইতিহাসে সে সব কথা লেখা নেই—

থাকলেও বড় কম। রাজা যযাতি কি সম্রাট সেণ্ট্‌হোটেপ, জুলিয়াস সীজর, থিয়োডোসিয়াস এবং তাবৎ সম্রাট্ পরিবারের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প আমরা শৈশব থেকে মুখস্থ করে এসেছি। কিন্তু গ্রীসের ও রোমের যব ও গমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ্‌ বন্যদ্রাক্ষার ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস আমি জানতে চাই। হোমার ভার্জিলের কবিতা প্রতিধ্বনী হয়ে উঠত কিনা এদের তুচ্ছ কথায় আমি জানি না কিন্তু উত্তরপুরুষদের কৌতূহল, স্নেহ ও সম্মানের অধিকারী হোত তারা একথা ঠিক।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের ফাঁকে সরে যায়, সারিবাঁধা বর্শার অরণ্যের ভিতর দিয়ে দূরের এক ভদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ী নজরে আসে, অজ্ঞাত কোন লেখকের জীবন কথা, কি কালের স্রোতে কুল-লাগা একটুকরা পত্র, প্রাচীন ইজিপ্টের কোন কৃষক শস্য কাটবার জন্য তার পুত্রকে কি আয়োজন করবার কথা বলে ছিল—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকবো ভাঙ্গা ফাটা মাটির তলায় চাপা পড়া মৃন্ময় পাত্রের মত পুরাতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়ে। তারপর কল্পনা—আর কল্পনা!

প্রস্ফুট সর্ষে ক্ষেতের সুগন্ধের মধ্যে বসে প্রভাতের নীলআকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার সেই দূরকালের পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভাবি।

বর্ত্তমানে একদল লেখক উঠেছেন যাঁরা ইতিহাসের এই ফাঁক পূর্ণ করবেন। তাঁরা ছোট গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, জীবন-চরিত লেখকের মধ্যে যাঁরা খুব সূক্ষ্ম দ্রষ্টা তাঁরা—দৈনিক লিপিলেখক—এঁদের দল। চেখাভ, এইচ্‌ জি. ওয়েলস্‌, গর্কি, ব্রেট হার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এঁদের লেখা ভবিষ্যৎ যুগের পুস্তকাগারে দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের তালিকার মধ্যে স্থান পাবে—খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবং অত্যন্ত পাকা দলিল হিসাবে এদের মূল্য হবে। রোমান্স লেখকগণও সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবে না—তাঁদের কল্পনার উল্লাসে, আবেগে অনেক সময় জীবনের সূক্ষ্ম দর্পণকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন বটে, কিন্তু তবুও স্কটের লেখা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের সম্বন্ধে যা জানতে পারি, কোন্ ঐতিহাসিক অতটা আলো সে সময়কার সমাজ, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর ফেলতে পেরেছেন?

কিন্তু আরও সূক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই। আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটী কোটী মানুষ প্রলয়-স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস। কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সে সবের চেয়েও খাঁটি ইতিহাস।

এই যুগ যুগ ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন্ মহাঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস। অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আটলান্টিস্‌ জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোন অধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্যশৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগ-

শিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হোল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে—ওর কথাও।

কিন্তু এ উপন্যাস মানুষের পাঠের জন্যে নয়। মানুষ শুধু মাটি পাথর খুঁড়ে, ওতে ওতে জোড়া তালি দিয়ে, দস্যুবৃত্তি করে লুকিয়ে চুরিয়ে এর এক আধ অধ্যায় চাবি-আঁটা পেটরা থেকে দিনের আলোয় এনে পড়ছে—সব বুঝতেও পাচ্ছে না।

। ৩০শে নভেম্বর ১৯২৭, ইসমাইলপুর।

সন্ধ্যার আগে লাখপতি মণ্ডলের টোলার পিছনের কুণ্ডীটা পার হয়ে ঘোড়া কাশজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব ছুটিয়ে রামজোতের পুরনো বাগান দিয়ে নীচের কুণ্ডীটাতে গেলাম। লাখপতিদের টোলার মাথার উপরে রাঙা টকটকে লাল সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যায় কাশজঙ্গলের ধারে ধারে কেমন সোঁদা সোঁদা ঠাণ্ডা গন্ধ। কুণ্ডীটার ধার দিয়ে খুব জোর করে ঘোড়া ছুটিয়ে কুণ্ডী পার হয়ে সামনের সে কুণ্ডীটা যেটার ধারে সেদিন লাল হাঁস বসেছিল—আমি যেতে যেতেই উড়ে গেল,—মারতে পারিনি—সেই কুণ্ডীটার ধারে গেলাম। পাখী কোথাও কিছু নেই। দূরপ্রসারী ঈষৎ অন্ধকার কাশজঙ্গলের মাথার উপর তাকিয়ে ভাবছিলাম—নয় বছর আগে ঠিক এমনি দিনগুলোতে বারাকপুরের বাড়ীতে সেই হরি রায়ের বাড়ীতে বসা—হরিপদ দা—সেই শোকের দিনগুলো আজ কোথায় কি হয়ে গিয়েছে।

জঙ্গলের পাশ দিয়ে দেখলাম দুটি হাঁস জলে সাঁতার দিচ্ছে কিন্তু বন্দুকটা আনিনি। কতকগুলি Snipe-ও ছিল, এদেশে বলে চাহা—বন্দুক থাকলে সুবিধা হোত।

তারপর খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম।

আজকাল ঠিক দুপুরে সন্ধ্যার আগে একবার করে বসি কাছারীর পেছনের কাশজঙ্গলের ধারে সর্ষেক্ষেতের পাশে। প্রস্ফুট সর্ষেক্ষেতের গন্ধে সেই ছেলেবেলার বড়দিনের বন্ধে বনগাঁ থেকে বাড়ী আসার কথা মনে পড়ে। বড় আনন্দ হয় এই মাটি, এই আধশুকনো, আধ-সবুজ কাশবনের স্নিগ্ধ ছায়া, তারই ধারে এই হলুদ রংএর গন্ধে ভরপুর সর্ষেক্ষেত, এই নির্জ্জনতা একবারে মাটির মায়ের কোলে বসে থাকা। এই আকাশ—আমার জানলা দিয়ে রোজ সন্ধ্যায় দেখতে পাওয়া, দূর পূব আকাশের orion-এর pointer-টা বড় মুগ্ধ করে দেয় আমাকে। আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে নির্জ্জন কাশবনের রহস্য আমার প্রাণে এসে লাগে—জীবনটা কি? কি গহন গভীর গোপনতা—কি যাওয়া আসার গতিচ্ছন্দ।

কাল সন্ধ্যায় টেবিলটায় বসে লিখতে লিখতে দূর পূব-আকাশের একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে ভাবলাম—ঐ সব নক্ষত্রের বা তার পাশের গ্রহের অজানা জীবনযাত্রা, আমাদের কাছে একেবারে গোপনতায় ঢাকা। কে জানে ওর মধ্যে কি প্রাণীদল, কি জীবনের গতি। এই আমি যে অত্যন্ত বাস্তব জীব এই টেবিলে বসে লিখছি—আর ঐ জ্বল-জ্বলে তারাটার মধ্যে অনন্ত মহাশূন্যের ব্যবধান—কোনকালেই এ ব্যবধান পৃথিবীর জীবে ঘোচাতে পারবে না বোধ হয়। কে জানে ওদের জগতে কিরকম জীবনযাত্রা? গভীর রাত্রে রামচরিত যখন আমার

ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে তখন বাইরে উঠে নির্জন বন মাঠের ওপরকার নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। বহু দূরপারের গভীর কোন্ গহন রহস্য ধীরে ধীরে আমার মনে নেমে আসে—সে বলা যায় না, লেখা যায় না। জীবনের গভীর মুহূর্ত সে সব—কেবল তা মনে এই সত্য আনে যে জীবন ঐ দূর ছায়াপথের মত দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়। এখানে আরম্ভও নয়—সুদূর কোথা থেকে এসে সুদূরের কোন্ পারের দিকে তার ডিঙার মুখ ফিরানো।

প্রাণের মধ্যে এই অনুভূতিটুকু যেন সকলের সত্য হয়ে ওঠে।

। ২রা ডিসেম্বর, ১৯২৭ ।

গভীর রাত্রে নির্জন কাশবনের মধ্যের কাছারী ঘরে শুয়ে শুয়ে গিবন পড়ছিলাম। কত রাজা রাণী সম্রাট মন্ত্রী খোজা সেনাপতি কত সুন্দরী তরুণী বালক যুবার আশানিরাশার দ্বন্দ্বের কাহিনী। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান পতন, কত অত্যাচার-উৎপীড়ন, হত্যা, পরের জন্যে কত প্রাণ দেওয়া—অতীতের ছায়ামূর্তিরা আবার গিবনের পাতায় ফিরে এল। হাজার যুগ আগের কত অশ্রুনয়ন নিষ্কলঙ্কা তরুণী, কত আশাভরা বুক নিয়ে কত মা বাপ কোথায় সব চলে গিয়েছে! অনন্ত কাল-মহাসমুদ্রে কোন অতীতকালে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে—কবে—কোথায়! এই গভীর রাত্রে তারা ফিরে এল।

পড়ছিলাম গিল্ডো, রুফাইনাস, খোজা ইউট্রোপিয়াসের অর্থলিপ্সার কথা, অর্থের জন্য তারা কি না করেছিল! বিশ্বস্ত বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করে তাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা করেনি, নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিশ্বাসঘাতকতা—কোথায় তাদের অর্থের সার্থকতা—কোথায় তাদের সে বৃথা শ্রমের পুরস্কার?

এই দেড় হাজার বছর পরে দাঁড়িয়ে এদের সে মূর্খতা দেখে আমি ইতিহাসের পাঠক—আমাকে করুণা প্রকাশ করবার জন্যেই কি রুফাইনাস কাউন্ট জন অত করে নির্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছিল! সে করুণা কাউন্ট জনের জন্য নয়, উৎপীড়ক রুফাইনাস ও তার ধন-লিপ্সার জন্যে। কারণ আমি জানি তার পরিণাম।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখেছিলেন কি বিউরি ঠিক লিখেছিলেন—সে বিষয়ে আমি তত কৌতূহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট সম্রাজ্ঞী, খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি—তৃণের মত স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে।

দুহাজার বছর আগের সেই সব মানুষের মত—তাদের ইতিহাস-লেখকও ছায়া হয়ে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের কোন্ প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে জীর্ণ তার সমাধি দীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জানি না। আর একশত বছর পরে এই আমিও স্বপ্ন হয়ে যাবো।

সন্ধ্যার শান্ত বাঁশবনে, দেবদারু পাতার মাথায় রাঙা রোদে, বৈকালের ম্লান আলোয়, মাঠের ধারের কাশবনে, নদীর ধারে আমি কতদিন এই গতিচ্ছন্দের সত্যকে মনে মনে চিনেছি। এর স্বপ্ন আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

হাজার যুগ আগের এই ঐতিহাসিক ছায়ামূর্ত্তিদের মত সব মিলিয়ে স্বপ্ন হয়ে যাবে। যা কিছু বর্ত্তমান, সব। এই অপূর্ব গতিভঙ্গি, মহাকালের এই তাণ্ডবনৃত্য ছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা, মহারাজা, সাম্রাজ্য, কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন বিশাল অসুরের মৃদঙ্গের গম্ভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলছে—দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস, গিল্‌ডো, রুফাইনাসের দল ও তাদের কড়ির পুঁটুলি ফেনার ফুলের মত মিলিয়ে যাচ্ছে—জাতি, মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর বিরাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁর মহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাস ভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে…অনাহত শব্দের মত তা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে।

সে ধ্বনি সম্রাজ্ঞী ইউডক্সিয়া শোনেননি। শুনেছিলেন সাধু জন্ ক্রাইসোষ্টম্। তাই তুচ্ছ বিষয়লিপ্সা ফেলে দিয়ে দূর সিরিয় মরুভূমির নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি ধ্যানজীবন যাপন করতেন। সান্ধ্য সূর্য্যচ্ছটায় সিরিয় মরুভূমির বালুরাশিতে সাধু জন্ এই গতিলীলার স্বপ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই।

॥ রাত্রি বারোটা, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৭, ইসমাইলপুর ॥

সন্ধ্যার পর আমার নিজের ঘোড়াটায় চড়লাম। প্রথমে ঘোড়াটায় চড়ে বেরুতেই সেটা বড় বদমায়েসী শুরু করে দিল। রামজোতের বাসায় চালের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রায় ঠেসে ধরেছিল আর কি। বেগতিক বুঝে অন্য কোনদিকে না গিয়ে বাঙ্গালী ধাপের দিকে গেলাম। সেখানে কারা মাছ ধরছে। অনেক পাখী বসে আছে, কিন্তু কয়দিনই উপরি উপরি পাখী মারতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হওয়ার দরুণ শিকারে আর স্পৃহা নেই। বাংলা ধাপের ওপারের জঙ্গলের মাথার সূর্য্য অস্ত গেল—বিরাম সূর্য্য-অস্ত একটা দেখবার জিনিস—কি রাঙা টক্‌টকে আগুন রংএর সোনা? সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দিলবরের টোলায় বাগবিরিদের বাদা পার হয়ে চললাম। বয়া মণ্ডলের টোলা যেতে যেতে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। লোধাইটোলায় যখন গিয়েছি, তখন তারা আগুন পোয়াতে বসেছে। তারপরই নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢোকালাম। ঘন জঙ্গলে ভাল করে জ্যোৎস্না ঢোকেনি, খাটো খাটো বনঝাউ গাছগুলো শিশিরে ভিজে গিয়েছে। জঙ্গল ক্রমে ঘনতর হোল, পথ শেষ হয়ে এল। আগে আর বছর যেখানে রঁাইচি-খামার লুট হয়েছিল, সেইদিকে ঘোড়া নিয়ে চলা গেল। অবশ্য একটু একটু ভয় হয়েছিল। বনে শূয়র বাঘের ভয় খুব। কাল অনেক রাত্রে ফেউ ডাকছিল। ভয়কে জয় করবার জন্যে জিদ্ করেই আরও ঘন নির্জ্জন বনে ঘোড়া ঢুকিয়ে দিলাম। পরে অনেকটা গিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে আনলাম। দূরে পূর্ব্বদিকে চেয়ে মনে হোল আমাদের বাড়ীর নির্জ্জন ভিটায় বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে একটু একটু জ্যোৎস্না পড়েছে—এই শীতকালে কবে দোলাই গায়ে দিয়ে শৈশবে পাটালি চালভাজা খাবার লোভে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছি। তারপর লোধাইটোলা ছেড়ে সোজা পথটায় ঘোড়া ছুটলো। চতুর্দ্দশীর মাঠভরা ধপধপে জ্যোৎস্না, নির্জ্জন মেঠো পথ—হুহু করে ঘোড়া ছেড়ে একেবারে বয়া মণ্ডলের

টোলার কাছটার এসে পড়লাম। মনে পড়লো ১৩১৮ সালের এই সময় এই দিনগুলোতে হরিপদ-দার সঙ্গে বাবা থেকে সকাল বিকাল কি করেই কাটাতাম। পাশের মাঠটার অনেক লাল হাঁস (চক্রবাক্) কাল সন্ধ্যার বসেছিল। রামচরিত্রের সঙ্গে মারতে এসেছিলাম, কিন্তু গুলি করতেই সব পালিয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নায় মধ্যে দিয়ে শুধুই ঘোরা হোল। ইউনিভার্সিটি সিল্কের চাদর ওড়ানো মেয়েলি কলকাতার ছেলের সঙ্গে ও এই ইংরাজ explorer যুবকদের কি তফাৎ।

ঐ রকম হওয়া চাই—দুর্দ্ধর্ষ, দুঃসাহসিক ঘোড়সওয়ার। বনে জঙ্গলে মেরুপ্রদেশের তুষার-ভূমিতে কাটিয়ে এসেছে—কতবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে—ভয় নেই। অথচ স্রষ্টা—out of chaos he has created something, ভগবানের তেজ, যৌবনদীপ্তি, জ্ঞান। অথচ কলকাতার যখন ক্লাবে গিয়ে বসবে তখন শৌখীন খুব। সেও সিল্কের চাদর ওড়াবে, বেয়ারার হাতে কোকো বা কফি খাবে।

আজ সতীশের পত্র পেয়েছি বহুদিন পরে। সে কয়লার কাজ শিখতে কোন্ স্কুলে পড়ছে—কিছু সাহায্য চায়। কতকালের কথা—সেই জাঙ্গিপাড়া—সেই ঠিক এই সময়ে জাঙ্গিপাড়া রেলস্টেশনের মধ্যে রাখাল বাবুর সঙ্গে বসে গল্প করা, সেই ত্রিপুরা বাবু, বুড়ো চক্রবর্ত্তি মশায় চাল কড়াই ভেজে আনতেন—সতীশ দুধ জাল দিয়ে নিয়ে আসতো, আর রুটী করে নিয়ে আসতো। সেই একদিনের ছুটী কোথায় না গিয়ে জাঙ্গিপাড়াতেই কাটানো গেল। লাইনের ধারে চেয়ারে বসে তেল মাখলাম—সে এক জীবন কেটেছে।

মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতি সব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাত-পড়ার মত দৈবাৎ কোন্ পুরোনো খোপে হাত পড়ে যায়—হঠাৎ সেটা বড় পরিচিত সুরে বেজে উঠে—অনেক কালের আগের একটা দিন আরকণের অস্ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরে আসে। এই রকম এল কাল—হঠাৎ অনেককাল আগে রংপুর থেকে ফিরে আসার পথে রাণাঘাট এসে অমৃতকাকার সঙ্গে যে রাণাঘাট Exhibition দেখতে গিয়েছিলাম খামাকা সেই দিনটার কথাই মনে পড়ে গেল! সেই "সাজাহান" থিয়েটার হবে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে তার বিজ্ঞাপন—সেই চানাচুর ভাজা কিনে খাওয়া—সেই বাবার পাতানো মায়ের বাড়ী যাওয়া—স্পষ্ট ভাবে সব কথা মনে এল।

আজ আর একটা আজগুবি কথা মনে এল। হঠাৎ কলকাতার গিয়ে প্রসন্নদের বাড়ীটা কি মদনমোহন ঠাকুরের বাড়ীর সামনে সেই শৈশবের মাঠওয়ালাটা ভাড়া নিয়ে বাস করা যায়? করবো নাকি? পঁচিশ বছর পরে আবার যদি সেই পঁচিশ বছর আগের দিনগুলো ফিরে আসে তবে তো!

॥ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

কাল রাত্রে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমি গোষ্ঠবাবু দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখলাম। খুব যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন গিয়ে শুয়ে পড়ি। আজ সকালে উঠে

প্রথমে জিনিসপত্র রওনা করে দিলাম। পরে খাওয়ার পরে ঘোড়া করে রওনা হলাম, মিত্র সঙ্গে সঙ্গে এল। লোধা মণ্ডলের টোলা ছাড়িয়ে এসে কাদা ততটা নেই, সেদিন অনাদি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন যতটা ছিল—পরে এসে পরশুরামপুর ঘাটে পৌছুনো গেল। কাছারীটা চিনতাম না—অড়হরের ক্ষেত বেয়ে বেয়ে এসে কাছারী পৌছান গেল। গত বৎসর মোহিনীবাবু ধামশ্রেণী গিয়েছিলেন—সেই ধামশ্রেণী। শৈশবের কত স্মৃতি মাখানো! জিজ্ঞাসা করলাম, রাণী সত্যবতীর ঠাকুরবাড়ীতে আজকাল রাত্রে সে রকম ভোগ হয় কিনা—সেই মজাপুকুরটা আছে কিনা। সেখান থেকে ঘোড়া ছেড়ে কারু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আসতে কলবলিয়ার ধারের পথ বেয়ে দেখি বনোয়ারী পাটোয়ারী আজমাবাদ চলেছে। তারই হাতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বড় খামখানা দিয়ে দিলাম। কলবলিয়ার পথ বেয়ে বেয়ে কখনো জোরে কখনো আস্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ভগবানদাস টোলার মধ্যে এলাম। পাছে পথ ভুলে যাই, এইজন্য সব সময়ে ডান দিকে বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার দিকে নজর রাখছিলাম। সে টোলা ছাড়িয়ে সোজা কলবলিয়ার ধারে ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কলাই ক্ষেতে ক্ষেতে তিনটাঙার প্রজারা কলাই তুলছে। একটা বাবলা বন পেরিয়ে ·কটা সুন্দর পথে এলাম। বামদিকে পথের ছায়াঝোপ, কি সব ফুলে ফুটে আছে, বেশ ছায়া পড়েছে—সেইদিকটা কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ঘোড়া করে এলাম, পরেই আবার একটা উলুখড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়া খুব জোরে ছুটিয়ে দিয়ে সামনে দেখি কুতকটোলা। তারপরেই পরিচিত সহদেব সিংএর বাসা দিয়ে লছমন মণ্ডলের টোলার অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে এলাম কাছারী। পথে পথে উৎসব বেশে সজ্জিতা নরনারী চন্দ্রগ্রহণের মেলা দেখে গল্প-গুজব করতে করতে কোশকীপুর অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছে। এ যেন বহু দূর থেকে অজানা পথ বেয়ে মোটরে কি এরোপ্লেনে করে নিজে পথ চিনে চিনে কখনো ধীরে কখনো জোরে এঞ্জিন চালিয়ে চলে এলাম—পথে পাহাড়, নদী, অজানা বনজঙ্গল, বেশ লাগল আজকার দিনটায়।

সন্ধ্যার সময় বসে আরাম চেয়ারটায় ঠেস্ দিয়ে অনেক কথা ভাবছিলাম। এই চেয়ারটা যেদিন থেকে তৈরী হয়েছে- ভ্রমণ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে। সেই সত্যবাবুর বাড়ীর দেউড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়ে চেয়ারটা নিয়ে নামলাম—সেই ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে তৃপ্ত হলাম—পরদিন থেকে যাত্রা শুরু হোল। মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, ৪১ মীর্জাপুর স্ট্রীট। সেই ফরিদপুরে সত্যবাবুর বাড়ী, গোয়ালন্দর স্টীমারে, মাদারিপুর, বরিশালে অনাদিবাবুর বাড়ী, চাটগাঁয়ের স্টীমার, কক্সবাজারের স্টীমারের ডেকে, সীতাকুণ্ডে, নকসিংদিতে, জ্যোতির্ময়ের ওখানে ঢাকায়—আবার ৪১, মীর্জাপুর স্ট্রীটে। বড় বাসায়, ইসমাইলপুরে,—কত জায়গায়। এই তো সেদিন কানিবেনের জঙ্গল হয়ে, জামদহ, অমরপুরের ডাকবাংলায় শালবনের মধ্যে নির্জন রাত্রি যাপন করে গেলাম দেওঘর। তারপর এই গেলাম রামচন্দ্রপুরে, বেণীবনে, বক্রডোয়ার ধারে ধারে, লক্ গেটে সূর্য্যাস্তের সময় কত বেড়ালাম। এই তো গেলাম পাটনা—শোণপুরে মেলা দেখলাম। জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্যালেজা ঘাটে স্টীমারে বসে চা খেতে খেতে

গঙ্গা পার হয়ে পাটনায় বৈকুণ্ঠবাবুর ওখানে ফিরে এলাম। হাসান ইমামের যে নতুন বাড়ীটা উঠছে তারই কাছে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবা, তারপর সেই কালীর সঙ্গে মালদা, সেই রাজগীর যাওয়া, সেই বাঁশের বন, শোন ভাণ্ডার, সেই চেনো, হয়নোৎ, শো—অদ্ভুত নামের স্টেশন সব—সেই গড়িয়ার জলায় জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে সাড়ে আটটায় গাড়ীতে রাজপুর যোয়া সেই জাঙ্গিপাড়াকে ভাবতাম কতদূরের দেশটা! কতদিন পরে আজ মনে হোল সেই তারামোহনের পুরানো বাড়ীটার কাছ দিয়ে পথ বেয়ে কাদের বাড়ী গিয়েছিলাম—সেই কলকাতায় হাওড়ায় পুলের কাছে অন্ধ ভিখারিণীকে রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করা—

এই অনবরত ভ্রাম্যমাণ জীবন। ঘুরতে হবেই যে—পথে যে নেমেছি—এই যে এখন তহশীলদার খবর দিলে রংবার লোক লালকিষন সিংকে মেরেছে—এদেশের এই এখন খুনকার—আমাদের গ্রামের হয়ত এইরকম খুনকার আছে—হানিডাঙায় কি বর্দ্ধনবেড়েতে ডাকাতি হয়েছে—যাই হোক আমি পথে নেমেছি। আমি কিছুর মধ্যে নেই, অথচ সবের মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব্ব গতির রূপ আমার চোখে পড়েছে। আমি আজন্ম পথিক—পথে বেরিয়েছি সত্যবাবুর বাড়ীতে যে দিন থেকে নেই—অনেক কাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মাণিকের গান হোল—পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিংএ এলাম—কি ক্ষণে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম জানি না—সেই বিদেশবাস শুরু হোল। পরে আর বারাকপুরকে বারমাসের জন্ত একবারও পাইনি—হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসছি—কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পূজায়—শনিবার পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায়—এখনও অন্ত ভাবে পাই।

এখনও তো শৈশবের স্বপ্ন দেখা সে সব দেশ দেখতে বাকী আছে, পথে যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন সত্যই কি সে সব বাদ থেকে যাবে?

॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

আজও কালকার ঘোড়া চড়াটা ভাল লাগল। আজ একটু বেলা গেলেই বেরুলাম। লালকিষন সিংএর বাসার পথটা দিয়ে, কালোয়ার চক হাটের পথ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু। যেতে হবে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপার। খুব জোরে সুখটিয়া কুলবনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। ঘোড়ায় এই চলাটা আজকাল বড় আরামের মনে হয়। সহদেব সিংএর টোলার কাছাকাছি সেই বনঝোপভরা পথটায় অন্তদিন থামি, কিন্তু আজ বেলা যাওয়াতে আর না থেমে সোজা বেরিয়ে গেলাম। কুতকটোলার মধ্যে মেয়েরা ইঁদারায় জল নিতে আসছে, সেই জন্তে আস্তে আস্তে চালিয়ে বাইরের মাঠটায় পড়ে আবার জোরে ছুটলাম। কলুটোলার সামনে দিয়ে কলাইক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে এসে একটা উঁচু আল পার হলাম—সে জায়গাটি বড় নির্জ্জন, একটা ছোট অশথ গাছ, বনঝোপ, সন্ধ্যার ঘন ছায়া ও নির্জ্জনতা বড় ভাল লাগল। পরেই এসে গঙ্গার ধারে প্রায়ান্ধকার পাহাড়টার দিকে

চোখ রেখে দূরে দিকচক্রবালের ধূসর সান্ধ্য মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘোড়ার ওপর বসে রইলাম। সেই দিনটার কথা মনে পড়ে—সেই জেঠামহাশয়ের সঙ্গে কুঠীর মাঠে গিয়ে ফিরে এসে ভেবেছিলাম কত দূর না গেছি। সেই দিনটি থেকে আজ কত দূর কোথায় চলে এসেছি! মায়ের কথা মনে হ'ল—ঠিক এই সময় মা বলতেন, আমার শীগগির যেতে হবে, ছেলের খাবার দিয়ে দোব।

কি অপূর্ব এই জীবন। এই দুঃখের, আনন্দের, শোকের, স্নেহের, আশার, পুলকের, ভালবাসার স্মৃতি জড়ানো—এই অপূর্ব গতিশীল সুখদুঃখের মধুর এই সুন্দর জীবন দোলা! ধূসর পাহাড়টার ওপরকার সন্ধ্যায় অন্ধকার-ঘেরা বনরাজির মাথার দিকে চেয়ে এক অপূর্বতা অনুভব করে গা যেন শিউরে উঠল—চোখে জল এল। তারপর কতক্ষণ আপন মনে ঘোড়ার উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যা যখন বেশ হয়ে গিয়েছে তখন আবার বয়ুদাম টোলা দিয়েই অন্ধকার মাঠের বনঝোপের পথ বেয়ে অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এসে লছমন মণ্ডলের টোলায় পৌছানো গেল।

তাই এই মাত্র অন্ধকারে কাছারীর পথটায় বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে ভাবছিলাম, ভগবান আমি তোমার অনন্ত স্বর্গ চাই না—তোমার দৈবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্র জগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস, এই ফুল ফল, এই শোক দুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতের মধ্যে দিয়ে বার বার যেন আসা-যাওয়ার পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়। এই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতার বোঝাই বইতে পারি না—এর চেয়ে আর কোন্ বড় দান চাইবার সাহস করবো? বড় ভালবাসি এই মাটির জীবনকে—এরই মাধুর্য্য যে লোভী বালকের মত বার বার আস্বাদ করে সাধ মিটাতে পারি না, একে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারি কি করে?

॥ ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনটা। কত কথাই মনে হয়, দেখতে দেখতে হুহু করে অগ্রসর হচ্ছে—এই সে দিন ১৯২৩ সালের এসময় ওদের ওখানে পড়াতে গেলাম—দেখতে দেখতে সে আজ পাঁচ বছর।

কাল সকালে ইসমাইলপুর থেকে খুব ভোরে বেরিয়ে হাতীর ওপর করে নবীনবাবু ও অমরবাবুর বাড়ি হয়ে ভাগলপুর গেলাম। সন্ধ্যার ট্রেনে অমরবাবুকে রওনা করে এসেই উদয়বাবু ও বেচুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুরেনের ওখানে গান শুনতে গেলাম। বড় ভাল লাগে সুরেনবাবুর গান আমার কাছে এমন শুদ্ধ প্রাচীন সুর আমি কোথাও শুনিনি—যে সব পর্দায় সাধারণের কণ্ঠ নামে না, তাঁদের ওপর সুরেনবাবুর অপূর্ব দখল—সুর-লক্ষ্মীর সকল রকম মান অভিমানের খোঁজ তিনি রাখেন।

আজ সকালে উদয়বাবু স্টেশনে উঠিয়ে দিয়ে গেল। সত্যবাবুর ছেলে তাতুর সঙ্গে এক সঙ্গে এলাম—ভারী সুন্দর দেখতে, বাবার মত একটু বাজে বকে, একটু হামবড়া ভাব।

ক'দিন বড় হৈ চৈ গেছে—আমি ওসব ভালবাসি। জগতের পেছনের যে নির্জন জগৎটা আছে, তা শুধু শান্ত সন্ধ্যায়, নিভৃ বনের লতাপাতার সুরভিতে আমার কাছে ধরা দেয়—গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় আসে। এটর্নি অফিসের ত্রিকসঙ্কুল কল-কোলাহল কর্মমুখর জীবন আমার বিষের মত ঠেকে। তাই আজ শান্ত বৈকালে যখন কলধলিয়া নদীতে নৌকা পার হচ্ছিলাম, তখন বড় ভাল লাগল। এই আকাশ, এই বৈকাল, এই শ্যামল শান্তি, এই অপূর্ব্ব উদার জগৎ—সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না আমার জীবনে এরাই অক্ষয় হয়ে থাকুক। চাই না তোমাদের দশ হাজার টাকার চেক্, মিনার্ভা মটরগাড়ী, পেলিটীর বাড়ীর খানা, অমুক এটর্নির অত আয়ের বিষয় সম্পত্তি। তোমাদের মর্টগেজ ট্রান্সফার প্রপার্টিজ এ্যাক্ট, কোবলা, ওয়ার বণ্ড তোমাদের থাকুক—এই নিঃসীম নীল শূন্য, ওই তারকারাজি, শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় নাগকেশর ফুলের সুরভি, কতদিন-হারা ছেলেমেয়েদের অস্পষ্টপ্রায় মুখগুলো আমার আপনার হয়ে থাকুক।

বেশ মনে আছে, বহুকাল আগের শৈশবে, সেই শিউলিফুলের তলায় ওদিককার ঘাসবনে যখন চড়াই পাখী, দোয়েল পাখী বসতো, এই শীতের দিনে প্রথম প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে পিঠ পেতে বসে মায়ের হাতের পিঠে খেতে যে অপূর্ব্ব কল্পনা জগতের স্বপ্ন দেখেছি—আমার বাঁশবনের ভিটার প্রতি ধূলিকণায় তার লিখন আছে—কোন্ এটর্নি আফিসের মর্টগেজ দলিল বস্তাবেজের মধ্যে তার জুড়ি খুঁজে মিলবে? সেই "নন্দসুত নীল নলিনাও" গান, সেই বালক কীর্ত্তন, সেই বকুলতলা, নটকান গাছ, বিল্‌বিলে, পূব মুখো যাওয়া, ভরত—সেই অদ্ভুত শৈশবস্বপ্ন—আমার সে সবই চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকুক।

আর সম্পদ হয়ে থাকুক, এমার্সন শেলি চেকভ রবীন্দ্রনাথ, আমার ঐ ছেঁড়া কালিদাস-খানা, রামায়ণ বার্ণার্ড শ—এঁদেরই আমি চাই, এঁরাই আমার ঐশ্বর্য্য।

আজ আবার শান্ত গ্রাম্যজীবনের মধ্যে এসে পড়েছি। আবার প্রশান্ত জীবন, সুন্দর নাকছিক শূন্য, সন্ধ্যায় বিচিত্র বর্ণকদম্ব, বজোয়া এসে গল্প করছে, বলছে—ম্যানেজারবাবু, তুমি যখন আসছিলে তখন আমি কুলোকুমারের কলাইক্ষেতে বসেছিলাম, তার পর ভাই কস্তুরিয়া এসেছে, আনন্দিয়া এসেছে—এই সব গল্প করছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটা যেমন শান্তিতে কাটল—সারা বছরটা এই রকম কাটুক।

॥ ১লা জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আবার সে শান্ত জীবন আরম্ভ হয়েছে। কাল ও আজ আবার আজমাবাদের কুলবন দিয়ে পাকা কুল খেতে খেতে ঘোড়া ছুটিয়ে, মহদেব টোলার সেই জোকাকুচা ঝোপবনের ভেতর দিয়ে অস্তসূর্য্যের আলোয় ধীরে ধীরে কুত্তকতোলা দিয়ে গঙ্গার ধারের দূরের পাহাড়গুলোর ধূসর দৃশ্য দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানটাতে ঘোড়া দাঁড় করালাম। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় নদীজল, পাহাড়, বহুদূরের দিক্‌চক্রবাল কোন মায়াজগতের ইন্দ্রজালময় স্বপ্নছবির মত অপরূপ দেখাচ্ছে। আবার সেই মাথার উপরে প্রায়ান্ধকার আকাশের প্রথর নক্ষত্রটি

নীল আলোকবর্ষ দূরের জগতের অজানা কুহক নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—শৈশবের বাঁশবনের গভীর রাত্রে লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের মত গভীর রহস্যভরা জীবনকে আবার ফিরে পেলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাব্‌লা গাছের পাশের সরু খালের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিই, ক্ষেতে ক্ষেতে লোক গান গাচ্ছে, কলাই-এর বোঝা মাথায় করে ক্ষেত থেকে ফিরছে—ভীমদাস টোলার ঘরের উঠানে কলাই-এর ভূষায় আগুন করে গোল হয়ে লোকে বসে আগুন পোহাচ্ছে আর গল্প করছে, ঝরু টোলায় ইঁদারায় মেয়েরা জল তুলছে—দেখতে দেখতে বাইরের মাঠে পড়ি, একটু একটু জ্যোৎস্না ওঠে, হুহু পশ্চিমে বাতাসে কন্‌কনে শীত করে, বাঁধটার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ডানদিকের অস্পষ্ট দিক্‌চক্রবালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেশের কথা ভাবি—ঠাকুরমা, পিসীমা, বড় চারা আমগাছ তলায়, নদীর ঘাটে কি করে আনন্দ ভোগ করে গিয়েছেন গত পুরুষে, সে কথা ভাবি—জ্যোৎস্নায় পথের পাশের আকন্দগাছ চক চক করে, ধুতুরার ফুল সুন্দর দেখায়—কাছারী এসে পৌছাই।

। ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৮ ।

একটু বেশী বেলা থাকতে আজ বেরিয়ে সুখটিয়ার ফুলবনে এগাছে ওগাছে ফুল খেতে খেতে বন ঝোপ অস্তমান সূর্য্য, আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ, ঘুঘু-মিথুন, সবুজ গমক্ষেত দেখতে দেখতে গিয়ে গঙ্গার ধারে গেলাম। চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো গঙ্গার জলে অল্প অল্প পড়ে চিক্ চিক্ করছে—ওপারের কুয়াশাচ্ছন্ন তীরভূমি দেখে হঠাৎ মনে হ'ল—আমি সুনীল ভূমধ্যসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দূরের কোন দ্বীপের দিকে চেয়ে আছি—হাজার দুহাজার বছরকার আগেকার জীবনযাত্রা আবার যেন চোখে পড়ে—কত সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীর দল—খে‍স্‌দেশীয় সামান্য গৃহস্থঘরের শান্ত সহজ জীবনযাত্রা, কত এল্‌ম, ওক্, মার্টল গাছের ছায়া, বন্য আঙুরলতার ঝোপঝাপ, জুনিপার গাছের বন—হাজার বছর আগের যে লোকদল, তাদের সভ্যতা গর্ব্ব, সোনা রূপার রথ নিয়ে ঐ অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন দূর তীরভূমির মতই ছায়া হয়ে হাজার বছর আগে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। অনন্ত জীবন কেবল এই নীল জলধিরাশির পথ অনন্ত পানে বেয়ে চলেছে একটানা—বড় বড় সাম্রাজ্যের কঙ্কাল, তীরস্থ শেওলা, জলজ উদ্ভিদের মত একপাশে হেলায় ফেলে রেখে দিয়ে উদাসীর মত চলেছে। আবার এখন থেকে হাজার বছর কেটে যাবে··সে দূর ভবিষ্যতের নবোদিত প্রভাত সে যুগের তরুণ বংশধরদের কাছে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, মোটর এরোপ্লেন, বেতারযন্ত্র, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নিতান্ত আদিম যুগের পণ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রাচীন রোমানদের স্বর্ণরৌপ্যে ঝকঝকওয়ালা স্প্রিংবিহীন গাড়ীর মত।

মানুষকে শুধু চলতে হবে। চলাই তার ধর্ম—পথের নেশা তোমাকে আশ্রয় করুক। যুগে যুগে তোমাকে আসতে যেতে হবে—নব নব প্রভাতে নব নব ফুলফল, হাসিমুখ তরুণ শৈশব স্নেহ প্রেম আশা হাসি জ্যোৎস্না—পথের বাঁকে বাঁকে ডালি সাজিয়ে তোমার জন্য

অপেক্ষা করছে—অনন্ত জীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে, আবার পেছনে ফেলে চলে যাবে—আবার পাবে।

চরণ বৈ মধু বিন্দতি। চরণ স্বাদুমুদু ম্বরম্—এই চলার বেগের অমৃত তোমার আপনার জীবনে সত্য হোক।

জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে, নতুবা আত্মার দৈন্য ঘোচাতে পারবে না। গতির মধ্যে দিয়ে অনন্তের স্বরূপ চোখে ধরা দেবে। হে জীবন পথের পথিক, পথের ধারে ঘুমিয়ে প'ড়ো না।

॥ ৩ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ পূর্ণিমার দিনটা পূর্ণচন্দ্রকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্যই একটু দেরী করে বেড়াতে বেরুলাম। সুখটিয়া ফুলবনেই বেলা গেল। সহদেবটোলায় তেলাকুচা ঝোপে ভরা সেই পথটায় যখন গেলাম তখন সূর্য্যের রাঙা রোদ ঝোপেঝাপের গায়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে আসছিলাম, প্রতি আকন্দ গাছ, তেলাকুচা লতা, নাটাকাঁটার ঝোপ, ছায়াশ্যামল তৃণভূমি উপভোগ করতে করতে মুখে দোদুল্যমান আলোকলতার স্পর্শ মেখে, পিছনের মাঠে অস্তসূর্য্যের রক্তগোলকটা পিঠের ওপর দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে কুতরু-টোলায় এসে পৌছলাম। তারপর পাখীর কাকলী শুনতে শুনতে ভাইনের শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, একটু দূরেই সন্ধ্যার কুয়াশায় অস্পষ্ট গঙ্গা ওপারের পাহাড়টা দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এলাম। পূর্ণচন্দ্র ততক্ষণ উঠে গিয়েছে—গঙ্গার জলে দীর্ঘ রশ্মি পড়ে কাঁপছে। দিয়া থেকে মাথায় করে লোকে কলাই-এর বোঝা নিয়ে ফিরছে—মাঠে খুপড়ী থেকে কলাই-এর ভূষার সাঁজাল দিয়েছে—তারই ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে।

জীবনটা কি অপূর্ব্ব, শুধু তাই আমার মনে পড়ে। সেই কতদিন আগে—মনে পড়ল, এমন দিনটিতে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে। সেই ছোট্ট ঘরটাতে থাকতাম, মোহন্ত ভোরবেলা উঠে কি স্তোত্র পাঠ করত, আর পিতলের লোটায় ঝোল রেঁধে আমাদের খেতে দিত। সেই তেঁতুলতলার দিকে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওপরের ছাদে বসে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল পড়া স্বপ্নের মত মনে আসে। এই আজকাল পূর্ণিমায় সেই আড়ংঘাটার ছাদটা কি রকম দেখাচ্ছে? বাবার করুণ স্মৃতিমাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলবো? ওপারের ধূসর পাহাড় শ্রেণী, কুয়াশাচ্ছন্ন উদাস গঙ্গা-বক্ষ, সুদূর পূর্ব্ব দিক্‌চক্রবাল⋯এদের সামনে রেখে কেবলই মনে পড়ে আমার দেশের ভিটায় এমনি জ্যোৎস্না আজ উঠেছে—চাঁপা পুকুরের পুকুর ঘাটে, বেলেঘাটা ব্রিজের মাঠে, ইছা-মতীর ধারে, চাটগাঁয়ের মণিদের বাড়ী পুরোনো স্মৃতির সব জায়গাগুলোতে। কুঠির মাঠের কথা হঠাৎ মনে পড়ে—দেশের জন্যে মন কেমন করে! তারপর পূর্ণচন্দ্রকে পেছনে রেখে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। চারধারের মাঠ কুয়াশায় ঘিরে নিয়েছে, সারাদিনের পশ্চিমে বাতাসের পর এত ঠাণ্ডা পড়েছে যে হাতে দস্তানা পরেও আঙুল কন্‌কন্ করছে—জীবদাসটোলায় ঘরে ঘরে লোকে কলাই-ভূষার 'ঘুম্র' লাগিয়ে আগুন তাতছে—ইন্দারায় মেয়েরা জল তুলছে। গত

বর্ষাকালে যে খালটা দিয়ে নৌকা বেয়ে ভগু সিং-এর বাড়ীর পিছনের ঘাট দিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম সে খালটার জল এখন শুকিয়ে গিয়েছে। বালির ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে এলাম। বাঁধের ওপরে উঠে আবার আড়ংঘাটার কথা মনে এল। বাঁধ ছাড়িয়েই এক দৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে ঘোড়া নিয়ে এলাম রাসবিহারী সিং-এর টোলার অশথ গাছটার কাছ পর্য্যন্ত! এত জোরে এলাম যে পরমেশ্বরী কুমারের যে খুপড়ীতে লোকজন আগুন তাপছিল—তারা হাঁ করে চেয়ে রইল।

॥ ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ নতুন পথে গেলাম। সীমানায় চলে গিয়ে অযোধ্যা সিং-এর বাড়ীর কাছের পথ ধরে মহারাজির জঙ্গলের পাশের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। আজকার মত একদৌড়ে অতটা পথ কোনো দিন ঘোড়া যায় নি। ফাঁকা মাঠ, দুপাশে ঘন কাশের ও নল খাগড়ায় বন পার হয়ে বড় বাবলা বনটার পাশ দিয়ে সোজা উত্তর পূর্ব্ব কোণে ঘোড়া ছাড়লাম। বটেশপুর দিয়ারা দিয়ে রাস্তা। মাঠ জঙ্গলের ধার দিয়ে গিয়ে সোজা পৌছানো গেল কলবলিয়ার কিনারায়। কাটারিয়ার এপারে কলবলিয়া যেখানে গিয়ে কুশীর সঙ্গে মিশেছে তার একটু এদিকে জল কম। বটেশপুর দিয়ারা থেকে কলাই-এর বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েরা হেঁটে নদী পার হচ্ছে—সেই পথে ঘোড়া শুদ্ধ পার হয়ে গিয়ে কাটারিয়ার সামনে নতুন রেলপথের ধারে এক বাবলা-বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বেশ সুন্দর ছায়া, পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু নীচু ভূমি—দুটি মেয়েতে কাঠ ভাঙছিল। তারা বললে, এ রাস্তা নয় পুলে যাবার—সামনে দিয়ে পথ। সেখান থেকে নেমে নতুন বাঁধের নীচে যেতে হবে। কাটিহারের ট্রেনখানা বেরিয়ে গেল। একটা জলাতে দুটো বড় বড় জাঙ্গিখল পাখী বসেছিল। বটেশপুর দিয়ারাতে এক ঝাঁক ঘুঘু পথের পাশ দিয়ে উড়ে গেল—বন্দুকটার জন্যে হাত নিসপিস করে।

তারপর খাড়া উঁচু পথে বাঁধটার ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে পুলটার কাছে গেলাম। ডাইনে বাঁয়ে ঘন বাবলা বন ও তেলাকুচা ও অন্য অন্য লতাপাতার ঝোপ—সন্ধ্যার ছায়ায় শ্যামল শীতল। কাটারিয়ার স্টেশনের ওপারে লাল টকটকে সূর্য্যটা অস্ত গেল। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে আবার ঢালু দিয়ে তেলাকুচাঘেরা বাবলাবনটার মধ্যে নামলাম। জেলে দুটো যেখানে রেলবাঁধের নীচে খুপড়ী বেঁধে আছে, সেখান দিয়ে নেমে এলাম। তারপর বাবলাবনের পাশ দিয়ে এসে কলবলিয়া পার হয়ে জোরে ঘোড়া ছাড়লাম। খুব বেলা গেলে আজ বেরিয়েছিলাম কিন্তু এতটা পথ গিয়ে আবার ফিরে এসে ভাল করে অন্ধকার হবার আগেই আজমাবাদ সীমানা ছাড়িয়ে জনকধারী সিং-এর বাসার কাছে এসে পৌছে গেলাম।

॥ ৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ দুপুরের পর বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। অন্য অন্য বার যে পথ দিয়ে যাই আজ সে পথ দিয়ে যাই নি। গুহাটার সামনে দিয়ে একটা পথ গভীর বনের

দিকে চলে গিয়েছে, সেদিকে গেলাম। কত কি বনের গাছ—একটা পাথরের ওপর বসে বসে দূর পাহাড়ের ওপরকার বাঁশবনের শোভা দেখলাম। পাহাড়ের ওপর অনেক কাঞ্চনফুল গাছে ফুটে আছে। সেখান থেকে তলা দিয়ে গিয়ে গিয়ে গভীর একটা বনের কাছে পৌঁছলাম। কল্পনা করছিলাম—চাবুকটা যেন আমার ধনুক—বটগাছের যে ডালটা ভেঙে নিয়েছিলাম সেটা যেন আমার বাণ। সভ্য জগৎ থেকে দূরে এক বন্য আদিম মানুষের জীবন যাপন করতে আমার বড় ভাল লাগে। তাই গাছ যেখানে বড় ঘন, ঝোপ খুব নিবিড়—তারই নীচে দিয়ে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করতে করতে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম পাহাড়ের ওপর বন্য বেতের গাছ হয়েছে—এর আগে বটেশ্বর পাহাড়ের বন্য বেতের গাছ কখনও দেখি নি। অনেকক্ষণ পাথরটার ওপর বসে বসে ভাবছিলাম—শৈশবে শুধু পিসিমা, হরি রায় এরাই আমার সঙ্গী ছিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা, ভীম, সাত্যকি, অশ্বত্থামা এই সব পৌরাণিক চরিত্রও আমার কাছে জীবন্ত ছিল। আমাদের গ্রামে আশে পাশে বনে বাদাড়ে তাদেরও স্মৃতি শৈশবের সঙ্গে জড়ানো আছে যে। রোদ রাঙা হয়ে এলে পাহাড় থেকে নেমে নৌকায় উঠলাম। একটা স্টীমার সকাল থেকে চড়ায় আটকে আছে। একটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পার হচ্ছিল, তার বাপের সঙ্গে নতুন শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে। ঘোমটা খুলে কৌতূহল চোখে স্টীমারটা দেখতে লাগল। নিজে হাল ধরে নৌকা ঠিক ঘাটে লাগিয়ে দিলাম। রাম সাধোকে বললাম, তুমি বন্দটোলা হয়ে চলে যাও। তারপর আমি ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের অভ্যস্ত স্থানটিতে এসে দাঁড়ালাম। কত কথা মনে হয়—সেই আড়ংঘাটায় বাবার সঙ্গে যাওয়া, সেই চাঁপাপুকুর, কত কি? জীবনটা কি বিচিত্র, তাই শুধু ভাবি। সত্যবাবুদের বাড়ী থেকেও এর বিচিত্রতা যেমন দেখলাম—বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে এই বিদেশে পাহাড় নদী বন গঙ্গা অস্তগামী রক্তসূর্য্যে বিচিত্রতার মধ্যেও তেমনি দেখছি।

খুব অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশ-ভরা তারার নীচে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে ভীমদাসটোলা দিয়ে বাঁধের উপর দিয়ে কাছারী ফিরলাম। পথ দেখতে পাই না—ঘোড়া শুধু আপনার ঝোঁকে কদমে চলে। শুধু আমি আর নির্জ্জন মাঠ, একরাশ অন্ধকার, নতুন ঝিমটার মস মস শব্দ ও মাথার ওপরে জলজলে বৃহস্পতি, দীর্ঘ ছায়াপথ।

কাল সকালে এখান থেকে ভাগলপুর যাবো।

॥ ২ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ কাঞ্চনগড়ে গাড়ী করে গিয়ে বিভাসবাবুর সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা কইলাম। তারপর ফিরে এসে ক্লাবে চণ্ডীবাবু ও অমূল্যবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যচর্চা করা গেল। কাল সকালে এক বোতল জ্যাম কিনে নিয়ে ইসমাইলপুর যাবো।

ক্লাবে মডার্ণ রিভিউ পড়ছিলাম। সিসিলিয়া বয়লের লেখা বড় ভাল লাগল। প্রাচীন দর্শন, উপনিষদের এই তত্ত বিদেশিনীর এত ভাল লেগেছে—বড় আনন্দ হ'ল। জীবনে জ্ঞান-

পিপাসায়, উন্নতিপিপাসায় আধ্যাত্মিক পবিত্রতার জন্যে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত্ত আত্মা খুব কম। দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হ'লে বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

এই কৌতূহল, এই ব্যগ্রতা, একটা কিছু হবো, আরও উন্নতি করবো···এইটাই আঁকবার। টমাস হেনরী র‍্যাদারফোর্ডের মত শত শত সুন্দর তরুণ যুবক প্রাচীনদিনের রাইনের প্রাসাদে প্রাসাদে—তাদের জীবন, দুঃখ, অদৃষ্ট মনে বড় লাগে। যে মেয়েটি কর্ণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তার কথা জেনে মনে একটা বড় উৎসাহ হয়। এই জ্ঞান-সুধা যে জাতির মধ্যে আছে তারা যদি বড় না হয় তবে বড় হবে কে?

শৈশবের সে স্বপন দিন আর নাই। উত্তর জীবনে এই আধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা, এই কৌতূহল, এই স্বপ্ন, এই জীবনকে Realise করবার মত ক্ষুধা—এইটাই আঁকবার।

॥ ১২ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ভাগলপুর ॥

পৌষ সংক্রান্তি! সকালে উঠে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনা করা গেল। তারপরে বেলা হ'লে আমরা চার পাঁচ জনে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। রোদ বড় প্রখর লাগতে লাগল। ছোট জলাটা পার হয়ে আমি ও নায়েববাবু ওপারের চড়ার পারে বড় গঙ্গায় নাইতে গেলাম। আমি আসবার সময় গল্প করছিলাম, সেদিন বটেশ্বরনাথের পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নেমে আসবার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণায় সেই বৈকালের ছায়াভরা পাথরের ঘাটটিতে পাণ্ডাঠাকুরের গেলাসে করে সেই নির্ম্মল শীতল গঙ্গার জল যে খেয়েছিলাম—তার কথা। ফিরে এসে নতুন ঘরের নিকানোপোছানো দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসে ভাবছিলাম, বাংলাদেশে বসন্তদিন আসছে—সেই প্রথম গা-নাচানো মন-মাতানো দখিন হাওয়া, সেই পাতা-সাজানো বৈঁচিগাছ, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ, কোকিলের ডাক, সেই দিনগুলো। জীবনকে প্রাণভরে ভোগ করাই জীবনের সার্থকতা। উদারভাবে প্রসারিত মনে ভোগ ব' বেঁচে থাকবার আর্ট। এটুকুও শিখতে হয়।

॥ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ইসমাইলপুর ॥

বৈকালে ঘোড়া করে বেড়াতে বেরুলাম। লোধাই টোলার ওদিকে জলার ধারের রাঁইচী-ক্ষেতের দিকে আকাশটা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল—এত রাঁইচীফুল ফুটে আছে—দূরে সন্ধ্যার ধূসর আকাশের নীচে উন্মুক্ত দূরপ্রসারী হলুদ রংএর রাঁইচীক্ষেত কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল। এই শুকনো কাশবনের সোঁদা সোঁদা ছায়াভরা গন্ধ, এই উদার নীল আকাশ, এই ঘনশ্যাম শস্যক্ষেত্র, এই নির্ম্মল বাতাস, চখাচখির সাঁঝ, দূরের ধূসর পাহাড়রাজি, এই গতির বেগ—সব শুদ্ধ মিলে জীবনকে পরিপূর্ণতা ও সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। আমি না ভেবে পারিনে যে এই উন্মুক্ত উদার গতিশীল যাত্রাপথের পথিক যারা নয় জীবন সম্পদে তারা দীন।

বসিরহাট থেকে পত্র এসেছে বহুদিন পরে পাটালি পাঠানোর জন্যে। বহুদিনের কথা মনে পড়ে। ৬০, মির্জ্জাপুরের কলেজ হোস্টেলে এই শীতের দিনের যে অপূর্ব্ব দিনগুলো—সেই

প্রথম যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ, নাট্যজগতের বন্ধ শিশিরবাবুর অভিনয় 'ইন্‌স্টিটিউটে' দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে বে যেতে থাকা। তারও আগে এই প্রথম বসন্তের দিনে রবীন্দ্রপরের অন্তে ফাল্গুনী দেখতে যাওয়া—সেই 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—সেই ভূতনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার সঙ্গে Landor পড়ার দিনগুলো! সেই গ্রামের বসন্ত দেখেছি ১৯১৭ সালে—এই দশ বৎসরের মধ্যে তা আর হয়নি।

॥ ১০ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে না এলে কি ষ্টীমার ধরতে পারতাম? জঙ্গল থেকে বার হয়েই দেখি ষ্টীমার এপারে। ভাগ্যিস ছিল ছোট ঘোড়াটা—বালির চর বেয়ে ঝড়ের বেগে ঘোড়া উড়িয়ে তবে এসে ষ্টীমারের ছাড়বার ঘণ্টা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেলাম ঘাটে।

দেবীবাবুর ধর্মশালায় উঠেছি আজ। একবার সরাইখানার অভিজ্ঞতাটা হোক না? দুনিয়াটা তো একটা বৃহৎ ধর্মশালা—বড়র মধ্যে যে জিনিসটা ছোট অথচ বড়রই প্রতীক সেটাকে চিনে নিই।

পাশের ঘরে কে একজন গান গাচ্ছে আর বেহালা বাজাচ্ছে—বাঙালী মনে হচ্ছে। 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গান ধরেছে।

একটা জিনিস নতুন ঠেকছে। কয়দিন হাতে অনেক কাজ, দেখি কি করি।

আজ ছিল বৃহস্পতিবার—আমাদের দেশের হাটবার। ষ্টীমারের ডেকে ব'সে ব'সে কেবল মনে ভেবেছি আমাদের বাঁশ বনে ঘেরা ভিটাটিতে দূর শৈশবের একদিনে সামনের পুরানো পাচীলটা দেখতে দেখতে হাটে বেরুচ্ছি। খানসামা চা দিয়ে গেল, চুমুক দিতে দিতে বার বার সেই কথাই মনে আসতে লাগল। উপরের ডেক আজ ছিল বড় নির্জ্জন, ব'সে ভাববার বড় সুবিধা।

মানসিক ঘুম ব'লে একটা জিনিস আছে শারীরিক ঘুমের চেয়েও তাতে মানুষকে লক্ষ্মী-ছাড়া ক'রে ফেলে! দেহে সজাগ থাকা কঠিন না হ'তে পারে কিন্তু মনে সজাগ থাকা কঠোর সাধনার ওপর নির্ভর করে। সেটা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি।

॥ ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ভাগলপুর ॥

এই দিনটাতে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম সাজকীর টিলায়। দুপুরের পর আজ হেঁটে সাজকী চ'লে গেলাম। উঁচু টিলাটার ওপর তেঁতুলগাছটার তলায় চুপ ক'রে অনেকক্ষণ নির্জ্জনে ব'সে ব'সে চারদিকের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে শ্যামল তালশীর্ষগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। কত বছর আগেকার সে শৈশব সুরটা যেন বাজে—এক পুরোনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর। কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, কত মধ্যাহ্ন আবার যেন ফিরে আসে পঁচিশ বছর পরে।

এই শান্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই মনে পড়ে জীবনটা কি—তা ভেবে দেখতে হবে। এই

পঞ্চাশ ষাট বছরের এবারকার মত জীবনে কি সারাজীবন ফুরিয়ে গেল? এই দুপুর, এই প্রথম বসন্তের আবেশ, এই নীল আকাশ, এই বাঁশের শুকনো পাতা ও খোলার আহ্বান, তেলাকুচালতার দুলুনি—এ সব যে বড় ভাল লাগে।

কে জানে হয়ত যদি আসতেই হয় তবে হাজার বছর পরে। কারণ পার্থিব জীবন ছাড়া আরও একটা অপার্থিব জীবনধারা কল্পনা করতে পারা যায় যাতে আনন্দ বা সৌন্দর্য্য আরও ক্রমপরিস্ফুট হবে—সৌন্দর্য্যের সত্যের উপভোগই জীবনের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।

তা যদি হয় তাতে সময় নেবে। হাজার বছর না হয় পাঁচশো বছরও হ'তে পারে। এসব বিষয়ে কিছুই নিশ্চয়তা নাই। চিন্তার গোঁড়ামি আমি বড় অপছন্দ করি, স্থিতিস্থাপক মন না হ'লে সত্যদর্শী হওয়া বড় শক্ত। কাজেই যদি ধ'রে নেওয়া যায় ওপরের কথাটাই সত্য তো এই পৃথিবীর আলো হাওয়া জল মাটির কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে? তাই নীরব রহস্যভরা মধ্যাহ্নে সেই বিদায়-বেদনার সুর বড় বাজে।

অমরবাবু, উপেনবাবুর সঙ্গে রণজিৎবাবুর বাড়ী যাওয়া গেল। ফিরে আসতে আসতে কথা হ'ল আমরা বেদের দল, তাঁবু ফেলে ফেলে বেড়াচ্ছি। রাখালবাবু চলেন কলেজে—উপেনবাবু তল্পি নিয়েই মঙ্গলবারে কলকাতা। ভাগলপুর শূন্য হয়ে পড়েছে। কাল আবার সঙ্গীতসমাজে Recitation-এ বিচারকের আসন গ্রহণ করতে হবে।

॥ ২১শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

সঙ্গীতসমাজে আবৃত্তির প্রতিযোগিতার বিচারকগিরি করতে গেলাম বেলা তিনটার সময়। সেখানে একটা ছেলে বড় সুন্দর আবৃত্তি করলে। সেখান থেকে চণ্ডীবাবু অম্বিকাবাবু ও আমি গেলাম ক্লাবে। সেখান থেকে চা-এর নিমন্ত্রণে গেলাম। সারাদি॰ Engagement-এর ভিতর দিয়ে দিনটি বেশ গেল।

একদিকে যেমন সরল সহজ জীবন দরকার অন্যদিক থেকে আলো শিল্প সৌন্দর্য্য সঙ্গীতও যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এটা ভুলে গেলেও তো চলবে না।

॥ ২২শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

কাল যেমন সারাদিনটি বাদলা গিয়েছে ঘোরাও গিয়েছে সারাদিন খুব। বেলা চারটার সময় বেরিয়ে ভিজতে ভিজতে উপেনবাবুর বাড়ী, সেখান থেকে স্টেশনে উপেনবাবুর টিকিট বিক্রী ক'রতে। সেখান থেকে ধর্ম্মশালায় ‹..য়েই বেরুনো হ'ল চণ্ডীবাবুর বাড়ী। সেখানে থেকে অমরবাবুর বাড়ী হয়ে উপেনবাবুর বাড়ী গিয়ে রাত কাটানো গেল। সকালে উঠে চা খেয়ে সেখান থেকে এলাম সুরেনবাবুর বাড়ী। তারপর ধর্মতলায় ব'সেই ইসমাইলপুর রওনা হওয়া গেল। খুব মেঘ মাথায়, ঘোড়াটা জোরে ছুটিয়ে ভিজে কাশের গন্ধ উপভোগ করতে করতে এলাম কাছারীতে।

পরদিন বৈকালে বর্ষণসিক্ত সবুজ কচি গমের ক্ষেত ও হলুদ রংএর ফুলে ভরা রাই ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে বেড়াতে গেলাম। দূরের পাহাড়গুলো আবার পরিষ্কার নীল রং ধরেছে বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের তলে সবুজ গম ক্ষেত ও হলুদ রংএর সমুদ্রের মত ফুলে ভরা রাই ক্ষেত আমার চোখে কি মোহ-অঞ্জন যে পরিয়ে দিল! ঈশ্বর ঝা লোধাই টোলা থেকে বেরিয়ে দু'খের কথা বলতে বলতে আমার ঘোড়ার পিছু পিছু কুণ্ডীর কাছাকাছি গেল। সেখান থেকে সে পথে গঙ্গা দেখে ফিরলাম। বাজা মণ্ডলের টোলা আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটা যা ছুটল! শূয়োরে যেসব ক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে তার মধ্য দিয়ে খুব জোরে ঘোড়া ছুটল।

॥ ২০শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এ জীবনে প্রথম দেখলাম সরস্বতী পূজার দিন এভাবের বাদল হয়। দুপুর থেকে আকাশ অন্ধকার ক'রে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এখন সন্ধ্যাবেলা টেবিলে আলো জ্বলছে, আমার বাংলো ঘরটায় ব'সে আপন মনে লিখছি—চারধার অন্ধকার ক'রে বেশ জোরে বিষ্টি পড়ছে—ঠিক যেন ছেলেবেলার এক শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। অথচ এটা বসন্তকালের প্রথম দিনটা—যে সময় কলকাতায় গান করতাম 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। আজ অনেক লোক খাবে, ব'লে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু দই আসেনি বলে ঘোড়া নিয়ে মুকুন্দী চ'লে গেল বাগলাকুণ্ড। বায়না ক'রে সরস্বতী পুজোর আয়োজন হ'ল ঠিক আর বছরের মত। ঈশ্বর ঝা পুজো করতে এল, আমি ও গোষ্ঠবাবু ঠাকুর সাজালাম। নায়েব মশায়ের বাসা থেকে পিঁড়ি আলপনা দিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। বাবার পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরীটা ও রামায়ণখানা বার ক'রে দিলাম ঠাকুরের পিঁড়িতে। বাবার খাতাখানা নিজের হাতে চন্দন মাখিয়ে ও ফুল সাজিয়ে বড় আনন্দ পেলাম। তিনি কি জানতেন তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পরে প্রথম যৌবনে তাঁর ছেঁড়া খেড়ো লেখা খাতাখানা বিহারের এক নির্জ্জন কাশ বনের চরের মধ্যে ফুল চন্দন দিয়ে অর্চ্চিত হবে?

ঈশ্বর ঝা ও তার ভাইকে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালাম। ওরা রসগোল্লা এদের দিতে চায় না—হুকুম দিয়ে আনালাম, এদের দিলাম। রামচন্দ্র সিং আমীনকে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়ে প্রসাদ খাওয়ালাম। তারপর ধাঙোড়রা বাইরে বৃষ্টি মাথায় খেতে বসলো। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ালাম। খ্যাড়া মহুয়া দই ও একটু একটু ক'রে গুড় পেয়ে সেই টিপ টিপ বাদলের দিনে ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় বর্ষণমুখর আকাশের নীচে অনাবৃত মাঠে ব'সে খেতে খেতে তাদের উৎসাহ লোভ আনন্দ দেখে চোখে জল এল।

কলক্ষা চামার ছেলেপিলে নিয়ে অন্ধকারে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে ময়লা গামছা পেতে চিঁড়ে খাচ্ছে ও চেঁচাচ্ছে—গুথা আছি মালিক, হে মালিক থোড়া গুড়। সিকদা পরিবেশন করছে, কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিচ্ছে না। ওরা যখন ভিজছে তখন আমার ঘরে ব'সে আরাম করবার কোন অধিকার নেই ভেবে আমিও ভিজতে ভিজতে গিয়ে

সেখানে দাঁড়ালাম ও হুকুম দিয়ে তাকে ও তাদের ছেলেদের আরও দই গুড় আনিয়ে দিলাম।

অন্ধকার বৃষ্টিধারায় ধোঁয়াকার ধূ ধূ মাঠের দিকে চেয়ে মনে পড়ল, কতকালের সেই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সরস্বতীপুজোতে কুঠির নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে যাওয়া।

কতকাল—কতকাল আগে—

জীবন কি অদ্ভুত, তাই মনে মনে ভাবি—

সেদিন সাজকীর সেই অপূর্ব্ব দুপুরটা মনে পড়ছে। সেই রৌদ্রদীপ্ত তালবৃক্ষশ্রেণী, সেই অপূর্ব্ব শৈশব স্মৃতিটা—সার্থক ছিল সে যাত্রা আমার। শুভক্ষণে ধর্মশালা থেকে বেরিয়েছিলাম।

বড় লোকের বাড়ীর অভিজ্ঞতাটুকু লিখছি।

রামচন্দ্র সিং আমীনকে আমার বড় ভাল লাগে। একা জঙ্গলের ধারে থাকে। আমোদ উৎসবে ওকে কেউ ডাকে না। বড় শুদ্ধ-সত্ত্ব লোক। তাই আজ ওকে ডেকেছি। প্রসাদ পেয়ে স্ফূর্তিতে কাছারী ঘরে বসে গান করছে—

তেরা গতি লখি না পারিয়া—

হরিচন্দর রাজা···গিরে ডোম ঘরে শনি দয়া হোইজী···

আর বারের মত। সেই আবার ভয়ানক Home sickness. পশ্চিমে হাওয়া—হীরেনবাবু, কাল্টঘরে লিখবার টেবিল···ঘুর পোয়ানো···জঙ্গলের মাথায় চাঁদ ওঠা।

খুব হাসছে, আর গাইছে :

একলাখ পুত সওয়া লাখ নাতি—
সকরি কোই নাম আয়ী—
দয়া হোই জী···

'কোই নাম আয়ী' অংশটা বার বার জোর দিয়ে গাইছে। গোষ্ঠবাবুও মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করছে। রামচরিত ভিজতে ভিজতে নওগাছিয়া ডাকঘর থেকে এসে বললে, চিঠিপত্তর কিছু নেই।

॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ সবুজ সব রাঁইচীক্ষেতে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলাম। ফিরে এলে গোষ্ঠবাবু ঘরে এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। ছট্টু সিংএর পাঠানো পেয়ারা খাওয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে দেশের কুঠীর মাঠের একটা দিনের ঘটনার ছবি অস্পষ্ট মনে এল। নতুন বোষ্টমীর আখড়ার পেছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে একদিন সকালে কুঠীর মাঠের দিকে যাওয়া। আউির নীচের ক্ষেতে কে নতুন চষেছে—জ্যাঠামশায় মা কে সঙ্গে আছেন—ফিরে এলাম।

সে কি প্রথম দিনটা কুঠী যাওয়া ? তাল মনে হয় না।

সেই সময়ের মনের ভাবগুলো বেশ ধরা যায়। ঐ দিনটা স্পষ্ট মনে এলে ঐ দিনের—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার শৈশবের এক হারানো দিনের ভাবনাটাও স্পষ্ট মনে পড়ে। ছুটো এক ফটোগ্রাফের প্লেটে তোলা ছবি একত্রে মস্তিকের কোথায় যেন আছে—এতদিন কত অন্ত প্লেটের তলে চাপা পড়েছিল—আজ হঠাৎ হাত পড়েছে।

॥ ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি! এরকম রাত্রি বিয়া ছাড়া অন্ত কোথাও দেখা যায় না—আর দেখা যায় বড় বাসার ছাদে। চারধার নিস্তব্ধ, সামনের কাশবনের মাথায় দুগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নাধৌত আকাশে রহস্যময় তারার দল। শুধুই মনে পড়ে, জীবনটা কি বিচিত্র রহস্য—এ শুধু একটা বিচিত্র অনন্ত রহস্য, এর সব-দিকেই অসীমতা—যেদিকে যাওয়া যায়। চাঁপাপুকুরের সেই যে বাড়ীটাতে নিমন্ত্রণ করেছিল, আমাদের গ্রামের সেই দশ-বিঘা ধানের বাঁশবন, বড় চারা আম তলায়, জাঙ্গিপাড়ার স্কুলের সামনের মাঠে—এরকম জ্যোৎস্না পড়েছে আজ—যখন এই সব বিভিন্ন স্থান ও তৎসংশ্লিষ্ট স্মৃতির কথা মনে ভাবি তখনই হঠাৎ জীবনের বিচিত্রতা প্রগাঢ় রহস্য আলোকে অভিভূত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়ে অনন্ত আকাশের নক্ষত্ররাজির উপর—কে জানে ওর চারপাশের অন্ধকার গ্রহদলের মধ্যে মধ্যে কি বিচিত্র-জীবন-ধারা প্রবাহ চলেছে। কোন্ দেববালকের মায়াময় শৈশব-স্বপ্ন দেশের গাছ-পালা ভূমিশ্রীর মধে কাটছে যুগ্যে যুগে—অপূর্ব্ব দেবতার লীলাভূমি কত সৌন্দর্য্য ভরা নব নব জগৎ—কত উচ্চস্তরের জীবকুল।

হাজার হাজার বর্ষস্থায়ী বিচিত্র প্রেম তাদের জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবন মৃত্যু বিরহমিলনের ভিতরে অক্ষুণ্ণ, চির সজীব ধারায় বয়ে চলে—কত সভ্যতার উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে, কত পৃথিবীর ধ্বংসসৃষ্টির তালে তালে। প্রাচীন ইজিপ্টের সে রাজকন্তার আত্মার কথা মনে পড়ে। এক বত্রিশ বৎসরের জীবনে যদি এই আনন্দের এই প্রাচুর্য্য, অনন্ত জীবন পথের পথিকদের হাজার হাজার বৎসর স্মৃতির মধ্যে কি অমৃত সঞ্চিত আছে—যদি অমৃতের পুত্রেরা তাদের সত্যকার অধিকার না হারিয়ে ফেলে? জন্মে জন্মে যুগে যুগে হারানো প্রেম ফিরে পাওয়া স্বপ্ন কল্পনা, না বাস্তব?

মৃত্যুর ওপারেও কি কল্পনা ধ্যান চলবে? সেখানে তো লেখা নাই- আধ্যাত্মিকতার আগ্রহ নাই, তবে কোন্ উদ্দেশ্যে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহ? হয়ত সেখানে তার উত্তর মিলবে।

আমি এই আকাশ, এই তারাদল, এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাত্রি এই নির্জ্জন মুক্ত জীবন ভালবাসি। প্রাণভরে ভালবাসি। বাংলার বারান্দায় ডেকচেয়ার পেতে বহুদূরের জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে একমনে চেয়ে রইলাম—কালীঘরের নীচেই যে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে তার মাথা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। অনন্ত দেশের রহস্যবার্ত্তার মত একটা বড়

নক্ষত্র, নির্জন ঝাউ ঝাড়ের মাথায় জল জল করছে—হু হু পশ্চিমে হাওয়া বইছে—কি এক অপূর্ব রহস্য মনে যে নিয়ে আসে। কি সব চিন্তা আনে? কি মাধুর্য্য··মনকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কেবল বহুদূরের কথা মনে পড়ে। আজ কাছারীর সামনে কাশজঙ্গলে সূর্য্যাস্তের সময় বেড়াতে গেলাম। গভীর নির্জনতা শুকনো কাশের ভরপুর গন্ধ—বাঁকাভাল বড় ঝাউএর ঝোপ—শুকনো খটখটে মাটির গন্ধ- সোঁদা সোঁদা—অনেকদূরে ভাগলপুরে গঙ্গার ওপর রাঙা সূর্য্যটা হেলে পড়ছে।

এই অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত এদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। এর সঙ্গে পরিচয় এদেশে এসে—বিহারের এই দিগন্তব্যাপী মাঠ, চরের মধ্যেই দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটরক্ত সিন্দুর বিন্দুর মত অপূর্ব্ব অস্তসূর্য্য সবুজের সমুদ্রের মত শস্যক্ষেতের ওপর যখন ঢলে পড়ে তখনই মনে হয় অনন্ত অন্তরতম অন্তরকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে—আমার উদ্দাম মুক্তিকামী স্বাধীনতাপ্রিয় মন এই প্রসারতা এই নির্জ্জন বন্য সৌন্দর্য্যের কর্কশ প্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হ'ল, সার্থক হ'ল।

তাই আজ ভাবছিলাম জীবনে কেউ শত্রু নয়—অল্পদিনের ব্যবধানে যাকে মনে হয় অমিত্র, দূরের ব্যবধানে তাকে দেখা যায় সে জীবনে পরম মিত্রের কাজ করছে। রাজকুমার, বাবু, খুকী- এ দু'জনের মত মিত্র কে?

আমার প্রসারতাপ্রিয় নির্জ্জনতাকামী মনকে ধ্যানের অবসর এরাই না যুগিয়েছে? ভগবান এদের আত্মাকে আজকালের জ্যোৎস্নাধারার মত শুভ্র করুন।

কাল সকালে উঠে জোয়ান ক্ষেত দেখতে দেখতে মুক্তিনাথের স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে বাসনাপুর যাবো। সকালে রামগিরিতে রামের ঘোড়াটা যাবে ঠিক হ'ল ও রামধনিয়া চাকর ব্যাগ নিয়ে যাবে। ভাটলি গোটা দেখে আমি ঘোড়া নিয়ে ঐ পথে অমনি চ'লে যাবো জোয়ান ক্ষেতে, সেখানে গণপৎ তহশীলদার ও মোহিনীবাবু আমীন উপস্থিত থাকবেন। পরে কাছারীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আহারাদির পর বৈকালে ফিরবো।

বড় ভাল লাগে এই উন্মুক্ত জীবন, বড় ভাল লাগে এই ঘিরা, এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, এই বন, কাশ ঝোপ, দূরের নীল পাহাড় দুটি, এই ঘোড়ায় চড়া, এই সর্ষে ফুলের গন্ধ, সকলের চেয়ে মনকে চারপাশে ছড়িয়ে দেবার এই অপূর্ব্ব অবকাশ!

বাঙ্গালী মণ্ডল আজ এক ঝুড়ি কুল নিয়ে আজমাবাদ থেকে এসেছে। ওদের বথ্‌নীদের কবজ নিয়ে যাবে।

সকালে বার হয়ে ঘোড়া ক'রে রাই ক্ষেত দেখে পরশু রামপুর চ'লে গেলাম। সেখানে বহুদিন পরে কলবলিয়ায় অবগাহন স্নান করা গেল। দূরে কহন গাঁয়ের নীল পাহাড়টা বড় ভাল লাগছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করার পরেই গোষ্ঠবাবু ও আমি হেঁটে বার হলাম। সত্যি, হাঁটার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা ঘোড়ায় চ'ড়ে পাওয়া যায় না। নাঢ়াবইহারের কাছে দূরপ্রসারী ঘন শ্যামল যব গমের ক্ষেত, আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার সারি বড় ভাল লাগছিল—বহুকাল পরে অনেক দূর পায়ে হেঁটে যাওয়ার সুখ অনুভব করলাম। পথের পাশেই নীল ফুলে ভরা খেঁসারীর ক্ষেত, চন্দন রংএর ফুলে ভরা

মটর ক্ষেত, কোথাও আবক্তকলো দূর্বা ঘাসের ক্ষেত। গোষ্ঠবাবু আসতে আসতে আবার কমর চৌধুরীর ক্ষেতের কাছে এসে পথ হারিয়ে ফেললে। আবক্তকলো দূর্বা ঘাসের ঘন কাশবনের মধ্যে দিয়ে খুঁড়ি পথ বেয়ে অনেক ঘুরে এলাম—আর বছরে সেই তেজির ক্ষেতে (যেখানে নীল গাই দেখেছিলাম) যাবার সময় যে রকম খুঁড়ি পথ দিয়ে যেতাম সেরকম। তারপরে কেবলই সবুজ সমুদ্রের মত শস্য ক্ষেত্র—দিগ্‌দিগন্তহীন দূর, দূর সুদূরপ্রসারী আকাশ। অপূর্ব্ব এ বিয়ার দৃশ্য! এরকম নীল আকাশ, এরকম পাহাড়, এ রংএর দূরপ্রসারী শ্যামলতার সমুদ্র আর কোথায়? মাঝে মাঝে বন্য শূয়োরে শস্যক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নির্জ্জন ফসলের ক্ষেত। এই গভীর বনের ধারে একটা কাশের তৈরী কুঁড়ে—তাতেই চাষী রাত্রে শুয়ে এই ভীষণ হিমবর্ষী রাত্রে ফসল চৌকী দেয়। ওরা পথ হারিয়ে গেল—যাদী ঘোড়া নিয়ে আসছিল। সে বললে, এ কোথায় এলাম? গোষ্ঠবাবুও দিশাহারা হয়ে গেল। আমিও প্রথমটা ঠাহর করতে পেরে উঠলাম না। পরে সিধা পথ পেয়ে খানিকটা আসতে আসতে দূরে কতকগুলো কাশের ঘর দেখে আমি বললাম, এই রাজা মণ্ডলের টোলা। গোষ্ঠবাবু বললেন, না। আমি কিন্তু আর খানিকটা এসে বাঁ-ধারে যে পথে লোধাইটোলা, ঘোড়া ক'রে গিয়ে সে পথটা দেখতে পেলাম। তারপর হেঁটে খানিকটা পার হয়ে রঘুনচাঁদের বাসার কাছ দিয়ে মানুষ সমান উঁচু রেড়ীক্ষেত দিয়ে এলাম। মুকুন্দী ও জহুরী আজই বৈদ্যনাথ থেকে ফিরে এসেছে। প্রসাদ দিয়ে গেল। মুকুন্দীকে বললাম, তুমি আমার কাছে আজ রাত্রিতে গল্প করবে। বড় আনন্দের দিনগুলো এসব।

অভিজ্ঞতায় একটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হ'তে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্ত ভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জ্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে।

আজ এমার্সনের "Immortality" প্রবন্ধটা প'ড়ে মনে হ'ল আমার মনের কথা অবিকল তাতে লেখা আছে। কতদিন ব'সে ব'সে ভেবেছি, অন্য জগতের জীবনেও নিশ্চয় চিন্তা, পড়াশুনা, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকবার প্রচুর অবকাশ আছে। হাজার বছর কেটে যেতে পারে তবুও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কারণ কি? ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্মৃতিভাণ্ডার যদি এ মধুকে পরিবেশন করে তবে অনন্ত জীবন পথে দুশো তিনশো বছরের স্মৃতির ঐশ্বর্য্য কি, তা ভাবলেও পুলকে শিউরে উঠতে হয়—হাজার বছরের? দুই হাজার বছরের? বিশ হাজার কি লক্ষ বছরের!

॥ নবমী, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

কাল রাত্রির থেকে খুব বৃষ্টি হ'য়েছিল। ভাবলাম বুঝি সকালে বটেশ্বরনাথ মেলা দেখতে যাওয়া হবে না। সকালে উঠে হু হু পশ্চিমে বাতাস দিচ্ছে। ভাগলপুরে রঘু

উঠছে, বেশ উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে পূর্ব্ব-উত্তর কোণে। কট্‌ মির্জা যাবার জন্ত তৈরী হ'ল—অনেক লোক বটেশ্বরনাথ স্নান করতে চ'লছে। আমিও স্নান ক'রে নিয়ে ঘোড়ায় উঠবো।

ঘোড়া নিয়ে বালাটোলার মাঠে খুব দব খাওয়ালাম। সেখানে থেকে খানিকটা যেতে ঘোড়ার পেটী আলগা হয়ে গেল কিন্তু একটা লোককে ডাকিয়ে সেটা ঠিক করে নিয়ে আবার ঘোড়া ছাড়লাম। কলবলিয়ার মাহতাব্‌ সহিস দাঁড়িয়েছিল, তাকে দিয়ে পেটি কষিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। তিনটাঙার পথটা বেশ ভাল—গাছপালা, আলোক-লতার জাল, ছায়া—খানিকদূর যেতে যেতে মেলার লোক সারবন্দী হয়ে যাচ্ছে দেখলাম—রাঙা কাপড় পরা মেয়ের দল, গরুর গাড়ীর সারি। মেলায় পৌছে এদিকে ওদিকে খুব বেড়ানো গেল। পরে ঘোড়া ছেড়ে লোকপূর্ণ পথ দিয়ে রওনা হলাম। একস্থানে অতি নিরীহ গোবেচারী ভীতু প্রকৃতির একজনকে দেখলাম। ব্রহ্মমণ্ডলের তাঁবুতে সে টাকা পয়সা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে এসেছিল। মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লে মরা কান্না কাঁদে—এ আগে কখনো দেখি নি। যখন কুড়ারী তিনটাঙার এধারের পথে আছি, তখনই সূর্য্য হেলে পড়েছে—খুব ঝাঁড়া গাছের ছায়া, পাশেই সবুজ যবক্ষেত সুগন্ধভরা! ঘুঘু পাখী বনের ছায়ায় ডাকছে—মনে হ'ল কেমন সেই গত পঞ্চমীতে দেশের কুঠীর মাঠ থেকে ফুল খেয়ে এসে আজ পঁচিশ বছর পরে বাড়ীর পিছনে বাঁশবনে ব'সেছিলাম। সে স্থানটিতে এরকম বাঁকা রদ্দুর প'ড়েছে—রবিবার আজ যে, দেশে পঞ্চানন-তলার কাছ দিয়ে হাট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে, বেগুনের কত দর আজ হাটে। ঝুরি দোলানো পথ দিয়ে মাধবপুর নতিডাঙার হাট ক'রে ফিরছে। আরও খানিকটা এসে একজন বললে, বড় রাস্তায় খানিকটা গিয়ে পশ্চিম দিকে বাসনাপুকুর রাস্তা পাওয়া যাবে। সে পথে আসতে আসতে জয়পাল কুমারের বাড়ী। কাছের জঙ্গলে ছুটো বন্তশুয়োর একেবারে সামনে প'ড়ল! তারপরই সোজা পশ্চিমমুখে পথ—ঘন ছায়াভরা ওধার থেকে অস্ত সূর্য্যের রাঙা ম্লান আলো বাঁকা হয়ে মুখে প'ড়েছে। সেই ঘুঘুর ডাক বড় ভাল লাগছিল! পথ ঠিক আছে কিনা জানতে সামনের একদল মেলাফেরতা যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে তারা বললে, বাসনাপুকুর যাবে। একেবারে পড়লাম কলবলিয়ার ধারে। বাসনাপুকুর আসতে রাঙা সূর্য্যটা বহুদূরে ঘিরায় পেছনে অস্ত গেল। ওদিকে পূর্ণিমার চাঁদটা পিছনে চেয়ে দেখলাম বটেশ্বরনাথের পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠেছে। কল্‌বলিয়া পার হবার সময় পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের ধূসর ছবি, ওপরে উঠা পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বাড়ীর ভিটের কথা ভাবছিলাম—সেই ভাঙা কলসী হাঁড়ি পড়ে আছে—কোন্‌কালের এই সজিনা ফুলভরা বসন্ত দিনের বার্ত্তা। পিসীমার কাছে কাটান সেই সব দূরের দিনগুলো। ছোট্ট এক নোনা গাছের ধারের ওপরের ঘরে কত পূর্ণিমার রাত চলে যাওয়া। সামনে ঘিরায় মধ্যে এখান থেকে এখনও ছ'মাইল এই রাত্রে যেতে হবে। ঘোড়া ছেড়ে চ'লে এসে যখন নাঢ়া বইহারে পড়েছি তখন খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে—বাঁয়ে বালিয়াড়ীর ওপরে কাশবন একটা। আশেপাশে কাশের ঝাড়। নির্জ্জন···ধূ ধূ করছে মাঠ আর কাশবন—কোন দিকে মানুষের সাড়াশব্দ নেই। পরে আন্দাজে ঘোড়া চালিয়ে এসে দেখি সামনে সেই পথ-দেওয়া জলাটা

পড়েছে। ঘোড়া টপকে পার হ'ল—প্রতিমুহূর্তেই ভয় হচ্ছিল, বুঝি পথ হারাবো। পরে জঙ্গলটা পার হয়ে লোধাইটোলার নীচের ডাঙাটার ধারে এসে থমকেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ জ্যোৎস্না-ভরা জলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। চাঁপাপুকুরের পুকুর ঘাটে যাবার ইঁদারা-ওয়ালা জমিটুকুতে ওই রকম জ্যোৎস্না পড়েছে। দীর্ঘ শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছাড়লাম—যবের শীষে পা লেগে সির্ সির্ শব্দ হচ্ছিল। লোধাইটোলা ছেড়ে ঘোড়া খুব দৌড় করালাম—Ranchman's Ride-এর মত খুব। গম যবের ক্ষেত দিয়ে এঁকে বেঁকে খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কাছারী পৌঁছালাম সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে।

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার রাত্রি! দাওয়ায় চেয়ার পেতে ব'সে আছি। সামনের কাশবনে জ্যোৎস্না এসে প'ড়ে অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে। কাছারীর অনেকে বটেশ্বরনাথের গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। কত কি পাখী ডাকছে। বিহারের দিক-দিশাহারা মাঠ, তার নির্জ্জনতা দু'একটা সাথীছাড়া রব, কাশবন, বালিয়াড়ী, অস্ত-সূর্য্যের রাঙা-আলো, অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না,—এই সবের মোহ ক্রমে ক্রমে মাথায় পেয়ে ব'সেছে। বড় আনন্দে দিন আজ কাটল। যাতায়াতে চব্বিশ মাইল ঘোড়া-চড়া হ'ল আজ।

আজ জয়পালটোলার নির্জ্জন ছায়াপথটা বেয়ে আসতে কেবলই মনে হচ্ছিল,—দূরে সেই হাটবার, পুবমুখো যাওয়া থেকে বহুদূর জীবনপথে চলেছি। সেই কুলক্ষেতে যাওয়ার দিন, সেই বাঁশবন পোড়ার দিনগুলো—কত কত পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে। এই উদাস ঘুঘুর ডাক, রাঙা অস্ত-সূর্য্যের রোদ এই গতির বেগ এ এক সঙ্গীত। অপূর্ব্ব জীবন সঙ্গীতের নব মূর্চ্ছনার মত মাদকতাময়।

॥ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

কয়দিন ধরে ক্রমাগত জঙ্গলের পথে ঘোড়া নিয়ে বেরুই। উপরি উপরি দু'দিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—সেদিন বড় কুণ্ডীটার কাছে গিয়ে পথ হারানোতে রাচু মিশ্র পথ দেখিয়ে আনে। আর একদিন লোধাইটোলার রাস্তা না খুঁজে পেয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথ বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কালামণ্ডলের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছিলাম—সে পথ দেখিয়ে আনে।

আজ রামজোতকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণপুরে দামড়ীকুণ্ডীর ফসল দেখতে যাই। লছমীপুর ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে গিয়ে গভীর মানুষ সমান উঁচু কাশজঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথ বেয়ে কুণ্ডীর ধারে যখন এলাম, তখন নির্জ্জন জঙ্গলের মাথায় পুবদিকে একটিমাত্র সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ওঃ কি ঘন নির্জ্জন জঙ্গলটা! শুধু উঁচু বালিয়াড়ী ও কাশের বন। ফিরে আসতে আসতে বেশ লাগল। দু'ধারে মানুষের গতিবিহীন নির্জ্জন কাশ-ঝাউএর বন। শুকনো কাশ-জঙ্গলের গন্ধে ভরপুর, সোঁদা সোঁদা বেশ লাগে। মাথার ওপরে তারা এখানে ওখানে—এখানে ওখানে উঁচু-নীচু ঢিবি, বালিয়াড়ী অন্ধকার। বিশাল নির্জ্জনতা, যেন চারপাশের জঙ্গলে আকাশের নক্ষত্র-জগৎ তার রাজত্ব বিস্তার করছে—Vast wilderness!...তার

মধ্যে ঘোড়ায় আমরা দু'টি প্রাণী—ঘোড়াটা পথ দেখতে না পেয়ে টক্কর খাচ্ছে। গভীর জঙ্গলের দিকে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই—কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল খুব ঘন নয়। চক্‌চকে বালি, এখানে ওখানে বন-ঝাউ-এর ঝোপ—উঁচু-নীচু পিছনে কাশ-জঙ্গলের মাথায় তারাভরা পূর্বদিকের আকাশ, সোঁদা সোঁদা কাশ-বনের গন্ধ।

এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জ্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জ্জনতা ভেদ ক'রে যে সুঁড়ি-পথটা ভিটেটোলায় বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়ি-পথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি—এইসব।

দূরে বাংলাদেশে এখন বসন্ত প'ড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ, সজনেফুল প'ড়ে আছে, আমের বউল, কচিপাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণ হাওয়া বইছে—কোকিল ডাকতে শুরু ক'রেছে, তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্তচোখে গৃহলক্ষ্মীদের হাতে আনা সন্ধ্যাদীপ…জানালায় ধূপগন্ধ…দেবতার মন্দিরে আরতি।

। ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ।

প্রায় একমাস পরে দিয়ারা একঘেয়ে কাশ ও বন-ঝাউয়ের বনের নির্ব্বাসন থেকে, বালি, সবুজ গম যবের ক্ষেত, ঘোড়ায় চড়া লোধাইটোলার খুবড়ী—এসব থেকে আজ ভাগলপুরে এলাম। অনেকদিন পরে ভারি চমৎকার লাগছিল। সব যেন নতুন নতুন। কাল এসেই চণ্ডীবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বার হ'লাম—ক্লাব থেকে মাঠে বেড়াতে গেলাম। কমিশনারের বাড়ীর কাছটাতে যখন এসেছি তখন চণ্ডীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হ'ল অনেক কালের কথা—সেই যে সব দিনের বনগ্রাম স্কুল থেকে Homesick হয়ে বাড়ী ফিরতাম। ভারতদের বাঁশতলা, কালীদের বাগানের কোণটা গাবতলাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরীর মত লাগত। কালীর সঙ্গে ইছামতীর ধারে বসে মনে হোত, কতদিন পরে আবার এসব সুপরিচিত স্থানে এসেছি। নভেলে এইসব শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de force হয়ে প'ড়বে।

আজ বৈকালে কলেজের ঘাসবনের পথ দিয়ে বেড়াতে গিয়ে প্রথম ফাল্গুনের গাঢ় স্নিগ্ধ আম্র-বউলের সৌরভে, বাতাবী লেবুফুলের গন্ধে, অপরাহ্নের ছায়ায় কত কথাই মনে আসতে লাগল। কি অপূর্ব্ব জীবনপুলক। বহুকাল পরে দিয়ারা কাশবন থেকে এসে এ-কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! চারধারে যে টুকুন ফুটে আছে, ঝোপে ঝোপে ছায়া নেমে এসেছে—আম্র-বউলের গন্ধে, পাপিয়ার ডাকে বাতাস অবশ। লেবুফুলের গন্ধে, মনে পড়ে কতকাল আগে কোন

কৈশোরের দিনে, স্নিগ্ধ ছায়াভরা বৈকালে যেন গোপালা গয়লার বাড়ীর পাশের চক্কত্তলার পথটা দিয়ে যাচ্ছি।

যাক, তারপর লাইনের ওপরকার সাঁকোর ওপর গিয়ে বসলাম, মনে হ'ল এই অপূর্ব্ব শিল্প যাঁর হাতের—এই পৃথিবী পারের নক্ষত্রজগতে হয়তো কত উন্নত বিবর্ত্তনের জীবজগৎ আছে। তিনি তার অপূর্ব্ব শিল্পপ্রতিভা সে সব উন্নততর জগতে না জানি কত অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন! অনন্ত সৌন্দর্য্যভূমি, এই নক্ষত্র-জগৎ—কত এ ধরণের উন্নত বসন্ত, আরও কত অজানা ঋতু বিলাস তার ধূলায় ধূলায়। যুগে যুগে যে সব শিল্পী, কবি এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির গান ক'রে গিয়েছেন—গ্রীকযুগ, রোমকযুগ, রামায়ণ, কালিদাস, শেলি, শেক্সপিয়র, কীট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথ—এইসব স্রষ্টাদের কথা ভাবি। ভগবানের সৃষ্টিকে এরা আরও কত মধুময় করেছে। ঐসব জগতে কত উন্নত ধরণের কবি, স্রষ্টা, ভাবুক আছেন—কে জানে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, নির্জ্জন জ্যোৎস্নাময়ী, অজানা গ্রহ-জগতে তাঁদের কল্পনার সে অপূর্ব্ব বিলাস।

॥ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এখানকার এক একটা দিন এক একটা সম্পদ হয়ে উঠছে—কলকাতায় এরকম দিন কটা আসে? আমারই বা এর আগে কটা এসেছিল? স্কুল-কলেজের রুটিনবাঁধা কাজ বা স্কুল-মাস্টারীর রুটিনবাঁধা কাজের সময় এসেছিল বটে দিনকতক, League-এর কাজের সময়। কিন্তু সেও বড় ভ্রমণশীল, বেদুইনের মত জীবন ছিল বলে সেও ততটা ভাল লাগেনি।

আজকালকার প্রত্যেক দিনটি এক একটা উৎসব দিনের মত সুন্দর! এত সুপ্রচুর অবসর, এত বৈচিত্র্য আর কখনো কি জীবনে পাব?

আজ তিনটার সময় চণ্ডীবাবু এল, তার সঙ্গে বার হয়ে গেলাম—প্রস্ফুট আম্রমুকুলের গন্ধ-ভরা বৈকালের বাতাসের মধ্য দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জাটাতে ঢুকলাম। দুধারে বৈকালের ছায়ায় সুন্দর গাছগুলো। আমরুল, কামিনীফুল, আমগাছ, দু'চারটা বিলাতী ফুলের গাছ, চিনি না। গঙ্গার ধারে কেমন সুন্দর বাঁশঝাড়, গোলাপের বাগান; Priest-এর সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। রোমান ক্যাথলিক পবিত্র Beatitude সম্বন্ধে আমাকে যা বোঝালেন তা অন্যভাবে আমি নিজের চিন্তার মধ্যে পেয়েছি। মানুষের মধ্যে এমন একটা শক্তি বেড়ে যাবে, যাতে করে সে ভগবানের বিরাট সত্তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে বিরাটের আনন্দ পাবে। বললেন, Inquisition সম্বন্ধে বিশ্বাস করো না—ওটা আমাদের শত্রুদের লেখা, অনেক সত্য আছে বটে কিন্তু অতিরঞ্জনও খুব। বললেন, আমরা Truth সম্বন্ধে Controversy করি না—দুটো একটা Doctrine যারা বাদ দিয়েছে তাদেরও বাদ দিয়েছি। রাজা বিয়ে করতে চাইলেন (Henry VIII)—সেই জন্যে আমরা ইংলণ্ডের মত দেশকে ছেঁটে বাদ দিলাম! St. Lewis বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, এতদূর এসেছেন, বললেন, আমরা আর দেশে ফিরবো না, মৃত্যু হয় তো এখানেই হবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে কলেজের পথে অন্ধকার ঘন আমবনটা দিয়ে রেল লাইনে এসে

উঠলাম। জ্যোৎস্না উঠেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে—এই পাশের তালতলায় গত তার আগে কল্পনা করেছিলাম দুর্গার তাল কুড়ানো, শৈশবে তাল প'ড়ে থাকলে গাছতলায় কি আনন্দ হোত। কি অপূর্ব্ব আম্র-বউলের গন্ধ মাখা জ্যোৎস্না রাত্রিটা! সাঁকোটার উপর অনেকক্ষণ ব'সে গল্প ক'রে স্টেশনে এলাম। কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা—তিনি সংকীর্ত্তন করতে যাচ্ছেন স্টেশনের বাসায়। বাজারে একটা শার্ট কিনে গ্রামোফোনের দোকানে রবি ঠাকুরের আবৃত্তি শুনলাম—আজি হ'তে শতবর্ষ পরে। বৃদ্ধ কবিবরের গম্ভীর গলায় উদাত্ত সুর বড় ভাল লাগল। তারপরে চণ্ডীবাবু চ'লে গেল তার বাড়ী, আমি আসতে আসতে পথে ভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা। ভোলাবাবু দীপবাবুর বাড়ী যাচ্ছেন Electric fittings-এর Canvass করতে। তাঁকে বললাম, দীপবাবু এখন ব্রীজ খেলতে ব্যস্ত, সকালে না গেলে কি দেখা হবে!

দিনটা বেশ কাটল।

। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮।

সকালে নায়েবের সঙ্গে গেলাম কমলাকুণ্ডু। বেশ ঘোড়া ছুটিয়ে সকালের হাওয়ায় রশচুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে দিয়ে গেলাম। কয়েকদিনের জড়তাটা কেটে গেল। ক্ষেতে ক্ষেতে যব পেকেছে। পাকা ফসলের সুগন্ধ চারধার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কখনো আমি ঘোড়া ছোটাই কখনো নায়েব মহাশয় ঘোড়া ছোটান। ফুলকিয়ার সীমানা ছাড়িয়েই জঙ্গল থেকে একটা বুনো মহিষ বার হ'ল। সেটার মূর্ত্তি দেখেই আমি বললাম, এটা মারতে পারে, ঘোড়া ঘোরান মশাই। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেটা শিং নেড়ে লাল চোখে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। যদি তেড়ে মারতে আসে—দু'জনে ঘোড়া ফিরিয়ে চালিয়ে খানিকটা এসে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম—ততক্ষণ মহিষটা চলে গিয়েছে। তারপর আমরা ঘোড়া ফিরিয়ে কমলাকুণ্ডু পৌছলাম। খুব রোদ চ'ড়েছে, কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধূধূ বালিয়াড়ী, পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভ'রে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল। গত পাঁচশত বৎসর ধ'রে কত ফুল ঝ'রে প'ড়ছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধ'রে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হ'ল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথি-পথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিমবন।

এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।

সন্ধ্যার পর কমলাহুড়ু থেকে বেরুলাম। ফিধ্যি জ্যোৎস্না উঠেছে। বালুর উপর চক্‌চকে জ্যোৎস্না! অরপানের নৌকাতে পার হ'তে হ'তে বড় ভাল লাগছিল আর ভাবছিলাম—আজ বৃহস্পতিবার, এই জ্যোৎস্নায় আমাদের দেশে দারিঘাটের পুলের কাছ দিয়ে এসময় হাট ক'রে কেউ হয়তো ফিরছে। রাত্তিরে কারা মাছ ধ'রছে—রাজু সিং জালসমেত ধ'রে নিয়ে এল, ছেড়ে দিলাম। তারপর ফিনিকফোটা জ্যোৎস্না রাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও মাহের পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে যেখানে ওবেলা মহিষ দেখেছিলাম ওখানে এলাম। মনে হ'ল দূরে আমার বাড়ী। এই জ্যোৎস্না-ওঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়িকলসী-গুলো প'ড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মার হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্ত্তি হয়ে উঠছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না। হরি রায়ের জমি-টুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘরকুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবে না। সে দেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘোড়ায় স্টীমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক—পথের নেশাতেই ভোর। মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, এ দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত এসে অন্ন সাজিয়ে গুজিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চাল ডাল - সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুল-তলার শান্ত জীবনযাত্রা সঙ্কীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা, হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার—আমার সংসার নয়।

মাথার উপরের নক্ষত্রজগতের দিকে চেয়ে দেখলাম, এই জীবন ঐ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কত এরকম জ্যোৎস্না রাত্রি, কত এরকম যাওয়া আসা, কত জীবনানন্দ।

যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধু বিশ্বাস বলে নয়—যেন দেখতেও পাই, হাজার হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব আনন্দভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন ক'রবো—পৃথিবী মায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসবো!

সে যাক, দুর্ব্বল-দৃষ্টি লোকে ভাবে আমি হয়েছি Theosophist.

জীবন ভোগ করতে হলে হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিলে ভোগ হয় না—চাই চিন্তা, ধীর চিন্তা। গভীর চিন্তাতে জীবনরহস্যের গভীর অনুভূতি হয়। সেই ছেলেবেলার এই ফাল্গুনে বেল কুড়ানো, চড়কগাছ খেলা, সেই মা, জেঠীমা, মেজ্দা, ভরত—সে জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই চাঁপাপুকুরের ধার, সেই যে কাদের বাড়ী বেড়াতে গেলাম, সেখানেও আজকার মত জ্যোৎস্না উঠেছে—সে জীবনও শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমায় দূরে যেতে হবে—বহুদূর। তা'হলে ভারী চমৎকার জীবনের উপভোগ হবে। জ্যোৎস্না রাত্রি কুজিমান পর্ব্বতে, কি প্যাসিফিকের কোনো কূলভারএর ধারে, কি সমুদ্রের উপর

জাহাজে, কি ইজিপ্টের সুত্তর, কি কয়নাকের মন্দিরের মধ্যে, লুবিয়া মরুভূমির উপরে—এইসব ভাবি।

। ১লা মার্চ, ১৯২৮।

কাল সন্ধ্যার পর ভাবলাম, ষোলপূর্ণিমা রাত্রে ঘোড়ায় বেড়াতে হবে। খুব বেলা গেলে বেরিয়ে রাবজোতের বাগানের কাছে যেতেই জ্যোৎস্না উঠে গেল। রামচন্দ্র সিংএর সঙ্গে কথা ক'য়ে বড় কুণ্ডীটার ধার দিয়ে নির্জ্জন কাশ-জঙ্গলের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেছে। নির্জ্জন। বহুদূর পর্য্যন্ত কেউ কোথাও নেই। শুধু কাশ-জঙ্গল, আর জলের ধার। লোধাইটোলার জঙ্গল পেরিয়ে জলাটার ওপর বড় সুন্দর জ্যোৎস্না প'ড়েছে—খানিকক্ষণ ঘোড়া ইচ্ছামত ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম। তারপর খুব জোরে ঘোড়া চ'ড়ে ফিরে এলাম।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। সারাদিন ভীষণ পশ্চিমা বাতাস ব'য়েছে—এখনও সমানে বইছে। ধুলো-বালিতে চারধার ভরপুর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, বালি-ধুলোর পর্দ্দায় ম্লান করে দিয়েছে—ঘোলা ঘোলা জ্যোৎস্না। সামনের ধূ ধূ কাশবনগুলো জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে, হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়েছে—বহুদূর জঙ্গলে আগুন লেগেছে, সেদিকের আকাশটা রাঙা হয়ে উঠেছে। আর মাঝে মাঝে দাউ দাউ ক'রে লক্‌লকে আগুনের শিখা খুব উঁচু হয়ে আকাশটাকে লেহন করতে ছুটছে।

বাংলাদেশের শান্ত দৃশ্যের কাছে এই নির্জ্জন বাত্যাক্ষুব্ধ ধূ ধূ জ্যোৎস্নাভরা মাঠ জঙ্গলের দৃশ্য, ঐ বনের আগুন, এই ধূলোভরা আকাশ কি অদ্ভুত মনে হয়!

। ৬ই মার্চ, ১৯২৮।

রামবাবুর ঘোড়াটা চ'ড়ে বড় আরাম পাওয়া গেল। কাল বৈকালে, পরশু রামপুরের মাঠে একেবারে সোজা কদমচালে চ'লে গেল—আজ তেলিং সাক্ষী দিতে নওগাছিয়া হয়ে এলাম—কি সুন্দর, লছমীপুরের ধাপটার কাছে এসে দেখি রূপলাল সবে ধাপটা পার হচ্ছে, লোকারা চামার মোট নিয়ে পিছনে। ঘোড়াটা হু হু করে উঁচু পাড়টার ওপর উঠে গেল—কি সুন্দর কদমই ধরলে! এরকম ঘোড়া চড়া কখনো হয়নি, এ কয়দিন বেশ হ'ল। নওগাছিয়া ইঁদারার কাছে ঘোড়া জল খেলে—তারপর একেবারে রামবাবুদের গোলা। তারপর ভাগলপুরে এসেই চণ্ডীবাবুদের বাড়ী এলাম। অনাদিবাবুর সঙ্গে গল্প করলাম, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মনে হ'ল সেই পাশের পথটা—পিসিমা জল নিয়ে প্রথম এল—আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে সেই প্রথম এলাম—দেখতে দেখতে কতকাল হ'ল!

Goethe-এর কথাটা ভাল লাগে—Those who cannot hope about a future life are already dead in this life. সন্ধ্যাবেলা অনিলবাবু উকিলের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের যাত্রা শোনা গেল।

। ১০ই মার্চ, ১৯২৮।

আজ তগু সিংএর আহাজে বিকালের দিকে ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এলাম মহাদেবপুর ঘাট। মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—মুকুন্দ, মাগব, পূরণ, ছট্টু সিং এবং সিপাহী ও রূপলাল—এই কয়জন সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে আসতে সাহস না পেয়ে আস্তে আস্তে এলাম। বালির চরে আসতে না আসতে অন্ধকার হয়ে গেল—বাঁ-ধারে পর্ব্বতের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। গঙ্গার ঘড়িয়ালগুলো আমাদের পায়ের শব্দে ঝুপুস ঝুপুস ক'রে জলে নেমে গেল। আমি নেমে হেঁটে চললাম। মুকুন্দকে বললাম, গল্প বল—সে গল্প আরম্ভ করে দিলে। খানিকটা এসে দিকভ্রম লাগল বালির চরের ওপরে। এত ঘন অন্ধকার যে, দু'হাত তফাতের মানুষ দেখা যায় না—আমার বড় লণ্ঠনটা জেলে নিয়ে তবু অনেকটা সুবিধে হ'ল। মুকুন্দ বললে, রাক্ষসের আলো জ্বলছে—এদেশে আলেয়াকে রাক্ষসের আলো বলে। কত ভূতের গল্প হ'ল।

'দেবতার ব্যথায়' এইরকম লিখতে হবে যে, কোন উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম-শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা ক'রে—পথও হারিয়ে যায়। অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা, দুর্জ্জয় সাহসী Pioneers!

। ১৩ই মার্চ, ১৯২৮ ।

আজ বিকালে ঘোড়া ক'রে পরশুরামপুর কাছারী এলাম। কুলিরা আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। মুনেশ্বর ধ'রে-বেঁধে একজন কুলিকে পেয়ে যোগাড় ক'রে তাকে দিয়ে টেবিল চেয়ার পাঠালে। আমি একটু বেলা গেলেই রওনা হলাম। কাল Imperial Library থেকে Conrad-এর বইখানা পাঠিয়ে দিয়েছে—আজ সেইটা পড়ছিলাম। আজকাল ইস্‌মাইলপুর কাছারীটা বড় সুন্দর লাগে। দুবলীঘাসের ফুল, কন্টিকারীর বেগুনী ফুল, বনমূলোর ফুল, আকন্দের ফুল। বৈকালে আজ বেড়াতে গেলাম, ক্ষেতে ক্ষেতে পাকা শস্যের গন্ধ, কাইনি মজুরেরা ফসল কাটছে। কাছারীর ওপর দিয়ে দু'বেলা মেয়েমানুষেরা যাচ্ছে—সকালটা বেশ লাগে। কি অদ্ভুত দুপুরটা—দুপুর রোদে ঝাউ ও কাশবন যেন কোন রহস্যের গভীর মায়া-যবনিকায় ঢাকা থাকে। কত অসম্ভব আর আজগুবি চিন্তা মনে নিয়ে এসে ফেলে। বিহারের ঐ সুদূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরের রৌদ্রে ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট নীল পাহাড় দুটো—পীরপৈঁতির পাহাড়শ্রেণী, দিলবরের খুবডীর পিছন দিয়ে, রামবাবুদের বাসার পিছন দিয়ে একেবারে এতমাদ্‌পুরের কাছারীর দিকে বিস্তৃত থাকে। বড় মৌন, রহস্যময় মনে হয় এই খররৌদ্র প্লাবিত চৈত্র-দুপুর।

আসতে আসতে রণপাল মণ্ডলের ক্ষেতের কাছে জঙ্গলটার সামনেই দেখলাম জমাদার আসছে পরশুরামপুর থেকে—বললে, কুলীরা সব পৌঁছে গিয়েছে। জঙ্গলটার কি সোঁদা সোঁদা গন্ধ! বার হয়েই জোধাইটোলার ধাপটার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তর, দূরের পাহাড়, হু হু উন্মুক্ত হাওয়া, আবার সেই পাকা ফসলের গন্ধ—আঃ এই জীবন। ভাবছিলাম সেই কত দিন আগে পিসিমা এল, ঠাকুরমায়ের পাশের পথটা দিয়ে—আমি ও বাবা এসেছি মামার বাড়ী

থেকে, পিসিমা কফিঘাটে—সেই সব দিনগুলো। নেড়ার বাবা এখনও কলিতাহা লাভবড়পুর ক'রে বেড়াচ্ছে—আর আমাদের বাংলার গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। কচিপাতা গজিয়েছে, কোকিল ডাকছে, কাঞ্চনফুল গাছ আলো ক'রেছে···অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় ঝোপে ঝোপে সুমিষ্ট বনফুলের বাস—ঘেঁটুর পাতা—চড়কের ঢাক—গোষ্ঠবিহার—কোকিলের কুহু, পাপিয়ার মন-মাতানো স্বর, রামনবমী।

অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে বালিতে পড়লাম—রাজু সিং এপারেই দাঁড়িয়ে ছিল—জল পার ক'রে ঘোড়া নিয়ে গেল। ছুবে এসে অনেক দুঃখ করতে লাগল যে, সে তার মেয়ের বিয়ে জমাদারের সঙ্গে দেবে না, তবুও কেন নায়েব তার জন্তে পীড়াপীড়ি করছে।

। ২০শে মার্চ, ১৯২৮ ।

পরশুরামপুর কাছারীতে অনেকদিন পরে বাস করছি। সেই প্রথম ভাগলপুরে এসে হেমন্তবাবুর আমলে কিছুদিন ছিলাম বটে, তারপর সেই একবার এসে বস্তির মধ্যে ঘরটায় ছিলাম। অনেকদিন পরে এখানে কিছুদিনের জন্তে বাস করতে এসে বড় ভাল লাগছে। আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বড় মন খারাপ হয়ে গেল—কিন্তু একটু বেলা হলেই মেঘটুকু কেটে খুব কড়া রোদ উঠল। গরমও। গৈব্বুর তহশীলদারের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ গভীর শীতল জলে অবগাহন স্নান ক'রে বড় আরাম পেলাম বহুদিন পরে। স্নান করতে কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের গাঁয়ের ইছামতীর ঘাট থেকে এই সুন্দর স্নিগ্ধ চৈত্র-দুপুরে কচিপাতা ওঠা বন-ঝোপের পাশ কাটিয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে ফিরে আসা। বালি বড় তেতে গরম হয়েছে—পা পুড়ে যাচ্ছে। রাখালবাবু মারা গিয়েছেন শুনে বৈকালে ঘোড়া নিয়ে তাঁর বাড়ী তিনটাঙাতে দেখতে গেলাম। জয়পাল সাধুর বাড়ীর কাছে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—ডাক্তারবাবুর বাড়ী কোথায়? সে কথা বললে না। তারপর একটা লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে রাস্তা বলে দিলে। এর-ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে একটা বাড়ী কাছে এলে, একটা কর্সামত ছেলে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কেউ নেই। সেখানে দেখি, বটুকনাথ পণ্ডিত কি করছে। সেই বটুকনাথ—যে তৌজিরদিন কাছারী গিয়ে কানের পোকা বার করবার যোগাড় করেছিল। ফিরলাম যখন বেলা প'ড়ে গিয়েছে। বহুদিন দিয়ারায় থাকবার সময় চোখে যখন হঠাৎ এই বড় বড় বট অশ্বত্থগাছ দেখি তখন একঘেয়ে কাশ-ঝাউবনের দৃশ্যের সঙ্গে তুলনায় মনে হয়, যেন কোন অঙ্গারযুগের পৃথিবী থেকে হঠাৎ উচ্চ বিবর্তনের জগতে এসে পৌঁছেছি।

স্নিগ্ধ বৈকাল। ঝোপে ঝোপে পাখী কিচ্ কিচ্ করছে, আলোকলতা দুলছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে এসে পথের ধারে একটা রোদপোড়া ঘাসেভরা মাঠ পেলাম—বড় ভাল লাগল। মাঠের একটা বড় অশ্বত্থ গাছে নতুন কচি রক্তাভ পাতা গজিয়েছে। অনেক শকুনির বাসা—মাঠে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। এই স্নিগ্ধ বৈকালে আমাদের ইছামতীর ঘাটের পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা সব গা ধুয়ে আসছে। যারা ছিল বিশ বছর

পূর্ব্বে নব-বধূ তারা আজ প্রৌঢ়া, জীবনের কত সুখ-দুঃখের ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সেই ফুলগাছ দেখে এসে বাঁশতলায় বসা—গিলিমায় সেই কঞ্চিকাটা বাঁশবন, যার হাতের হাঁড়ী কলসী পোড়ো ভিটায় পড়া—যার হাতের পোঁতা সজনে গাছ—এই স্নিগ্ধ বৈকালে কচিপাতা ওঠা অদ্ভুত ধরনের আঁকাবাঁকা গাছটার সীমারেখার দিকে চেয়ে মন-মাতানো কোকিল, পাপিয়ার উদাস ডাক শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল জীবনটা কি অপূর্ব্ব করুণ সঙ্গীত। সন্ধ্যায় পূরবী গৌরী রাগিণীর মত নির্লিপ্ত নির্বিকার, অথচ চারু-শিল্পের চরম দান। বিহারের এই ধূ ধূ উদাস মাঠ প্রান্তর, দূরপ্রসারী দিক্‌চক্রবাল, দু' একটি পুরোনো শিমুলগাছ—রক্ত সূর্য্যাস্ত বড় ভাল লাগে। দূরের নীল পাহাড়টা—যেন এক মায়া, রাজ্যের সীমা এঁকেছে সন্ধ্যাধূসর পূর্ব্ব আকাশপটে। সারাদিনের খররৌদ্রদগ্ধ মাটির সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া গন্ধ, তারপরেই কলবলিয়ার ঠাণ্ডা জলের গন্ধ—বড় আনন্দ পেলাম আজ।

এখানকার জলের গুণ বড় ভাল দেখছি।

দুপুরবেলা কমলাকুণ্ডুর কাছারীতে বসে বসে লিখি—খর-প্রচণ্ড চৈত্র-রৌদ্র—পাশের ঘর যেন আগুনের মত দাউ দাউ জ্বলে—হু হু পশ্চিমে হাওয়া বয়, আমার খোলা দরজার ঠিক সামনে দূরের ঐ কচিপাতা ওঠা শিশুগাছটির দিকে ও তার পেছনকার উটের পিঠের কুঁজের মত ধূসর পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—কেবল মনে পড়ে, এই মধ্যাহ্নে বাংলাদেশের কত অজানা মাঠ ঘেঁটুফুলে ভরা, উলুখড়ে ভরা, কত মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো, রাঙাফুলে ভরা* শিমুলগাছ। এগাছের ওগাছের তলায় যেন বললাম। অজানা গ্রাম্যপথে মাঠের ধারের বনে গাছতলায় স্নিগ্ধ ছায়ায় ব'সতে ব'সতে পথ হাঁটা, রেলপথ থেকে বহু-বহুদূর সব গ্রাম—কত দরিদ্র পল্লীতে শান্ত নিভৃত জীবনযাত্রা। কত ঘরে কত সুখ-দুঃখ—কত বধূ কত কন্যার শান্ত চোখ।

। ২১শে মার্চ, ১৯২৮।

,আজকার বেড়ানোটা সবচেয়ে অপূর্ব্ব। কলবলিয়া পার হয়ে মুকুন্দপুরের পথে বেড়াতে গেলাম। বেলা একেবারে গিয়েছে। বাঁ ধারে কলবলিয়ার ওপারে সিমালিপুরের দিয়াড়ে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। কমলাকুণ্ডু পার হয়েই পথের ধারে বড় বড় শিমুল পাকুড়গাছ, ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ—বাঁশঝাড়, কোকিলের ডাক, গ্রামসীমার গাছপালার মধ্যে পাপিয়া ডাকছে। বসন্তের দিনে বেশ লাগল। অজানাপথে আকন্দফুল, কচি ওড়াফুলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যেতে এমন লাগছিল! যেতে যেতে একটা গ্রাম প'ড়লো—ধবটুলিয়া, পরে বোচাহি। পথে কীর্ত্তনিয়া বৃন্দাবন হেঁটে আসছে—বললে, মাগরা গিয়েছিল কীর্ত্তন করতে। আমি বললাম—রামবাবুর ওখানে? তারপর সে চ'লে গেল। ক্রমে ভিমুহী পেলাম। চৌধুরীটোলা। সেইখানটা দিয়ে পথের ডানধারে একটা সরু মাটির পথ- দু'ধারে ঘন শিশুগাছের শ্রেণী—ছায়াভরা মাটির পথ। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ধরলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পোড়ো ভিটাখণ্ড—ঘেঁটুফুলের একেবারে জঙ্গল। ঘেঁটুফুলের গন্ধে একেবারে

ভরপুর। ওদিকে আর একটা বাঁশঝাড়, একটা পাড়া। সেইখানটা গিয়ে মনে প'ড়ল অনেকদিন আগে সেই যে গিয়েছিলাম বাগান-গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ী গিয়ে, ওদিকে কোদলার ধারে একটা পুরোনো ভিটেতে- সেই কথা মনে প'ড়ল। ঠিক যেন সেই স্থানটা —এ স্থানটা ঠিক যেন বাংলাদেশ। বিহারে এতদিন পরে বাংলার সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—কোন্ বিদেশে আছি—আজ আমার দেশে বৃহস্পতিবারের হাট, পঞ্চাননতলা দিয়ে মনো শ্যামাচরণ দাদা ফনীকাকা হাট ক'রে ফিরছে— কেউ জিজ্ঞাসা করছে —আজ বেগুনের সের কত? তুমি বুঝি এখন হাট থেকে এলে? আমার মায়ের হাতে পোঁতা সজনেগাছ—ভাঙা কদলী—হরি রায়ের বিষয়—

সে সব থেকে কতদূরে বিদেশে ঘোড়া করে বেড়াচ্ছি—অজানা গ্রামের পথে পথে, অজানা ঘেঁটুফুলের ঝোপের ধারে ধারে—আমার কি সাজে কলকাতার আফিসে ব'সে বদ্ধ হাওয়ায় কাজ? আমার জন্যে এই আকাশ ওই সূর্য্যাস্ত ওই নদী ওই মুক্ত-হাওয়া, স্বাধীনতা —অপূর্ব্ব অপরাহ্ণ! ডেস্কে ব'সে শুধু লেখবার কাজ আমার নয়!

। ২২শে মার্চ্চ, ১৯২৮।

কাল বৈকালে পুরুষোত্তমপুরে মিরার লবটুলিয়ার এপারে খুব হাঙ্গা হয়ে গেল। হাঙ্গার হৈ হৈ শব্দ কাছারী থেকে শোনা যাচ্ছিল। নারায়ণকে ঘোড়া দিয়ে পাঠান হ'ল। খুব ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে খবর দিলে—আজ সকালে আমি ও ছুটু ঘোড়া ক'রে জঙ্গলের পথে ইসমাইলপুর চ'লে এলাম। পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে চেয়ার নিয়ে বারান্দাটাতে বসলাম। দূরে নীল পাহাড়টার দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সুন্দর ইছামতী—আমাদের গ্রাম—এই বৈশাখের সুগন্ধভরা প্রভাত, অপরাহ্ণ, সেই আম জাম তলা, মাঠ, নদী—ঠাকুরমাদের বেলতলাটা বেলফুলের গন্ধ—কতদিনের কত আনন্দ!

খুব জ্যোৎস্না—বড় সুন্দর লাগল।

। ২৮শে মার্চ্চ, ১৯২৮।

পরশু গেল রামনবমী। বসে বসে ভাবছিলাম এই দুপুরে এতক্ষণ পা ছড়িয়ে বালির ওপর দিয়ে সব খেতে চলেছে কারা? রাখাল রায়, হরিশ বাঁড়ুয্যে, বাবা এঁরা নন। তাঁদের পৌত্রের দলেরাই বেশী। সন্ধ্যার সময় বাদা ময়রার দোকান খুলবে—এই জ্যোৎস্নায়। জীবনটা একটা অবাস্তব রূপকথার কাহিনীর মত মধুর ও রহস্যময় ঠেকে।

তারাভরা আকাশের দিকে চাইলে সেই চাঁপাপুকুরের নিমন্ত্রণ খাওয়ার বাড়ী, আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ীর ছাদ মনে হয়। সমুদয় আকাশ, তারাগুলো অপূর্ব্ব রহস্য-ঘেরা মনে হয়। কাল গেল '১লা এপ্রিল'। সেই "১লা এপ্রিলের শান্তোজ্জ্বল ঊষালোকে" ছেলেবেলাকার কথা। কাল ছুটু চ'লে গেল এখান থেকে। বড় পশ্চিমে বাতাসটা দিয়েছে কাল।

। ২রা এপ্রিল, ১৯২৮।

আজ গুডফ্রাইডে। অনেককাল আগে মনে পড়ে এইদিন বনগাঁ স্কুল থেকে সন্ধ্যাবেলা আমি আর ভরত বাড়ী চ'লে এসেছিলাম। সেইটাতেই যেন ভরত মারা গেল। কতকালের কথা সে সব, তবু মনে হয় সেদিন। তারপর কত গুডফ্রাইডে কেটে গেল। কালের চক্রটা ভয়ানক বেগে ঘুরে চলেছে।

এইমাত্র হঠাৎ বড় ঝড় এল। আমি আর গোষ্ঠবাবু আমার ঘরের সামনে বসে আছি—এমন সময় দেখা গেল উত্তর পশ্চিম কোণে ঘন কালো মেঘের পাড়। হাওয়াটা যেন একটু জোর—এমন কি আমরা বলছিলাম বেশ হাওয়া তো? দেখতে দেখতে মেঘের পাড়টা শুমরে উঠলো—তার পরই হু হু ক'রে ঝড়টা এল—সঙ্গে সঙ্গে ধূলো ও ঝিরার বালির চরের সমস্ত বালি উড়ে আসতে লাগল—কমে না—এক এক দমকায় আমার ঘরখানা তো কাঁপতে লাগল।

। ৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ ।

আজ খুব বর্ষা ঘনিয়ে এল ভাগলপুরের দিক থেকে বিকেলটাতে। ছেলেবেলাকার মত কালবৈশাখী যেন। ঘন-কালো মেঘটা ঘুরে গঙ্গার দিক থেকে পৈন্তির পাহাড়ের দিকে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগল কালকের সকালে যে চারধারে পরিখায় বাদামে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল বংশী, জামালপুর—সব ঢেকে দিলে।

ঘনান্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল, এই তো জীবনের সম্পদ—হয়তো তিন হাজার বছর পরে আবার পৃথিবীর বুকে আসবো—তিন হাজার বছর আগের ষাট বৎসরের প্রতিদিন কি অবদানে, সুষমায়, স্মৃতিতে মণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল—কত কালবৈশাখীর মেঘে, কত চোখের হাসিতে, চাঁপাফুলের গন্ধে, কত দুঃখে, কত গানে—সে সব তখন কি মনে থাকবে? এই একটা একটা দিন জীবনের মণিহারে গাঁথা অপূর্ব্ব সম্পদ—প্রতিদিনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ বন্ধুতা—সব। দূরে হয়তো মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছে এতদিনে বনের মধ্যে ডাঁটা ধরে আছে—কে জানে? হয়তো কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে—নয়তো নয়। গতির অপূর্ব্ব বিচিত্রতা আমি লক্ষ্য করছি—সে আমাব চোখে প'ড়েছে।

বসে আছি—কিন্তু কি বিশালবেগে চলেছি।

। ৯ই এপ্রিল, ১৯২৮ ।

কাল থেকে কি একরকম অজানা খুশিতে মন থেকে থেকে ভরে উঠছে— ওই দূরের নীল পাহাড়টার পাশের দিকে চেয়ে থাকলেই সে আনন্দটা পাই। কাল তাই ভাবছিলাম, হে বিশ্বদেব, কি অপূর্ব্ব কাণ্ড সৃষ্টিই করেছ এই মানুষের জীবনে, এই বিশ্বে!

আজ সকালে উঠে গেলাম গঙ্গাস্নান করতে। ফিরে এসে কালীঘরে কলসী উৎসর্গ ক'রে ভারী তৃপ্তি পাওয়া গেল। পুরোরমারী থেকে সিদ্ধেশ্বর মাশিগুকে রামচরিত্র ডেকে আনলে, কারণ মোহনের অসুখ ক'রেছে। তারপর খাওয়ার পর একটু ঘুমোনো গেল। বড় গরমটা প'ড়ে গিয়েছে।

দুপুরে রেড়িক্ষেতের কাছটা থেকে ফিরে আসতে হঠাৎ মনে হ'ল, আজ চড়ক, তিরিশে চৈত্র! অমনি স্নায়ু গাটা যেন শিউরে উঠল—গত-স্মৃতির দ্বার এক ঝাপটা হাওয়ায় খুলে গেল! দুপুরের খররৌদ্রভরা আকাশের তলায় হলুদরং-এর বনমূলার ফুল, আকন্দফুল, বেগুনী-কন্টিকারী ফুল পোড়ো জমিটাতে অজস্র ফুটে অনন্তের সন্ধান এনেছে—আমার খড়ের বাংলা-ঘরের পিছনে। ঐখানটায় দাঁড়িয়ে দূরের নীল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে মনে প'ড়ল, এতক্ষণ আমাদের চড়কতলায় হয়তো দোকান-পসার ব'সে গিয়েছে—হয়তো সেই গাছটায় ছেলেবেলার মত কাঁটা ভাঙছে—কাল গিয়েছে নীলের দিন। হয়তো গাঁয়ে যাত্রা হবে—হয়তো কত আনন্দ হচ্ছে—পুরোনো দলের কেউ কাঁটা ভাঙছে না; নতুন দলের ছেলেপিলেরা, শ'ত জেলে এখনও বেঁচে আছে।

আমাদের বাড়ীর ভিটেটাতে নতুন পোঁতা প'ড়ে আছে, কতকাল আগের এক নব-বর্ষের জলদানের চিহ্ন—দাতা হয়তো বেঁচে নেই। কত যত্নে তোলা ছিল- সেই সজনে গাছটার মত, কত যত্নে সঞ্চয় করা। সামনে বাঁশতলায় ভিটেটাতে যে-সব খোলা-খাপড়া প'ড়ে আছে, কতকাল আগেকার কোন বিস্মৃত নব-বর্ষের ঘটদানের ভাঙা কলসীর খোলা-খাপরা সে-সব? ভাবতেও- এইকালের অনন্ত-প্রবাহের চিন্তা করেই গা কেমন শিউরে ওঠে।

সূর্য্য আছে, চন্দ্র আছে, অসীম বস্তুপিণ্ডগুলো আছে—কিন্তু মানুষ যদি না থাকতো, তবে কিছু না। মানুষ আছে ব'লেই এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, সুখের-দুঃখের আনন্দ-উৎস। অজানা গ্রহ-নক্ষত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু মনে হয় সে-সব স্থান মরুভূমির নয়—তরুণ-মুখের হাসি-কান্নায়, সে-সব অজানা দূরের জগৎও জাগ্রত প্রাণস্পন্দনে ভরা, সেখানেও বিচিত্র সন্ধ্যাকাশে বিচিত্র বনপর্ব্বতের নির্জ্জনতায় বিরহী একা বসে প্রিয়ার কথা ভাবে, মা হারানো ছেলের স্মৃতিতে চোখের জল তোলেন, দেশকর্ত্তারা বড় বড় কাজ করেন, বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ হয়।

এই পৃথিবীতে এই মানুষের মনের সুখ-দুঃখ নিয়েই ভগবানের অপূর্ব্ব কাব্য। এর সঙ্গে জীব-জন্তুর, গাছপালার দুঃখ তাঁর মনে আসে যদি, তবে তাঁর আনন্দের তুলনা কোথায়?

। ১৩ এপ্রিল, ১৯২৮। ৩০শে চৈত্র, ১৩৩৪।

নব-বর্ষের দিনটা।

অনেককাল আগের শৈশবের সেই-সব কালবৈশাখীর দিনের কথা মনে পড়ে। সেই বৃষ্টির গন্ধ, মেঘান্ধকার! আকাশের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘরের কোণে বসা, কাঁথা পাতা, শিল-পড়ার আশায় আগ্রহে আকাশের দিকে ঘন-ঘন চাওয়া, ঘরের দাওয়ায় চেয়ার পেতে মেঘান্ধকার আকাশের দূর পূর্ব্বপ্রান্তে চেয়ে বিদ্যুৎ-চমক—বৃষ্টির গন্ধ উপভোগ করতে করতে মনে পড়ল কত কথা। অনেক দূরে আজ আমার গ্রামে হয়তো চড়কের গোষ্ঠবিহার, ছেলেবেলার মত মেলা হচ্ছে, কত হাসিমুখ ছেলেমেয়ে, পাড়াগাঁয়ের কত মাটির ঘর থেকে এসেছে—এতক্ষণ লাঠিখেলা চলেছে—পঁচিশ বৎসর আগের মত হয়তো। পঁচিশ বৎসর আগের যে বালকের কথা মনে হয়, যার মনে কালবৈশাখী অপূর্ব্ব বার্ত্তা আনতো!

ত্রিশ পঞ্চাশ একশো হাজার তিন হাজার বছর কেটে যাবে। তিন হাজার বছর পরেকার যে বাংলার ছবি আমি এই মেঘান্ধকার নির্জন সন্ধ্যাটিতে বাংলা থেকে দূরের দেশে এক জঙ্গল—পাহাড়ের ধারে ঘরটিতে ব'সে মনে আনতে চেষ্টা করি। হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সভ্যতা, যার বিষয় আমরা কল্পনা করতেও সাহস পাই না, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা তখন জগতে এসেছে। হয়তো ইংরেজ-জাতির কথা, প্রাচীন গ্রীক রোমানদের মত ইতিহাসের গল্পের বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেল ষ্টীমার এরোপ্লেন টেলিগ্রাফ তখন প্রাচীন যুগের মানব সভ্যতার কৌতূহলপ্রদ নিদর্শন-স্বরূপ—সে ভবিষ্যৎযুগের মানবের চিত্রশালিকায় রক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমান বাংলাভাষা, তখন আর কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো এ ভাষা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়ে এর স্থানে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের ভাষা প্রচলিত হয়েছে। বহুদূর ভবিষ্যতের ছবি!

তখনও এই রকম কালবৈশাখী নামবে, এই রকম মেঘান্ধকার আকাশ নিয়ে, ভিজে মাটির গন্ধ নিয়ে, ঝড় নিয়ে, বৃষ্টির শীকরসিক্ত ঠাণ্ডা জলো হাওয়া নিয়ে, তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎচমক নিয়ে—তিন হাজার বছর পরের বৈশাখ-অপরাহ্ণের উপর।

তখন কি কেউ ভাববে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন যুগের এক বিস্মৃত কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় এক বিস্মৃত গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব্ব আনন্দে দুলে উঠতো? এই মেঘান্ধকার আকাশের বিদ্যুৎচমক—সকলের চেয়ে এই বৃষ্টির ভিজে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা কি আশা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা দূর দেশের, দূরের উত্তাল মহাসমুদ্রের, ঘটনাবহুল অস্থির জীবন-যাত্রার কি মায়া-ছবি তার শৈশবমনে ফুটিয়ে তুলতো?

কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভেঙে পাপিয়ার যে মন মাতানো ডাক—গ্রাম্যনদীটির ধারে শ্যাম তৃণদলের উপর ব'সে ব'সে কত গান গাওয়া, কত আনন্দ-কল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মৃদু সুগন্ধ যা তার নববিবাহিতা তরুণী পত্নীর সঙ্গে সে উপভোগ করেছিল? কোথায় লেখা থাকবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সে সব আনন্দকাহিনী?

দূর ভবিষ্যতের যে সব তরুণ বালক-বালিকার মনে এই কালবৈশাখীর নব আনন্দের বার্ত্তা আনবে, কোন্ পথে তারা আসবে?

এই সন্ধ্যায় ব'সে গভীরভাবে একথাগুলো ভাবতে ভাবতে কোন্ গভীরের মধ্যে ডুবে গেলাম! মেঘভরা নির্জ্জন সন্ধ্যা—বিদ্যুৎচমক—ঝড়ের শব্দ—হঠাৎ এই জলের গন্ধে এক অপূর্ব্ব বার্ত্তায় আনন্দে মন শিউরে উঠলো।

এই ঘন মেঘের পরপারে কোথায় যেন আছে অনন্ত প্রাণধারার উৎস, দিকে দিকে যুগে যুগে প্রবহমাণ জীবনের উৎসব, নিত্য শাশ্বত আনন্দলীলা ও অনন্তের গভীর রহস্য, বিশালতা …আর যা আছে, তাদের বর্ণনা মানুষের ভাষায় নেই—কোনো ভাষার ব্যাকরণে তার

প্রতিশব্দ গ'ড়তে পারেনি। 'অনন্ত' 'শাশ্বত' 'নিত্য' 'বিরাট' প্রভৃতি মামুলি একঘেয়ে কথায় তার বর্ণনা শেষ হয়ে যায় না, বোঝানো যায় না প্রকৃতরূপ—যে শুধু এই কালবৈশাখীর বৃষ্টির গন্ধ মিশানো দূর হাওয়ায়, ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎচমকে, ঘনান্ধকার আকাশের রহস্য মনে আসে—অনন্তের সে বেণুগীত।

মানুষের চিন্তা বড় পঙ্গু, তার শক্তি নেই সেখানে পৌঁছায়। নক্ষত্রলোকে যদি কোনো দুঃসাহসিক মানুষ যেতে চায় তবে রেল কি মোটর বাহন নির্দ্দিষ্ট করলে তাকে চলবে না। তাকে যোগাড় করতে হবে আলোকের রথ—একমাত্র আলোকের গতি তাকে আশ্রয় করতে হবে সেখানে পৌঁছাতে হ'লে। এমন একটা জিনিস আছে, যা মনোজগতে আলোর রথের কাজ করে। মনোজগতের সুদূরের বাহন এই জিনিসটা Logic সঙ্গত। শান্ত সুষ্ঠু, ক্রমবদ্ধ, হুঁশিয়ার চিন্তা পদ্ধতি অবলম্বনে সেখানে পৌঁছাতে তুমি লীলাসম্বরণ ক'রে ফেলবে তবুও হয়তো পৌঁছাতে পারবে না।

সে জিনিসটা কি তা বোঝানো মুস্কিল, শুধু অনুভব ক'রে আস্বাদ করবার জিনিস সেটা। Bergson তাকেই Intuition ব'লছেন বোধ হয়—আমি ঠিক জানি না।

আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর। পৃথিবীর দেহটার সম্বন্ধ ঠিক জন্মের মতনই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিস নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত-জীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যু স্পৃষ্ট না হয়ে অক্ষুন্ন অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে, তা তোমার আমার সকলের। যুগে যুগে চিরদিন এই জ্ঞানটাই শুধু মানুষের দরকার— আর কিছু না। দেশে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জল নাই—যাঁরা সে সব দেবার ভার নেবেন বা নিয়েছেন, অত্যন্ত মহৎ তাঁদের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। তাঁরা তা দিন। কিন্তু তার চেয়েও বড় দান হবে এই জ্ঞানটা—শুধু এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের প্রাণে পৌঁছিয়ে দেওয়া। দেহের খাদ্য অনেকেই যোগাতে পারে—আত্মার খাদ্য ক'জন যোগায়?

শুধু এই জ্ঞানটা মানুষ মনে যখন বরণ ক'রে নেবে, তার দৈন্য দূর হবে, হীনতা কেটে যাবে, সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে মুছে পবিত্র হবে।

কালবৈশাখী শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের বুভুক্ষু, অজ্ঞানতাদগ্ধ মনে অমৃতের বর্ষণ করুক। দূর অজানা স্বপ্নজগতের কোণ থেকে বয়ে আসুক।

মনোজগৎ মানুষের অপূর্ব্ব সম্পদ। একে অবহেলা না ক'রে দুঃসাহসিক আবিষ্কারকের উৎসাহ নিয়ে এক অজানা দেশসমূহে যদি অভিযান করতে বার হওয়া যায়, বিশ্বে বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অনেকদূরের আমার গ্রামের চড়কতলার মেলা থেকে হাসিমুখে ছেলে-মেয়েরা মেলা দেখে ফিরে যাচ্ছে—কারুর হাতে বাঁশের বাঁশী, কারুর হাতে মাটির রংকরা ছোরা, মাটির পাখী।

একদল গেল গাঙ্গুলীপাড়ার দিকে, একদল নতিডাঙার মাঠের পথ বেয়ে বেঁটু ও সোনাবনের ধার দিয়ে ছাতিম বনের ছায়ায় ছায়ায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়া ঘাটে যাচ্ছে—পার হয়ে ওপারের চাষা-গাঁয়ে যাবে। পঁচিশ বৎসর আগে যারা ছোট ছিল, এই রকম মেলা দেখে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে তেলে ভাজা জিলিপি খেতে খেতে ফিরে গিয়েছিল—তারা এখন মানুষ হয়ে অনেক দিন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, কেউ কেউ মারা গিয়েছে, কারুর জীবন ব্যর্থতায় হীনতায় ভ'রে গিয়ে বেঁচে থেকেও নেই—আজকার এই নিষ্পাপ, অবোধ, দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলোর পঁচিশ বৎসরের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি কল্পনা করতে বড় ভাল লাগে। দিদি দুর্গা যেন রুক্ষ চুলে হাসিমুখে আঁচলে কদমা বেঁধে নিয়ে মুচকুন্দ চাঁপার অন্ধকার তলাটা দিয়ে বাড়ী ফিরছে—

—অপু—ও অপু—তোর জন্যে কত খাবার এনেছি ভাখ রে,—ও অপু। পঁচিশ বৎসরএর পার থেকে ডাক আসে।

॥ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল ॥

আজকার দিনটি সত্যই মনে ক'রে রাখবার মত—সেই সকালে আটটার সময় ঘোড়া ক'রে বার হওয়া গেল। কমলাকুণ্ড গ্রামের বাড়ী বাড়ী রুগী দেখে বেড়ালাম। কৈমুর মেয়ে, বেহারীদের বাড়ী—বেলা প্রায় বারোটার সময় ফিরে এসে গণপৎদের গাঁয়ে গেলাম। সেখানে যাবার সময় বস্তির এদিকে কাশের মাঠটা থেকে পাহাড় বেশ দেখাচ্ছিল। ভাবলাম সব লোকে আমাদের গাঁয়ে নীলপূজোর দিন দুপুরে কাদামাটি দেখতে গিয়েছে—ছাড়ানো ধানগুলো এখনও কাদার ওপরে, ভাল ক'রে গাছ বার হয়নি। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর—গণপৎদের বাড়ী গিয়ে ওদের বাড়ির মধ্যে সব ঘুরে ঘুরে দেখা গেল—তারপর দইএর শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হলাম। এপারে যুগল শিশি হাতে ক'রে ঔষধ নিতে এল—সব কাজ মিটিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ধিরা কাছারীতে। সেখানে তরমুজের শরবৎ ও লুচি ইত্যাদি ললিতবাবু খাওয়ালেন—কিছুতেই ছাড়লেন না। সাড়ে তিনটার সময় সেখান থেকে বেরুলাম—পথে ললিতবাবুর সঙ্গে Einstein সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'ল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর—আমরা গেলাম কমলাকুণ্ড, সেই বস্তীটার কাছে তিন সীমানার মীমাংসা করতে। সেখানে হরিবাবুর তহশীলদারও এল। সেখান থেকে বার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম—বেলা প'ড়ে গেল—পাহাড়টার দিকে চাইতে চাইতে ভাবছিলাম—গাছটায় দু'একদিন হ'ল চড়কের কাঁটা ভাঙা হয়েছে। আজ যদি হঠাৎ যাই তবে সে সব দেখে মনে হবে আবার ছোট হয়ে বনগাঁয়েই পড়ি। ক্রমে বেশ রৌদ্র পড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। নাঢ়াবইহারের দিকে সূর্য্যটা লাল হয়ে ডুবে যেতে লাগলো। ঘোড়াটা কি চমৎকার ছোটে! কি আরাম! মুক্তমাঠের মধ্যে হাওয়ায় ওরকম ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কি আনন্দের! পথে গণপৎ ঝা ও সহদেব ভকতের সঙ্গে দেখা। ইসমাইলপুর জঙ্গলে একজন কে আগুন দিয়েছে—নাম বললে হংসরাজ—আসরফি আমিন জমি মেপে দিয়েছে বললে। ধিরার যব গম সব কাটা হয়ে

গিয়েছে—তার পর এসে সেই যে জায়গাটা আমি রোজ ঘোড়া নিয়ে পাহাড় দেখি, সেখানে এলাম। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম—বড় ভাল লাগল—মুক্ত উদার মাঠ, হু হু নির্মল হাওয়া—দূরবিসর্পিত দিকচক্রবাল—জঙ্গলের খানিকটা খুঁড়ে ফেলেছে। তাই পাশ দিয়ে এসে লোধাইটোলায় ঐ পথটা দিয়ে ঘোড়াটা খা ছুটলো! এসে ফিরে স্নান করলাম। দিনটা ভাল লাগল—এগার ঘণ্টা ঘোড়ার ওপর কেটেছে আজ। এত ক্লান্ত কোন দিন হইনি।

॥ ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ বৈকালের দিকে ছোট ঘোড়াটা ক'রে ললিতবাবুর খিরা কাছারী গেলাম। বেশ লাগল—বাইরে টেবিল পেতে ললিতবাবু ও মোহিনীবাবু বসে—হু হু করে পূবে হাওয়া আসছে। সারাদিন গরমের পরে বেশ লাগল। টেলিস্কোপে নক্ষত্রটা দেখে নিলাম। Nion Nebula-টাও দেখলাম। তাঁরা Observation-এর জন্যে টেলিস্কোপটা খাটিয়ে রেখে দিয়েছেন। এখন মনে পড়লো ছেলেবেলায় কলকাতা থাকতে দেখেছিলাম, চাঁৎপুর রেলের ধারে জংলী লোক এই রকম টেলিস্কোপ দিয়ে মাপ করছেন—বাবা বললেন, দূরবীন। না জানি সে লোকটা এখন বেঁচে আছে কি-না। তারপর গল্পগুজব করবার পর রাত্রি সাড়ে-ন'টার সময় সেখান থেকে বেরুলাম। লোধাইটোলা পর্যান্ত একজন আলো দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল। ভগনি ভগৎ খাতির ক'রে সুপারী ও সিগারেট দিলে। তারপরই অন্ধকার—পথ দেখা যায় না—মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ—নক্ষত্রের আলোয় একটু একটু পথ দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়া বেশ ছুটল। এক জায়গায়—এমন Romantic লাগছিল - বালা মণ্ডলের টোলার ওদিকের মেয়াক্ষেত থেকে একটা বুনো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে চলে গেল। বামা বৈরিজের বাসাটা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে প'ড়ে ঘোড়াটা খা ছুটলো—একেবারে জঙ্গল—মাথার ওপরে নক্ষত্রভরা আকাশ। কাছারীতে এসে দেখলাম ললিতবাবু Traverse টেবিলের জন্যে Draft-টা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানী ভাগলপুর থেকে এসেছে। টেবিলের ওপর গ্লাসের জলে তিনটা বড় ম্যাগ্নোলিয়া সাজানো।

॥ ১৭ এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

বৈকালের দিকে ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে গেলাম। এক দৌড়ে এতটা পথ কোনো ঘোড়াকে আমি যেতে দেখিনি। লোধাইটোলার ওপারের মাঠে অনেক খেজুর গাছ গত বৎসরের বীজ থেকে বেরিয়েছে। সেখানে ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ও কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়াটা নাকের সামনের বাতাসে ক্রমে ক্রমে মিশে যাচ্ছে দেখতে দেখতে—ধীর, শান্তভাবে ঘোড়া চালিয়ে লোধাইটোলার খামার দিয়ে নিয়ে এলাম। আজ খুব হাওয়াটা।

॥ ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজও খেড়ীকেত গিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দাঁড়ালাম। পাহাড়টা বড় সুন্দর দেখা যাচ্ছে—আসরফিকে কাল বড় রেগে গিয়ে চাবুক নিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে ক্ষেত দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালে।

আজকাল এই অপরাহ্নগুলো যে কি সুন্দর লাগে! প্রতিদিন লেখার কাজ সেরে এই পাহাড়ের এপারে লোধাইটোলায় খেড়ীক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াই। আজ অপূর্ব ভাব মনে এল। সেই বোর্ডিং থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে সোঁদালি-ফুলভরা ঝোপের তলা দিয়ে সকালবেলা মাঠে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওধারের মাঠটা—স্নিগ্ধ নদী জলের গন্ধ—উমা পদ্মফুল দিয়ে শিবপুজো করতো—সেই গ্রামের হাওয়ার, মাঠের রূপে, নদীজলের স্নিগ্ধতার, ফুলেফুলে আত্মা গড়ে উঠেছিল—কি অপূর্ব আনন্দই এরা জীবনে এনে দিয়েছিল একদিন! আজও সে সব আছে—কিন্তু তাদের যেন ছেড়ে দিয়েছে, আর তারা আমার নয়। শৈশবের সে গ্রাম এখন আমার কাছ থেকে বহুদূর চলে গিয়েছে—সে সব পুরোনো পাখীর ডাক, ফুলফলের সুগন্ধ, স্নেহময় মুখের হাসি স্বপ্ন হয়ে দূর অতীতে মিশিয়ে গিয়েছে! দশ বৎসর আগে এমন দিনে সকালে উঠে শিয়ালদহে ট্রেণে চড়ে ৬০, মির্জাপুরের কাছে শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় বিদায় নিয়ে ভোরের বাতাসে কচিপাতা ওঠা বসন্ত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সেই প্রথম বৃষ্টির সোঁদা সোঁদা ভিজা মাটির গন্ধ—তারও আগে সেই P. C. Roy-এর ওখানে নেমন্তন্ন, বৃন্দাবন চাকর—দেশে ফিরে Scott-এর বই পড়তাম শুয়ে শুয়ে—জীবনের প্রথম-যাত্রা—বড় মধুর স্বপ্নমাখা সে দিনগুলো—

আমি জানি আমার কাছে যা মধুর বলে মনে হবে অপরের কাছে তার মাধুর্য্য বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না—তবু ভবিষ্যতে এই ছত্র কয়টি যদি কেউ পড়ে তবে সে যেন ভুলে না যায় যে জীবনের আনন্দ অতি রহস্যময়—কারো কোনো দিনের স্মৃতি তুচ্ছ নয়। তারা যেন মনে রাখে ঐসব দিনগুলো এক গ্রাম্য বালককে যে সুখ একদিন দিয়েছিল, দুনিয়ার রাজৈশ্বর্য্য তার কাছে তুচ্ছ।

সন্ধ্যা হয়েছে। বনঝাউগাছের বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম। বনঝাউ-গাছের মাথায় চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে। অল্প অল্প মেটে জ্যোৎস্না এখনও ফোটেনি—নির্জ্জন কাশজঙ্গল—বনঝাউগাছ—মাথার ওপরে চাঁদ—দ্রুতগামী ঘোড়া—বেশ লাগে।

॥ ২০শে এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এইজন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঘোড়া করে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে গেলাম। খুব বন—খুব বন—এত বনের পথ আমার জানা ছিল না। সেই বনঝাউয়ের বনের মাথায় সুন্দর জ্যোৎস্না যখন উঠেছে, তখন ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে সোঁদা সোঁদা গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম।

সুন্দর—অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় মনে ভাবছিলাম ভরতদের ঘরে বসতো যে বালকটি, কঞ্চি নিয়ে খেলা করত সে—এসব Egotism ছেড়ে এলাম। তবুও এই ঘোড়া চড়ে জ্যোৎস্না ওঠা জঙ্গলের মৃদু সুঘ্রাণ উপভোগ করতে করতে ঐ কথাটা কেবলই মনে হচ্ছে।

। ২০শে এপ্রিল, ১৯২৮ ।

পরিশিষ্ট ॥ সাহিত্যের কথা

সাহিত্য যদিও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোন সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক প্রায় সম্ভবই নয়,—তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন,—যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবি-মানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দ্দেশ্য-ভাবাবেগ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, এর জন্যে আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'র আবহাওয়ায় যত বেশীক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তাঁর লেখার মাল-মশলা,—কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালবাসার স্বালোকক্ষেপ ব্যতীত দৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানব-হৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্ত্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যান। চারিপাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান,—তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তার পক্ষে চরম একাকীত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হ'লে তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

সাহিত্যের কী মূল্য। ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোট গল্প, নিবিড় রেশময়

একটি 'লিরিক', ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, যেখানে বাস্তব জীবন-নাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে,—আমাদের জীবনে এ সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার? উত্তর হচ্ছে, দরকার,—অত্যন্ত বেশী দরকার আরো এই জন্যে যে, এইসব প্রশ্ন এখনো আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লকড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে ঝিমিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি—দু-পাশের এই দুই রকম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটায় আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতি-অভ্যাসে বদ্ধ ঝিমিয়ে-আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আব-হাওয়া সর্ব্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবন-ময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকশিত করে। জীবনের এই অতি-বিরাট পটভূমিকায় জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্ত্তে আপনাকে বড় করে যায়। দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পিছনে পড়ে থাকে—মানুষ খানিকক্ষণের জন্য অন্ততঃ খণ্ড কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ম্ময় চেতনান্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম বেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষণের জন্যেও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনার নেশায় মতন হয় আসক্ত—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা-সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভববৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়, এবং রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশন, যে মূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হল উৎপত্তি,—সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেমকীর্তি জন্মমৃত্যু সব ব্যেপে এবং ছাড়িয়ে যে' নৈর্ব্যক্তিক আনন্দসত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন তার মর্ম্ম এই যে, আমাদের ধরণী ভারী সুন্দর—একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকু বোঝান হল, আমাদের এই দৃষ্টিটি বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে রিয়ালিটি বলে ভুল করি, জীবন-নদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না, তাই তো

কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার—শুকনো মিথ্যা-বাস্তবের পাক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোন মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তা হ'লে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমতি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোন আদেশের উপর যদি জোর দেওয়া হয় তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানির জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যান্ত উপকার কিছু হবে না। রসসাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন' মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্ম রসের স্বাদ-গ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অধিকার মানতে হয়। বাস্তবিক পক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্য্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জয় অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথন অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানতঃ 'ইনটেনসিটি'র দিক দিয়ে—বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুন্ন হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দুদিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্ত্তমানের দাবীকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচে নি, বড় বড় নাম-ওয়ালা কথাসাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়া পাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু'দশজন সাহিত্য-রসিক, দু'পাঁচজন পণ্ডিত, দু'একজন বৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অথও আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন কুইকজোট কে পড়ে? চসার, দান্তে, মিল্টন এঁদের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এদের পাতা ওল্টায় না—সকলে তো কাব্য-প্রিয় নয়—কিন্তু অত বড় যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বালজাক তাঁর উপন্যাস রাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোকে শখ করে পড়ে? স্কট, হেনরি জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে; অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত' প্রভৃতি বড় বড় গাল-ভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেণ্টেন্স রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি।

যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস-সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসার বিরাগী, ঊর্দ্ধবাহু, মৌনী, যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনাস্তে বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা, সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্ব্বেই বলেছি, মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথাসাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালের মত ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে তার মূল্য কিছু থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশী, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখ দুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ীর পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোন ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোন দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্য্য-মণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'এমা বোভারি'র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে!

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্য্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দুই একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোন সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগাণ্ডা

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোন প্রচারবিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফ্‌লেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোন উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ—অনেক কিছুর মত এক্ষেত্রেও। তারপর আমরা আনতে পারি—সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি, দুর্নীতি, শ্লীলতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীত-রূপে আমাদের মানস চেতনায় পাই। এইজন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখন তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই তা হয় আর্ট। তখন তা শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণ-বুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রস-স্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কি জীবনে, কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হ'লে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হ'লে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লোকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং যদিও মানুষের জীবন এত বিচিত্র ও মোহনীয়রূপে জটিল কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবল এইই নয়। তা ছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি!

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মত পরাধীন দরিদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না। "আমাদের দেশে কি আছে মশাই, যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই খাড়া বড়ি থোড"—একথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখা যায়—এসব কথা মাত্র আংশিক-ভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যাসকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল—

বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।

* "সাহিত্যের কথা" স্মৃতির রেখা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছিল না। ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণে উহা সংযোজন করা হয়। উহা বিভূতিভূষণ প্রদত্ত অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত রূপ। নিবন্ধটি গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইবার পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকা'র "সাহিত্যের খবর" নামক বিভাগে প্রকাশিত হয়। ১৩৬৮ সালের ২৮ ভাদ্র বিভূতিভূষণের জন্মদিনে প্রকাশিত "আমার লেখা" গ্রন্থেও "সাহিত্যের কথা" অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমার লেখা

আমি কেমন করে লেখক হলাম, এ আমার জীবনের, আমার নিজের কাছেই, একটা অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য হয়তো একথা ঠিক, নিজের জীবনের অতি তুচ্ছতম অভিজ্ঞতাও নিজের কাছে অতি অপূর্ব্ব। তা যদি না হত, তবে জগতে লেখক জাতটারই সৃষ্টি হত না। নিজের অভিজ্ঞতাতে এরা মুগ্ধ হয়ে যায়—আকাশ প্রতিদিনের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তে কত কল্পলোক রচনা করছে যুগে যুগে—তারই তলে কত শত শতাব্দী ধরে মানুষ নানা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের দিন কাটিয়ে চলেছে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বিষাদ, ঋতুর পরিবর্ত্তন, বনপুষ্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব—কত ছোট বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে—কে এসব দেখে, এসব দেখে মুগ্ধ হয় ?

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের চোখে কল্পনা সব সময়েই মোহঅঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে। অতি সাধারণ পাখীর অতি সাধারণ সুরও তাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে, অস্তদিগন্তের রক্তমেঘস্তূপ স্বপ্ন জাগায়, আবার হয়ত তারা অতি দুঃখে ভেঙে পড়ে। এরাই হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক। এরা জীবনের সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। এক যুগের দুঃখ-বেদনা আশা আনন্দ অন্য যুগে পৌঁছে দিয়ে যায়।

আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতা তাই চিরদিনই আমার কাছে অভিনব, অমূল্য, দুর্লভ হয়ে রইল। যে ঘটনা আমার জীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে বাঁক ফিরিয়ে দিয়েছে—আমার জীবনে তার মূল্য অনেকখানি।

১৯২২ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে একটা পল্লীগ্রামের হাইস্কুলে মাস্টারি চাকুরি নিয়ে গেলুম আষাঢ় মাসে।

বর্ষাকাল, নতুন জায়গায় গিয়েছি। অপরিচিতের মহলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। বৈঠকখানা ঘরের সামনে ছোট্ট একটু ঢাকা বারান্দাতে একলা বসে সামনে সদর রাস্তার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটি ষোল-সতের বছর বয়সের ছেলেকে একখানা বই হাতে যেতে দেখে তাকে ডাকলাম কাছে। আমার উদ্দেশ্য, তার হাতে কি বই দেখব এবং যদি সম্ভব হয় পড়বার জন্যে চেয়ে নেব একদিনের জন্যে।

বইখানা দেখেছিলাম, একখানা উপন্যাস। তার কাছে চাইতে সে বললে, এ লাইব্রেরির বই, আজ ফেরত দেওয়ার দিন। আপনাকে তো দিতে পারছি নে, তবে লাইব্রেরি থেকে বই বদলে এনে দেব এখন।

—লাইব্রেরি আছে এখানে ?

—বেশ ভাল লাইব্রেরি, অনেক বই। দু আনা চাঁদা।

—আচ্ছা চাঁদা দেব, আমায় বই এনে দিও।

ছোকরা চলে গেল এবং ফেরবার পথে আমাকে একখানা বই দিয়েও গেল। আমি তাকে বললাম—তোমার নামটি কি হে?

সে বললে—আমার নাম পাঁচুগোপাল চক্রবর্ত্তী, কিন্তু এ গ্রামে আমাকে সবাই বালক-কবি বলে জানে।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—বালক-কবি বলে কেন? কবিতাটবিতা লেখ নাকি?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বললে—লিখি বই কি। না লিখলে কি আমাকে বালক-কবি নাম দিয়েচে? আচ্ছা কাল এনে দেখাব আপনাকে।

পরদিন সে সকাল বেলাতেই এসে হাজির হল। সঙ্গে একখানা ছাপানো গ্রাম্য মাসিক পত্রিকা গোছের। আমাকে দেখিয়ে বললে—এই দেখুন, এই কাগজখানা আমাদের গাঁ থেকে বেরোয়। এর নাম 'বিশ্ব'। এই দেখুন প্রথমেই 'মানুষ' বলে কবিতাটি আমার। এই আমার নাম ছাপার অক্ষরে লেখা আছে কবিতার ওপরে—বলেই ছোকরা সগর্ব্বে কাগজখানা আমার নাকের কাছে ধরে নিজের নামটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ সত্যিই—লেখা আছে বটে, কবি পাঁচুগোপাল চক্রবর্ত্তী। তাহলে তো নিতান্ত মিথ্যা বলে নি দেখছি।

কবিতাটি সে-ই আমায় পড়ে শোনালে। বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান খুব বড়—ইত্যাদি কথা নানা ছাঁদে তার মধ্যে বলা হয়েছে।

অবশ্য কাগজখানা দেখে আমার খুব ভক্তি হল না। স্টেশনের কাছে একটা ছোট প্রেস আছে এখানে, সেই প্রেসেই ছাপানো—অতি পাতলা জিল-জিলে কাগজ। পত্রিকাখানিকে 'মাসিক' 'পাক্ষিক' ইত্যাদি না বলে 'ঐকিক' বললেই এর স্বরূপ ঠিক বোঝানো হয়। অর্থাৎ যে শ্রেণীর পত্রিকা গ্রামের উৎসাহী লেখা-বাতিক-গ্রস্ত ছেলে-ছোকরার দল চাঁদা তুলে একটিবার মাত্র বার করে, কিন্তু পরের বারে উৎসাহ মন্দীভূত হওয়ার দরুন আশানুরূপ চাঁদা না ওঠাতে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়—এ সেই শ্রেণীর পত্রিকা।

তবু আমার ঈর্ষা না হয়ে পারল না। আমি লিখি না বা লেখার কথা কখনও চিন্তাও করি না। অথচ এতটুকু ছেলে—এর নাম দিব্যি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল। এর ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল, মনে ভাবলাম, বেশ ছোকরা তো। অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে কেমন কবিতা লিখেছে। সাহিত্যের সমঝদারিত্ব তার মধ্যে ছিল তা আমি জানি। তখনকার আমলের একজন বিশেষ লেখকের বই না থাকলে পল্লীগ্রামের কোন লাইব্রেরি চলত না। সেই লেখকের এক একখানা বই-এর তিন চার কপি পর্য্যন্ত রাখতে হত কোন কোন বড় লাইব্রেরিতে।

ছেলেটি বলত—ওসব ট্র্যাশ-ট্র্যাশ! দেখবেন ওসব টিকবে না।

এক এক দিন পাঁচুগোপাল আমাকে নিয়ে গ্রামের বাইরে মাঠে বেড়াতে যেত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চোখও তার বেশ ছিল—মাঝে মাঝে মুখে মুখে কবিতা তৈরি করে আমাকে শোনাত। অনেকগুলো কবিতা হলে পর একটা কবিতার বই ছাপাবে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ

করত। সেই সময় কলকাতার কোনও 'পাবলিশিং হাউস' ছয়-আনা গ্রন্থাবলী প্রকাশ শুরু করে দিল—তার প্রথম বই লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বইখানি স্থানীয় লাইব্রেরী থেকে পাঁচুগোপাল আমায় এনে দিয়ে বললে—"এ বই নিতে ভিড় নেই। নতুন এসেছে, এক-আধজন নিয়েছিল, কাল ফেরত দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখুন গে যান অমুকের বই-এর জন্তে কি যে মারামারি। ডিটেকটিভ উপন্যাস না রাখলে লাইব্রেরি উঠে যাবে। কেউ চাঁদা দেবে না।" পরের মাসে আর একখানি বই বেরুল। সেখানা আমার কাছে নিয়ে এসে সে বললে—"আমি একটা কথা ভাবছি, আসুন আপনাতে আমাতে এই রকম উপন্যাস সিরিজ বের করা যাক। খুব বিক্রি হবে, আর একটা নামও থেকে যাবে। আপনি যদি ভরসা দেন, আমি উঠে পড়ে লাগি।" আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—"তুমি আর আমি দুজনে মিলে বই-এর কারবার করব, এ কখনও সম্ভব? এ ব্যবসার আমরা কিই বা জানি? তা ছাড়া, বই লিখবেই বা কে? এতে লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে হবে, সে পয়সাই বা দেবে কে?"

সে হেসে বললে—"বাঃ তা কেন, বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব। পরকে টাকা দিতে যাব কেন।"

বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসতাম বটে, কিন্তু নিজে কলম ধরে বই লিখব এ ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা আমার কাছে। অবিশ্যি পাঠ্যাবস্থায় অন্য অনেক ছাত্রের মত কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা প্রবন্ধ, এক আধটা কবিতা যে না লিখেছি তা নয়, বা প্রতিবেশীর অনুরোধে, বিবাহের প্রীতি-উপহারে কবিতা যে দু-পাঁচটা না লিখেছিলাম তাও নয়—কিন্তু সে কে না লিখে থাকে?

সুতরাং আমি তাকে বললাম—"লেখা কি ছেলেখেলা হে যে কলম নিয়ে বসলেই হল? ওসব খামখেয়ালি ছাড়। আমি কখনও লিখি নি, লিখতে পারবও না। তুমি হয়ত পারবে—আমার দ্বারা ওসব হবে না।"

সে বললে—"খুব হবে। আপনি যখন বি-এ পাস, তখন আপনার কাছে এমন কিছু কঠিন হবে না। একটু চেষ্টা করুন তাহলেই হয়ে যাবে।" তখন বয়েস অল্প, বুদ্ধিশুদ্ধি পাকে নি, তবুও আমার মনে হল, বি-এ পাস তো অনেকেই করে, তাদের মধ্যে সকলেই লেখক হয় না কেন? অথচ বি-এ পাস করা লোকদের ওপর পাঁচুগোপালের এই অহেতুক শ্রদ্ধা ভেঙে দিতেও মন চাইল না। এ নিয়ে কোনও তর্ক আমি আর তার সঙ্গে করি নি।

কিন্তু করলেই ভাল হত, কারণ এর ফল হয়ে দাঁড়াল বিপরীত। দিন দশেক পরে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি সেখানে নোটিশ-বোর্ডে, দেওয়ালের গায়ে, নারকেল গাছের গুঁড়িতে সর্বত্র ছাপানো কাগজ টাঙানো—তাতে লেখা রয়েছে,—বাহির হইল! বাহির হইল!! বাহির হইল!!! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস!

লেখকের নামের স্থানে আমার নাম দেখলাম।

আমার তো চক্ষুস্থির। এ নিশ্চয় সেই পাঁচুগোপালের কীর্ত্তি। এমন ছেলেমানুষি সে করে বসবে জানলে কি তার সঙ্গে মিশি! বিপদের ওপর বিপদ, স্কুলে ঢুকতেই শিক্ষক

ছাত্রবৃন্দ সবাই জিজ্ঞেস করে,—"আপনি লেখক তা তো এতদিন জানতাম না মশাই? বেশ বেশ! তা বইখানা কি বেরিয়েছে নাকি? আমাদের একবার দেখিয়ে যাবেন।" হেডমাস্টার ডেকে বললেন, তাঁর স্কুল লাইব্রেরিতে একখানা বই দিতে হবে। সকলের নানারূপ সকৌতূহল প্রশ্ন এড়িয়ে চলি সারাদিন—কবে থেকে আমি লিখছি, আর আর কি বই আছে, ইত্যাদি। স্কুলের ছুটির পরে বাইরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

তাকে খুঁজে বার করলাম বাসায় এসে। দস্তুরমত তিরস্কার করলাম তাকে, এ তার কি কাণ্ড! কথার কথা একবার একটা হয়েছিল বলে একেবারে নাম ছাপিয়ে এরকমভাবে বার করে; লোকে কি ভাবে।

সে নির্ব্বাক হয়ে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে –"তাতে কি হয়েছে? আপনি তো এই রকম রাজিই হয়েছেন লিখতে। লিখুন না কেন!"

আমি বললাম—"বেশ ছেলে বটে তুমি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, তুমি নাম ছাপিয়ে দিলে কি বলে, আর দিলে দিলে একেবারে স্কুলের দেওয়ালে, নোটিশ বোর্ডে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছ, এ কেমন কাণ্ড? নামই বা পেলে কোথায়? কে তোমাকে বলেছিল ও নামে আমি কিছু লিখেছি বা লিখব?"

যাক—পাঁচুগোপাল তো চলে গেল হাসতে হাসতে। এদিকে প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে সকলের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হল—বই বেরুচ্চে কবে? কত দেরি আছে আর বই বেরুবার?—মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। সে যা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে তার আর চারা নেই। আমি এখন নিজের মান বজায় রাখি কেমন করে? লোকের অত্যাচারের চোটে তো অস্থির হয়ে পড়তে হয়েচে।

সাতপাঁচ ভেবে একদিন স্থির করলাম—এক কাজ করা যাক। সে একটাকা সিকিজের বই কোনদিনই বের করতে পারবে না। ওর টাকা কোথায় যে বই ছাপাবে? বরং আমি একখানা খাতায় যা হয় একটা কিছু লিখে রাখি লোকে যদি দেখতে চায়, খাতাখানা দেখিয়ে বলা যাবে, আমার তো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি কি করব। কিন্তু লিখি কি? জীবনে কখনও গল্প লিখি নি, কি করে লিখতে হয় তাও জানা নেই। কি ভাবে প্লট যোগাড় করে, কি কৌশলে তা থেকে গল্প ফাঁদে—কে বলে দেবে? প্লটই বা পাই কোথায়? আকাশ-পাতাল ভাবি প্রতিদিন, কিছুই ঠিক করতে উঠতে পারি নে। গল্প লেখার চেষ্টা কোনদিন করি নি। পাঠ্যাবস্থায় সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে সাধ হত, লেখক হতে পারি আর না পারি, একজন বড় বক্তা হতে হবেই।

কিন্তু লেখক হবার কোন আগ্রহই কোনদিন ছিল না, সে চেষ্টাও করি নি। কাজেই প্রথমে মুশকিলে পড়ে গেলাম। সাত-পাঁচ ভেবে প্লট সংগ্রহ আর করতে পারি না কিছুতেই। মন তখন বিশ্লেষণমুখী অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায় নি। সব কিছুতেই সন্দেহ, সব কিছুতেই ভয়।

অবশেষে একদিন এক ঘটনা থেকে মনে একটা ছোট গল্পের উপাদান দানা বাঁধল। সেই পল্লীগ্রামের একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্য বধূকে দেখি পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়—কিন্তু দেখা ওই পর্যান্ত। তাঁর পরিচয় আমার অজ্ঞাত এবং বোধ হয় অজ্ঞাত বলেই একটি রহস্যময়ী মূর্ত্তিতে তিনি আমার মানসপটে একটা সাময়িক রেখা অঙ্কিত করেছিলেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক তো, কি হয় দেখি! গল্প শেষ করে সেই গ্রামের দু-এক জনকে পড়ে শোনালাম—পাঁচুকেও। কেউ বলে ভাল হয়েচে, কেউ বললে মন্দ হয় নি। আমার একটি বন্ধুকে কলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে গল্পটি শুনিয়ে দিলাম। সেও বললে ভাল হয়েচে। আমি তখন একেবারে কাঁচা লেখক; নিজের ক্ষমতার ওপর কোন বিশ্বাস আদৌ জন্মায় নি। যে আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটি বড় পুঁজি, আমি তখন তা থেকে বহু দূরে, সুতরাং অপরের মতামতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় কি। আমার কলকাতার বন্ধুটির সমঝদারিত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল—তার মত শুনে খুশি হলাম।

পাড়াগাঁয়ে স্কুলমাস্টারি করি। কলকাতার কোন সাহিত্যিক বা পত্রিকা-সম্পাদককেই চিনি না—সুতরাং লেখা ছাপানো সম্বন্ধে আমায় একপ্রকার হতাশ হতে হল। এইভাবে পুজার অবকাশ এসে গেল, ছুটিতে দেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম। পুনরায় ফিরে এসে কাগজপত্রের মধ্যে থেকে আমার সেই লেখাটি একদিন বার করে ভাবলাম, আজ এটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পত্রিকা আপিসের সামনে এসে পড়া গেল। আমার মত অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন লেখকের রচনা তারা ছাপবে এ দুরাশা আমার ছিল না, তবু সাহস করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেখা যাক না কি হয়, কেউ খেয়ে তো ফেলবে না, না হয় লেখা না-ই ছাপবে। ঘরে ঢুকেই একটি ছোট টেবিলের সামনে যাঁকে কর্ম্মরত দেখলাম, তাঁকে নমস্কার করে ভয়ে ভয়ে বলি—"একটা লেখা এনেছিলাম—"; ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোথাও আপনার লেখা কি বেরিয়েছিল? আচ্ছা, রেখে যান, মনোনীত না হলে ফেরত যাবে। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।"

লেখা দিয়ে এসে স্কুলের সহকর্ম্মী ও গ্রামের আলাপী বন্ধুদের বলি—"লেখাটা নিয়ে বলেছে শীগগির ছাপবে।" চুপি চুপি ডাকঘরে গিয়ে বলে এলাম, আমার নামে যদি বুকপোস্ট গোছের কিছু আসে, তবে আমাকে স্কুলে বিলি যেন না করা হয়। কারণ লেখা ফেরত এসেছে এটা তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে সহকর্ম্মী ও ছাত্রদের মধ্যে। দিন গুনি, একদিন সত্যিই ডাকপিওন স্কুলে আমায় বললে—আপনার নামে একটা বুকপোস্ট এসেচে, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসবেন। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নবজাত রচনার প্রতি অপরিসীম দরদ যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা বুঝবেন আমার দুঃখ। এতদিনের আকাশকুসুম চয়ন তবে ব্যর্থ হল,

লেখা ফেরত দিয়েচে !

কিন্তু পরদিন ডাকঘর থেকে বুকপোস্ট নিয়ে খুলে দেখি যে, আমার রচনাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের একটি চিঠি। তাতে লেখা আছে, রচনাটি তাঁরা মনোনীত করেছেন, তবে সামান্য একটু-আধটু অদল-বদলের জন্যে ফেরত পাঠানো হল, সেটুকু করে আমি যেন লেখাটি তাঁদের ফেরত পাঠাই, সামনের মাসে ওটা ছাপা হবে।

অপূর্ব্ব আনন্দ আর দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে ডাকঘর থেকে ফিরি। সগর্ব্বে নিয়ে গিয়ে চিঠিখানা দেখাতেই সবাই বললেন—"কারু সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি ওখানে ?—আজকাল আলাপ না থাকলে কিছু হবার জো-টি নেই। সব খোশামোদ, জানেনই তো।" তাঁদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, যাঁর হাতে লেখা দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর নাম পর্য্যন্ত আমার জানা নেই ! তার পর সে গ্রামের এমন কোনও লোক রইল না, যে আমার চিঠিখানা না একবার দেখলে। কারও সঙ্গে দেখা হলে পথে তাকে আটকাই এবং সম্পূর্ণ অকারণে চিঠিখানা আমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসে এবং বিপন্ন মুখে তাকে বলি—তাই তো; ওরা আবার একখানা চিঠি দিয়েচে, একটা লেখা চায়— সময়ই বা তেমন কই ! —হায় ! সে সব লেখকজীবনের প্রথম দিনগুলি ! সে আনন্দ, সে উৎসাহ, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার বিস্ময় আজও স্মরণে আছে, ভুলি নি। নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে গৌরব এবং আত্মপ্রসাদ নিহিত, লেখকজীবনের বড় পুরস্কার সবচেয়ে তাই-ই। স্বচ্ছ সরল ভাবানুভূতির যে বাণীরূপ কবি ও কথাশিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে নিয়ে যান—তা সার্থক হয় তখনই, যখন পাঠক সেই ভাব নিজের মধ্যে অনুভব করেন। এইজন্য লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি ভিন্ন কখনও কোন রচনাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

বালক-কবির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সে-ই একরকম জোর করে আমাকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

পাঁচুগোপালের সঙ্গে মাঝে দেখা হয়েছিল। সে এখন চব্বিশ পরগণার কাছে কি একটা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালার হেডমাস্টার। এখনও সে কবিতা লেখে।

গ্রন্থ-পরিচয়

'পথের পাঁচালী'

'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণ রচিত প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের গ্রন্থকর্তারূপেই বিভূতিভূষণ সাহিত্য-জগতে প্রবিষ্ট হন। তৎপূর্বে 'মেঘমল্লার' গল্প-গ্রন্থের কয়েকটি গল্প তৎকালীন বিখ্যাত সাময়িক-পত্র 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও বটে, প্রথম উপন্যাসও বটে। 'পথের পাঁচালী' পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্বে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে নিয়মিত মাসিক কিস্তিতে 'বিচিত্রা'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে শুরু হয় (আষাঢ়—১৩৩৫)।

'পথের পাঁচালী'র 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক রচনা হিসাবে প্রকাশকাল: আষাঢ় ১৩৩৫—আশ্বিন ১৩৩৬।

পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশ: পথের পাঁচালী, প্রথম সংস্করণ: মহালয়া আশ্বিন ১৩৩৬, (ইং ১৯২৯)। পৃ ৪২৭, কাপড়ে বাঁধাই। প্রকাশক রঞ্জন প্রকাশালয়, ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, [রুম নং ১৬।১ শ্রীমাণি মার্কেট, দ্বিতল], প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'পথের পাঁচালী' পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্বে রঞ্জন প্রকাশালয়ের তরফে ১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের সূচীপত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠার নীচে গ্রন্থটির নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বাহির হয়—

> **পথের পাঁচালী**
>
> শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস। প্রকৃতির স্বাধীন আবহাওয়া একটি শিশু চিত্তকে কি ভাবে ধীরে ধীরে সংসার-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে তাহারই বিচিত্র ইতিহাস অপরূপ ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে। শিশু-মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ইতিপূর্বে আর কেহ এদেশে এরূপ ভাবে উদঘাটিত করেন নাই; অন্য দেশেও কেহ করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই।
>
> উপন্যাসখানি 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই সাহিত্য-রসিক মহলে ইহার সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে।
>
> আশ্বিনের মাঝামাঝি বাহির হইবে।
>
> মূল্য তিন টাকা
>
> **রঞ্জন প্রকাশালয়**
>
> ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, [রুম নং ১৬।১ শ্রীমাণি মার্কেট, দ্বিতল]
>
> প্রাপ্তিস্থান: ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'পথের পাঁচালী'র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৩৯, ইং ১৯৩২।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মুদ্রণের কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ঘট হওয়ায় বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক "মিত্র ও ঘোষ" হাফ ফুলস্কেপ সাইজে 'পথের পাঁচালী' মুদ্রণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে "মিত্র ও ঘোষে"র কর্ণধার শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত সুমথনাথ ঘোষের আন্তরিক আগ্রহে হাফ-ফুলস্কেপ সাইজে বিশেষ ধরণের হাতে তৈয়ারী কাগজে রেক্সিনে বাঁধাই অতি সীমিত সংখ্যক রাজসংস্করণ 'পথের পাঁচালী' মুদ্রিত হয়। প্রতিটি রাজসংস্করণ 'পথের পাঁচালী'র আখ্যাপত্রে বিভূতিভূষণ স্বহস্তে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন।

'বিচিত্রা' তৎকালীন অভিজাত-সমাজের মুখপত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে কিছু কথা গ্রন্থ-পরিচয়ে দেওয়া আবশ্যক। ভাগলপুরে থাকিতে বিভূতিভূষণের কেবলই গ্রামের কথা মনে পড়িত। পূর্বেই শিক্ষার কালে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, কয়েক বৎসর আগে মাতা ও প্রথমা স্ত্রী মারা গিয়াছেন। বিভূতিভূষণ সাংসারিক জীবন সম্পর্কে আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। কার্য্যব্যপদেশে ভাগলপুর জেলার জঙ্গলমহলে থাকার সময়ে বোধ করি নিজের শৈশবকাল স্মরণ করিয়াই 'পথের পাঁচালী' লেখা আরম্ভ করেন।

এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার দিনলিপি এবং চিঠিপত্রে উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বোধে সে-সব রচনা হইতে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'পথের পাঁচালী'র রচনাংশ "অপুর পাঠশালা" নামে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইলে কবি কালিদাস রায় কবিশেখর 'পথের পাঁচালী' ও "অপুর পাঠশালা" সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হইয়া পত্র লিখিলে বিভূতিভূষণ তাঁহাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি :

"পথের পাঁচালীর গ্রাম্য চিত্রগুলি সবই আমার স্বগ্রাম বারাকপুরের। জেলা যশোহর। গ্রামের নীচেই ইছামতী নদী।

"আমি নিজে ছেলেবেলায় যে গুরুমশায়ের পাঠশালাতে পড়েছিলাম, তাঁর নাম প্রসন্ন গুরুমহাশয়, কিন্তু তাঁর বাড়ী ছিল হুগলীর দু' মাইল দূরে কেওটা নামক গ্রামে। বাল্যে আমি কেওটাতে মামার বাড়ী থাকতাম মাঝে মাঝে—বাবাও সেখানে বাসা করে অনেকদিন ছিলেন। প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের মুদীর দোকান এবং পাঠশালা ছিল। ঐ গ্রাম থেকে চলে এসে আমি স্বগ্রাম বারাকপুরে হরি পোড়া বা হরি রায় নামক এক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হই। অপুর পাঠশালার পটভূমি এই হরি রায়ের পাঠশালার অনুরূপ। অমনি বনভূমির মধ্যে পাঠশালাটি ছিল—স্বগ্রামে আমার পৈতৃক ভিটার পাশেই। হরি রায় মহাশয়ই শ্রুতিলিখন দিয়েছিলেন—প্রসন্ন গুরুমহাশয় ন'ন। আমি বাল্যের অভিজ্ঞতায় এই দুই পাঠশালাকে জড়িয়েছি।

"দীনু পালিত, রাজু রায় আমার দেখা বিভিন্ন গ্রাম্য মানুষের ছবি। তবে বড্ড জড়িয়ে গিয়েছে। ও-নামের কোন মানুষ আমাদের গ্রামে ছিল না, তবে ঐ ধরণের কথা বলতো

অনেকে—ছেলেবেলায় শুনেছি। ভাগলপুরে বসে পথের পাঁচালী লেখা। তখন অনেকদিন দেশ ছাড়া, এমন কি, কখনো আবার ফিরে যাবো সে আশাও ছিল না। সুদূর প্রবাসে বাল্যদিনগুলির সুখস্মৃতি মনে যে ভাবলোক সৃষ্টি করতো—তারই ফলে "পথের পাঁচালী"র সৃষ্টি। অবশ্যি অনেক কিছু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েচে বই-কি!" বিভূতিভূষণ, কালিদাস রায়, 'কথা-সাহিত্য', যুগ্ম সংখ্যা (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৭)।

কবি কালিদাস রায় কবিশেখর উক্ত "বিভূতিভূষণ" নামক প্রবন্ধে 'পথের পাঁচালী' এবং বিভূতিভূষণ সম্পর্কে কিছু কিছু মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক বোধে তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

"তাঁহার চিত্রিত অপুর মধ্যে তাঁহার বাল্যজীবনটি কিভাবে প্রচ্ছন্ন আছে তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ও পিতৃভূমি যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামের একটি পল্লীতে। এই পল্লীতেই তাঁহার বাল্যজীবন কাটিয়াছিল। বিভূতির পিতা ছিলেন একজন কথকতা-ব্যবসায়ী। কথকতার উদ্দেশে অনেক সময় তাঁহাকে প্রবাসে কাটাইতে হইত। পথের পাঁচালীতে বর্ণিত গ্রামখানি লেখকের নিজেরই গ্রাম। ইহারই প্রাকৃতিক পরিবেশ পথের পাঁচালীতে বর্ণিত হইয়াছে। পথের পাঁচালীতে যে ইছামতী নদীর কথা আছে—তাহা এই গ্রামের নিকট দিয়াই প্রবাহিত। হরিহরের বৃত্তি, আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে বিভূতিবাবুর পিতার বৃত্তি ও জীবনযাত্রার অনেকটা মিল আছে।

"অপুর বাল্যজীবন দারুণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই কাটিয়াছিল—বিভূতির জীবনও তাহাই। বিভূতির রচনায় দারিদ্র্যের চিত্র জ্বলন্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্ত্তী জীবনে বিভূতির আর্থিক অবস্থা ভালই হইয়াছিল—কিন্তু বিভূতি তাহার বাল্যসঙ্গী দারিদ্র্যকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দরিদ্রের মতই জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

* * *

"প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপুকে এমনই মুগ্ধ করিত যে তাহাতে মনে হয়—অপু অসামান্য সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি লইয়াই জন্মিয়াছিল। এইরূপ সৌন্দর্য্যরস-রসিকতা সেই শ্রেণীর শিশুতে থাকে, যে শ্রেণীর শিশু উত্তর জীবনে খুব বড় সাহিত্যিক বা শিল্পী হয়। উত্তর জীবনে দেখা গিয়াছে বিভূতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন—বিশেষ করিয়া বৃক্ষলতাগুল্মের শ্যামল সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। ইহা হইতে মনে হয় পথের পাঁচালীর অপু বিভূতিভূষণ ছাড়া অন্য কেহই নয়।

"অপুর শিশুমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এমনই য 'যব যে কোন শিশুকে দেখিয়া এইরূপ বিশ্লেষণ চলিতে পারে না। লেখক নিজের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত নিজেরই শিশুজীবনের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতিগুলিকে রূপ দিয়াছেন।"

—বিভূতিভূষণ, কালিদাস রায় কবিশেখর, 'কথা-সাহিত্য', যুগ্ম সংখ্যা (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৭)।

'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গের উল্লেখ বিভূতিভূষণের আরও একটি চিঠিতেও পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভাবী পত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন :

"আমার যখন তোমার বয়েস (সে যুগের কথা অবশ্যি), তখন বনগাঁয়ের বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ি, বারাকপুর ছেড়ে এসে মায়ের জন্যে বাবার জন্যে বিশেষ করে বারাকপুরের নদীতীর, গাছপালার জন্যে আমার মন খারাপ হোত এবং পুরনো দিনের কথা মনে পড়তো। যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও বারাকপুরের জন্যে মন কেমন করতো, তা থেকেই বোধ হয় পথের পাঁচালীর উৎপত্তি।

"চিরকাল বারাকপুর ভালবাসি। কেউ নেই সেখানে আপনার বলতে, তবুও যে যাই সেখানে, সে শুধু বারাকপুরের প্রকৃতির টানে, কি জানি কি দিয়ে আমার মন বেঁধেচে ওখানকার পল্লীপ্রকৃতি। যদি সম্ভব হয় একদিন ছুটিতে তোমাদের ওখানে যাবো নিয়ে। আমার মনে হয় তোমারও ভাল লাগবে।"

বিভূতিভূষণের জীবনের একেবারে শেষের দিকের মুদ্রিত দিনলিপি 'হে অরণ্য কথা কও'-তেও বাল্যস্মৃতি এবং স্বগ্রামের প্রতি ভালবাসার কথা পাওয়া যায়। সারান্দা অরণ্যের নির্জ্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে বনবিভাগের অরণ্য-আবাসে অবস্থানকালে একদিন শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া তাঁহার বাল্যকালের কথা এবং গ্রামের সৌন্দর্য্যের কথা মনে পড়িয়া যায় :

"রাত সাড়ে চারটায় উঠলুম, বাইরে গেলুম। জ্যোৎস্না উঠেচে, কালকের মত শুকতারা জলজল করচে, দূরের পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে বাল্যের বারাকপুরের বাঁশবনে বাড়ি, বাবা মার কথা মনে এল। শৈশবের সমস্ত অবস্থা— আমাদের দারিদ্র্য, বালক হয়ে আমার সমস্ত মনের ভাব যেন আমাকে পেয়ে বসলো শেষ রাত্রে। জীবন কি অপূর্ব্ব! কি অমৃতময়— জন্মে জন্মে শত শত বারাকপুরের মধ্য দিয়ে শতবৈচিত্র্য, পিতামাতার কোলে বার বার আমি যাই ক্ষতি কি? শুধু যেন বিশ্বদেবকে মনে রাখি, অনন্ত বৈচিত্র্য দেখবার যেন চোখ পাই।" ('হে অরণ্য কথা কও', বি. র. ৭ম, পৃ. ৪৩৫।)

পল্লীপ্রকৃতির রূপমুগ্ধ বিভূতিভূষণ তাঁহার 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে মুক্তমনেই স্বগ্রামের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা লিখিয়াছেন :

"মনে মনে তুলনা করে দেখলুম এ ধরণের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখিনি—এইতো পাশেই চাল্‌কী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এ ধরণের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বনজঙ্গল বড় বেশী, এতদিন তত লক্ষ্য করিনি, কাল লক্ষ্য করে দেখে মনে হোল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখিনি তো! দেখবোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরণের—প্রাচুর্য্য বৈচিত্র্য ও কারু-

কার্য্য কম—বিপুলতা বেশী, গাম্ভীর্য্য বেশী।

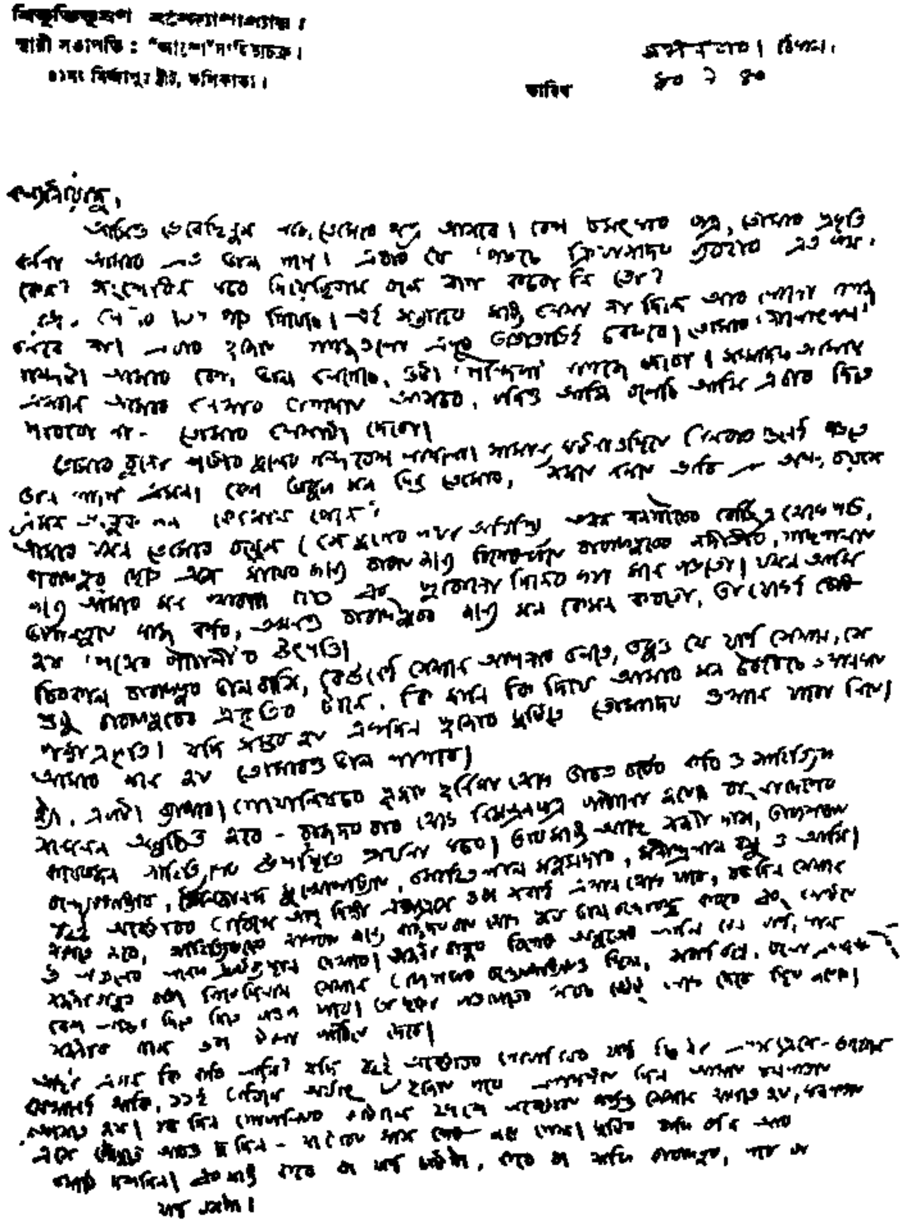
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্থায়ী সভাপতি : "আলোছায়া" সাহিত্যচক্র।
৪১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
তারিখ

'পথের পাঁচালী'র উৎস সম্পর্কে বিভূতিভূষণের পত্র। ভাবীপত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত।

"ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরণের পাখী, বিশেষ ধরণের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরণের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরণের বৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়—বনদেবীর সাজির একটা অযত্ন চয়িত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয়—এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে—সে আর কোনো ফুলে দেখলাম না।" (তৃণাঙ্কুর, বি. র. ২য়, পৃ. ১৭৭।)

কি রকম পটভূমি ও পরিবেশের মধ্যে বসিয়া বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' রচনা করিয়াছিলেন তাহার কথা তাঁহার 'হে অরণ্য কথা কও' নামক দিনলিপিতে পাওয়া যায়:

"ঠিক আজ তেমনি প্রভাত—তেমনি মেঘান্ধকার, শীতল, বর্ষণমুখর ভাদ্রের প্রভাত। সাতটা বেজেচে অথচ আমি ভাল করে খাতার লেখা দেখতে পাচ্ছিনে আধ-অন্ধকারে। যেমন কতকাল আগে আজমাবাদ কাছারিতে সেই নকছেদী ভকতের দেওয়া বেলফুলের ঝাড়ের পাশের চেয়ারে বসে "পথের পাঁচালী" লিখতাম, মুহুরী গোষ্ঠবাবু বসে হিসেব বোঝাতো, উত্তর বিহারেব বন্যার-জলে-ডোবা মকাইয়ের খেত আর কাশবন—সেই উদ্দাম ঘোড়ায় চড়া, সেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়েব নীল দৃশ্য, সেই দিগন্তলীন মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট—সেই সব দূর অতীতের ছবি আজকার দিনে মনে জাগে। সে হলো আজ আঠারো বছর আগের কথা, মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে আঠারো বছর—কতকাল!" (হে অরণ্য কথা কও, বি. র. ৭ম, পৃ. ৪৭৯-৮০।)

বিভূতিভূষণের প্রথম দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'তেও 'পথের পাঁচালী' রচনার সময়ে অনুরূপ বৃষ্টির কথা পাওয়া যায়:

"এ জীবনে প্রথম দেখলাম সরস্বতী পূজার দিন এভাবে বাদল হয়। দুপুর থেকে আকাশ অন্ধকার ক'রে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এমন সন্ধ্যাবেলা টেবিলে আলো জ্বলছে, আমার বাংলো ঘরটায় ব'সে আপন মনে লিখছি—চারধার অন্ধকার ক'রে যেন জোরে বৃষ্টি পড়ছে—ঠিক যেন ছেলেবেলার এক শ্রাবণ মাসের বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। অথচ এটা বসন্ত কালের প্রথম দিনটা—যে সময় কলকাতায় গান করতাম 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'।··· অন্ধকার বৃষ্টিধারার ধোঁয়াকার ধূ ধূ মাঠের দিকে চেয়ে মনে পড়ল, কত কালের সেই জ্যাঠা-মশায়ের সঙ্গে সরস্বতী পুজোতে কুঠীর (মাঠে) নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে যাওয়া। কত কাল—কত কাল আগে—

জীবন কী অদ্ভুত, তাই মর্মে মনে ভাবি—" (স্মৃতির রেখা, বি. র ১ম, পৃ. ৪১০-৪১১।)

প্রথমে 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার চরিত্র ছিল না। ভাগলপুরে একদিন অপরাহ্ণে একটি দেহাতী গ্রাম্য কিশোরী মেয়েকে দেখিয়া তাঁহার মনে আশ্চর্য্য মায়ার সঞ্চার হয়। মেয়েটির তৈলহীন রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়িতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই তিনি দুর্গা চরিত্র কল্পনা করেন। তাহার ফলেই তাঁহাকে পুনরায় নূতন করিয়া 'পথের পাঁচালী' লিখিতে হয়।

পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র

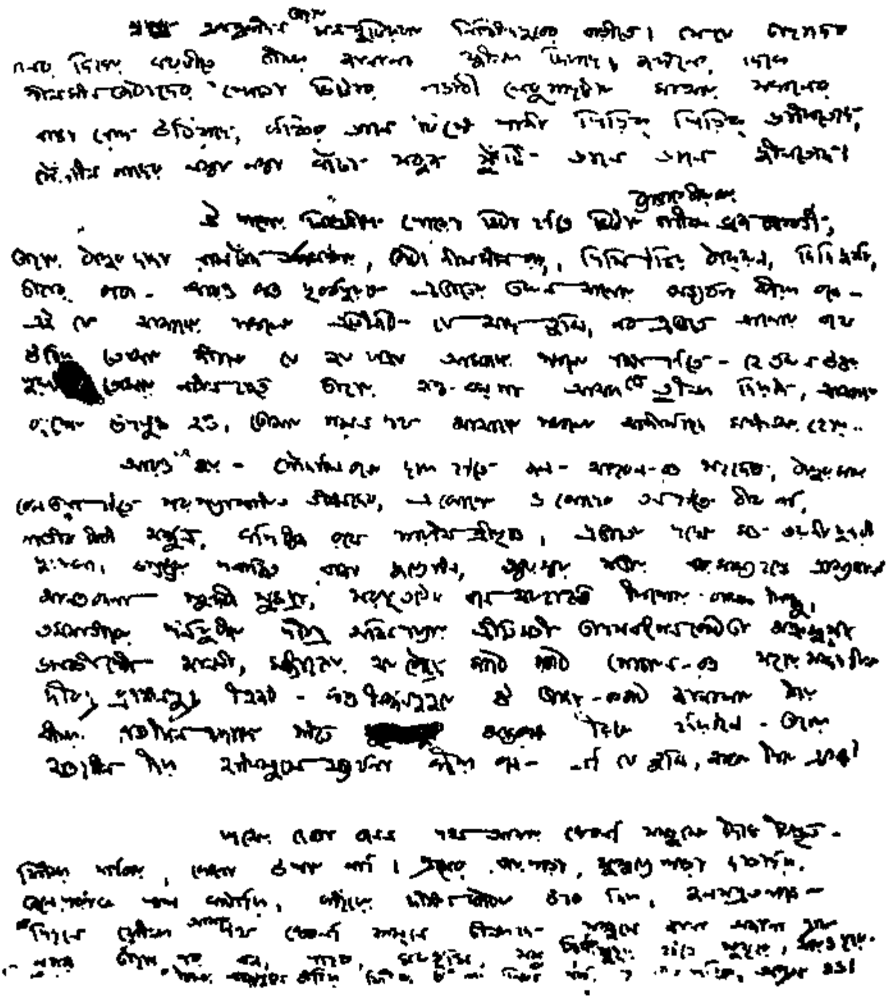

'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপির শেষ পাতা। [১৯৩১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বনগ্রামে শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে স্মারক হিসাবে রাখিবার জন্ত প্রদান করেন।

'পথের পাঁচালী'র প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে পাঠভেদ আছে।

কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে 'পথের পাঁচালী'র যে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বিভূতিভূষণ প্রথমে দুর্গাকে ছাড়াই 'পথের পাঁচালী' রচনার কথা ভাবিয়াছিলেন এবং কিয়দংশ রচনাও করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর সপ্তপর্ণী নামক গ্রন্থেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়:

"পথের পাঁচালী যখন প্রথমে লিখি তাতে দুর্গা ছিল না, শুধু অপু ছিল। একদিন হঠাৎ ভাগলপুরের রঘুনন্দন হল-এ একটি মেয়েকে দেখি। চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে। সে আমার দৃষ্টি এবং মন দুইই আকর্ষণ করল—তার ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল, মনে হ'ল উপন্যাসে এই মেয়েকে না আনলে চলবে না। পথের পাঁচালী আবার নতুন ক'রে লিখতে হ'ল, এবং "রিকাস্ট" করায় একটি বছর লাগল।"

কবি কালিদাস রায় কবিশেখর বিরচিত পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধেও এ বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়:

"দুর্গা একেবারে কাল্পনিক নয়। লেখকের একটি ভগিনী ছিল। অবশ্য সে ভগিনী অল্প বয়সে মারা যায় নাই।

অজয়, পটু, সতু, রাণুদিদি, অতসী ইত্যাদি বাল্য সখাসখীদের কথা একেবারে কাল্পনিক নয়। তবে নামগুলি লেখকেরই দেওয়া। অজয় তো যাত্রাদলের ছেলেটির নাম নয়—সে যাত্রার পালায় অজয় সাজিয়াছিল বলিয়া লেখক অজয় নামেই তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইন্দির ঠাকরুণও সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত নয়, তবে নামটা লেখকের দেওয়া।"—বিভূতিভূষণ, কালিদাস রায় কবিশেখর, 'কথা-সাহিত্য', যুগ্ম সংখ্যা, (শ্রাবণ ভাদ্র ১৩৭৭।)

ভাগলপুরের "বড় বাসা"তেই ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং এখানেই ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয়। ঐ দিনই তিনি উহা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। তবে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের প্রথমাংশ বা সর্বাংশ তৎপূর্ব্বেই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লইয়া গিয়াছিলেন। শোনা যায় এই বই 'বিচিত্রা'য় প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল—সে সম্বন্ধে বহু ঘটনা বহু লোকের মুখে শোনা যায়। তবে সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

বর্ত্তমান 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থের সঙ্গে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'র কিঞ্চিৎ পাঠভেদ রহিয়াছে। (আশ্বিন। ১৩৩৫। বিচিত্রা পৃ. ৫১৮।) এখানে দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া হইল:

"সেই হইতে বছর খানেক অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সে প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় গিয়াছিল। পরে তথায় কিছু হইতেছে না দেখিয়া তাহাকে তাহার বাবা রাজু রায়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

"রাজু রায়ের পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আট দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে মাদুর আনিয়া পড়িতে বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানি জীর্ণ কার্পেট আনে।"

"দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া অনেক রাত্রে বেতনা নদীতে রোজ স্নান করিয়া আসিতেন, আলুভাতে ও মাছের ঝোল রাঁধিয়া আহার করিয়া দুটা তিনটা রাত্রিতে তবে শুইতেন।"

'পথের পাঁচালী' গ্রন্থে আছে প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় এক শীতের প্রত্যূষে সন্থ-জাগ্রত অপু গিয়া ভর্তি হইয়াছিল। পরে আছে বৈকালে পাঠশালা বসিত এবং গুরু মহাশয়ের বন্ধুরা আসিয়া একে একে মিলিত হইতেন এবং নানারূপ গল্পগুজব হইত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার সময় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও রাজু রায়ের পাঠশালা এক হইয়া গিয়াছে এবং বেচারা রাজু রায় বাদ পড়িয়াছেন। 'বেত্‌না' নদী 'বেত্রবতী'তে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপ পাঠভেদ আরও অনেক পাওয়া যাইবে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিভূতিভূষণ বনগ্রামে বর্তমান নিবন্ধকারকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখিবার জন্য 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাটি দান করেন। 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাটির সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত 'পথের পাঁচালী'র শেষ পৃষ্ঠাটির কিছু কিছু পাঠভেদ রহিয়াছে। আবার 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'র শেষাংশের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার এবং বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের পাঠভেদ বর্তমান। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত শেষাংশ এবং বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে পাঠভেদ এখানে দেখানো গেল :

"নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না…সে চলিয়াছে চলিয়াছে…চলিয়াছে সে আর মা…এ পথে তো একা কখনো আসে নাই? পথ সে চিনিতে পারিতেছে না…ও কাস্তে হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু ব'লে দ্যাওনা আমাদের?— যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে?…

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন -মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশবনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হ'য়ে, পদ্ম ফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চ'লে গেল সামনে, সামনে শুধুই সামনে দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্য্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, দূর ছেড়ে সুদূরের দিকে…দিন রাত্রি পার হ'য়ে চ'লে যায়…তোমাদের মর্ম্মর স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, বিশ্বের পর বিশ্ব চূর্ণ পাথর হ'য়ে খনির অন্ধকারে চাপা পড়ে, পথ আমার তখনও ফুরায় না…চলে চলে…এগিয়েই চলে…অনন্তের অনাহত, অনির্ব্বাণ সঙ্গীত—তোমার হারানো শৈশবের বীণার মত কালের বুকে বাজ্‌তে থাকে…অনন্ত দিন ধ'রে · চির যুগ ধ'রে…

সে বিচিত্র যাত্রাপথের অদৃশ্যতিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি!…

চল এগিয়ে যাই।" (বিচিত্রা, আশ্বিন, ১৩৩৬, পৃ. ৫৫৫।)

বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে এরূপ পাঠান্তর পাওয়া যায় :

"নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না···সে চলিয়াছে··· চলিয়াছে···চলিয়াছে · সে আর মা···এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না··· ও কাস্তে-হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা একটু বলে দাও না আমাদের ? যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে।" ('পথের পাঁচালী', বি. র. ১ম, পৃ. ২৩৩।)

তাহার পরে বিভূতিভূষণ অনেকটা বাড়াইয়াছেন 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'র শেষাংশ হইতে। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার সহিত প্রচলিত সংস্করণের শেষাংশের অনেক মিল আছে। অবশ্য পাঠভেদও বর্তমান। আমরা 'পথের পাঁচালী'র প্রচলিত সংস্করণ হইতে এখানে তুলিয়া দিতেছি : "পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি। তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে···দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে ··দিন রাত্রি পার হ'য়ে, জন্ম পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়—তোমাদের মর্মর জীবন স্বপ্ন শেওলা-ছাতা দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না ··চলে ··চলে···চলে ··এগিয়েই চলে···

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ···

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি···

চল এগিয়ে যাই।" ('পথের পাঁচালী', প্রচলিত সংস্করণ, বি. র. ১ম, পৃ. ২০৫।)

এই গ্রন্থের দুইটি কিশোর-পাঠ্য সংস্করণ আছে। 'ছোটদের পথের পাঁচালী' ও 'আম আঁটির ভেঁপু'—১৯৪৪ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

'পথের পাঁচালী' ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য-অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি সাহিত্য-অকাদেমীর সহযোগিতায় মালয়ালম ভাষায় ইহার একটি কিশোর-পাঠ্য সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশে সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব জার্মানী হইতে রাশিয়ান ও জার্মান ভাষায় 'আম আঁটির ভেঁপু' প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো কর্তৃক 'পথের পাঁচালী'র ইংরেজি ও ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজি সংস্করণ লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক George Allen and Unwin কর্তৃক গ্রেট ব্রিটেন হইতে এবং ইণ্ডিয়ানা ইউনিভারসিটি কর্তৃক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental and African Studies-এর অধ্যাপক টি. ডবলিউ. ক্লার্ক ও ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। 'পথের পাঁচালী'র শেষাংশ ইংরেজি ও ফরাসী সংস্করণে

বর্জিত হইয়াছে। ফরাসী সংস্করণ ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রকাশক Gallimard কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং মূল বাংলা হইতে সরাসরি অনুবাদ করিয়াছেন মাদাম ফ্রান্স ভট্টাচার্য।

এই গ্রন্থ-পরিচয় রচনার সময় সংবাদ পাওয়া গেল, Folio Society of Great Britain ইংরেজি 'পথের পাঁচালী'র একটি রাজসংস্করণ (সীমিত সংখ্যক) ছাপার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৯৭১ সালে উহা প্রকাশিত হইবার কথা।

'মেঘমল্লার'

'মেঘমল্লার' বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প-গ্রন্থ এবং তাঁহার রচিত প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয়। 'মেঘমল্লার' (শ্রাবণ, ১৩৩৮, ইং ১৯৩১) প্রথম প্রকাশিত হয়। সূচী : মেঘমল্লার, নাস্তিক, উমারাণী, বউ-চণ্ডীর মাঠ, নব-বৃন্দাবন, অভিশপ্ত, খুকীর কাণ্ড, ঠেলাগাড়ী, পুঁই-মাচা, উপেক্ষিতা।

নানা কারণে 'মেঘমল্লার' গল্প-সংগ্রহের গল্পগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে। বিভূতিভূষণ 'মেঘমল্লার' গ্রন্থভুক্ত "উপেক্ষিতা" নামক গল্পটি লইয়াই বাংলা সাহিত্যজগতে প্রথম প্রবেশ করেন। "উপেক্ষিতা" গল্পটি বিভূতিভূষণের প্রথম মুদ্রিত রচনা, উহা বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালের মাঘ-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, ইংরাজি ১৯২২ সালের জানুয়ারী। ১৯২১ সালের কোনো এক সময়ে গল্পটি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বিভূতিভূষণ নিজেই ১৯৪৫ সালের ৯ জুন কলিকাতা কেন্দ্র হইতে "কেমন করে লেখক হলাম" শীর্ষক বেতার-ভাষণে তাহা প্রচার করেন। রচনাটি বর্তমানে 'আমার লেখা' নামক প্রবন্ধ ও ভাষণ সংকলন গ্রন্থে "আমার লেখা" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "আমার লেখা" নামক রচনাটি সর্বপ্রথম 'নবাগত' গল্প-গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। ('নবাগত', প্রকাশকাল : ২৮ জানুয়ারী, ১৯৪৪।)

'মেঘমল্লার' গল্প-সংগ্রহের গল্পগুলি 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা'য় নিম্নোক্ত ক্রম অনুযায়ী প্রকাশিত হয়।

১। উপেক্ষিতা (প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮)	৬। পুঁই-মাচা (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩১)
২। উমারাণী (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯)	৭। বউ-চণ্ডীর মাঠ (বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪)
৩। মেঘমল্লার (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩০)	৮। নব-বৃন্দাবন (বিচিত্রা, ১ম বর্ষ বৈশাখ: ১৩৩৫)
৪। অভিশপ্ত (প্রবাসী, আষাঢ, ১৩৩১)	৯। ঠেলাগাড়ী (বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৩৫)
৫। নাস্তিক (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩১)	১০। খুকীর কাণ্ড (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৭)

প্রসিদ্ধ সমালোচক সজনীকান্ত দাস "উপেক্ষিতা" সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"ইতিপূর্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তিনি পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধেও চিন্তা করিতেছেন। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার সকলগুলিই বীজাকারে তাঁহার এই প্রথম গল্প

'উপেক্ষিতা'য় পাইতেছি। সেই শুভ্র-শুচিতাবোধ, সেই খাদ্য-লোলুপতা, সেই আদেশ্‌-বেদনা এবং সেই জন্মান্তর-রহস্য অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' ও 'দেবযান' দুই-ই এই গল্পটিতে উঁকি মারিতেছে।"

পুস্তকাকারে 'মেঘমল্লার' গল্প-সংগ্রহভুক্ত হইয়া বাহির হইবার কালে "উপেক্ষিতা" গল্পের শেষাংশ বর্জিত* হয়। বিভূতিভূষণের এই গল্পটির উপর বিশেষ মায়া ছিল। "উপেক্ষিতা" 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইলে, উহা পাঠ করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উচ্চপ্রশংসা করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন।

"নব-বৃন্দাবন" গল্পটি বিভূতিভূষণ সর্ব্বপ্রথম বেতারে পাঠ করেন। ভাদ্র ১৩৩৫-এর 'বিচিত্রা'র "নানা কথা"য় জানা যায় বিভূতিভূষণের "নব-বৃন্দাবন" যাহা ১৩৩৫ সালের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা "ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি" কর্ত্তৃক গত মাসে পঠিত হইয়াছে। "বিভূতিবাবুর গল্পটি শুনিয়া সাধারণে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।"

'স্মৃতির রেখা'

'স্মৃতির রেখা' (দিনলিপি) প্রথম সংস্করণ : ১ শ্রাবণ ১৩৪৮, ই ১৯৪১, পৃ. ১৫৫। ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন।

'স্মৃতির রেখা' বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত দিনলিপি। অন্ততঃ এই বইটিতে সন-তারিখের কিছুটা হিসাব মেলে। 'পথের পাঁচালী' রচনার পূর্ব্বে তাঁহার চিন্তাধারা এবং 'পথের পাঁচালী'র সমসাময়িক চিন্তাধারা এই দিনলিপির পাতায় বিধৃত রহিয়াছে। 'পথের পাঁচালী' রচনার কিছু ইতিহাসও তিনি ইহার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বিভূতিভূষণ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের সম্ভবতঃ ৩০ এপ্রিল তারিখে ভাগলপুরে পথের পাঁচালী' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি দিনলিপিতে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে! গাছপালা, ফুল পাখী, উদার মাঠ ঘাট, অস্ত সূর্য্যের আলোয় রাঙা নদী তীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদারশূন্য…জগতের শত-করা ৯৯ জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়…

---

* বর্জিত অংশটি এই—'এ কাকে দেখলুম বলবো!

"আমাদের এই পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মতো তাঁদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্য্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা বোনেরা যে দেহ ধারণ করে বেড়াবেন, এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিতে দেখতে পেলুম।"

(প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)

"সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্ত্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী বার্ত্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেচে·· এই কাজ তাদের কর্ত্তে হবেই···তাদের অস্তিত্বের এ-ই শুধু সার্থকতা "

'পথের পাঁচালী' রচনা সম্পর্ক ২০ নভেম্বর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের দিনলিপিতে আরও তথ্য পাওয়া যায় :

"সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে। লেখার পাতাগুলো ছড়ানো আছে। ফুলদানিটাতে chrysanthemum, কলা ফুল। এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত—হয়তো একার বৎসর পরে আমার কোনও চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা হয়ত থেকে যাবে। হয়ত কত লোকের মনে আশা সান্ত্বনা দেবে। হয়ত পাঁচ শত বছর পরে—যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে—আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীন কালের এক লেখক হয়ে যাবো। আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না। তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব চলবে। অনাগত ভবিষ্যতের সে সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জ্বেলে তেল খরচ করে, আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবুও দেবো, দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি। তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি আর দেখতে আসবো না। আমার ফুলদানির এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর chrysanthemum ফুলটা আর বছর এসময় কোথায় থাকবে? আশি বছর পরে আমি কোথায় থাকবো?" (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৩৬৪-৬৫।)

'পথের পাঁচালী'র শেষ পৃষ্ঠার সঙ্গে 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপির পৃষ্ঠায় লিখিত বিভূতিভূষণের চিন্তাধারার সঙ্গে আশ্চর্য্যজনক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারী বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে বসিয়া দিনলিপিতে লিখিতেছেন :

"—মনের মধ্যে জীবন যেন বলছে—এই যে গণ্ডী তুমি তোমার চারিদিকে রচনা করে বসে আছো এরা তোমারই ভৃত্য, তোমারই দাস। তুমি কেন ভুল করে এদের হাতে ইচ্ছে করে খাঁচার পাখীর মত বন্দী হয়ে আছো? তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়। জীবনটা ভালো করে দেখতে হবে। উপভোগ করতে হবে। জীবন উৎসবের মূল শুকিয়ে দেয় অলস নিষ্কর্ম্মা জীবনযাত্রায়। শত্রুকে তাড়াতে হবে।

···—অনন্ত শূন্য পথে ভ্রমণশীল জলন্ত পুচ্ছ, জানা অজানা ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমান ধাতু-পিণ্ড, প্রস্তরপিণ্ডের অতি অদ্ভুত রহস্যভরা ইতিহাস—এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষ কোটী প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলা উৎসব। মৎস্য যুগ, অঙ্গার যুগ, সরীসৃপ যুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা, কত কূলহীন, দিকহীন, গর্জ্জমান মহা সমুদ্র—অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয় জীবন মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে। চুপ করে চোখ বুজে বসে এই গতিশীল তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল মহাকালের মহাযাত্রার উৎসবের কথা ভাবো—কোথায়

যাবে তোমার দুদিনের বদ্ধজীবনের দৈন্য, কোথায় যাবে তোমার রুদ্ধ ঘরের অনির্গল দুষ্ট হাওয়ার তাণ্ডব—প্রাণের বেগে গতির বেগে ছুটে বেরিয়ে পড়ে ছাখো জীবন কি মহিমাময়, কি বিরাট, কি শক্তিশীল।

কি অক্ষয় অনাদি অনির্বাণ জীবন, সঙ্গীতের কি মধুর লয় সঙ্গতি।" (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৩৭১-৭২।)

ভাগলপুর থাকিতে বিভূতিভূষণ ও তাঁহার বন্ধু অম্বিকাবাবু হাঁটাপথে ভাগলপুর হইতে দেওঘর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁহারা রওনা হইয়া হাঁটাপথেই সম্ভবত ৪ অক্টোবর (১৯২৭) সকাল ৮টার সময় ভাগলপুর ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার "অভিযাত্রিক" নামক ভ্রমণকাহিনীতেও পাওয়া যায়। এই ভ্রমণের কথা তাঁহার 'উৎকর্ণ' দিনলিপির (বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৩৯০) পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়া অতীতের স্মৃতিচারণ করিয়াছেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর ভাগলপুর হইতে রওনা হইয়া তাঁহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে রজৌন থানার ভারপ্রাপ্ত মুসলমান দারোগার আতিথ্য গ্রহণ করেন। রজৌন থানায় বসিয়া বিভূতিভূষণ যে দিনলিপি রচনা করেন তাহা বিভূতি-জীবনীর পক্ষে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া এখানে উদ্ধৃত করা হইল—এই দিনলিপিতে বিভূতিভূষণের শৈশবের স্মৃতিচারণের সহিত 'পথের পাঁচালী'র অপুর শৈশবের 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' পাঠ করিয়া পুলকিত হইবার কথা মনে পড়িয়া যায়। ('পথের পাঁচালী', বি র. ১ম, পৃ. ১৬৩।)

অপুর ধনুক হাতে যুদ্ধ করিবার মত বিভূতিভূষণও যে বাল্যকালে তাঁহার ভিটার কাছে জঙ্গলে পাকাটি হাতে "শিবাজী" সাজিয়া যুদ্ধ করিতেন সে-কথারও উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। (দ্রঃ পথের পাঁচালী, বি. র. ১ম, পৃ. ৩৮।) সেই সঙ্গে হরিহরের মত পিতার ভবঘুরেমির কথা এবং সোনারপুরে মাতার মৃত্যুর কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। মাতার মৃত্যুর মাস—আশ্বিন মাস (ইং সেপ্টেম্বর মাস) বলিয়া মনে হয়। কারণ বিভূতিভূষণ তখন হরিনাভি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন এবং সোনারপুরে থাকিতেন। বিভূতিভূষণ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত হরিনাভি স্কুলে কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মনে হয় ইং ১৯২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে (বাংলা আশ্বিন মাসে) সোনারপুরে নগেন্দ্রনাথ বাগচীদের গৃহে বিভূতিভূষণের মাতা মৃণালিনীর মৃত্যু হয়।

"এই থানা, সামনের মৃণালফোটা বৃহৎ পুকুরটা, এই কি সুন্দর হাওয়া—সন্ধ্যার পর এই থানার আয়না বসানো টেবিলটার ধারে বসে লিখছি—এসব যেন কোথায় এসে পড়েছি! সেই—সেই সময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মত যুদ্ধ যাত্রা মনে পড়ে—সেই মায় তাদের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া—বাবার দেশ ভ্রমণের বাতিক—সেই বড় দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো···কত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনে নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে এমন সময় মা মারা যাওয়ার দিনটি

থেকে খুব নিয়ে চলছে—সেই কিশোরীবাবুর বাড়ী, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।" (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৩৮৩।)

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর জামদহ ডাকবাংলোতে বসিয়া দিনলিপি লিখিতে লিখিতে বিভূতিভূষণের মৃতা প্রথমা স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া যায়: "এই সুন্দর অপরিচয়ের মধ্যে বসে মনে হ'ল কতদিন আগেকার গানটা—"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার,"—ঠিক এই সময়—কোলকাতার বোর্ডিংটা। আজ দ্বিতীয়া…সামনেই পূজা আসছে ষোলই আশ্বিন। সেবার পুজো ছিল চব্বিশে। সেই সময়কার দূরকালের সে জীবনটার সঙ্গে আজকার এই নির্জ্জন জীবনের মধ্যকার এই শালবন-বেষ্টিত পাহাড়, নদীতীরের ডাকবাংলা, এই নিভৃত সন্ধ্যা, এই সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনটা মনে পড়ে। (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৩৮৪।)

তাঁহার 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতেও এই মধুর স্মৃতির পুনরুক্তি পাওয়া যায়। ২৫ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ১৯৩৬) বিভূতিভূষণ "উৎকর্ণে" লিখিয়াছেন :

"অনেককাল আগে, আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পুজোর ছুটি উপলক্ষে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ী গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম অবিশ্যি আগের দিন, কিন্তু দেখা হয়নি, বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল বলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পুজোর সময়েই তার বাপের বাড়ী থেকে নিতে এল তাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের বাড়ীতে সে মারা গেল। সেই জন্তেই আজকার দিনটি আমার এত মনে আছে, থাকবেও চিরকাল।" (উৎকর্ণ, বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৩৪৭।)

'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে মায়ের কথা এবং প্রথমা স্ত্রীর কথা আরও কয়েক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন—বিভূতি জীবনীর পক্ষে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

"তারপর ফিনৃকি ফোটা জ্যোৎস্না রাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও নায়েব পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে যেখানে ও-বেলা মহিষ দেখেছিলাম ওখানে এলাম। মনে হ'ল দূরে আমার বাড়ী। এই জ্যোৎস্না ওঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়ি-কলসীগুলো প'ড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মার হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্ত্তি হয়ে উঠেছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না। হরি রায়ের জমিটুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘরকুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা হ'য়ে মানুষ হবে না। সে দেশে দেশে বহুদূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘোড়ায় ষ্টীমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক—পথের নেশাতেই ভোর।

মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, এ দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত এসে অল্প সাজিয়েগুছিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চাল ভাজা—সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে,

তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুল তলায় শান্ত জীবনযাত্রা সকীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন —সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার– আমার সংসার নয়।" (স্মৃতির রেখা, বি. র ১ম, পৃ. ৪২০-২।)

মনে হয় প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে বিভূতিভূষণের মা পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর কথা 'স্মৃতির রেখা'র অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর তিনি দিনলিপিতে লিখিতেছেন:

"তারপর সত্যি সত্যি কত ভাল জিনিসই পেলাম। গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায়-কপালে ঠেকানোর কথা মনে হয়ে পুলক হয়।"

(স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৩৯২।)

বিভূতিভূষণ ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ৩২ শ্রাবণ প্রথম বিবাহ করেন। বিভূতিভূষণের প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর মারা যান। এ বিষয়ে 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে একটি ক্ষীণ উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ বিভূতিভূষণ তাঁহার 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে লিখিতেছেন:

"কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্নটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্নে নিদ্রা ভেঙে পাপিয়ার যে মন-মাতানো ডাক— গ্রাম্য নদীটির ধারে শ্যাম তৃণদলের উপর ব'সে ব'সে কত গান গাওয়া, কত আনন্দ-কল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মৃদু সুগন্ধ যা তার নববিবাহিতা তরুণী-পত্নীর সঙ্গে সে উপভোগ করেছিল? কোথায় লেখা থাকবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সে সব আনন্দ-কাহিনী?" (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৪২৮।)

মনে হয় তিনি এখানে নববিবাহিতা প্রথমা পত্নীর কথাই লিখিয়াছেন। 'স্মৃতির রেখা'র উপরোক্ত উদ্ধৃতির সঙ্গে 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাস মিলাইয়া পাঠ করিলে সর্ব্বজয়া ও অপর্ণা চরিত্রের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাস রচনা সম্পর্কে বিভূতিভূষণ 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে আরো দুটি মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। 'পথের পাঁচালী'র উৎস সম্পর্কে তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

"প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ, ছেলেমেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল

কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়। যত অজ্ঞাতনামা লেখকই কেন হোক না, তার সত্যিকার অনুভূতি কখনো কৌতুহল না জাগিয়ে পারে না—পড়বেই সেটা সকলে! সকলেই খেলার তাঁবুর দুয়ারে অপেক্ষা করছে—রহস্য ভরা খেলাটা সকলের ভাল লাগে, কিন্তু ভাল বুঝতে পারে না—তাঁবুর বাইরে এলেই পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান ও তুলনা হয়—'মশাই কি রকম দেখলেন?' প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে - প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতুহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ, হাসি কান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্যে ভর করে—যেমন সনেটের পিছনে তেমনি হ্যামলেটের পিছনে শেক্সপীয়ার গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েছেন।

"তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাবো। আমি জগৎকে কি রকম দেখলাম? আমার শৈশব কি রকম কাটল? কোন্ কোন্ সঙ্গীকে আমি আনন্দ মুহূর্তে দেখলাম? কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃত রসে স্নিগ্ধ করলে? গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার করে লেখার জালে তাদের বেঁধে যাবো—সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা তাদের কাহিনী জানবে। আর হয়তো এ পথে আসব না, হয়তো আবার যুগযুগান্ত পরে ফিরে আসবো—কে জানে? বহুকাল পৃথিবীর সন্তানগণের মনে এ লেখা ঐ ইতিহাস কৌতুহল জাগাবে—তাজমহলের ধ্বংসস্তূপ যেন মাহেঞ্জোদরোর মত, গভীর মাটির রাশি মধ্যে যাকে খুঁজে বার করতে হবে—Great war-এর কথা মহাভারতের কি হোমারিক যুদ্ধের কাহিনীর মত প্রাচীন অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে—কলকাতা সহর বঙ্গোপসাগরের তলায় ঢুকে যাবে—সেই সুদূর অতীতের নতুন যুগের নতুন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ এসব কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। বলবে—আরে দেখ, সেই সে কালেও লোকে এমনিভাবে বিয়ে করতে যেতো! এই রকম জমি নিয়ে মারামারি করত, মেয়ের বিদায়ের সময় কাঁদতো। ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে তারা।

"যুগযুগান্তের শাসনে জীবনদেবতা বসে বসে শুধু হাসবেন।" (স্মৃতির রেখা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, বি. র. ১ম, পৃ. ৩৮০।)

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে বসিয়া 'পথের পাঁচালী' রচনা প্রসঙ্গে দিনলিপিতে লিখিতেছেন:

"কমিশনারের বাড়ীর কাছটাতে যখন এসেছি তখন চণ্ডীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হ'ল অনেক কালের কথা—সেই যে সব দিনের বনগ্রাম স্কুল থেকে Home sick হয়ে বাড়ী ফিরতাম। ভারতদের বাঁশতলা, কালীদের বাগানের কোণটা গাবতলাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরীর মত লাগত। কালীর সঙ্গে ইছামতীর ধারে বসে মনে হোত, কতদিন পরে

আবার এসব সুপরিচিত স্থানে এসেছি। নভেলে এইসব শৈশব কালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de force হয়ে প'ড়বে।" (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৪১৭।)

অপুর মত অতি শৈশবকালে জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণ কুঠীর মাঠ দেখিতে গিয়াছিলেন সেকথারও উল্লেখ 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপির তিন জায়গায় পাওয়া যায়। (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ. ৪১১।)

'স্মৃতির রেখা'তে দুর্গা নামের উল্লেখ (বি. র. ১ম, পৃ. ৪৩০) মাত্র একবার পাওয়া যায়। সেখানেও তাহার রুক্ষ চুলের কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। 'স্মৃতির রেখা'তেও দুর্গার মত রুক্ষ চুল ধূলিধূসরিত একটি মেয়ের উল্লেখ একবার পাওয়া যায়। হরিহর ছত্র মেলা দেখিতে গিয়া বিভূতিভূষণ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর শোনপুরে রেলওয়ে-কম্পার্টমেণ্টে বসিয়া লিখিতেছেন: "আজ সকালে মাহেন্দ্র ঘাট থেকে ষ্টীমারে হরিহর ছত্র মেলা দেখতে গিয়ে কত কি দেখলাম। ভেটারীনারী হাসপাতালে জিনিসপত্র রেখে টমটমে বেরুলাম। কি ভিড়, ধুলো। সেই যে মেয়েটি ধূলায় ধূসরিত বেশ নিয়ে বসে আছে, ভারী সুন্দর দেখতে। (বি. র. ১ম, পৃ. ৩৮৬।)

"দুর্গা" চরিত্রের ক্ষীণ উৎসের আভাস উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল 'পথের পাঁচালী' রচনা সমাপ্ত করেন এবং কলিকাতায় 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের দপ্তরে পাঠাইয়া দেন। সে কথা তিনি 'স্মৃতির রেখা'তেও উল্লেখ করিয়াছেন:

"আজ আমার সাহিত্যসাধনার একটা সার্থক দিন—এইজন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।" (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ম, পৃ ৪৩২।)

'ইছামতী' ও 'দেবযান' (দেবতার ব্যথা) নামক উপন্যাস রচনা করিবার পরিকল্পনাও ইহাতে পাওয়া যায়।

'স্মৃতির রেখা'য় ১।৩।২৮ তারিখের দিনলিপিতে তিনি 'ইছামতী'র খসড়ার কথা লিখিয়াছেন। ১৫।৩।২৮ তারিখে 'দেবযান' (দেবতার ব্যথা) সম্পর্কে লিখিতেছেন:

"'দেবতার ব্যথা'য় এইরকম লিখতে হবে যে, যে কোন উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা করে—পথও হারিয়ে যায়। অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা, দুর্জয় সাহসী pioneers।"

'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও জীবনের উন্মেষকালের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

'আমার লেখা'

"আমার লেখা" রচনাটি প্রথমে 'নবাগত' গল্প-গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (প্রকাশকাল : ২৫ জানুয়ারী, ১৯৪৪)। ১৯৪৫ সালের ৯ জুন কলিকাতা কেন্দ্র হইতে এক বেতার-ভাষণে তিনি রচনাটি প্রচার করেন। পরে 'গল্প-পঞ্চাশৎ' গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে উহা মুদ্রিত হয় (পৌষ, ১৩৬৩, ইং ১৯৫৬)। বিভূতিভূষণের প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও পত্র-সংগ্রহ একত্র করিয়া ১৩৬৮ সালের ২৮ ভাদ্র 'আমার লেখা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। "আমার লেখা" রচনাটি উক্ত গ্রন্থের প্রথম রচনা হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। (দ্রঃ পুস্তক পরিচয়, মেঘমল্লার)।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

'পথের পাঁচালী'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিভূতিভূষণের পত্র

কলিকাতা
প্যারাডাইস লজ্,
৪১, মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
১৮।১১[১৯৩১]

শ্রীচরণ কমলেষু,

আপনাকে কোনোদিন পত্র লিখিনি, এজন্য প্রথম পত্র লিখ্তে কেমন একটু ভয় ভয় করে। এবার ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা করি, কিন্তু দার্জ্জিলিং থেকে ফেরবার কোনো সংবাদ পাইনি। আশা করি আপনার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভালো।

গত শ্রাবণ মাসে একবার জোড়াসাঁকোয় বাড়ীতে গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সে সময় আমার 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে কি লিখ্তে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তখন আপনার শরীর ভালো ছিল না বলে তারপর এ নিয়ে আর কোনো কথা ওঠাইনি। আর একখানা ছোট গল্পের বই বার করেচি, সেখানাতে আগের লেখা গোটা দশেক গল্প আছে—দুটো ছাড়া বাকীগুলো প্রবাসীতে বার হয়েছিল। সব গল্পই 'পথের পাঁচালী' লিখ্‌বার আগে লেখা—অনেক ক্ষেত্রে ৬।৭ বছর আগেও লেখা। 'উপেক্ষিতা' গল্পটী বইয়ে দেওয়ার

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ওটা আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম গল্প সে হিসেবে ওর প্রতি একটা মায়া আছে শুধু এই জন্যেই ওটা দিয়েচি।

আপনাকে একখানা 'পথের পাঁচালী' ও একখানা 'মেঘ মল্লার' পাঠালাম। আপনার সময় মত যদি কিছু লেখেন, তবে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করবো। লেখাটা যদি কৃপা করে 'বিচিত্রা'তে পাঠান, তবে ভাল হয়, কেননা বইখানা 'বিচিত্রা'তেই প্রথম বার হয়েছিল। আপনাকে আর একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, এর মধ্যে আর বোধহয় কল্‌কাতায় আস্‌বেন না ?

'পথের পাঁচালী'র অনুবৃত্তি 'অপরাজিত' বলে উপন্যাসখানা সম্প্রতি প্রবাসীতে শেষ হয়েচে— বড়দিনের আগেই প্রকাশিত হবে। আপনি মাসিকের পাতায় উপন্যাস পড়েন না জানি—বইখানা বেরুলেই আপনাকে পাঠিয়ে দেবো—তবে সেবার সমালোচনা লিখ্‌বার জন্য আপনাকে বিরক্ত কোরবো না।

প্রণত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—'পথের পাঁচালী'র আর এক ভলুম এর পরে লিখ্‌বো। একটী শিশুমন বিশ্বের আলোয় তার পাপড়ী গুলি কিরূপে ধীরে ধীরে মেলচে, এর বিপুল রহস্যের প্রতি সচেতন হয়ে উঠ্‌চে—এই বইগুলিতে সেটাই বক্তব্য। খুব তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাগুলোকেও দিয়েচি এই জন্যে যে গোটা জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডারে তাদের দান অমূল্য ও অক্ষয়। আপনার একটুও যদি ভাল লাগে, তবে আমি রচনা সার্থক বিবেচনা করবো।

'বিশ্বভারতী'র সৌজন্যে মুদ্রিত

—প্রথম খণ্ড সমাপ্ত—